নিবেদিতা রচনাসংগ্রহ

চতুর্থ খণ্ড

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৯শে ভাদ্র ১৩৮৬
৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

প্রকাশক
বিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীকানাই লাল বসাক
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

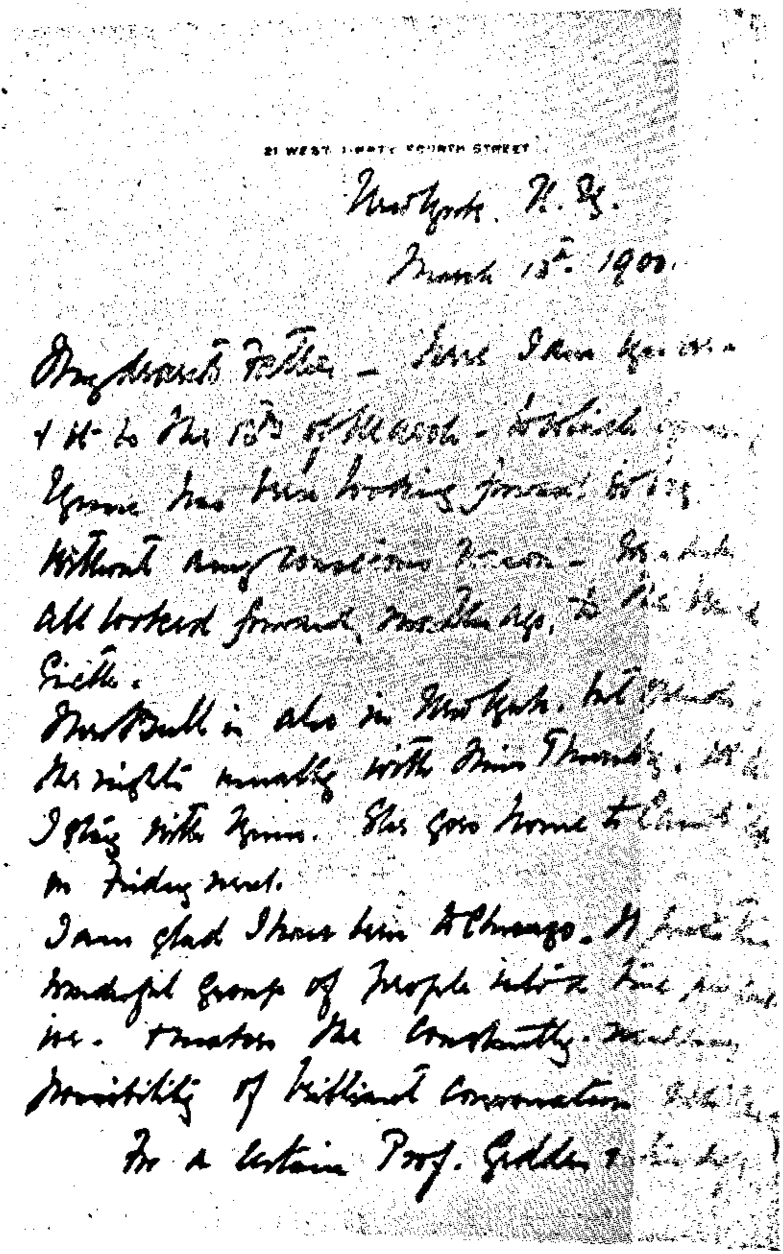
প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

গ্রাহক মূল্য—পাঁচ খণ্ডে মোট ৬০ টাকা

Nivedita Rachana Samgraha
The works of Sister Nivedita
Vol. IV



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জায়া সারদা দেবীর সঙ্গে


21 WEST THIRTY FOURTH STREET

New York. N.Y.
March 13th 1900.

My dearest Father — Since I saw you [illegible] to the 15th of March — to which Yum has been looking forward so long without any conscious reason — [illegible] all looked forward months ago, to [illegible]

Mrs Bull is also in New York. [illegible] the nights usually with Miss Thursby, [illegible] I stay with Yum. She goes home to Cambridge on Friday next.

I am glad I have been to Chicago. It [illegible] wonderful group of people [illegible] constantly [illegible] possibility of brilliant conversation [illegible]

For a certain Prof. Geddes [illegible]

স্বামীজির কাছে ভগিনী নিবেদিতার লেখা চিঠির প্রতিলিপি

নিবেদন

বইপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই প্রকাশের যে সুনাম অর্জন করেছিল—সন্দেহ নেই, তা এখন অনেকাংশে ম্লান। গ্রাহকরা দিনের পর দিন ঘুরছেন। মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে এক একটি খণ্ড প্রকাশে। এর দায়িত্ব স্বীকার করেও বলতে চাই, পরিস্থিতি এজন্য দায়ী।

নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বই প্রকাশ এর আগেও আমরা করেছি। কিন্তু যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে—তার নজীর সম্ভবতঃ নেই। কাগজের প্রতি রীম বিক্রয় হচ্ছে চড়া দামে। ছাপাখানায় কাজ ব্যাহত নিয়মিত বিদ্যুত ঘাটতির জন্য। অনিয়মিত প্রকাশনা আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ফেলছে প্রকাশকদের।

এতকিছুর মধ্যে প্রকাশিত হল নিবেদিতা রচনাসংগ্রহের চতুর্থ খণ্ড। এই খণ্ডে অনুবাদকর্মে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী বিনয় চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ঘোষ ও মনোশ্রী ল্যাহিড়ী। এদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাস কয়েকের মধ্যে পঞ্চম তথা শেষ খণ্ড প্রকাশনায় আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বিনীত—

বিকাশ ঘোষ

প্রকাশক-পক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ১৩৮৬

সূচীপত্র

ভারতীয় জীবনের বুনানি

টানা সুতার বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়

কলকাতা শহরে হিন্দু-জীবনে যে অবস্থায় আমি প্রথমে প্রবেশ করি, তা হোল : আহার, নিদ্রা এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় চালাবার জন্য নিজের একটি বাড়ী ; এবং আশপাশের এক দল মহিলা বন্ধুর অকুণ্ঠ স্বাগত অভ্যর্থনা। এঁদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আমি দিনে রাতে যখন খুশি জলে্ম করে গিয়েছি এসেছি। আমি যখন আসি, তখন মায়ের শারদোৎসব শেষ হয়েছে। শীতের শেষে যখন প্লেগের মহামারী দেখা দেয় তখনও আমি সেখানে। রাত্রে পথগুলিতে মানুষের গাদি লাগত। সেই মানুষেরা প্রার্থনার বিচিত্র সংগীত গাইত, আর ধর্মীয় উত্তেজনায় অর্ধোন্মাদের মত হয়ে যেত। আমি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও সেখানে ছিলাম। সে সময় কাজ হয়ে উঠত বোঝা এবং এ রকম অবস্থায় কি করে যে জীবনধারণ করতে হয়, সেটা কেবল হিন্দু বন্ধুরাই জানতেন। বর্ষা আরম্ভ হলে আমি কিছুক্ষণ বাড়ী থেকে বেরোতাম ; দেখতাম আশপাশের পথে ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়াগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রয়েছে। তাদের পেট পর্যন্ত জলের মধ্যে ডুবে।

কি সুন্দর পুরাতন জগতের মধ্যেই না আমি সেই মাসগুলি কাটাই। সে জগৎ চলত ধীর গতিতে, এমন এক ছন্দে ও তালে যা আমার জানা সবকিছু থেকে আলাদা। এ জগতে মহতী চিন্তা বা তীব্র আবেগকেই প্রকৃত কাজের মত কাজ বলে ধরা হতো। সেই চিন্তা বা আবেগ দিনগুলিকে এমন এক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করত, যা করা অন্য কোন কাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ এমন এক জগৎ যেখানে কটিবাসপরিহিত ব্যক্তিরা ধুলায় ভরা পথের ধারে দরজার চৌকাঠে বসে শেক্সপীয়র ও শেলী সম্পর্কে এমন সব কথা বলতেন, যা শোনার জন্য আমাদের কেউ কেউ দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে রাজি ছিলেন। গাম্ভীর্য, সারল্য এবং মহৎ চরিত্র ও ইচ্ছার সুদৃঢ় ও স্থায়ী বাস্তবে সে জগৎ পূর্ণ ছিল।

সূর্যাস্তের পর পাড়ার চতুর্দিকের প্রতিটি বাড়ীর ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির সময় ঘোষণা করে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসত। ঠিক সেই সময়টিতে হয়তো দেখা যেত ছুতার তাঁর যন্ত্রপাতির সামনে ধুনো দিচ্ছেন বা স্কুলের ছাত্ররা তাদের দোয়াত-কলমের সামনে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে। দিনের কাজের নিরভিমান সহায়ক এই যন্ত্র ও উপকরণগুলিকে সবাই যেন তাদের কাছে পাওয়া সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করছে। পুজায় যাবার পথে গঙ্গা নজরের মধ্যে পড়লেই বা তুলসীতলা দেখলেই মহিলারা থেমে দুহাত জোড় করে মাথা নত করে প্রণাম করবেন। হিন্দু সংস্কৃতির মর্মটি যখন আমার জীবনসংগীতের রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এই সন্ধ্যার সময়টি এবং সূর্যোদয়ের ক্ষণটি ক্রমে ক্রমে আমার দৈনন্দিন জীবনের বড় ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। মেটরলিঙ্ক যাকে 'বিরাট সক্রিয় স্তব্ধতা' বলেছেন, ভারতে সেই নৈঃশব্দ্যে বিশ্বাস করতে শেখা যায়। আর এই মুহূর্তগুলিতে চেতনা যেন রাজমিস্ত্রির ওলন দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা ভারের মত চিত্তের গভীরে নেমে আসে, চিন্তাকে পিছনে ফেলে রেখে এসে এমন কিছুর সান্নিধ্য লাভ করে, যার পরিমাপ করা হয়নি এবং যার পরিমাপ করা যায় না। ভার-কেন্দ্র সরে যায়। ভারতের বাণী অনুযায়ী দৃষ্ট বস্তু স্থান কালের বেলাভূমিতে অ-দৃষ্টের ভেসে-আসা ধ্বংসাবশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দিবালোকে সংঘটিত কোন কিছু এই অভিজ্ঞতার পাল্টা আকর্ষণ হিসাবে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, ভারতের দিন তার নিজের সুরে বাঁধা। দিনের কাজ কম, কিন্তু সেগুলি মর্যাদা ও নিষ্ঠা সহকারে করা চাই। প্রতিটি কাজের চারপাশ থেকে যেন দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আমাদের কাছে আহার ও স্নান প্রধানতঃ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত ক্রিয়া কিন্তু এখানে আহার ও স্নান ধর্মের অনুষ্ঠান, যা প্রতিটি বিন্দুতে সামাজিক সম্মান ও পবিত্রতার তীব্র আবেগ দ্বারা সুরক্ষিত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতির জীবন প্রবাহিত হতে থাকে। শ্রমের গুঞ্জন এবং যন্ত্রের ধ্বনি আকাশে ওঠে। আর, যেমন বড় বড় মঠে হয়, তারই সঙ্গে থাকে প্রার্থনা সংগীত এবং ধর্মচিন্তার পরিমণ্ডল। দিনের আলো থেকে অন্ধকারে উত্তরণটা অবিশ্বাস্য রকমে দ্রুত। পেঁজা বরফের মত কয়েক খন্ড মেঘ দিগন্তে জমে ওঠে। শুভ্র সেই মেঘগুলি রং বদলে হয়তো কমলা বা গভীর লাল রং পরিগ্রহ করল। তারপর সূর্য নেমে এলেন এবং আমরা সহসা দেখলাম যে ভারতের রাত্রির গভীর রক্তবর্ণ ও কম্পমান তারাগুলির সঙ্গে আমরা একা। বহু দূর উত্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহজ ও বিচিত্র বর্ণের সূক্ষ্ম নীলায় ভরা শুভ্র আকাশে রূপরেখাগুলি নিজেদের স্পষ্টতর করে তোলে এবং বিস্তীর্ণ-অঞ্চলব্যাপী অনুচ্চ পাহাড়গুলি সমুদ্রে ছায়া ফেলে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তরাঞ্চলের আছে সন্ধ্যা, দক্ষিণের আছে রাত্রি।

চৈত্র-বৈশাখে (এপ্রিল-মে মাসে) দিনের শেষে কালবৈশাখী একটা সাধারণ ঘটনা। সেই সময় ঘণ্টাখানেক বা ঘন্টাদুয়েক ধরে প্রকৃতির যে ভীষণ মত্ততা ও আক্ষেপ দেখা যায়, তাদের ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এবং ইতিহাসে পরিদৃষ্ট গুরুত্বের বৈষম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য বৈপরীত্যের বহু নিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ এমন এক দেশ যেখানে মানুষ তার ভিতরের সবটুকু নিঃশেষে উজাড় করে দিতে দ্বিধা

বোধ করে না। তবু কিন্তু লাল আর সোনালি রংয়ের পাশাপাশি তাঁতে বোনা কাপড়ের বিচিত্র বর্ণগুলি কি অননুকরণীয় সূক্ষ্মতার সঙ্গেই না মেলানো হয়। ভারতের জীবনও সেই রকম। তাতে কুসুমের মৃদু কোমলতা এবং বজ্রকঠিন বীর্য পাশাপাশি অবস্থান করে। দুটোই কিন্তু জানা, এবং দুটোকেই স্বাগত জানান হয়। যেমন ধরা যাক আমার পরিচিত একটি ছেলের কথা। ছেলেটির প্রপিতামহী সতী হয়ে স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। ছেলেটি একদিন ছুটে এসে তার মাকে বলে, "মা, মা, মাসীর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। উনি তাঁর চোখের চাহনি দিয়ে আমাকে মারছেন।"

একটা জাত সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার ভিত হচ্ছে তাদের ধর্মটা বোঝা; কারণ সামাজিক কাঠামো প্রধানতঃ শ্রমের উপর নির্ভর করে এবং শ্রমও অবশ্যই স্থানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এইভাবেই আমরা চিন্তা এবং আদর্শের গোপন রহস্যে উপনীত হই। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ 'উত্তরাঞ্চলের মানুষ' বলে অভিহিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকদের কথা ধরা যাক। এদের দৃষ্টি সূর্যের উপর নিবদ্ধ থাকত। মধ্যগ্রীষ্মের দিন (চব্বিশে জুন) ও বড়দিনের সময়কার ভোজগুলি এরাই খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে এনে চালু করেছিল। সৌরবর্ষে মধ্যগ্রীষ্মের দিন ও বড়দিনের তো অদল বদল হয় না। পক্ষান্তরে দক্ষিণের মানুষের কাছে চন্দ্রের গতিপরিক্রমাই সব। তাই দক্ষিণের লোক এনে দিল খ্রীষ্টের ক্রুশে আরোহণ ও পুনরুজ্জীবন উৎসব ইস্টার এবং ঐ উৎসবের সাত সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হুইটসন-টাইড উৎসব। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌরগণনার মূলসূত্রগুলি ক্যালডিয়াতে গ্রথিত হয়েছিল এবং চন্দ্রগণনার সূত্রগুলি গ্রথিত হয় ভারতে। আজও কলকাতার স্কুলের ছেলেমেয়েরা চন্দ্র এবং তার বিভিন্ন দশার কথা তাদের ইংরেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চেয়ে বেশি জানে। এদিক দিয়ে শেষোক্তদের শক্তি প্রধানতঃ ব্যয়িত হয় সারা দিনের মধ্যে একটা খাড়া লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের উপর নজর রেখে। পড়া ও লেখার কারখানায় কাজের প্রক্রিয়াটাই তো আর শিক্ষা নয়। জীবন আমাদের কাছে যেসব কর্মের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। এবং সেই কর্মকাণ্ডের জন্য সমগ্র যে প্রস্তুতি করা হয় সেটাই হোল শিক্ষা। কাজেই, যেখানে শিক্ষার কাজ চলে, সেই জায়গার অবস্থা ও পরিমণ্ডলের দ্বারা শিক্ষা স্পষ্টতঃই গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

নদীকে নমস্কার করার জন্য যে নারী দিনের পড়ন্ত আলোয় থেমে দাঁড়িয়ে পড়েন, এই ধরনের আর একটি দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। গঙ্গা সম্পর্কে হিন্দুদের গভীর আবেগের মধ্যে কোন গোপন রহস্য নেই। গঙ্গার শীতল জলস্পর্শে কি গভীর হর্ষ। গঙ্গা কি নয়নানন্দদায়িনী।

বর্ষার অধীনতা পাশ থেকে মুক্তি পাওয়া কৃষকের গঙ্গার প্রতি কৃতজ্ঞতা।- গুলিই তো সেই সঞ্চারিত আবেগের যথাযোগ্য ভিত্তি। কোন কিছুকে মূর্তরূপ দেওয়ার যে স্বাভাবিক শক্তি সরল লোকদের মধ্যে আছে, ক্ষমতা, এবং হিন্দুপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য আদর্শবাদকে উপরের উক্তির সঙ্গে : করলে, এইসব মানসিক ভাবানুসঙ্গজাত সুরধ্বনির পুরা হিসাবটা পাওয়া যায়।

গঙ্গার কাছে দীর্ঘদিন বাস করে গঙ্গার ব্যক্তিত্বের জাদুতে অভিভূত হওয়া সত্যিই শক্ত। পৃথিবীর ইচ্ছাবৃত্তিক যেসব সুন্দরী নারী নিজে খেয়ালখুশি মত চালনা করেছেন, তাঁদের খামখেয়ালিপনার, প্রায় বিশ্বাসঘাতকত কিছুটা এই হরিদ্রাবর্ণা, সিংহবিক্রান্তগামিনী, গর্বোদ্ধতা গঙ্গার মধ্যে দেখা যায় সেমিরামিস, মিশরের রাণী ক্লিওপ্যাট্রা ও ব্রিটেনের মেরী স্টুয়ার্ট হিন্দু আদর্শ থে বহু দূরে থাকলেও তাঁদের সকলের শক্তি ভারতপূজিতা মা গঙ্গার মধ্যে রয়েছে সরল লোকদের কাছে গঙ্গা শুধুই মা গঙ্গা। তিনি কি প্রাণদাত্রী, অন্নদাত্রী নন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তিনি পবিত্রতা দান করেন। প্রতিটি স্নানার্থী গঙ্গাজলে নাম সময় একটু জল মাথায় দেবার জন্য পরমশ্রদ্ধায় দেহ নত করেন এবং গঙ্গাজলে পা দেওয়ার অপরাধ ক্ষালনের জন্য, ক্ষমা চেয়ে গঙ্গাস্তোত্র সুরসহকারে আবৃত্তি করেন। দার্শনিকের কাছে এই নদী হোল তাঁর জীবনের প্রবাহ। সেই তরঙ্গ সব বাধা ভাসিয়ে দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে বিশ্বজনীনতার দিকে ছুটে চলেছে বারাণসী এবং পর্বত তুষারের কথা, দেবাদিদেব মহাদেব এবং নারীজাতির জ উমা হৈমবতীর কাহিনী গঙ্গা পরিব্রাজকের কাছে বিবৃত করেন। অথবা গঙ্গ শাখানদী যমুনাপুলিনে অবস্থিত বৃন্দাবনের বনে বনে ভারতের খ্রীষ্টের স্মৃতি এবং তাঁর যৌবনের স্মৃতি গঙ্গা বহন করে আনেন। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে তিনি আর্যদের যুগযুগান্তের চিন্তা ও সভ্যতার ধারাবাহিকতার প্রতীক। বিভিন্ন জাতির জীবন ও বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে প্রবহমানা গঙ্গা তাদের জীবনকে ঐ ও তাৎপর্য দান করেছেন, অতীতের বাণী ভবিষ্যতের নিকট বহন করে নি গিয়েছেন। সে বাণী গভীর প্রতিশ্রুতির, সে আশ্বাস অপরাজেয় স্থৈর্যের কিন্তু এ-সব ধরে নিয়েও এবং এসবের বাইরে গিয়েও, ভক্তদের চোখে গঙ্গা মানবী আমরা যারা গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এত দূরে চলে এসেছি, তাদের প কথাটা বোঝা শক্ত। চন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিত গ্রীকদের আবৃতপদ-অশ্বপৃষ্ঠে আর চন্দ্রের দেবী সেলিনিতে (আর্টেমিস) পরিণত হয়। গ্রীক হর্ম্যের ত্রিকোণাকৃ চূড়ার এক কোণ থেকে গ্রীকদের সূর্যদেব ফীবাস এ্যাপলোর আবির্ভাব ঊষা আকাশের একটা বিশ্বাসযোগ্য চিত্র হয়ে ওঠে। আর দিনের আগমনের সঙ্গে পৃথিবী ও জলকে সচেতন ও জীবন্ত মানুষ মনে করে। তাদের সঙ্গে কথা ব লোকে নিজেরাই আশ্চর্য হয়ে যায়। নদী এবং গাছের প্রতি হিন্দুদের

ও ভালবাসার অভিব্যক্তির অর্থ বোঝার জন্য প্রস্তুতি এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে। এই ভালবাসায় প্রতি দিবসের জীবন স্পন্দিত হয়। "পূজা না করে খাওয়া নয়। স্নান না করে খাওয়া নয়।" অন্ততঃ প্রতিটি নারী এই কঠিন ও কঠোর নিয়মটি মেনে চলে। সেইজন্য নদীতে প্রাতঃস্নান দিনের প্রথম বড় কাজ। প্রত্যুষে মর্যাদা-সম্পন্ন বড় বড় ঘরের মহিলাদের ছোট ছোট দল বাড়ী থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে যেতে যখন আরম্ভ করে, তখনও অন্ধকার কাটেনি। এইসব মহিলা বংশগর্বে গর্বিত বড়ঘরের অসূর্যম্পশ্যা নারী। এ'রা পথিকের দৃষ্টি সইতে পারেন না, আবার ভক্তিমতীরা গঙ্গায় অবগাহনের পুণ্যটাও বাদ দিতে পারেন না। কাজেই সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান সেরে তাঁরা দুটি সমস্যার গ্রন্থিই এইভাবে ছিন্ন করে ফেলেন। এই পুণ্যস্নানের প্রতিটি ক্ষণের স্তোত্র এবং মন্ত্র আছে। ফেরার সময় পিতলের একটি কলসী বা কমণ্ডলুতে তাঁরা গঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে আসেন। আহার এবং পূজার জায়গায় সারাদিন ঐ জল ছিটানো হবে।

বাড়ী ফিরে তাঁরা দেখবেন পূজার ফুলের সাজি, ফুলের চুপড়ি, ততক্ষণে এসে গিয়েছে। ফুল দিয়ে পূজনীয়ের পা ঢেকে দেওয়া হিন্দুদের পূজার একটা বড় অঙ্গ। পৃথিবীর ধূলিধূসরিত এবং বেদনাদায়ক কাজের সঙ্গে সংস্পর্শের দরুন মানুষের পাদুটি দেহের সর্বনিম্ন এবং সবচেয়ে অবহেলিত অঙ্গ বলে পরিগণিত। আর মাথা হোল এমন পবিত্র অঙ্গ, যা কেবল গুরুজনরাই স্পর্শ করতে পারেন। কোন সাধুর বা দেবমূর্তির পদধূলি নিয়ে মাথায় রাখা সেইজন্য ভক্তি এবং নিজের অকিঞ্চনতার প্রতীক। ব্যগ্র প্রেমিক তাই প্রেমাস্পদের 'চরণ কমলে' প্রেম নিবেদন করেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাস্থ্যের দরুন প্রাতঃস্নান করতে যেতে পারতেন না, পয়সার অভাবেও কারও কারও রোজ ঘেরা পাল্কীতে করে গঙ্গায় যাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু বেলা সাড়ে নটা দশটার সময় দেখা যেত বাড়ীর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মেয়েরা মায়ের নিজের পূজার জন্য ফুল, চন্দন আর গঙ্গা-জলের যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মা যখন পূজায় বসেন, তখন তারা ফলমিষ্টির নৈবেদ্য তৈরী করতে ব্যস্ত। পরে তা নিবেদন করে বিতরণ করা হবে।

মন্দির ও গির্জার মধ্যে প্রভেদটা কৌতূহলোদ্দীপক। মন্দিরকে অসম্ভব রকমের ছোট বলে মনে হতে পারে। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয় মন্দির হোল মাথার উপরে আচ্ছাদনসমন্বিত এক পবিত্র স্থান। যার ভিতরে এক বা একাধিক মূর্তি, প্রতীক বা লিঙ্গ আছে। পুরোহিতরা এই মূর্তি বা প্রতীক-গুলির সামনে যথোচিত উপচারসহ যথাবিহিত অনুষ্ঠান পালন করে পূজা করেন। ঠিক ভাবে ধরতে গেলে মায়ের মন্দিরগুলিতেই পূজাবেদীকে বেদী বলা যায়; অন্যান্য মন্দিরে ঠাকুরের সিংহাসনের কথা বলাই বোধহয় ঠিক হবে। কারণ সেসব জায়গায় শুধু ফলফুল নিবেদন করা হয়, কোন বলি দিতে দেওয়া

হয় না। কাজেই এটা স্পষ্ট যে প্রাচ্যের মন্দির খ্রীষ্টানদের গির্জার কেবল সেই অংশটুকুর অনুরূপ, পরিভাষা অনুযায়ী যাকে বলা হয় উপাসনাগৃহের পবিত্রতম অংশ। যিনি পূজো দিতে আসেন, তিনি এখানে অনুষঙ্গ মাত্র। তিনি সিঁড়ির উপরে হয় এমনি বসে থাকেন বা নতজানু হয়ে থাকেন আর তাঁর কল্যাণে বা তাঁর অভিলাষ মত কাজ করে দেবার জন্য পুরোহিতকে দক্ষিণা দেন। অথবা তিনি (স্তোত্র বা মন্ত্র) পাঠ করতে থাকেন এবং ভক্তিভরে মূর্তির ধ্যান করতে থাকেন। গির্জা বলতে কিন্তু উপাসনাস্থলের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকদেরও বোঝায়। মুসলমানদের মসজিদের সঙ্গে গির্জার সাদৃশ্য বেশি এবং বারান্দা প্রভৃতি বাদ দিলে মসজিদ গির্জার আচ্ছাদনহীন অনাবৃত মূল অংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বঙ্গে মন্দির খুব জনপ্রিয় নয়। তার কারণ সব বাড়ীতেই নিজস্ব *একটা* ঠাকুরঘর থাকার কথা। বাড়ীর মেয়েরাই ঠাকুরঘরের কাজকর্ম করেন, অবশ্য কোন গৃহস্থের বাঁধা পুরোহিত রাখার মত পয়সা থাকলে আলাদা *কথা। বাড়ীর* বা পাড়ার একজন ব্রাহ্মণ পূজো করলেও বাড়ীর মেয়েদের *পূজো বাদ যাবে* না। জলগ্রহণ বা আহারের কথা ভাবার আগে ব্যড়ীর মেয়েরা বেশ খুঁটিয়ে নিজেদের পূজো সারবেন। এ সম্পর্কে আমি নিজের পাওনা নিন্দা এবং ভর্ৎসনার একটি কথা কখনও ভুলব না।

সেদিন সকালে আমি প্রথম এক হিন্দু বাড়ীতে গিয়ে উঠেছি। বেশ কয়েক দিন রেলে কাটাবার পর শ্রান্ত ধূলিধূসরিত অবস্থায় সকালে আমি পৌঁছেছি। ঘুমাব বলে মেঝেয় পাতা একটা সতরঞ্চির উপর শুয়েছি। আটটা নাগাদ চা জল-খাবারের ঝুড়ির কথা মনে পড়াতে আমার নিরাশ মনে একটু আশার আলো দেখা দিল। সাগ্রহে বাক্স খুলে আমি চা জলখাবার বার করতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। পাপের প্রতিবিধান করার জন্য যেন দেবদূতের আবির্ভাব হোল। তাঁর বড় বড় বাদামী চোখদুটি এমন বেদনা ও বিস্ময়ে ভরা, যার যথাযথ অভিব্যক্তি শুধু শিশুর মুখেই ফুটে ওঠা সম্ভব। সে ইংরেজী তেমন জানত না। খুব ভেবে চিন্তে প্রতিটি কথার ওপর জোর দিয়ে সে আমাকে বলল, "আপনি—কি—পূজো—করেছেন?"

বর্ষাকালে বাড়ীর উপর তলায় যাবার জন্য ছাতা নেওয়াটা অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কিন্তু আমার বাড়ীর মাঝখানে উঠানদুটি না থাকলে কলকাতার গ্রীষ্ম অসহ্য হয়ে উঠত। উঠানগুলির কল্যাণে প্রাচ্যের ঘরবাড়ীগুলি দিনের বেলা হাওয়া-ভরা গুহায় পরিণত হয়; আর রাত্রে সেগুলি তারাখচিত আকাশের চন্দ্রাতপে ঢাকা শিবির হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আকাশ ও তারা দেখার জন্য দরজা খুলে দেওয়া যে কি জিনিস, সেটা এই অভিজ্ঞতা যাঁর নেই তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না। ভারতের রাত্রি অবিস্মরণীয়। বিরাট, গভীর এবং ঘনকৃষ্ণ এই

রাত্রিকে বৃহৎ কোমল তারাগুলি মৃদু আলোকে আলোকিত করেছে। অজানা এক দ্যুতিতে তারাগুলি মৃদু দীপ্তি লাভ করে স্পন্দিত হচ্ছে। আর কোন রাত্রিচর ভিক্ষুকের গানে রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছে। সে দূরে কোন পথে ভগবানের নাম গেয়ে ভিক্ষা চাইছে। অথবা খোলা মাঠে শৃগালের দীর্ঘ ও সুউচ্চ রব রাত্রির প্রহর ঘোষণা করছে। তালগাছগুলির কানে কানে বলা ফিস্‌ফিসানি এবং তাদের মসীকৃষ্ণ ছায়াসমন্বিত চন্দ্রালোকও এই গম্ভীর 'অন্ধকার রাত্রি'গুলির চেয়ে সুন্দর নয়। এইসব রাতে প্রকৃতির অন্ধ-নীরবতা সুমহান মাতৃভাবসহ ধ্যানগম্ভীর অবস্থায় আত্মার উপর বিরাজ করতে থাকে।

মধ্যযুগে যেসব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেইসব শহরের গৃহিণীরা দরিদ্র ছাত্রদের কল্যাণের জন্য নিজেদের দায়ী বলে মনে করতেন। তেমনি সমগ্র হিন্দু-সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিজের কাজ মনে করে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। ধর্মশিক্ষার্থীদের পুরো দায়িত্ব সমগ্র হিন্দু সমাজের। যেখানেই ধর্মশিক্ষার্থী সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি যেসব গৃহস্থ থাকেন, তাঁদেরই শিক্ষার্থীদের ভার নিতে হবে। আমি ছাত্রের মত অভিনিবেশসহকারে তাঁদের ধর্মের তত্ত্ব বুঝাবার চেষ্টা করি বলে, আমার সহৃদয় প্রতিবেশীরা সংসারের জিনিসপত্র জুগিয়ে সর্বদাই অনুগ্রহ দান করেছেন। এই সদয় ব্যবহারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, বোধহয়, আমার কোন অতিথি আসবেন, সে কথা বললেই হোল; সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিবেশীরা রান্না করে খাবার পাঠাবেন, বিছানাপত্র পাঠিয়ে দেবেন। এই দান ও অনুগ্রহের জন্য যাঁদের কাছে আমি ঋণী, তাঁদের নাম পর্যন্ত আমি জানতে পারতাম না। আর এইভাবে সাহায্য করে গেলেও 'আমি কি পড়ছি, কি সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, সে বিষয়ে কেউ আমাকে কখনও কোন প্রশ্ন করেননি, আমার পাঠক্রমের গঠন ও রূপ সম্পর্কেও কোন সমালোচনা হয়নি। গৈরিকবাসপরিহিত সন্ন্যাসীর পরিচর্যা করা যেমন তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ, এক ইউরোপীয় নারীকেও তাঁরা সেই পরিচর্যা সহজেই দিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে বিষয়মুখী গবেষণা করাই সেই ছাত্রীর উদ্দেশ্য। আর এটাও তাঁরা ভাল করে জানতেন যে, ঘরকরণার কাজ চালান ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব নয়। যে সংস্কৃতি এত সহজে জীবনে প্রয়োগ ও পুনঃপ্রয়োগ করা যায়, তার গভীরতার কী পরিচয়ই না এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়! জনসাধারণের বুদ্ধির স্বাধীনতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে কত কথাই না আমরা এ থেকে জানতে পারি!

ভারতীয়দের জীবনে ভিক্ষুকদের ভূমিকা ও সামাজিক তাৎপর্য যত কৌতূহলোদ্দীপক, তেমন কৌতূহলের বিষয় কমই আছে। কান্ট এবং স্পিনোজার জীবনের মত জীবনে সম্পত্তি সম্পর্কে যে অরুচি আমরা দেখি, সেই অরুচিই ভারতের পরিমন্ডলে সহজেই নিঃস্ব অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। আশ্রয় এবং

পরিধান সেখানে প্রায় প্রয়োজনই নয়। যেকোন গৃহস্থের দ্বারে একমুঠো ভাত ও দুচারটে শাকসব্জী পাওয়া যায়; কেবল সেগুলিই হোল 'না-হলে-নয়' গোছের জিনিস। কিন্তু মহৎ চিন্তার দায়িত্ব এবং তার সহায়কদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের দায়িত্ব ভিক্ষুকের উপর এসে পড়ে। ভিক্ষুক উঠানে দাঁড়িয়ে কোন স্তব গান করে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। ভিখারী আসে ভগবানের নাম নিয়ে। ভিক্ষুক-দের বিচিত্র খেয়ালে ভরা এবং সরল গীতাবলীর একটা নিজস্ব সাহিত্য আছে। আমরা ইয়োরোপে যাকে কেল্টিক বা কেল্টীয় ভাব বলি, সেইভাবে এই গানের সাহিত্য পূর্ণ। সেইজন্য সর্বনিম্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতের ভিক্ষুক তার দেশের লোকসংগীতের রক্ষক। কিন্তু যেখানে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুদৃঢ়, সেখানে সে তার চেয়ে অনেক বেশি। যে নারী তার ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা দেয়, তার চোখে ভিক্ষুক তখন ধর্মোপদেষ্টা; সেই নারীর সংগে ভিক্ষুক তখন এমন সব বিষয়ে কথা বলে, যা নিয়ে ভিক্ষুকের সংগে আলোচনা করতে ভিক্ষাদাত্রী অক্ষম। এইভাবে ভিক্ষুক মহত্তম সংস্কৃতি দূরে দূরান্তরে বহন করে নিয়ে যায়।

বলা হয় যে, রণজিৎ সিংহের আমলে দান-ধ্যান করার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পুনরভ্যুদয়ের ফলেই পাঞ্জাবী নারী সমাজের ভারতীয় দর্শনের সংগে গভীর পরিচয় হয়। "ওই যে একদিন দুপুরে দুয়ারে দাঁড়িয়ে লোকটি ভিক্ষা চেয়েছিল, ওই যে যার মুখে ছিল জ্ঞানের দীপ্তি"—ভিক্ষুকের ফেলে যাওয়া এই ধরনের স্মৃতি নিয়ে চিন্তা করলে আমরা সেই অনুভূতির একটা সূত্র পাই, যে অনুভূতি পরমেশ্বরকেও ভিক্ষুক রূপে অংকিত করে।

সারা শহরটা কয়েকটা পাড়ায় ভাগ করে, একটা নির্দিষ্ট দিনে একটা নির্দিষ্ট পাড়ায় গিয়ে হাজির হওয়াটা বেশ মজার। বুধবার আর রবিবার ছিল আমার বার হবার দিন। একদিন সকাল নটা আন্দাজ বেরোবার পর আমি সৌভাগ্যক্রমে দেখতে পেলাম গলি দিয়ে পুরো একটা মিছিল আসছে। তাতে মেয়েপুরুষ দুই-ই ছিল। তাদের বেশির ভাগই বয়স্ক কিন্তু সুস্থ ও সবল। তাদের ডান হাতে লাঠি আর বা হাতে ধাতু বা কাঠের ভিক্ষাপাত্র। আমার দেখা সবচেয়ে প্রফুল্ল মানুষদের মধ্যে তারা পড়ে। শহরটাকে প্যাকাপাকিভাবে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করাকে ট্যাক্সের টাকা দিয়ে গরীবদের সাহায্য করার একটা ভিত্তি হিসাবে ব্যবস্থা করা যায়। (ভারতে অবশ্য এ রকম কোন ব্যবস্থা নেই।) এ থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, নিজেদের অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে এবং সংগঠন করতে হিন্দুরা অন্য যে কোন জাতের মতই পটু। দরিদ্র-আশ্রমে কিছু কাজের বিনিময়ে আহার ও আশ্রয় দান হয়তো একটা প্রয়োজনীয় সমাধান হতে পারে। কিন্তু সমাজের অধিকতর সম্পন্ন অংশের মধ্যে অভাব এইভাবে ছড়িয়ে বিতরণ করা এবং সংগে সংগে দানকে মনের স্বাভাবিক অনুভূতির সংগে মিলিয়ে দেওয়া আমাদের (ইয়োরোপীয়দের) আচরণের

চেয়ে ঢের কম যান্ত্রিক এবং ঢের বেশি মানবতাবোধদ্বারা অভিসিঞ্চিত বলে মনে হয়। নিজেদের অযৌক্তিক বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষ কতটা নাছোড়বান্দা হতে পারে, তা দেখে মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক বোধ করা যায়। এক ইংরেজ মহিলা একটি ভারতীয় ভিক্ষুককে একখানা পাঁউরুটি দিতে চাইলেন, ভিক্ষুক তা নিল না, অথচ পাঁউরুটির দামের পয়সাটা পেলে সে খুবই খুশি হতো। আমি দেখলাম এতে ইংরেজ মহিলাটি খুবই দুঃখ পেলেন। দাতা এবং তাঁর বন্ধুরা ব্যাপারটা আগাগোড়া অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে ধরে নিয়ে হতাশ বোধ করলেন। কিন্তু ঘটনার দর্শকের চোখে মনে হোল, জেদটা ছিল তাঁদেরই। ইংলণ্ডে লোককে সাবধান করে দিয়ে বলা হয় যে, যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার জোটে না, সেই গরীবদের মদ সর্বদাই প্রলুব্ধ করছে। সেইজন্য তাদের পয়সা না দিয়ে খাবার দেওয়াই ভাল। কিন্তু ভারতে এদিক দিয়ে মোটেই কোন ঝুঁকি নেই। কারণ শতকরা একজন মানুষও মদের স্বাদ কেমন তা জানে না, আর হিন্দু ভিক্ষুক মদ্যজাত খামি (যেমন তাড়ি) দিয়ে তৈরী পাঁউরুটি খাবে না। তাছাড়া তার নিজের জাতের বা তার চেয়ে উঁচু জাতের লোকের হাতে সেঁকা না হলে সে পাঁউরুটি সে মুখে দেয় কি করে? এখন এ পাঁউরুটি ছিল তাড়ির খামি দিয়ে তৈরী। মুসলমানের সেঁকা আর খ্রীষ্টানের ছোঁওয়া। মহিলাটি যে দিতে চান তা লোকটি বুঝেছিল, কিন্তু দানের সঙ্গে তিনি কেন সব অসম্ভব শর্তের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন? আমিও ঠিক তারই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করেছিলাম—কেন?

রাত্রে যারা ভিক্ষা করে, তাদের আচার আচারণ বড় অদ্ভুত। এরা মুসলমান এবং সব পাড়াতেই তারা চরে খায়। তাদের হাতে একটা ভিক্ষাপাত্র (নারকেল মালা বা লাউয়ের খোলার পাত্র) এবং আলো বা চেরাগ। এইগুলিই তাদের বৃত্তির নিদর্শন। এই ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কতটা পয়সা দরকার সেটা দিনান্তে সূর্যাস্তের সময় তারা ঠিক করে নেয়। তারপর তারা কিরা বা দিব্যি করে নেয় যতক্ষণ ওই পয়সা যোগাড় না হচ্ছে, ততক্ষণ তারা থামবে না। সেইজন্য সময় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে আর কত পয়সা পেলে তাদের লক্ষ্য পূরণ হবে। যারা রাত করে বাড়ী ফেরে, বা যারা অসুস্থ ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে রয়েছে, তারা খুশি মনে সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে এদের গোলমাল থামিয়ে শান্তি পেতে চায়। তারকাখচিত আকাশের নীচে আল্লার নাম নিয়ে তার অবিশ্রান্ত জয়ধ্বনি ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুনলে মনে একটা অপার্থিব ও রহস্যময় ভাবের উদয় হবেই।

প্রবল জোয়ারের মত মাসগুলিকে আঘাত করে বারো মাসে বারো-তেরোটি পালপার্বণ উৎসব আসে যায়। বঙ্গে সবার বড় উৎসব হোল শারদীয়া পুজো—বিশ্বশক্তির আরাধনা উৎসব। প্রকৃতিমাতার যা কিছু সুন্দর, যা কিছু স্নেহকোমল

কোমল, তার চিন্তা ও আরাধনার জন্য পরের একটি মাসে নির্দিষ্ট আছে। ভারতের মিনার্ভা দেবী সরস্বতীও অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকেন। যাঁরা ল্যাংকাশায়ারে বাস করেছেন তাঁদের মনে পড়বে (লেণ্ট উৎসবের মধ্যে ইস্টারের পূর্বে) সিনেল রবিবারের সময় পথ ও কুটিরগুলির চেহারা কেমন বদলে যায়। প্রতিটি জানালা কেক দিয়ে সাজানো, আর চিনির রসে ডোবানো বাদাম দিয়ে তৈরী প্রতিটি কেকে যাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে ঘোরার বা অন্য কোন স্থানীয় দৃশ্যের প্রাণবন্ত ছবি। আমাদের বড়দিনের সময় চিরশ্যামল 'হলি'-গুল্ম এবং 'মিসলটো' নামে চিরহরিৎ এক পরগাছা দিয়ে সাজানো দোকানগুলি আনন্দে ঝলমল করে। ফলে সময়টা যে কি—তা নিয়ে আর ভুল হয় না। তেমনি কলকাতায় পূজার আগে বাজারে বিশেষ বিশেষ জিনিসের আমদানী হয়। এই যেন একদিন কাঁচপোকার পাখা আর ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরী হাতপাখা আমদানী এল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দোকানে এবং প্রতিটি ফেরিওয়ালার হাতে সুন্দর পাখাগুলি দেখা গেল। আশ্বিন-কার্তিকে দুর্গাপূজার সময় যেমন এগিয়ে আসে, পথে পথে মায়ের আবাহন সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হোল বিজয়ার দিন, প্রতিমাবিসর্জনের দিন।

নির্দিষ্ট দিনগুলির বেশি দিন সচরাচর তিনদিনের বেশি কোন প্রতিমা রাখার বিধি নেই। পূজা আরম্ভ হবার আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিমা পবিত্র বস্তু নয়—যে কেউ তখন প্রতিমা ছুঁতে পারে। সন্ধ্যায় সারাদিন উপবাসী এক ব্রাহ্মণ প্রতিমার সামনে বসে ধ্যান করেন, বলা হয় তিনি প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছেন। যেসব মন্ত্র তিনি সুরসহযোগে পাঠ করেন, সেগুলিকে তাঁর নিজের মনঃসংযোগের সহায়ক বলে ধরা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর দেবীমূর্তি পবিত্রতা লাভ করে। তখনও কিন্তু প্রতিমার পূজা হয় না। এ্যাংলিকান গির্জায় চিত্রিত কাঁচের জানালা বা বেদীর যে অবস্থা, প্রতিমার অবস্থাও এখন সেই রকম। তখন প্রতিমা ভক্তি-নম্র ভাবনা ও অনুভূতির কাছে ইঙ্গিত বা সংকেত মাত্র। প্রতিমার সামনে পাদপীঠে পিতলের একটি জলপূর্ণ ঘট। পুরোহিতের মন ওই জলের দিকেই নিবদ্ধ। বলা হয়, এইভাবেই মূর্তিহীন অরূপ ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। নিজের ইচ্ছাকে ব্যাহত ও ব্যর্থ করে, প্রতিমার পক্ষে শুধুই মূর্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে হিন্দুর মন খুবই সচেতন বলে মনে হয়। কেবল পূজার সময়েই এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বিধান দেওয়া হয় যে পূজা-শেষে প্রতিমা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নদীতে বিসর্জন দিতে হবে। সেইজন্য তৃতীয় সন্ধ্যায় সূর্য অস্তাচলে যাবার সময় শোভাযাত্রা বেরোয়। শোভাযাত্রা বাড়ীর দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় প্রতিটি বাড়ী থেকে দুচারজন লোক তাতে যোগ দেয়। একজন বা দুজন দেবদেবীদের প্রতিমা

নিয়ে যাচ্ছে। তাদের পিছনে পিছনে চলেছে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এবং অন্যান্য লোকজন। গঙ্গাতীরে পৌঁছবার আগে আঁকাবাঁকা দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। সেখানে গিয়ে প্রতিমার মুকুট সাবধানে খুলে নেওয়া হয়। সৌভাগ্যপ্রদ এই মুকুট এক বছর ঘরে রাখা হবে। তারপর নদীর জলে নেমে প্রতিমা-বাহকরা প্রতিমা উঁচু করে তুলে ধরে যতটা দূরে সম্ভব ততটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা দাঁড়িয়ে দেখি দুর্গার পিঠভরতি চুল নদীর জলে একবার ভেসে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে। তারপর প্রায়শঃই ছেলেমেয়েদের চোখের জলের মধ্যে আমরা বাড়ী ফিরি। বাড়ী থেকে আনন্দদায়িনী অতিথি চলে গিয়েছেন। যেখানে তিন দিন ধরে পূজো আর ভোজের উৎসব ছিল, সেখানে এখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। তবে পরিশ্রান্ত মহিলা দিনরাত ধরে রান্নার হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশি। বাচ্ছা ছেলেমেয়েরাও তাড়াতাড়ি তাদের হাসিখুশি ভাবটা ফিরে পায়। দু-এক মাস পরেই তো আসছে নতুন কোন উৎসব। সেই উৎসব স্মৃতির নতুন ভাণ্ডার এনে দেবে।

সন্ধ্যায় কোন হিন্দু-নগরীর ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করলে প্রাচ্য জীবনের পরম শোভন এবং ভদ্র ভাবটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাড়ীতে ঢোকার পথ এবং জানালাগুলির পাশে পাথরের চওড়া বেঞ্চি। নৈশ ভোজনের পর তার উপর বসে পুরুষেরা সাগ্রহে আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু পথে নারীরা নিরাপদ। একটা কথা বলে ডাকার বা তাঁদের দিকে চেয়ে দেখার স্বাধীনতা কারও নেই। হিন্দুদের মহাকাব্য রামায়ণে লক্ষ্মণ যেমন সীতার রত্নাভরণের মধ্যে কেবল তাঁর পায়ের নূপুর চিনতে পেরেছিলেন, তেমনি পুরুষের সম্মান ও মর্যাদাবোধ নির্দেশ জারি করে বলে দিয়েছে যে পথচারিণীর পায়ের উপরের কোন অংশে নজর দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম এমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় যে, পথে বেরোনর মত অগ্নিপরীক্ষার বিরল উপলক্ষ্যেও এক ভারতীয় মহিলা তাঁর নিজের ভাইয়ের চোখেও ধরা পড়েননি। আমি দেখেছি ভাই তাঁর নিজের বোনের দিকে না চেয়েই তাঁকে যেতে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে মেয়েরা যে পাড়াপড়শীর বাড়ীতে গল্পগুজব করার জন্য সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টাখানেক বেরিয়ে পড়েন না, তা বলা যায় না। এই সময় বাড়ীর ঝি আলো হাতে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যায়। যাঁরা বিরাট বহির্বিশ্বের মাঝখানে গিয়ে পড়েননি, বা তাঁদের বাড়ীর চৌকাঠ থেকে যতদূর দেখা যায়, তার বেশি দেখেননি, এমন সব শান্ত নারী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এ দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের কুটির সম্বন্ধে যে কথা খাটে, প্রাচ্যের অন্দর মহলের বেলাতেও সেই কথা সত্য। নিজের শক্তিতে গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা নারীর সর্বত্রই সমান। তার গৃহের শিক্ষা দীক্ষা সর্বত্রই একই দাবি ঘোষণা করে। একবার আমার কলকাতার বাড়ীতে এক ইয়োরোপীয় মহিলাকে পরিচয় করিয়ে দেবার দুর্ভাগ্য আমার হয়। তাঁর আচরণে আমি গভীর মনস্তাপ পাই।

তিনি চলে গেলে বাড়ীর মহিলারা ব্যাপারটা সব দিক থেকে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত এই কথা বলে শান্তভাবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া হয়ঃ "ও'র ভাল বংশে জন্ম নয়।" আর একবার কোন বিশিষ্ট বন্ধুর আসার সময় আমি সন্ধ্যাবেলা গিয়ে উপস্থিত হই। তাঁকে এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হোল, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়ার মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম মনোভাব ব্যক্ত হোল, যে, আমার মনে হোল আমিই বুঝি সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসে অনধিকার প্রবেশ করেছি। আমি সেখান থেকে চুপিসারে চলেই যেতাম কিন্তু শান্ত একটি হাতের স্পর্শ আমাকে আটকে রাখল। মা বললেন, "আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াও, কারণ ইনি যে কে তা যে আমি জানি-ই না।"

অবশ্য জীবনে কিছু কিছু অসুবিধাও ছিল। ইংরেজ নারীকে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে এমন একটা বাড়ীর সন্ধান পেতে কিছু সময় লেগেছিল। তারপর বাড়ী যখন পাওয়া গেল, তখন আমার পরিচারিকার কাজ করার জন্য হিন্দু মেয়ে খুঁজে পেতে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। অবশেষে বেশ বুড়িসুড়ি একজনকে পাওয়া গেল। আমাকে সে 'মা' বলে ডাকে আর তার অর্ধেক বয়সের মানুষ হয়েও আমি তাকে বলি 'মেয়ে' বা 'ঝি'। এই বৃদ্ধা পরিচারিকা ঘর ধোয়া মোছার কাজ এবং একটা বাধা সময়ে স্নান ও পানের জন্য গরম জল করতে পারত। যেকোনও কারণেই হোক সে এই কড়ার করে নিল যে সে ওই কাজগুলি করবে বটে কিন্তু এই শর্তে যে, আমি তার রান্নাঘরে ঢুকব না। আর তার উনান বা জল ছোঁব না। তবু কিন্তু গরম জল সহজে পাওয়া গেল না। আমার যে উনান ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে এই প্রয়োজনীয় বস্তুটির দাম ছয় ফার্দিং। সেই অর্থের আয়ুধে সজ্জিত হয়ে, আমার বিশ্বাসী পরিচারিকা বেরোল। সে বাড়ী ফিরল একখানি টালি আর লোহার কয়েকটি শিক নিয়ে এবং তারপর সেগুলি দিয়ে পরম নৈপুণ্যসহকারে উনান তৈরী করে ফেলল।

সেই ছোট গলিটিতে দিনগুলি কি সুখেরই না ছিল। হিন্দু জীবনের দৈনিক কার্যপরম্পরা এবং বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত ধর্মান্ধ ফ্যারিসিদের জীবনযাত্রার যে ভীতিপ্রদ চিত্র আমার শৈশবকে তিক্ত করে তুলেছিল তাদের সঙ্গে এই জীবনের কত প্রভেদ। অবিরত স্নান, বিরামহীন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, অর্থহীন জাতিভেদের বিষাদময়ী কাহিনী কি যন্ত্রণাই না দিয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে তার কতই না প্রভেদ! আমার পড়ার ছোট ঘরটিতে আধুনিক ছবি আর কয়েকটি বই ছিল। সেই ঘরটি থেকে প্রফুল্লতম প্রতিবেশীদের দেখা যেত। এই দেখি মা বা ধাত্রীর কোলে বাদামী রংয়ের একটি শিশু; তার চোখে কাজল, তার কোমরে সোনার ঘুনসি, ওদিকে চোখে পড়ে মর্যাদাময়ী কোন মহিলা গঙ্গাস্নানের জন্য ঘাটের দিকে চলেছেন, একটি বার দেখলেই মনে হবে, মাধুর্যে তাঁর মন ভরা। এবার নজরে পড়ল শান্তপ্রকৃতির একটি

লোক। তাঁর মুখ হোল বুদ্ধিজীবির মুখ। তিনি প্রাচ্যদেশসুলভ অবসর উপভোগ করছেন। আর সবার উপরে দীর্ঘ তালবনগুলি। তাদের পায়ের কাছে ছোট ছোট গ্রাম আর পুষ্করিণীগুলি যেন আরামে বাসা বেঁধে রয়েছে। আর এই সময়ে একই সঙ্গে ঠিক আমার জানালার বাইরে নানা ধরনের পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এবং আমার লেখার সময় পাতার উপর তাদের ছায়া পড়ছে। প্রথম রোমান্সের সোনালি আভা এখনও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-সবই যেন নতুন এক জগতে জন্ম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি আহারের জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় কান্নার শব্দ গলির অন্ধকার হবার পরের সময়কার শান্তি ভঙ্গ করে দিল। যে দিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে আমি ঠিক বিপরীত দিকে চাকরদের কুঁড়েঘরের উঠানে গিয়ে ঢুকলাম। উঠানে একটি মরণাপন্ন মেয়ে। আমরা বসে তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। সময় বয়ে যায়। পুরুষেরা শ্মশানে গিয়েছে দাহের ব্যবস্থা করতে। সকালের আগেই সৎকারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমি রোরুদ্যমানা নারীদের কাছে বসে আছি। তাদের আমি সান্ত্বনা দিতে চাই, অথচ কি বলে প্রবোধ দেব তা জানি না। অবশেষে তাদের শোকাবেগে তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ল আর মরা মেয়েটির মা পর্যন্ত আচ্ছন্নের মত আমার বাহুর মধ্যে হেলান দিয়ে শুয়ে রইল। হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণের মত সে সব ভুলে গেল। তারপর শোকে লোকের যেমন হয়, তেমনি, শোকের বন্যা আবার যেন তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আমার দিকে ফিরে সে কেঁদে উঠল ঃ "ওঃ, আমি কি করি ? আমার মেয়ে এখন কোথায় ?"

আমি এরপর চিরদিন এই ধরে নিয়েছি যে ওই ক্ষণটিতে আমি চাবিকাঠি খুঁজে পাই। সহসা করুণার আবেগে আমার মন ভরে গেল। বিয়োগকাতরা মাতার জন্য সে করুণা ততটা নয়, যতটা তাদের জন্য যাদের কাছে অনন্তের কোন বিশেষ ভাষার প্রয়োগ ধর্ম ও নীতির প্রশ্ন। সামনের দিকে ঝুঁকে আমি বললাম, "চুপ কর মা, তোমার মেয়ে মায়ের কাছে, কালীর কাছে।" তারপর একটি মুহূর্ত স্মৃতি স্তব্ধ হয়ে গেল এবং বিশ্ব হৃদয়ের সান্ত্বনার অতল গভীরতার মধ্যে আমরা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—একসঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচ্যের মা

এই আঠার শতাব্দী ধরে ইউরোপ প্রাচ্যের নারীর পবিত্র সারল্য নিয়ে স্বপ্ন দেখে আসছে। এশিয়া একটি অখণ্ড ভূমিভাগ এবং বাইজানটাইন যুগ থেকে গতকাল পর্যন্ত সমগ্র খ্রীষ্টীয় শিল্পের অদ্ভুত বিস্ময় জনয়িত্রী কুমারী প্রাচ্যের সরল সাধারণ মা ছাড়া আর অন্য কোন রূপে প্রতিভাত হয়েছেন ? তাঁর যে উপবাস ও তন্দ্রাবিহীন-রাত্রি-জাগরণের কাহিনী আমাদের বলা হয়, তার ফলে তিনি কি নিজেকে দিব্য ও পবিত্র সাধুসন্তদের জননী বলে নিজেকে চিনে উঠতে পারেননি অথবা অপরের চোখে সাধুসন্তদের জননীর রূপ পরিগ্রহ করেননি ? অবগুণ্ঠনই ছিল যাঁর সবসময়ের পরিধান, খ্রীষ্টজননী সেই নারী ছিলেন আত্মহারা *নম্রতা*। গভীর ও সংযত এক নীরবতার স্পর্শ এবং মাতৃত্বের সেই দিব্যমাধুর্যের বৈভব, যা আমরা তাঁর ছায়ায় সৃষ্ট ও পরিবর্ধিত শিশুর সুগোল সুঠাম মধুর মুখচ্ছবি থেকেই ধরে নিতে পারি,—এছাড়া আমরা সেই মহিমান্বিতা কুমারীর আর বেশি কি জানি ?

এর বেশি কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে তা আমরা ভারত বা প্রাচ্যের অন্য কোন স্থান থেকেই জেনে নিতে পারি। প্রাক-খ্রীষ্ট যুগের শেষ শতাব্দীগুলিতে প্যালেস্টাইন ও লেবানন ছিল কৃষিকর্মের দেশ। সেখানে তখন পুরানো আমলের কৃষকরা বাস করে। জেহাদের ধর্মান্ধ আবেগের বেদীতে তখনও তাদের দগ্ধ উপচার হিসাবে বলি দেওয়া হয়নি। মরুভূমিকে নতুন রূপে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য পশুপালকের জীবনের প্রেরণা যখন বোধকরি ইসলামকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, এবং তারপর ইসলাম যখন আক্রমণাত্মক ভাবধারায় প্রবুদ্ধ হয়ে, প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ক্যালডিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিজের ভাবাদর্শকে সুস্পষ্টরূপ নির্ধারিত করে দেয়, সেই যুগের পূর্বে সিরিয়ার সাধারণ জীবনের সঙ্গে হিন্দুদের জীবনের মিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল। ইহুদীদের মধ্যে ধর্মান্ধ ফ্যারিসী সম্প্রদায় এবং বাইবেলের 'নতুন দলিলের' (নিউ টেস্টামেন্টের) যুগের খানদানি-বংশজাত স্যাডুসি নামে অভিহিত অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ; পানপাত্র এবং আহারের থালা অবিরাম শোধন ; অভ্যাসবশে বারংবার একটি নাম বা মন্ত্র জপ, যার ওপর পরের আমলের খ্রীষ্টানীকৃত চেতনা 'মিথ্যা' এই দাগ অঙ্কিত করে দেয় ;—এসব হিন্দুয়ানীর 'মত' নয়, আমরা যাকে হিন্দুয়ানী বলে জানি—এ-সব ঠিক তাই। এশিয়ার জীবনের ঠাসবুনানিতে সমৃদ্ধ যে বস্ত্রখণ্ড একদিন ভূমধ্যসাগরের উপকূল স্পর্শ করেছিল, এগুলি তারই কয়েকটি সূত্র মাত্র।

মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের মত মৌলিক ব্যাপারেও জাতির নিজস্ব বাণী ধর্মের প্রবক্তারা প্রয়োগ এবং প্রচার করে থাকেন। 'যে মায়ের পদচুম্বন করে, সে স্বর্গে যাবে'—এতো নবীর নিজের মুখের কথা।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এত ভক্তিভরে যাঁর পুজো করা হয়, সেই মা কি কোমল, কি ক্ষীণ তাঁর তনুদেহ, কি কচি তাঁর মুখখানি। ভারতীয় মাতার কোলে তাঁর ছেলে। মায়ের আঁচলে শিশুর দেহ অর্ধাবৃত, অর্ধ উন্মুক্ত। পোপ চতুর্থ সিক্সটাসের আমলে ভ্যাটিকান প্রাসাদে পোপের প্রার্থনা গৃহ সিস্টাইন চ্যাপেলে রক্ষিত যীশু-জননীর কোন প্রতিকৃতি ভারতীয় মায়ের ললাটফলকের মহিমান্বিত শুচিতা, এবং তাঁর কমনীয় ও অনাহত কৌমার্যের দৃষ্টি দিতে পারে না।

এই চিত্র ভারতের জীবনের মর্মস্থলটিতে এমনি ভাবেই বিরাজ করছে। তাকে আদর্শরূপে এঁকে প্রতিফলিত করার জন্য সাহিত্যিক বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই। কাব্যে ও পুরাণে আদর্শ স্ত্রীর চিত্র অনেক আছে, কিন্তু আদর্শ মাতৃত্বের চিত্র একটিও নেই। পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঈশ্বরকে ঈশ্বর জ্ঞানেই পুজো করে। মায়েদের কাছে ভগবান হলেন বালগোপাল। পক্ষিমাতা যেমন সর্বদাই আশঙ্কা করে যে এই বুঝি তার শাবক তাকে ছেড়ে চলে গেল। সেই রকম একটা অর্ধ-করুণ রস পাশ্চাত্য মাতৃত্বের মধ্যে সব সময়েই সমুপস্থিত থাকে। এখানে কিন্তু সেই রসটি নেই। তার জায়গায় আছে অভিভূত করে দেওয়া বাৎসল্য রস। সন্তানের সঙ্গে স্নেহ, মিলনের ভাবটি। মায়ের কাছে ছেলে সব সময়েই শিশু। এই ভাবটি ঢাকতে চাওয়া মানুষের মত মানুষের কাজ নয়। কিন্তু মায়ের জন্যই ছেলের শক্ত সমর্থ সাবালকের আচরণ করা দরকার, যাতে তিনি অন্ধকার ও গভীর প্রয়োজনের সময়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার একটা অবলম্বন পান। মা ও ছেলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনার ক্ষমতা ছেলের স্ত্রীরও নেই, কারণ ছেলের বৌ যতটা না তার স্বামীর, তার চেয়ে বেশি তার শ্বাশুড়ীর। সেইজন্য ছেলের জীবনে অন্য এক নারীর আবির্ভাবে ঈর্ষার সৃষ্টি হয় না। তার বদলে মা-ই ছেলের বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তাগিদ দেন। কনের বাড়ী তত্ত্বাবাস যায় ছেলের মায়ের নামে। আর বিয়ের কদিন আগে গায়ে হলুদের আনুষ্ঠানিক স্নানের জন্য মাঙ্গলিক তেল হলুদ ও গন্ধদ্রব্য নিয়ে তত্ত্ববাহকের যে দল কনের বাড়ী যায়, তারা নতুন এবং প্রতীক্ষিত কন্যাটির জন্য স্নেহের আমন্ত্রণও বহন করে নিয়ে যায়।

ভারতীয় গৃহ তীব্র মাধুর্যে ভরা কিন্তু গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে সেখানেও মা ও ছেলের বন্ধনের সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্কের তুলনা করা যায় না। প্রথম সন্তানটি ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী বধূ যেন নবদীক্ষিতার শিক্ষানবিশী পর্যায় থেকে অগ্রসর হয়ে গেল। সে তখন পারিবারিক কর্তৃত্ব-চক্রের একজন। সমগ্র বিশ্ব যেন মেনে নিচ্ছে যে এখন থেকে

একজনের কাছে তার প্রতিটি কাজ শুচিতায় পরিপূর্ণ অন্ততঃ একজনের চোখে তার কোন দোষ থাকতে পারে না এবং সারা পৃথিবী যেন তার প্রতি তার সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধা রক্ষা করার জন্য পরামর্শ করে ফন্দি এঁটেছে। কারণ সন্তান যে মায়ের কাজের সমালোচনা করবে প্রাচ্যের মানুষের দৃষ্টিতে এমন অবস্থা অসম্ভব। সেইক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেট-জননী গারট্রুডের প্রতি ভারতীয়দের বিতৃষ্ণা প্রায় অতিরঞ্জনের কোঠায় গিয়ে পড়ে। তবু ঘটনার বিবরণ দানের সময় হ্যামলেটের মোহর ঘোর নিশ্চয়ই কেটে যায়! তার কাছে তার মায়ের পাপও পাপ নয়, পুণ্য, দোষও নিন্দার উর্দ্ধে। মায়ের কৃতকর্ম নিজের বলে ধরে নেওয়া ছাড়া অন্যভাবে সে চিন্তা করতে পারে না।

মায়ের প্রতি ছেলের মনোভাব ও অনুভূতিতে পাশ্চাত্যে যে স্বাধীনতা ও কৌতুকবোধ সমুপস্থিত, এই কারণেই প্রাচ্যে তার অভাব বহুলপরিমানে দেখা যায়। পূজারতা মায়ের ঠাকুর ঘরে তিন থেকে ছ'বছর বয়সের শিশুর দল দিনের পর দিন যেন প্রতিজ্ঞা করে দঙ্গল বেঁধে যখন তখন আনাগোনা করবেই; তারা যেন সেনাবাহিনীর মত হানা দিয়ে শহর দখল করছে। হানা দেওয়া যে না হয় তা নয়; ছেলেমেয়েরা হইহুল্লোড় করে লাফিয়ে ভালমানুষ মায়ের পিঠে চড়ে। তারা জানে পূজার সময়ে মায়ের ধর্মকর্ম সব নির্ভর করে মুখবুজে চুপটি করে থাকার উপর। এখন মা তাদের দিকে ফিরে চেয়ে মধুর হাসি হেসেই তাদের সাজা দেবেন। এইভাবে পূজার ব্যাঘাত ঘটছে দেখে এক মা তাঁদের বাড়ীর পুরোহিতকে ব্যাপারটা জানান। পুরোহিত বলেন, "কেন মা, ভগবান তো জানেন তুমি মা, সেইজন্যই তিনি এ সব খুঁত বলে না ধরে মেনে নেন।" প্রাচ্যের গৃহে পাঁচ ছ'বছরের ছেলে-মেয়েদের দুষ্টামি এইভাবে প্রকাশ পেলেও, যে কাঠখোট্টা ইয়ারকীপনার মনোভাব, বাবাকে গভর্ণর আর মাকে 'মাতর' বলতে শেখায়, তা কিন্তু বর্বরতার সামিল। আর যে মেয়ে তার বাপকে পিছনে ফেলে গটগট করে এগিয়ে চলে, সে তো পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করার মত মহা অপরাধে অপরাধী। পিতামাতার স্নেহ এবং পুত্রকন্যার ভক্তি একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। জীবনের প্রথম দুবছর প্রতিটি শিশু যে পরম স্নেহে পরিচর্যার বস্তু। এই কথাটি বুঝতে পারলেই, আমরা মনের গভীরে নিহিত বদ্ধমূল সেই অনুভূতিগুলির গোপন রহস্য জানতে সমর্থ হই। কাজেই ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ ভেঙে যাবার আগেই মনে চেতনা এমন কি চিন্তার সঞ্চার হয়। পাশ্চাত্যে যে নির্ভরশীলতা একটা আবছায়া কলপনা মাত্র, প্রাচ্যের নরনারীর কাছে তা একটা জীবন্ত স্মৃতি।

স্মৃতি যে মোগল সম্রাটকে 'মহান' এই বিশেষণে ভূষিত করেছে, তাঁর জীবনের একটি কাহিনী থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ ব্যাপারটা কত বদ্ধমূল হতে পারে। এক রাজপুত পরিবারে আকবরের এক ধর্ম ভাই ছিল। আকবরের বাবা হুমায়ুন

আকবরের জন্মের আগে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং আকবরের জীবনের প্রথম ছ' বৎসর ওই পরিবারেই অতিবাহিত হয়। আকবরের মাতার মৃত্যুকালে রাজপুত রানী শিশুটির ভার নিয়ে তাকে নিজের ছেলের সংগে ছেলের মত করে মানুষ করেন। শিশু অতিথিটি যদিও তৈমুরের বংশজাত মুসলমান এবং পালিকা-মায়ের দেহে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাজপুত বংশের রক্ত, তবু কিন্তু আকবর ও মায়ের নিজের ছেলে—এ দুজন সহোদর ভাইয়ের মতই মানুষ হতে থাকে। ঘটনাপ্রবাহ বাল্যকালেই বালকদুটিকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং ভাগ্যচক্রের আবর্তনে বিজেতা বংশের বালক বহু বৎসর পরে সম্রাট হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে। সম্রাট হয়ে আকবর দেখেন যে রাজপুত প্রজাদের বশে আনা প্রকৃতই কঠিন। জাতীয় ভাবধারা রাজপুতদের মধ্যে বারবার নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের তালিকার একটি নাম কিন্তু সম্রাট বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একজন ব্যাপারটা তাঁর নজরে এনে বলল, এ বিদ্রোহীর বিচার না হলেই নয়। মন্ত্রণাদাতার কথার উত্তরে মহান সম্রাট বললেন, "বিচারের কথা বলছ বন্ধু, আমার আর ওই *বিদ্রোহীর মধ্যে মাতৃস্তন্যধারার সমুদ্র* প্রবাহিত। বিচার তো সেই সমুদ্র পার হতে পারবে না।"

সুদীর্ঘ শৈশব যে বন্ধন সৃষ্টি করে, সে বন্ধন কিছুতেই ভাঙা যায় না। ভারতীয় পুরুষের দৃষ্টিতে নারীত্বের চিন্তা ও অনুভূতি কখনও ব্যঙ্গহাস্যের উদ্রেক করতে পারে না। মা তাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না—এ কথায় ছেলে কখনও লজ্জা অনুভব করে না। মায়ের ইচ্ছায় পরিচালিত হওয়াকে সে ঠিক বলেই মনে করে।

একমাত্র চরম অধঃপতনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ছাড়া, নিষ্ঠুর কার্যে প্রবৃত্ত অন্য লোকদের মনেও নারীর দুর্বলতা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন খাটিয়ে লোককে যদি তার বুড়ো বয়সে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আচ্ছা, বলুন তো এত পরিশ্রম করার ধাত এবং খুঁটিনাটি সম্পর্কে এমন নাছোড়বান্দা ভাব আপনি কোথায় পেলেন?" তাহলে উত্তর দেবার সময় বৃদ্ধের মন তাঁর সুদূর শৈশবে চলে যাবে, এবং বহুদিন পূর্বে মৃত তাঁর তরুণী মায়ের ইচ্ছা ও উপদেশের স্মৃতি তাঁর উত্তরের মধ্যে ফুটে উঠবে। কোন পথ খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা ব্যক্তিও শিশুর মত স্বাভাবিকভাবেই মায়ের অশিক্ষিতপটুত্বের আলোকে প্রশ্নটির বিচার করে। খুব সম্ভব তার মা লেখাপড়া মোটেই জানেন না, কিন্তু ছেলে জানে মায়ের মন সিধা পথে চলে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভালবাসা এবং অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞান আসে এবং পুঁথিগত বিদ্যার সংগে তার সম্পর্ক কম।

ছ'বছরের একটি ছেলের জীবনের একটি ঘটনাকে বোধহয় মধুরতম অভি

বলীর অন্যতম বলে ধরা যায়, এই ছেলেটি উত্তরকালে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। পণ্ডিত স্বামীর কাছে ছেলেটির মা লেখাপড়া শেখার আগ্রহের কথা লজ্জায় মু ফুটে বলতে না পেরে, ছেলেকে নিজের মনের কথা জানান। তারপর থেকে দিনে পর দিন গ্রামের স্কুল থেকে হেঁটে ফিরে, সে শ্লেট পেনসিল নিয়ে মায়ের সঙ্গে বসে তার সকালের পড়া আবার ফিরে ফিরতি তৈরী করে। এইভাবে গোপনে গোপনে মা তাঁর নিজের ছেলের কাছে পড়তে শেখেন। ভারতের প্রায় সব মহাপুরুষে মধ্যেই মাতৃভক্তির গভীর আবেগ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ এক বিচারকের কথা বলছি প্রায় পঁচিশ বছর হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দেওয়া রায় যেসব ইংরেজ শুনে- ছিলেন, তাঁরা এঁর রায়গুলি ইংলণ্ডের আইনে নজির হিসাবে নথিবদ্ধ করেছেন, এবং যথাস্থানে সেগুলি উল্লেখ করেছেন। এই বিচারক যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর মা একদিন স্নানের পর তাঁকে দেখতে আসার সময় ছেলের ঘরের চৌকাঠে হোঁচট খান এবং ফলে তাঁর পায়ে আঘাত লাগে। রোগ-দুর্বল বিচারক উঠে দাঁড়াতে পারেন না, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মেঝেয় বুক ঘষড়ে তিনি মায়ের সামনে এসে পড়ে মায়ের আহত পা চুম্বন করতে লাগলেন, এবং মায়ের কষ্ট দেখে আত্মগ্লানির অশ্রু দিয়ে মায়ের পা ধুইয়ে দিলেন। এই ধরনের গল্প দিয়ে লোককে আশ্চর্য করে দিয়ে তাদের তাক লাগান যায় বলে নয়, এসব গল্প মানুষের মানুষ নামকে পূতপবিত্র করে বলেই ভারতীয় সমাজে এ ধরনের কাহিনী স্মরণে রেখে বারবার বলা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের পীয়র জীন্ট নাটকে আস-এর সঙ্গে মৃত্যু দৃশ্য পীয়র জীণ্টকে পরিত্রাণ করে তাকে মুক্তিদ করে। জীবনের এই মৌলিক সম্পর্কটিতে যে সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে অপর দিন- গুলিতে বিকৃত ও কলুষিত হতে পারে না, এবং তার সিদ্ধান্তগুলি যতই বিপরীত মনে হোক না কেন, সেগুলি একেবারে অগ্রাহ্য করার মত হতে পারে না। আমাদের পরমপ্রিয় যীশুর মাতা সম্পর্কে কি ধরনের অনুভূতি ও ভাব সঙ্গতভাবে প্রকাশ পেতে পারে, তা নিয়ে খ্রীষ্টীয় জগতে কি বিচিত্র আলোড়নই না চলে যীশুর জীবনে তাঁর মাতার সর্বোচ্চ স্থানটি তো আপনা থেকেই সকলের চোখে পড়ে। তাই মাতার প্রতি তাঁর মধুর ভাবানুভূতি, মাতার উদ্দেশ্যে ভালবাসা ভক্তিতে উৎসারিত তাঁর বাক্যের চেয়ে, খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর মায়ের মিলন ও একাত্মত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোন প্রমাণ থাকতে পারে কি? এইভাবে আশ্চর্য সারল্য সহকারে প্রাচ্যের বিরাট হৃদয় আমাদের ক্ষীণ যুক্তিগুলি ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের চোখের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরে।

কিন্তু ভারতে কেবল মহাপুরুষরাই মাকে পূজা করেন না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের এক প্রতপ্ত দিনের দীর্ঘ প্রহরগুলির কথা আমি ভুলব না। প্লেগে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী এক বালকের শয্যাপার্শ্বে আমি বসে আছি। সে গৃহ অতি দরিদ্রের।

তার মাটির দেওয়াল এবং খড়ে-ছাওয়া চাল। বালকটি এক শূদ্র পরিবারের। দেখে মনে হোল তার বাবাও লিখতে পড়তে জানে না। ছেলেটির বয়স এগার-বারো বছর হবে। তার বাঁচার আর কোন আশাই নেই। তাদের গৃহে সমাগত ব্যক্তিরা যে উপকারটুকু করতে পারে তা হোল রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে সে সম্পর্কে সতর্কতার ব্যবস্থা করা। ছেলেটির ঘরের সামনের উঠানের অপর দিকে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে যেসব নির্বাক নারী আসা যাওয়া করছিল, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ পেলেই ছেলেটির শয্যাপার্শে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াচ্ছিল। অজ্ঞানতা-জনিত হঠকারিতার দরুন সে রোগে সংক্রামিত হবার বিপদ ডেকে আনছিল। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বোঝাবার জন্য যত ভালভাবে পারি বললাম যে, সে যেন ছেলেটির থেকে যতটা সম্ভব দূরে থেকে নিজে বিপদ এড়ায় এবং অপরকে বিপন্ন না করে।

একটিও কথা না বলে আমার কথা মেনে নিয়ে সে চলে গেল কিন্তু যাবার সময় তার পাণ্ডুর ও শীর্ণ দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামতে লাগল। চোখের জল মোছার জন্য আঁচলের এক প্রান্ত তুলে, সে কান্নার বেগ থামাতে চেষ্টা করল কিন্তু ফোঁপানি পুরো চাপতে পারল না। সেই সময় দ্বারপ্রান্ত থেকে আমার কানে এল, "ওই তো ওর মা।" আমি কি করেছিলাম তা কল্পনা করে নেওয়া যায়। হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, তাই তো, ছেলেটির যে হাওয়া চাই-ই এবং তার বালিসের পিছনের জায়গাটা যে হাওয়া চলাচলের পথের বাইরে। সেই থেকে মা ছেলের শিয়রে গুটিসুটি হয়ে বসল এবং পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ প্রহরগুলি ভরে ছেলের সেবা করে গেল। মাঝে মাঝে ছেলেটি বিকারের ঘোরে ভুল বকে ওঠে, তার মায়ের শিয়রে বসে থাকার কথা ভুলে যায়। তখন সে এপাশে ওপাশে মাথা চালতে থাকে, এবং তার জ্বরপ্রদীপ্ত চক্ষুর শূন্যদৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ থাকে। তার মুখে একটি মাত্র শব্দ "মা, মা, মাতাজী, মা, মাগো।" আমার কান পাশ্চাত্যের কান। সেখানে বালকের এই ক্রন্দনধ্বনি কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল। মাঝে মাঝে ছেলেটি স্মৃতি ফিরে পায় এবং আমাকেই তার মা মনে করে ক্ষীণ হাসি হাসে। একবার সে আমার হাতটা জোর করে টেনে তার নিজের ঠোঁটের ওপর রাখল। মাধুর্যমণ্ডিতা অজানা মা, আমার এই ভালবাসা চুরি তুমি ক্ষমা কোরো। তোমার অপার করুণা, এবং গভীর স্নেহের অবগুণ্ঠনবিদীর্ণ করা চৌর্যবৃত্তির অপরাধ ক্ষমা কোরো।

হায়, সেই ছিল মা ও ছেলের দুজনের একত্রে থাকার শেষ দিন। সমস্তক্ষণ ছেলেটি ভগবানের নাম নেবার চেষ্টা করল। অপরাহ্নবেলায় সে যেন হাতড়ে হাতড়ে একটি গান খুঁজে পেল। তখনকার দিনে পথে পথে এই গানটি খুব গাওয়া হতো; কিন্তু গানটি তার গলা দিয়ে বেরোল না। আমার কাজ হোল

তার কথার খেই ধরে তার পাশে দাঁড়িয়ে গানের কথাগুলো বলা। ছেলিটির মুখে শান্তির মৃদু হাসি ফুটে উঠল, দু-এক মুহূর্তে সে শান্ত হয়ে শুয়ে রইল। তারপর তার শ্বাস উঠল এবং তার মায়ের দৃষ্টি তার মুখের উপর নিয়ে সূর্যাস্তের সময় সে মারা গেল।

হিন্দু জাতির কোটি কোটি মানুষ এই ধাতুতেই গড়া। মৃত্যুযন্ত্রণায় যখন পাশ্চাত্যদেশবাসীর ওষ্ঠাধর প্রার্থনা উচ্চারণ করার চেষ্টা করে বা মুখ থেকে নির্গত হয় পবিত্র বাক্যের অন্ততঃ অর্ধেকটা। তখন হিন্দুর মুখ দিয়ে বেদনার যে কাতর-ধ্বনি বেরোয়, তা হোল পরম গভীর প্রয়োজনের ক্ষণে শিশুর রোদনধ্বনি—"ও, মা।"

এ ধরনের দৃষ্টান্ত একের পর এক যোগ করা সহজ। আমরা যা চাই তা হোল মাতৃত্বের মহাকাব্য। প্রতিটি মা ও ছেলে সেই মহাকাব্যের একটি পংক্তি বা স্তবক মাত্র। আমরা চাই জাতির সেই কল্পনা যা সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে, ব্যক্তির মধ্যে সে সতত কার্যরত থাকে।

ইতালীয় কবি দান্তের 'নরক দর্শনে'র কথা উল্লেখ করে আমরা হালকা চালে আলোচনা করে থাকি। আমাদের ভিতর কতজন নরকে গিয়ে বা বেশ কিছুটা দূর থেকে নরক দর্শন করেছেন যে, নরকে নামা কি সেটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব? উন্মত্ততার অন্ধকার মনের উপর নেমে এসে প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিকে যখন বিদীর্ণ ও বিনষ্ট করতে চায়, যখন কোন ভয়াবহ কল্পনার ক্ষয়কারী হতাশা তার ছায়ায় আমাদের আবৃত করে ফেলে, তখনও প্রেমিক, অথবা সন্তান অথবা প্রেমিক এদের মধ্যে কে আমাদের পঙ্গু ও অশুভ সান্নিধ্যকে পরম মঙ্গলজনক বলে মনে করবে? অবশ্য এমন একজন আছেন যিনি আমাদের পরিত্যাগ করছেন বলে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেই একজনের ইচ্ছাই আমাদের কাছে ন্যায়ের বিধান, অথচ পাপ করার সময়ে আমরা তারই সাহায্য চেয়ে কেঁদে উঠি। এদিক দিয়ে হিন্দুর মনে ভগবানের ভালবাসা মাতৃস্নেহেরই সামিল। স্ত্রীর প্রতি প্রেম ও মাধুর্যের হেরফের অনুযায়ী, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসায় জোয়ার-ভাটা আসতে পারে, কিন্তু মাতৃস্নেহের এমনই প্রকৃতি যে, প্রয়োজন যত গভীর হয়, স্নেহও তত গভীর হতে থাকে। সে স্নেহ সন্তানের পিছু পিছু নরক পর্যন্ত ধেয়ে যেতে দ্বিধা করে না। এই ব্যাকুল স্নেহ কখনও আমাদের প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেয় না; এ আশীর্বাদ সতত আমাদের সহযাত্রী। এ এমন এক সান্নিধ্য, যার থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা বৃদ্ধি এবং প্রসার লাভ করতে পারি না। এ এমন এক হৃদয় যেখানে আমরা সর্বদাই নিরাপদ। এ মাধুর্য অতল; এ বন্ধন ভাঙা যায় না; এ পূত-পবিত্রতা ছায়াপাত করে না। মাতৃত্ব হচ্ছে এইসব এবং আরও অনেক কিছু। মাতৃবক্ষশায়িত শিশুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুখদুঃখের একটি আশ্রয়গৃহের সন্ধান-

লাভ যে প্রত্যেক হিন্দুর অন্তরের আশা ও অভিলাষ—এটা মোটেই বিস্ময়ের কথা নয়। এই স্বপ্নেরই নাম নির্বাণ, মুক্তি, স্বাধীনতা। আমাদের পছন্দসই যেসব বস্তু, বিষয় ও চিন্তা আমাদের পিছনে টেনে রেখেছে, তাদের থেকে নিবৃত্তি লাভের নামই ত্যাগ। মা শব্দটি পবিত্র বলে পরিগণিত এবং সৎব্যক্তি সতী নারীর রক্ষার্থেই তাঁকে মা বলে সম্বোধন করেন। কোন নারী যত যুবতী বা সুন্দরীই হোন না কেন, তাঁকে যদি সম্পূর্ণ অপরিচিত পথিক প্রথমে একবার মা বলে সম্বোধন করেন, তাহলে ঐ পথিক সর্বপ্রথমে ঐ অপরিচিতা নারীর সেবা বিধান্ করবেন। পিতা তাঁর ক্ষুদ্র কন্যাটির দিকে চেয়ে ঐ বালিকার মধ্যে ভবিষ্যতের রহস্য দেখতে পান, এবং তা প্রকাশের চেষ্টায় মেয়েকে 'ছোট্ট মা' বলে সম্বোধন করেন। জাতির মাতা উমা হৈমবতী সর্বদাই বালিকারূপে চিত্রিত। তাঁকে বাড়ীর মেয়ে বলেই ধরে নেওয়া হয়। বিবাহ মাতৃত্বেই পূতপবিত্রতা লাভ করে। মাতৃত্ব ছাড়া, শুধু প্রেমের পূর্ণতা তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। এইটেই হোল সন্তান কামনার প্রকৃত রহস্য। স্বামী যেখানে স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করেন, পূজার সেই উত্তুঙ্গশিখরে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নীচ বন্ধন মুকুটে ভূষিত হয়, এবং তাদের ক্ষুদ্রতার অবসান ঘটে।

হিন্দু নারীর গোপালপূজা যে দেখেছে, সে কি আর তা ভুলতে পারে? ছোট্ট একটি খাটে নিদ্রা বা ক্রীড়ারত শিশু কৃষ্ণের পিতলের একটি ছোট মূর্তি রয়েছে। সারা সকাল ধরে, স্নানের পরে রান্নার আগে মূর্তির সামনে ফুল, স্নানোদক, ফল, মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য অর্ঘ্য ও উপচার হিন্দুনারী নিবেদন করেন। এই নারী নিজে কারও স্ত্রী বা মা না-ও হতে পারেন। নৈবেদ্য-উৎসর্গের মধ্যে ধ্যান এবং নিঃশব্দে পূজাও চলে। তিনি ভগবানকে পরিত্রাতা শিশুরূপে কল্পনা করে পূজা করেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের জননী বলে মনে করেন। জিজ্ঞাসা করলে, প্রশ্নের জবাব তাঁর তৈরীই থাকে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "আমার প্রতি আমার সন্তানদের আচরণের হেরফের হলে তাদের প্রতি আমার স্নেহ কি বদলে যায়? সেইভাবেই ভগবানকে ভালবাসতে হয়। যাদের সব চেয়ে বেশি দরকার, মা তো তাদেরই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। সেইভাবেই ভগবানকে ভালবাসতে চাই।" এই সাদাসিধা উত্তর একগঙ্গা ধর্মতত্ত্বের সমান। এটাও ভোলা যায় না যে, রক্ত-মাংসের সে সন্তানগুলি মায়ের ডাকে সাড়া দেয়। তারাও ভগবানের মূর্তি। সন্তানদের খাওয়ান, শেখানপড়ান, খেলা, সেবা পরিচর্যা, তাদের দিয়ে কাজ করান, বাৎসল্য রস উপভোগ—এইসব কাজের প্রতিটি মুহূর্তকে মা পূজায় রূপান্তরিত করতে পারেন। পূজার ভিতর দিয়ে বিশ্বজনীন আত্মার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ানই তাঁর উদ্দেশ্য। নিজেকে আদর্শ মাতারূপে গড়ে তোলা পর্যন্ত তিনি কি এ কাজ করেছেন? আদর্শের এই অনুভূতি নিয়েই কি তিনি ধ্যানরতা ছিলেন?

সন্তানের মনেও মায়ের ইচ্ছা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই মৃদু হেসে তিনি সন্তানের দিকে চান, পরক্ষণেই তাঁর মুখে দুঃখের ছবি। এই ক্ষণে যদি তাঁর মুখ দিয়ে প্রশংসার কথা বেরোয়, পর মুহূর্তেই তাঁর মুখে শোনা যাবে ক্রুদ্ধ ভৎর্সনা। কিন্তু তিনি সর্বদাই একই ভাবে মা। তাঁর প্রতি কার্যের ভিতরে থাকে অফুরান, অক্ষয় স্নেহ। তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর সন্তানদের প্রতিটি কাজের অর্থও অন্য কিছু হতে পারে না। প্রফুল্ল এবং অধীর প্রকৃতির সন্তান, বাধ্য এবং জেদী, একগুঁয়ে সন্তান—এরা সবাই বিভিন্ন ভাবে মায়ের প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে তিনি স্নেহের আহ্বান জানান। বিপরীতের এই সমন্বয়, এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্য আবিষ্কারের মধ্যেই প্রাচ্যের ধর্মের সমগ্র প্রচেষ্টা ও ভাবধারা নিহিত।

'মা' এই মহান শব্দটি প্রয়োগ করে কোন্ মহত্তম চিন্তা ভারতকে আহ্বান করছে! একি সেই স্নেহের অলৌকিক দৃশ্য, যে স্নেহ কখনও কোন কিছু অধিকার করতে চায় না, যা শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত, যে দান কোন প্রতিদান চায় না; যে আলোক আমরা স্বপ্নেও উপলব্ধি করতে পারি না, সেই চিরন্তন সূর্যকিরণকে আমাদের অন্তরে এবং চারপাশে খেলা করতে দিয়ে, আমরা রবির আলোকের সেই ঝরনাধারায় স্নান করে পরিতৃপ্ত হই।

কিন্তু যে আদর্শ কোন এক ধরনের শৃঙ্খলার দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ যা এই রকম শক্তিশালী, তেমন কোন আদর্শের অস্তিত্ব কি কখনও ছিল? তাহলে হিন্দুনারীকে এই মহার্ঘ পূজার জন্য কি মূল্য দিতে হয়? সে মূল্য অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধন। সে পূজা মূলতঃ একাগ্রতা এবং পবিত্রতার আরাধনা। হিন্দুসন্তানের মনে যদি মুহূর্তের তরেও এ চিন্তা জাগতে পারত যে শত প্ররোচনা, হিমশীতল আচরণ এবং নিষ্ঠুরতা সহ্য করার পরেও তার মা ক্ষণেকের জন্য তার পিতার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়েছে। তবে সেই ক্ষণেই মা সম্পর্কে তার আদর্শবোধ জীবন্ত যন্ত্রণায় পরিণত হতো। যে বিধবা আবার বিবাহ করেছে, হিন্দুর চোখে সে চরিত্রহীনা। বাগদানের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে এবং (বাপ ও স্বামীর মৃত্যু হলে) বাগ্‌দত্তার অবস্থা দাঁড়ায় আমাদের child-widowর মত।

অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের সঙ্গে কিন্তু আকর্ষণ এবং প্রেমের কোন সম্বন্ধ নেই। একবার কারও স্ত্রী হলে, চিরকালই তার স্ত্রী থাকতে হবে, সে বন্ধন অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নিলেও বা শুধু নামে পর্যবসিত হলেও। অন্য পুরুষ নারীর পক্ষে ছায়ামাত্র, এবং স্বামীর সঙ্গে যেকোন পথে, এমন কি মৃত্যুর পথেও যাবার জন্য স্ত্রীর পদদ্বয় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। ভারতে স্ত্রীর পবিত্রতা এইসবের মধ্যেই নিহিত। কোন কোন সাধ্বী স্ত্রীর কাহিনী নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিবৃত করে বলা হয় যে, তাঁরা স্বামীর মৃত্যু আসন্ন দেখে হাসতে হাসতে এই বলে ঘুমোতে যান,

"আমি আগে যাব, পরে নয়।" তাদের সেই ঘুম আর ভাঙে না। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে আসলে পবিত্রতা কি? পবিত্রতা কখন এবং কোথায় আসে সেটা কেমন করে বলব? পবিত্রতা যে এখন এখানে নেই—তাই বা কি করে নিরূপিত হবে? একটা মানুষের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পবিত্রতা কোথায়? আর পবিত্রতা যদি মনের জিনিস হয়, তাহলে দৈহিক কোন পরীক্ষা ন্যায়তঃ কি করেই বা চাপিয়ে দেওয়া চলে?

ভারতীয় জীবন পবিত্রতার প্রতিটি রূপকে অন্বেষণ করে চলেছে। তার অভীষ্টের কেন্দ্রস্থলে এই অন্বেষণ অবস্থিত। কিন্তু হিন্দু যুক্তি বিজ্ঞান ও ন্যায়ের নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখে অন্বেষণের এই তীব্র আবেগও ম্লান হয়ে যায়। ভারত স্বীকার করে যে শেষপর্যন্ত পবিত্রতা বলতে কোন একটি বস্তু বোঝায় না। নৈর্ব্যক্তিক এক মহাজীবন ব্যক্তির ভিতর দিয়ে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং প্রতিটি সুনীতি ও সদ্‌গুণ হোল এই মহাজীবনের অপর একটি নাম।

সেইজন্য অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতার ভাবটির উপর প্রতিষ্ঠিত, মাতৃত্বের পবিত্রতার এই আদর্শ কৌমার্য ও ব্রহ্মচর্যের মহত্তর মতবাদের মধ্যে যথোচিত এবং যুক্তিযুক্ত পূর্ণতা লাভ করে। "খদ্যোতের কাছে যেমন মেরু পর্বত"—তেমনি সমাজজীবনের উর্ধ্বে অবস্থিত এই উত্তুঙ্গ আদর্শ সমস্ত সামাজিক বন্ধনকে অনুমোদন দান করে এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে। মানুষের জীবন যে অনুপাতে সন্ন্যাসীর জীবনে পরিণতি লাভ করে, সেই অনুপাতে এই আদর্শ তার পূর্ণ গৌরব অর্জন করে। সন্তানকে নিঃশ্বাস বায়ুর রহস্য জানাবার জন্য জননী মধুর আত্মোৎসর্গের কারাগারে প্রবেশ করেন এবং তাঁর অখণ্ড, অমলিন আরাধনা-দ্বারা আকাশের তারকাস্পর্শী অন্য এক জীবনের চিন্তা সন্তানের চোখে সম্ভব করে তোলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দু-স্ত্রী

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আদর্শ নারী সম্পর্কে আজকের পাশ্চাত্যের ধারণা খুবই কম। টেরেসা এবং চতুর্থ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার ক্যাথেরিন, যিনি তীক্ষ্ম-দণ্ড-সমন্বিত চক্রে ছিন্নভিন্ন ও পিষ্ট হবার হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন, আজ ইতিহাসের গালভরা নাম মাত্র। বিয়াট্রিস খৃীষ্টীয় গির্জার প্রকৃত সন্তান কিন্তু তিনি কেবল কবিদেরই ভালবাসার পাত্রী। জোন অব আর্ককে লোকে এঁদের চেয়ে ভাল বোঝে; জনসূত্রে তিনি সন্ন্যাসিনী, কিন্তু প্রতিভায় ও কর্মে বীরব্রতধারী নাইট। তবু এঁদের সংগে এক গভীরতর জ্ঞাতিত্ববোধ ব্যতীত হিন্দু-বিবাহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত হবে। কারণ পাশ্চাত্য নারী যেভাবে গির্জায় অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, হিন্দুবধূরা অনেকটা সেই-ভাবেই তার স্বামীর গৃহে আসে। তাদের ভালবাসা হোল উজাড় করে দেওয়া গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা; এবং তা দিতে হয় গোপনে। তারা ভাল করেই জানে যে পরস্পরের জীবনে তাদের একের প্রভাব অপরের উপর সবচেয়ে দৃঢ়। কিন্তু সংসারের সামনে এই সত্যটি জাহির করে বলা যায় না। তাদের প্রথম কর্তব্য হোল, অপর সকলের দাবিগুলি যে পূরণ হচ্ছে তা দেখা, কারণ, এইটেই হোল আদর্শ যে, বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে স্ত্রী বেশি ভালবাসবে, অবশ্য সেটা যদি সম্ভব হয়; তার নতুন বাপ-মা (শ্বশুর-শাশুড়ী) তার কাছে তার পুরানো বাপ-মার চেয়ে বেশি হয়ে উঠবেন। তাঁদের বাড়ীতে বধূও দুহিতার পূর্ণ ও পরম প্রাচুর্যের অধিকার নিয়ে প্রবেশ করবে, এবং তাঁদের সন্তানের ভালবাসা ও ভক্তি তাঁদের শ্রেষ্ঠ আসনকে স্বকৃতি দান করবে;—এর চেয়ে সুন্দর কোন দান নিয়ে কোন বধূ স্বামীগৃহে আসতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পরিবারের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি সতত রাখতে হবে। এইটেই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসবে—বিবাহের লক্ষ্য তা নয়। কিন্তু নারীর পক্ষে পরম প্রেমও একটা কর্তব্য আবার পুরুষের কাছে তার মা-ই সবার আগে। সেইজন্য কোন কোন অর্থে সম্পর্কটা পারস্পরিক নয়। জাতির মনোভাবের সংগে এটার পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে। যে ভালবাসা সমান প্রতিদান চায়, তাকে 'দোকানদারী' বলে তার গায়ে কলঙ্কের দাগ দেওয়া হয়। স্বামীর সামনে বা সম্মানিত অতিথিদের সামনে তরুণী বধূ আগ বাড়িয়ে এসে গুরুজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। সে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকে, হয়তো পাখা

দিয়ে হাওয়া করে বা তার নতুন মায়ের কোনকিছু টুকিটাকি কাজকর্ম করে। কিন্তু দিবসের সর্ব কর্মে সে বিশ্বস্ত সহকারিণী এবং শাশুড়ী-বধূর সম্পর্কটা প্রায়ই খুব মধুর। ভাল শাশুড়ীর দেওয়া শিক্ষার ছাপটা যত সহজে নজরে পড়ে, তেমন আর কিছুই পড়ে না। হাসিখুসি ভাব ও স্বাধীনতাসহ মর্যাদাবোধ এর বড় বৈশিষ্ট্য। হিন্দুনারীর পারিবারিক শিক্ষা এবং শিষ্টাচার এতই নিখুঁত যে তার ব্যতিক্রম না দেখলে সেই শিক্ষা চোখেই পড়ে না; যেমন সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারিণী বা সুন্দরী কোন মেয়ে, যে বেশি আদর পেয়ে বিগড়ে গিয়েছে। তার নিজেকে জাহির করার স্বভাব এবং সংযমের অভাব হয়তো তার বয়সী ইংরেজ মেয়ের পক্ষে শোভন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলি সাধারণ মানের প্রকৃত মূল্যের একটা পরিমাপ করে দেয়।

শুধু বধূর শান্ত ও নম্র স্বভাবই তার সুশিক্ষার পরিচায়ক নয়। তার মানসিক প্রশান্তি ও শালীনতা তার সারা জীবনের সাথী—কোন কিছুতেই সে প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ বা নষ্ট হয় না। এই প্রশান্তি ভাঙতে আমি কখনও দেখিনি। এর একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। খুব পীড়াপীড়ি করাতে আমার এক অত্যন্ত লাজুক এবং নিষ্ঠাবতী বন্ধু তাঁর ফটো তুলতে দিতে রাজি হন; তবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটি শর্ত আরোপ করে বলেন যে, কোন মহিলাকে দিয়ে ছবি তোলাতে হবে। কিন্তু দেখা গেল যে তা সম্ভব নয়।

তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তাহলে কোনও ইংরেজই তুলুক।" কোন পুরুষ তাঁর ছবি তুলবে এই কথাটা ভাবতে তিনি স্পষ্টতঃই সংকোচ এবং কষ্টবোধ করছিলেন কিন্তু সংগে সংগে এও ভাবছিলেন যে জাতের দূরত্বটা যত বেশি হবে, অশোভনতাটাও ততই কমে যাবে। সকাল হোল, ইংরেজ ফটোগ্রাফার এলেন, কিন্তু যে ভারতীয় মহিলা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তাঁর মধ্যে কোন অহেতুক আত্মসচেতনতা বা ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। এক চমৎকার ঔদাসীন্যসহকারে তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। জীবনে প্রকৃত কোন ঝঞ্ঝাট এলে এই ঔদাসীন্য রক্ষাকবচের কাজ করতে পারত।

হিন্দুপরিবারের সব ছেলেই তাদের স্ত্রীদের এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়। মা তাঁর নিজের মেয়েদের পরের ঘরে দিয়েছেন। তিনি তাঁর মেয়েদের জায়গায় বৌদের নিয়ে নেন। এইভাবে বেশি বয়সী মায়ের চারপাশে তরুণ জীবন সদা সর্বদা প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল থাকে, এবং মায়ের অবস্থাটা হয় খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনীদের মঠের কর্ত্রী মোহান্ত-মায়ের মত। মেয়েদের মধ্যে হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব ও খোশখবরের আদান-প্রদান যে চলে তা সবই তিনি জানেন, যদিও তাঁর আসার সংগে সংগে তাদের চাপল্য কোথায় যেন চলে যায়। ঘরের কোণে কোণে ফিসফিসানি চলে, এবং তাঁর সামনেও উল্লাসের কমতি থাকে না, কিন্তু তিনি সেদিকে নজর না দিয়ে, তাঁর বয়সী

মানুষদের প্রতি মনোযোগ দেন। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সকালে উঠে তিনি দেখেন মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের শোবার জায়গা থেকে নিঃশব্দে উঠে ছাদে চলে গিয়েছিল, তার অর্ধেক কারণ হোল ছাদে ঠাণ্ডা, আর বাকি অর্ধেক কারণ হোল, মধ্যরাত্রে মেয়েদের গল্পগুজবের রহস্যময় আনন্দ। শাশুড়ী এইসব দেখেন আর প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

দয়াবতী এবং বিশ্বাসের পাত্রী মঠাধ্যক্ষার সঙ্গে নবদীক্ষিতা সন্ন্যাসিনীদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গতা থেকে যতটা দূরে, শাশুড়ী ও বধূর এই সম্পর্কও অন্তরঙ্গতা থেকে ঠিক ততটাই দূরে। হাসিঠাট্টা এবং স্বাধীনতার প্রকাশ পথটি আলাদা,—সেটি হোল, দিদিশাশুড়ী বা যৌথ সংসারে দিদিশাশুড়ীস্থানীয়া যেকোন বর্ষীয়সী মহিলা। আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যেমন বাবা বা মা'য়ের সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্য সদাপ্রস্তুত ঠাকুরমার কাছে মিষ্টি কথা বলে ধরনা দেয়, তেমনি নতুন বধূ স্বামীর ঘরে এমন কোন বৃদ্ধা মহিলার শরণ নেয়, যিনি অপেক্ষাকৃত তরুণদের হাতে তাঁর কাজকর্মের ভার ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখন গোপন, অন্তরঙ্গ কথার বিশ্বস্ত শ্রোতারূপে মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যিনি সকল দায়দায়িত্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বাকিটা কল্পনা করে নেওয়া যায়। নতুন পরিবেশে অনেক অসুবিধা, অনেক জটিলতা থাকবেই কিন্তু বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা সেইসব অসুবিধা ও জটিলতার অনুরূপ কোন-না-কোন অতীত অবস্থা খুঁজে বার করে দেয়। পিছন ফিরে নিজের স্মৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করে দিদিশাশুড়ী তাঁর বধূজীবনের সমস্যা ও প্রশ্নের কথা এবং তাঁর ভুলভ্রান্তির কথা বর্ণনা করেন, সমস্যার সমাধানের কথা বলেন। তরুণী বৃদ্ধার সঙ্গে বসে একসঙ্গে পরামর্শ করে, এবং যদি শাশুড়ী সহানুভূতিশীলা না হন, তাহলে দিদিশাশুড়ীর নাতবউ-এর তরফে মধ্যস্থ হবার সম্ভাবনাও থাকে। সেইজন্য শাশুড়ীর সামনে ভক্তির যে ভার কখনও কমিয়ে লাঘব করা যায় না, দিদিশাশুড়ীর সামনে ভক্তির সেই ভার মোটেই থাকে না। এমন কি ঘোমটাও টানতে হয় না। দিদিশাশুড়ী নাতবউকে ডাকেন 'তুই' বলে, নাতবউ-এর কাছেও দিদিশাশুড়ী 'তুমি';—'আপনি' সম্বোধনের দূরত্ব সেখানে নেই এবং হিমশীতল গাম্ভীর্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর অবকাশও থাকে না।

বহুপূর্বে যখন সাত-আট বছর বয়সে বাগ্‌দান হতো, তখন বৃদ্ধবৃদ্ধারা চাইতেন যে তাঁদের চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন থাকে; সেইজন্যই ছোট ছোট মেয়েদের বাড়ীতে আনা হতো। ঠাকুরমা এবং দিদিশাশুড়ীদের কোলেই ছোট ছোট বর-বউ-এর পরিচয় হতো। ঠাকুরমা এবং ঠাকুরদাদা আগ্রহ এবং উদ্বেগের সঙ্গে দেখতেন যে নাতি-নাতবউ-এর মনের মিল হচ্ছে কিনা। আবার ছোট্ট নাতবউটির যখন 'বাড়ী'র জন্য মন কেমন করত, তখন দাদাশ্বশুর-দিদিশাশুড়ীই নাতবউটিকে আদর দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করতেন।

অন্যান্য কারণের মধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধির চাপে আজকাল বিবাহ বেশি বয়সে হয়, এবং ঘরের বালিকা বধূদের ভোলাবার জন্য বাজারে পুতুল ও খেলনা কিনতে বৃদ্ধদের আর তেমন দেখা যায় না। তবে নতুন ঘরকে নিজের পছন্দসই ঘর করে নেওয়ার সেই সহজ প্রবৃত্তিটি এখনও আছে। বধূর বার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে—তার বিবাহ এবং পুনর্বিবাহের মধ্যে—তরুণ দম্পতি পরস্পরের পরিবারে পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করে।

হিন্দুদের ধারণা যে যৌথ স্মৃতির এক দূরপ্রসারী কল্পনাবীথি বিবাহবন্ধনকে মাধুর্য দান করে, এবং এই ধরাণাকে আমরা সত্য বলে মনে করি বা না করি, এই ধরনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিবাহিত জীবন যে সুখের হয় তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বৃদ্ধ এবং তরুণদের মধ্যে পারস্পরিক রসসমৃদ্ধ অনুভূতি সম্পর্কে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ থাকতে পারে না, কারণ এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর সর্বদেশে এই মধুর অনুভূতি জীবনের একটি সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। মহাভারতে অর্জুনের বাল্যস্মৃতিতে এর ভারতীয় মনোভাবসম্মত একটা ব্যাখ্যা দেখা যায়। কুলপ্রধান পিতামহ মহাবীর ভীষ্মের কথা স্মরণ করে অর্জুন বলেন, "খেলার পর ঘর্মাক্ত ও ধূলিধূসরিতদেহে তাঁর কোলে উঠে, দুহাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে আমি পিতা বলে সম্বোধন করেছি।" আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছেন, "না, বৎস, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা, পিতামহ।" সত্য বলতে কি, প্রতি প্রজন্মে, প্রতি পুরুষে এই বন্ধন দৃঢ়তর ও গভীরতর হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে একশো দুশো লোক এক বাড়ীতে বাস করে, সেখানে সবসময়েই একটা জটিল শিষ্টাচারবিধি গড়ে ওঠে। সেই আচরণবিধি অনুসারে মর্যাদা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার স্তরবিভাগ সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যাস করে দেওয়া হয়। হিন্দুদের রীতিনীতি অনুযায়ী এই বিধিবিধানের ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে এখন তাকে একটা পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি এবং জীবনের একটা সুসংবদ্ধ সমালোচনা বলা যায়। —সর্বত্র মানবিকতার বিচিত্র এবং মনোরম ইঙ্গিত বহন ক'রে সেই সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ। মায়ের আত্মীয়রা বাবার আত্মীয়দের চেয়ে কেন প্রিয়তর হবে, তা আমরা জানতে না পারি, কিন্তু এই ধরনের উক্তি করলেই সবাই তা মেনে নেবে। বড় বোনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং ছোট বোনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যে এক নয়, এটা আমরা খেয়াল করি না। ভারতবর্ষে কিন্তু বড় বোন ছোট বোন বোঝাতে আলাদা আলাদা শব্দ আছে। হিন্দুদের কাছে 'দিদি' ও 'বোনটি' এই দুটি শব্দের বিশবজোড়া মধুরতার মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ব্যবধান। খুড়তুতো, জাঠতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাই-বোনদের অনবরত ভাইবোন বলা হয়; একটা সম্পর্ক আর একটার মধ্যে পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। এত সুনির্দিষ্টভাবে ভাষার ব্যবহার একটা ভাবাবেগসম্পন্ন এবং অসাধারণ মানসিক অনুশীলনের পরিচায়ক। অবশ্য এই অনুশীলন মহৎ

অনুভূতিসমৃদ্ধ মন ও প্রকৃতির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। এই ধরনের মনে অভিব্যক্তির অনুপাতে ভাবানুভূতি বিকাশলাভ করে এবং যে মনোভাব গ্রামের সবাইকে খুড়ো, জ্যেঠা, খুড়, জ্যেঠী, পিসি করে তোলে তাই শেষপর্যন্ত সারা বিশ্বের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। হিন্দুনরনারীর এইটেই বোধহয় সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ; তারা গোড়াতে লাজুক ; সব বড় শক্তির যেমন স্বভাব, এরাও তেমন ছোটখাট আবেগে সহজে সাড়া দেয় না ; কিন্তু একবার একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে, এরা সম্পূর্ণভাবে অন্ধের মতন বিশ্বাস করে ; সেই সম্বন্ধের জন্য তারা সব করতে প্রস্তুত থাকে; জাতি ও জন্মের সকল দূরত্ব বা পরিবেশের সর্ব-প্রকার প্রভেদ তারা একেবারে ভুলে যায়। কঠিন শুষ্ক ও ঊষর প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আচরণের সময় এই নিয়মের দুর্বলতা চোখে পড়ে। এদের মধ্যে বাইরের দাবির ডাকে অন্তরের সাড়াটা কম, কাজেই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিতে আন্তরিকতা কমে যায়। সেটা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক জগতের উন্মুক্ত বায়ুতে বাসের পক্ষে এ প্রস্তুতিকে জীর্ণশীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলা যায়, কারণ আধুনিক জগতে পদ, বয়স এবং পবিত্রতা এ সবই কমবেশি অগ্রাহ্য করতে হয় এবং তার সহজাত মনুষ্যত্ব তাকে যতটা নিয়ে যেতে পারে ততদূর পর্যন্ত মানুষকে স্বাধীন এবং সমান মানুষ হিসাবে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। পতঙ্গ যেমন আলোর চারপাশে এসে জমা হয়, এইসব মানুষও তেমনি স্বাভাবিক কারণেই শক্তিশালী বিদেশীর চারপাশে ভিড় জমায়। এরা কিন্তু হিন্দুদের ব্যর্থতার উদাহরণ, হিন্দুদের আদর্শ নয়, এবং এরা সংখ্যায় খুব কম। একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্য এবং সংগ্রামের পাশ্চাত্য আদর্শগুলি এদের সামনে উপস্থাপিত হতে পারে এবং যদি তারা চায় তো সে আদর্শ তারা নেবে।—আবার সুদূর ইউরোপে হয় তো এমন সব মানুষ আছে যাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন তাঁদের অবাধিত ও অনুন্নত ভাবানুসঙ্গজাত পরিবেশ সহ্য করতে সমর্থ নয়। মানব সম্পর্কের ভারতীয় ভাবধারায় জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে দেখে, তাঁরা কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

সমস্ত কুল বা গোষ্ঠী প্রথায় যেমন হয়, তেমনি হিন্দুপরিবারেও প্রতিটি লোকের চরিত্রগত গুণ হোল সকলের সাধারণ কর্তব্য এবং বিপদাপদগুলিকে নিষ্ঠা-সহকারে স্বীকৃতি দান করা। এটা চলে আসছে। স্বামীর বিধবা বোন এবং তার ছেলেমেয়েদের প্রতি স্বামীর দায়িত্বের অংশীদার হতে অস্বীকার করেছে---এমন স্ত্রীর কথা ভারতে কখনও জানা যায়নি। দুঃখের দিনে বিরাট গোষ্ঠীর সব অংশ এক হয় ; এক রক্তের কেউ বিপদে সাহায্য চেয়ে বিফল মনোরথ হয় না ; যে কেবল 'গ্রাম সূবাদে' আপনার লোক, সেও তার প্রয়োজনের সময় আশ্রয় পায়। দায়দায়িত্বের এই সুদৃঢ় আত্মীয়তাবন্ধন, দরিদ্রদের কাজের বিনিময়ে আহার ও আশ্রয়দানের আশ্রম, হাসপাতাল, অনাথাশ্রম এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করে।

এখানে সৌভাগ্যবান এবং মন্দভাগ্য পাশাপাশি বেড়ে ওঠে। প্রাচ্যের পরিপক্ব এবং দয়াপ্রবণ সৃজনীশক্তি ও প্রতিভা একথাটা সর্বদাই স্পষ্ট করে বুঝেছে যে, যাদের রক্ষা করার কেউ নেই, সেই হতভাগাদের প্রয়োজন হোল গৃহ, সেনানিবাসের ব্যারাক নয়।

এই জটিল ভাগ্য ও ভবিতব্যের মধ্যে বধূ প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে একেবারে চূড়ান্ত ভাবে প্রবেশ করে। এতদিন সে ছিল হাসিখুসিতে ভরা বালিকা, স্বাধীন-ভাবে সে ঘুরত ফিরত, তার পায়ে জুতো নেই, মাথায় ঘোমটা নেই, সে যা খুসি খায় দায়, এতদিন জীবন ছিল প্রশ্রয়ে ভরা। মেয়ের বাপমায়ের মনের উপর মেয়ের সঙ্গে শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ছায়া ক্রমেই বিস্তার লাভ করেছে। তাই তাঁরা প্রাণ ধরে শক্ত হতে পারেননি ; কঠিন হলেই তো সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখ আসবে, সে দুঃখ জন্মে তো যাবার নয়। বাগ্‌দানের মুহূর্ত থেকে অবশ্য মেয়ের অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে বদলাতে থাকে। সূচের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহৃত অঙ্গুলিত্রাণ আনার জন্য যদি খৃষ্টীয় মঠের নবীন সন্ন্যাসিনী ছুটে যায়, তাহলে তাকে যেমন বলা হয় "আরও ধর্মভাবের সঙ্গে (অর্থাৎ আস্তে আস্তে) গিয়ে ওটা নিয়ে এস," তেমনি নববিবাহিতা বালিকাকে ঘিরে ধীরস্থির সমীহের একটা সূক্ষ্ম আবহাওয়া গড়ে ওঠে। সিঁথি কেটে তার চুল বাঁধা হয়, ছোট মেয়ের মত আর পিছনের দিকে আঁচড়ে টেনে বাঁধা হয় না। বিয়ের পর তার মাথায় সবসময় ঘোমটা, আর মাথার ঘোমটার পাড়ের ঠিক পরেই সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া হয়। সকালে কাপড়-চোপড় বদলে সাজার সময়েই সিঁথিতে সিঁদুর পরতে হয়। সিঁদুর দেওয়ার মানে হোল স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা। হাতে পাখা নেবার সময় পাখার আড়ালে মুখ অনুপস্থিত কোন প্রিয়জনের উদ্দেশে একটি চুম্বন নিক্ষেপও হয়তো করা হয়। তরুণী বধূর পায়ে জুতো নেই। তার বাঁ হাতে সোনায় বাঁধানো লোহা। তার নবলব্ধ মর্যাদার উপযোগী কিছু গহনা তার বালিকাসুলভ আত্মগরিমার একমাত্র ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু তার আরও গহনাপত্র আছে। তার রোজকার পরার আটপৌরে গহনাগুলি সোনার ; তাতে অল্পবিস্তর বেশ কারুকার্য থাকে, কিন্তু বিয়ের রাতে তার সিঁথিতে ওঠে তিননরী জড়োয়া সিঁথি, তার হাত আর গলা গহনায় বসানো পাথরের ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ-সবই হোল তার বাবার দেওয়া যৌতুক ; তার স্ত্রীধন। বধূর সম্মতি ছাড়া তার স্বামীও এইসব গহনায় হাত দিতে পারবে না ; অবশ্য পূজাপার্বণে, উৎসবে সে নতুন গহনা স্ত্রীকে দেবে। বধূ নানা উপলক্ষে গহনাগুলি বার বার পরবে, কিন্তু নিত্যব্যবহারের জন্য রুপার মল, সোনার হার আর চুড়িই যথেষ্ট। নিজের গহনার ওপর বধূর অধিকার মেয়েটি ভাল করেই বোঝে। বিপদে আপদে দুর্যোগে দুর্দিনে, বা বাড়ীর কোন ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য এই স্ত্রীধনটুকুর সবটা বা তার

কিছুটায় হাত দিতে বধূ বা শাশুড়ী যে কতবার কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে তা বিশ্বজগৎ কখনও জানতে পারবে না। বৈধব্যের হিমশীতল হস্ত ত জীবনের উপর নেমে না এলে, যে জিনিসটি সে প্রাণ গেলেও ছাড়বে না, হোল তার বাঁ হাতে সোনায় বাঁধানো লোহা। এইটি তার বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনের চিহ্ন। পাশ্চাত্যে যাকে বিবাহের অঙ্গুরী বলে—আসলে এ হোল হিন্দুঘরে তাই।

নবদীক্ষিতা খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীর ভীরুতা নিয়ে লাজুক মেয়েটি তার নতু গৃহে আসে। বাড়ীর উঠানগুলির চারপাশে থাম থাকার দরুন বাড়ীর গঠনট খ্রীষ্টীয় মঠের ধরনের বলে মনে হবে। পুরুষের সামনে বা কোন গুরুজনের সামনে ঘোমটা-টানা প্রকৃত নিভৃত বাসের লক্ষণ, আসল নির্জনতার প্রতীক। সেই নিভৃত নির্জনতার মধ্যে পৃথিবীর সকল কণ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে এবং পরিণত হয় তারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে, যা মনকে ডাকার মত ডাক দেয়, বাগ্র চরণকে চলতে বাধ্য করে। অতিমাত্রায় পূজাকে ভারত ভয় করে না। যারই অস্তিত্ব আছে তা সবই ভারতের কাছে দৃষ্টিগোচর বাহ্য রূপের বিরাট যবনিকা মাত্র; যাকে ে যবনিকা ঢেকে রেখেছে, সেই অদৃশ্য এবং অন্দৃষ্টের নিঃশ্বাসবায়ুতে এই যবনিক মাঝে মাঝে কম্পিত হয়। যেকোন বিন্দুতে কাঁটার একটি আঁচড় এই বিরাট মায়াকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বিরাট সত্য সম্পর্কে সন্ধানী মনকে অবহিত করে তুলতে পারে। আর সেই অনন্ত প্রকাশ ও সান্নিধ্যকে দেখাবার বাতায়ন স্বমী ছাড়া আর কে হতে পারে? স্বামীই তে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে ভক্তিভাজন।

নিজেকে আলোকিত করে বা নিজের অনুভূতির দ্বারাই যে আত্মা সবচেয়ে বেশি স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে, এ বিষয়ে একটা গভীর এবং ব্যতিক্রমহীন ধারণা আছে। সেইজন্য তরুণী বধূ কতখানি দিতে পারছে, সেইটেই তার সকল চেষ্টার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তার সকল স্বপ্ন ত্যাগে মহিয়সী মহিলাদের ঘিরে। সীতা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে চিরজীবনের মত বিদায় নিলেন; তাঁর প্রেম স্বামীকে আদর্শ রাজায় রূপান্তরিত করে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করল। সতী পিতা দক্ষের মুখ থেকে পতিনিন্দা শোনার চেয়ে প্রাণবিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ করলেন। উমা দেখলেন তাঁর প্রেম বুঝি ব্যর্থ হয়, তবু কিন্তু তিনি ত গভীরতর নিষ্ঠাসহকারে তাঁর নির্ধারিত পথেই চললেন। বধূরূপে পিত নিকট বিদায় নেবার সময়, পিতা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, 'সাবিত্রীর মত হও' গ্রীক পুরাণের এলসেস্টিস আর ভারতীয় পুরাণের সাবিত্রীর গল্প প্রায় একই ধরনের। সাবিত্রী তাঁর মৃতস্বামীর পুনর্জীবনলাভের বর আদায় করা পর্যন্ত যমের অনুসরণ করেন। স্ত্রী কতটা দিলেন, তারই অনুপাতে তাঁর জীবন মহনীয়

হয়ে ওঠে, কতটা পেলেন তার অনুপাতে নয়। পাশ্চাত্যে সারা জেনিংস সারা জীবন তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ভালবাসা ধরে রাখতে পেরেছিলেন বলে আমরা তাঁর রূপের প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু এদেশে উপন্যাসরচনার সময় বা আসল চরিত্র আঁকার সময় নারীর সৌন্দর্যের সুখ্যাতি করার কথা কারও মনেই আসবে না। হিন্দুরা বলে থাকেন, সৎলোক তাঁর স্ত্রীর প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু এ ছাড়া প্রণয়ের ভান বা দম্ভ যতই মনোহারী হোক না কেন, তা বিবাহকে মর্যাদা দান করতে পারে না। সারা জীবনের ঘনিষ্ঠতাকে যদি শোভা ও মাধুর্যে মণ্ডিত করতে হয়, তাহলে তার ভিত্তিটা গভীরতর হওয়া চাই ; সেই ভিত্তি হোল স্ত্রীর প্রেম, যা সবকিছু দিতে পরোয়া করে না এবং প্রতিদানে কিছু চায় না ; মাতার স্নেহ, যার কোন পরিবর্তন নেই ; বন্ধুর বদান্য ঔদার্য, যা সিধাপথে চলে, এঁকেবেঁকে যায় না। এই বিষয়টা যদি সর্বোচ্চস্তরে আলোচনা করা না হয়, তাহলে প্রাচ্যের গম্ভীরপ্রকৃতির ব্যক্তির কাছে সেটা অশোভন বলে মনে হবে। তবু কিন্তু এশিয়ার ফ্রান্স বলে অভিহিত পারস্য হিন্দুদের জীবনে একটা রোমান্টিক প্রভাব অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তার করে এসেছে। পারস্যের প্রেমের কবিতার মত আবেগপূর্ণ প্রেমের কাব্য পৃথিবীতে আর নেই বলেই ধরা হয়। এই প্রসিদ্ধ স্তবকটি দেখা যাক :

> চারি চক্ষুর মিলন হোল। দুটি হৃদয়ে এল পরিবর্তন। এখন আমি মনেই করতে পারি না যে সে পুরুষ এবং আমি নারী, বা সে নারী এবং আমি পুরুষ। আমি যা জানি তাহলো, দুজন ছিল ; তারপর প্রেম এল, এখন একজনই আছে।

এই স্তবকটিতে ঠিক মেজাজটি ধরা পড়েছে। ফারসী ভাষা অবশ্য দিল্লীর রাজসভা এবং সাহিত্য মারফত ভারতকে স্পর্শ করেছে মাত্র। এটা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির আওতায় পড়ে ; এবং এখানে ওখানে যাঁরা ফারসী সাহিত্য আয়ত্ত করার চেষ্টায় সময় ব্যয় করেছেন, তাঁদেরই এই বিদ্যার ইলমদার বলা যেতে পারে ; কিন্তু হিন্দুনারীর জগৎ এর থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, মনে হবে তা যেন অন্য কোন গ্রহউপগ্রহের জিনিস।

খ্রীষ্টধর্মের রোমান্টিক দিকটা সম্পর্কে এটা ঠিক ততটা সত্য নয়। ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী পড়ানর ফলে উপন্যাস পড়া বেশ বৃদ্ধি পায়। এই পঙক্তিগুলি আসলে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় রচিত। এবং বই ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত দেশী ধরনের গল্প-উপন্যাস বিকাশলাভ করে। একদিক দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণাগুলির ধরন-ধারণ এর দ্বারা খুবই গভীরভাবে পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা আছে। ধারণা হোল যে বরবধূর দৃষ্টি পরিবারের কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ থাকবে, নিজেদের কল্যাণের দিকে নয়। তাদের ধারণা দীর্ঘদিন সমাজের ভিত্তিরূপে

বর্তমান থাকবে। বিবাহের উদ্দেশ্য হোল পরস্পরের প্রতি প্রেম এবং রোমান্টিক সুখের নির্ঝর উৎসারিত করা নয়, সাহায্য ও সেবার স্রোতোধারার বাঁধ খুলে দেওয়া। সব জাতির মধ্যে যেমন স্বার্থপর স্ত্রী এবং সন্দেহপরায়ণ স্বামী থাকে, হিন্দুদের মধ্যেও তেমনি তারা থাকবেই কিন্তু হিন্দু-স্ত্রীর কাছে দুটি গুণ দাবি করা হয়; প্রথম গুণটি হোল পূর্ণ অকলঙ্ক স্বভাব, এবং তার পরের গুণটি হোল স্বামীগৃহের সম্মান সর্বতোভাবে রক্ষা করা.

এই সূত্রে অনুসরণ করলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে হিন্দুপ্রথার গোলমেলে দিকগুলি,—যেমন পুরুষের একাধিক বিবাহের দৃষ্টান্ত এবং দত্তকগ্রহণের আইন—বোঝা সহজ হয়ে পড়ে। স্ত্রী নিঃসন্তান হলে তার স্বামী সাত বৎসর পরে, এবং স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করে, আইনতঃ দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করতে পারে কেবল এই আশায় যে, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তার পুত্র জন্মে তার উত্তরাধিকারী হবে। ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব অনুযায়ী, এই সম্মতি আদায় করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হবে, কিন্তু প্রাচ্যের পারিবারিক দায়দায়িত্বের ধারণা অনুসারে এটা সব-সময় অসম্ভব হয় না। এই ধরনের বিবাহজাত একটি লোকের কথা আমি জানি। তাঁর কাহিনী বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের সময় সমুপস্থিত হয়েছে বলে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন এবং অনেক খোঁজ খবর করে সবচেয়ে সুন্দরী পাত্রী রূপে আমার গল্পের নায়কের মাকে পছন্দ করলেন। বিয়ের পর বিবাহটাকে সুখের করে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার সীমা-পরিসীমা ছিল না এবং নতুন বৌকে তিনি নিজের ছোট বোন বলে সাদরে গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, সপত্নীর সন্তানের প্রতি এমনই তাঁর স্নেহ যে, ছেলে হবার পর, বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে জানতেই পারেনি যে তিনি তার মা নন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অবশ্য দ্বিতীয়া স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী হন। বাড়ীতে ছেলেপিলেদের মধ্যে ছিল নিকট ও দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয় বালক-বালিকা, কিছু আশ্রিত মাতৃ-পিতৃহীন শিশু, জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো দু-তিনজন ভাইবোন এবং আমার গল্পের নায়ক। সে-ই তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় এবং সে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাতো যে তার মা তাকে সবচেয়ে কম ভালবাসেন আর তার পরেই তার জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই-বোনদের তার চেয়ে আর একটু বেশী ভালবাসেন। হিন্দুনারীর সহজাত মাধুর্য এবং শুভবুদ্ধি অনুসারে মা জবাব দিলেন, 'না বাবা, ইচ্ছা করলেও তোমাকে আমি অযত্ন বা অবহেলা করতে পারব না। সেইজন্য যাদের যত্ন করলে দেখার বা বলার কেউ নেই, তাদের দিকেই প্রথমে নজর দেওয়া কি ঠিক নয়?"

এই ধরনের গল্পে যে পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জীবন অনন্যসাধারণ মহত্বে পূর্ণ; এক-বিবাহ প্রথা আমাদের মধ্যে যে ঔদার্য সঞ্চারিত করে, বহুবিবাহ প্রথার ফলে যে সে উদারতা তার চেয়ে বেশি ঘন ঘন হয় একথা

মনে করার কোন প্রয়োজন নেই। সে যাই হোক, যে জোয়ার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বহন করে আনে, সেই জোয়ারই এই প্রথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ; এই প্রথা কখনই খুব বেশী প্রচলিত ছিল না এবং এখন তো প্রায় উঠেই গিয়েছে। ব্যতিক্রম হল রাজরাজড়া এবং বড় বড় ঘরোয়ানা বংশ, কিন্তু এই সব শ্রেণীর মধ্যেও প্রথার মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

"একটি প্রাচীন শ্লোক এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।"

"নারী যেখানে পূজিত, সেখানে দেবতারা প্রীতিলাভ করেন। যেখানে নারীর সম্মান নেই, সেখানে ধর্মানুষ্ঠানে কোন কাজই হয় না।"

"যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রসন্ন, সেই গৃহে সৌভাগ্য সুনিশ্চিতভাবে বর্তমান থাকবে।"

মনুসংহিতা পাঠে যে আনন্দ পাওয়া যায়, খুব কম গ্রন্থই পাঠককে সেই ধরনের আনন্দ দান করতে সক্ষম। মনুসংহিতাকে পার্লামেন্টকর্তৃক অনুমোদিত আইনের সংকলন বলে কোন মতেই বর্ণনা করা যায় না ; কারণ আগাগোড়া এর দৃষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং খুব দ্রুত পাঠ করলেও দেখা যাবে যে মনুসংহিতা যুগযুগান্তরে বিভিন্ন প্রথার বিকাশ পাঠকের সামনে তুলে ধরছে এবং গ্রন্থটি কোন-ক্রমেই একজনের লেখা নয়। এই হল বইটির প্রথম এবং সবচেয়ে চোখে পড়ার মত গুণ। অবশ্য প্রায়ই দেখা যায়, এবং সেটা হতে বাধ্য, যে, একটা অভ্যাস বা প্রথার কুসংস্কার সেই প্রথার মূল উদ্দেশ্যের মতই পরম গাম্ভীর্য সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কদাচিৎ সেটা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে করে মূল তাৎপর্যটা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বা মূল উদ্দেশ্যটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা শক্ত হয়ে পড়ে। আগাগোড়া গ্রন্থটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সৌজন্য ও রুচির সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের উপলব্ধি-সঞ্জাত গভীর আবেগে স্পন্দিত, অথচ প্রশান্ত, নৈর্ব্যক্তিক বিচারের ভাষায় রচিত। বিশেষ করে নারীর অধিকার সম্বন্ধে অনুশাসনগুলি এই ধরনের ; সেগুলি ভারতের ঘরে ঘরে মুখে মুখে ফেরে। জীবনের উপর লিখিত শব্দ ও বাক্যের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তা আমরা জানি। একদা যেসব ঘটনা বা তথ্য ধর্মগ্রন্থ রূপে লিপিবন্ধ করা হয়েছিল, সেগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, একটা রহস্যপূর্ণ তাৎপর্য তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং 'লিখিতমিদং' 'ইহা লিখিত আছে' এই কথাগুলি এমন ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে যে তাতে স্বয়ং শয়তানও ভয় পায়। এই-ভাবে নারীর অভিশাপের ভয় ভারতে একটা কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে এবং এক দল হল্লাবাজ গোঁয়ার মানুষ একটি মাত্র নারীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তার আদেশে পিছু হঠেছে—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কারণ শাস্ত্রে কি লেখা নেই, "যে গৃহের উপর নারীর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তা একেবারে ধ্বংস হয়, যেন শত্রুর

মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তার বিনাশ হয়েছে।" এ এক প্রাচীন, বিচিত্র ও বর্ণাঢ় শব্দসমষ্টি, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিপর্যয়জনিত বিষাদ বর্তমান।

তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, জাতি যে আদর্শে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করছিল, মনুসংহিতা সেই আদর্শের ঘোষণা ততটা নয়, যতটা তা জাতির মানস-চিন্তার অচেতন অভিব্যক্তি। আর সেইজন্যই ভারতীয় প্রথার সুস্থ সমালোচনার নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রূপে মনুসংহিতাকে ধরা যেতে পারে। পারিবারিক সুখশান্তি পূর্ণাঙ্গ ধারণা মনুসংহিতায় পাওয়া যায়, এবং স্বামীর মুখের দিকে চাইবার সম ভারতীয় নারীর মুখের দ্যুতি যিনিই লক্ষ্য করেছেন, তিনি কখনই সন্দেহ করবে না যে এই আদর্শ জীবনে প্রায়শঃই রূপায়িত হয়েছে। দেশের সকল অংশেই আমি এই আলোকচ্ছটা দেখেছি। কারণ স্বামীর প্রতি আবেগপূর্ণ ভক্তি যদি হিন্দু স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে হিন্দু স্বামীর বৈশিষ্ট্য হল সকল অবস্থায় স্ত্রীকে রক্ষা করার অপরিমেয় আশ্বাস দান। জীবনে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের মত পবিত্র বিষয় বিশ্লেষণ করার সাহস যদি আমাদের হয়, তাহলে মনে হবে যে পুরুষে সম্পর্কটির মূল এবং প্রধান সুর হচ্ছে দরদ এবং স্নেহের সুর। উৎকর্ষের আদর্শ হিসাবে নিজের মায়ের স্মৃতির দিকে চেয়ে, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যা নিয়ে আসে তার মধ্যে আবার কিছুটা মাতৃত্ববোধ থাকেই। বালিকার মত স্ত্রী স্বামীর জন্য রান্না করে, স্বামীকে অন্ন পরিবেশন করে এবং তার খাবার সময় পাখা হাতে বসে মাছি তাড়ায়। শিষ্যা রূপে সে স্বামীর সামনে প্রণিপাত করে এবং স্বামী আশীর্বাদ লাভের পূর্বে স্বামীর পায়ে তার মাথা ঠেকায়। এটা সমতা নয় সমানে সমানের আচরণ নয়। তা তো নয়ই। কিন্তু হিন্দু স্ত্রী প্রশন করবে—"পূজা নিবেদনের অবর্ণনীয় মহিমা ও আনন্দের কথা যখন বলা হয়, তখন স্থূল মামুলি সমতার কথা কেউ কি বলবে?"

পুরুষ কি ভাবে এটা গ্রহণ করে? আত্মশ্লাঘা এবং অভিমান বিরহিত ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনে যে আত্মা একটা সুযোগ পায়, এই ভাবটি জাতির জীবনে গভীর ভাবে নিবদ্ধ। স্বামী উপলব্ধি এবং স্বীকার করে যে স্বামীর মাধ্যমে ও সহায়তা স্ত্রীর পরম উৎকর্ষ লাভের অধিকার আছে, কিন্তু সে কখনও ভোলে না যে, এতে তার স্ত্রীর ভালবাসার শক্তিই প্রকাশ পায়, তার নিজের ভালবাসা পাবার যোগ্যতা প্রকাশ পায় না। তাহলে এই দিক দিয়ে সর্বত্রই জীবন কি একই বর্ণের নয়? যে ভালবাসা আমাদের যোগ্যতার অনুপাতে বড় বেশি বলে আমাদের মনে হয়, অন্য কিছু সেই ভালবাসার মত আমাদের শ্রদ্ধার ভাবটিকে নাড়া দিতে পারে কি?

কথার পৃষ্ঠে প্রায়ই অতি সহজে বলা হয়ে থাকে যে এইভাবে সেবা পেয়ে পেয়ে ভারতের পুরুষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং অপরের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। আমি কখনও এটা হতে দেখিনি। একথা সত্য যে,

নারী প্রবেশ করলে ভারতীয় পুরুষ উঠে দাঁড়ায় না, এবং নারী না বসা পর্যন্ত পুরুষ দাঁড়িয়েও থাকে না। নারী যে দরজা দিয়ে যাবে, সেই দরজা খুলে দেবার জন্য পুরুষ তাড়াতাড়ি উঠে যায় না—তাও সত্য। কিন্তু এসব পাশ্চাত্যপ্রথা তো তাদের দেশের শিষ্টাচার সম্মত বা আদবকায়দা মাফিক নয়। শেষের কথাটি সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের ধারণা হল যে বনের মধ্যে পথ কেটে বার করার ঐতিহ্য অনুযায়ী, পুরুষ নারীর আগে চলবে। বীরত্বব্যঞ্জক-প্রেমাশ্রিত জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনাবলীর মধ্যে একটি হল সীতা যেখানে বলছেন যে, তিনি বনপথে রামের আগে আগে যাবেন, যাতে করে তিনি তাঁর অঞ্চলাগ্র দিয়ে তাঁর স্বামীর পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ঐতিহ্য-বিরোধী প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ইংলন্ডে একভাবে দেখান হয়, ভারতে অন্যভাবে দেখান হয়ে থাকে। কিন্তু আচরণের মর্মটা দু দেশেই সমান। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সৌজন্য হল অক্ষয়, অব্যয়। প্রবাদ আছে, "ফুল দিয়েও নারীকে আঘাত করবে না।" স্বামী কোথাও হয়তো যাবেন; তাঁর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা স্ত্রীর প্রথম দাবি। বছরের পর বছর চলে যায়; স্বামী ক্রমশঃ তাঁর স্ত্রীকে "আমার অমুকের মা" বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন; আগন্তুক এবং অভ্যাগতদের কাছে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেন "আমার ছেলেমেয়ের মা" বলে। এটা খুবই মর্মস্পর্শী ব্যাপার এবং এইভাবে মাতৃত্বের পুজো স্ত্রীর উপর প্রতিফলিত হয়। প্রথম জীবনে তাঁর নিজের চরিত্রের বেপরোয়া ঝোঁকগুলি মাত্রার মধ্যে রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শের উপর নির্ভর করেন; বার্ধক্যে জগতের অন্যান্য সব জায়গায় যেমনটি হয়। স্ত্রীর কাছে তিনি তাঁর সন্তানসন্ততির জ্যেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হন এবং স্ত্রী ক্রমেই পরিবারের প্রকৃত প্রধান ও কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি প্রথমে যা ছিলেন, সর্বদাই তাই রয়ে যান। তাঁর স্বামীর ঘরের সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী। বিয়ের পর সেই গোড়ার দিকে স্বামী হয় তাঁর মায়ের হাতের বা স্ত্রীর হাতের রান্না ছাড়া খেতেন না; আর স্ত্রীর নিষ্ঠার একটা লক্ষণ ছিল যে স্বামীর খাওয়া না হলে এবং তাঁদের কথাবার্তা শেষ না হলে স্ত্রী খেতে বসবেন না, যদিও এর দরুন তাঁর রাতের আহার শেষ হতে রাত্রি দ্বি প্রহরও পেরিয়ে যেত। এখন সংসারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। বহুলোককে খাইয়ে দাইয়ে তবে তাঁর খাবার অবসর মেলে। তবু কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, দুটি মনের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাবটিকে, দুটি আত্মার পারস্পরিক চুক্তিকে ভাঙতে সক্ষম হয় নি। এই দুটি নরনারী এত বৎসর ধরে সারা বিশ্বের মধ্যে পরস্পরের আশ্রয়স্থল হয়ে আছেন অথচ তাঁরা এতদিনে একটিবারও নিজেদের পরস্পরের থেকে আলাদা মনে করে দুজনে দুজনকে ধন্যবাদ দেন নি বা নাম ধরে

কথাবার্তা বলেন নি। একই মানুষের মাথা আর হাত কি দুটি আলাদা লোক হতে পারে।

বিবাহের সেই সন্ধ্যায় ছোট্ট বধূটিকে যখন বরের সামনে পিঁড়িতে করে নিয়ে আসা হল, তখন বরবধূ দুজনকেই বলে দেওয়া হল যে শুভদৃষ্টির সময় এসেছে তাদের মিলনের প্রথম অনুষ্ঠানগুলি অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করার জন্য বেদীবি অনুযায়ী হোমাগ্নী প্রজ্বলিত হল; বধূ বরের গলায় মালা পরিয়ে দিল। বন্ধনে তারা আবদ্ধ হল এই মালা তারই মধুর প্রতীক। তারপর জীবনের বিভি অবস্থা সম্পর্কে পুরোহিতের যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণের সংগে তারা হাতে হাত রেখে সপ্তপদী গমন করল। এই তাদের বিবাহ। সেই থেকে একজনের অধিকার অপরের অধিকারে পরিণত হয়েছে; তাদের সুখ দুঃখ, কর্তব্যও এক। সেই সুদূর রাত্রির বধূ যদি সবদিক দিয়ে ভাগ্যবতী হয়ে থাকে, আজও পর্যন্ত তার শৈশবের প্রার্থনা পূর্ণ হয় তার জীবনের শেষে। সেই প্রার্থনা হল,

"গঙ্গায় যখন জোয়ার আসবে,
তখন স্বামী পুত্রের হাত থেকে
আমি যেন ভগবানের চরণে গিয়ে পড়ি।"

হিন্দু দম্পতিদের দেখে আমার মনে হয়েছে যে পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা লাভে তার অনন্যভাবে সফল হয়। এটা কিসের দরুন হয়? শৈশবে মিলনের দরুন, অথবা প্রণয় এবং অনুরাগ বিবাহের আগে না হয়ে পরে হওয়ার দরুন? অথবা অপরের সমক্ষে সম্পূর্ণ শালীনতা ও সংযম রক্ষার তীব্র শৃংখলাবোধ এর মূলে। ভারতীয়দের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন বাল্যবিবাহই এর কারণ। আমি একবার আমার এক বন্ধুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বন্ধুটি ধনী, সংস্কৃতিবান, নিষ্ঠাবান ও নিঃসন্তান। আমার প্রশ্ন ছিল, "ব্যক্তিগত কথা দূরে রেখে, যদি ধরুন বাইরে থেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আপনি উত্তর দেন, তাহলে আমাদের বিবাহ প্রথা এবং আপনাদের বিবাহ প্রথার মধ্যে কোনটা বেশি ভাল?"

তিনি কিছুক্ষণ থেমে, ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "আমার মনে হয়, আমাদেরটাই ভাল। কারণ আমি এবং আমার স্ত্রী যেমন পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়ে বিকা লাভ করেছি অন্য কোন বিবাহ প্রথায় দুটি মানুষ তেমনভাবে মিশে গিয়ে বিকশিত হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।"

পাশ্চাত্যের বিলাসবহুল জীবনের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করেছি যে পরিবেশ যতটা সরল হয়, মানুষের বন্ধন বুঝি তারই অনুপাতে দৃঢ়তা এবং গভীরত লাভ করে। যে জাতির কাছে বাহিরের সকল জটিলতা অসম্ভব, তারা হয় চি এবং অনুভূতি নিয়েই বাঁচবে, না হয় ঊষরপ্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্ত এ বিষয়ে সত্য যা-ই হোক না কেন, আমি বারবার সুস্পষ্টরূপে দেখেছি যে, হিন্দ

নারীর জীবনকে বুঝতে পারার জন্য পাশ্চাত্য জগতের যে মূল সুরটি অনুধাবন করতে হবে, তা হল ধর্ম জীবনের সুর। স্ত্রীর জীবন সম্পর্কেও এই কথা খাটে। নির্জন গৃহে অবগুণ্ঠনবতী এই নারী একটি নাম এবং একটি চিন্তার কাছে আপনাকে সমর্পন করেন অথচ সেই সমর্পনের কথা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ পেতে দেন না; যেমন আমাদের খৃষ্টান মঠে সন্ন্যাসিনী গোপনে সকলের অজান্তে উঠে গিয়ে জানু পেতে প্রার্থনা করেন, কারুর চোখে সেটা পড়তে দেন না—এও অনেকটা সেইরকম। খৃষ্টীয় মঠের সন্ন্যাসিনীর মত তিনিও যে আদর্শ অনুসরণ করেন, তা হল একটা দিব্য দর্শনের আদর্শ যা সসীমকে অসীমের মধ্যে লীন করে দেয়, এবং বিয়োগ, বিচ্ছেদ এমন কি পরিবর্তনকে উপহাস করে; এবং অভ্যাসের দ্বারা যে বিন্দুটিতে উপনীত হবে, তা হচ্ছে সেই বিন্দু যেখানে প্রিয়ের উপস্থিতি সারা বিশ্বকে সুন্দর করে তোলে, যেখানে ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া হয়, এবং অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করা হয়—আর এ সবই হয় এই আনন্দসঞ্জাত উপলব্ধি থেকে যে অন্য সবাইও তারই মত মানুষ। লক্ষ্য হল এমন একটি বিন্দু যেখানে সমস্ত চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা চিরকালের মত ভেসে যায় এমন এক প্রেমের জোয়ারে যে প্রেম আরও পরিপূর্ণভাবে ভালবাসার শক্তি অর্জন করা ছাড়া অন্য আর কোন প্রতিদান চায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর ন্যায় সুদৃঢ় প্রেম

আকাশের কেন্দ্র যেমন ধ্রুবতারা, তেমনি প্রাচ্য গৃহের কেন্দ্র হল নারী জাতির প্রতি তার অবিচলিত সম্মান। যে মাতৃপূজায় পরিবারের সকল সংহতি ও ঐক্য পরিবারের কর্তার প্রতি সকল আনুগত্য নিহিত, এই হল তার গোপন রহস্য। প্রেমের মহিমা বা ঐশ্বর্যের শক্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য নারীর তৃষ্ণা এবং আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে; এশিয়াতে নারীর বিশেষ স্বপ্নগুলি হল, উৎকর্ষ, পবিত্রতা এবং বিশ্বাসের স্বপ্ন। পাশ্চাত্যে নারী হল রানী। যে ভীষণ সংগ্রাম সিংহাসনকে আঘাত করে, তার সামনে নারী দাঁড়ায়; রাজামহারাজাদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলিকে নারী ভাল বা মন্দভাবে ব্যবহার করে। প্রাচ্যের রানীরাও কিন্তু এত পবিত্র যে সাধারণ মানুষের চোখ তাদের দেখতে পায় না। সুদূর অতীতে পঁচিশে মার্চ তারিখে দেবদূত গ্রেব্রিয়েল কুমারী মেরীর নিকট যীশুর জন্মগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার বিভিন্ন চিত্রে দীর্ঘ শ্বেত লিলি ফুল-গুলিকে দেখা যায়। কল্পনা করা যাক, এই ফুলগুলিকে কোন পূজাগৃহের অস্পষ্ট আলোকে পূজাবেদীর পাশে রাখা হয়েছে। এমনকি প্রার্থনারত ভক্তদেরও দৃষ্টির আড়ালে সেগুলি রাখা। প্রাচ্য নারীও এই শুভ্রফুলগুলির মত বেড়ে ওঠে। যে দীর্ঘ রেশমী তাঁবুর ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে এই মহিলারা বাড়ীর দরজা থেকে গাড়ীর পাদানীতে পা দেন, তা কোন অমার্জিত কারাগৃহ নয়, তা পবিত্র মন্দির। গোপনীয়তার এই আবরণ না থাকলে, তাঁরা অসম্মানিত বোধ করবেন, মনে করবেন তাঁদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, পাশ্চাত্যে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ জনতার মধ্যে অন্নের জন্য সংগ্রামরতা বিধবার যেমন মনে হয়, এঁদেরও ঠিক তেমনই মনে হবে।

কমনীয়, কোমল, সম্ভ্রান্ত ঘরের শিষ্টাচারসম্পন্ন নারী সমাজের উপর প্রচারের এই আলোকচ্ছটা পতিত হওয়ার সম্ভাবনাকেই প্রাচ্য মনের কাছে কেমন যেন বেমানান ঠেকে। ব্যবধানজনিত দূরত্ব এবং ছায়া, নীরবতা এবং অস্পষ্টতাই যেন পুণ্যের প্রকৃত পরিবেশ বলে মনে হয়; এবং নারীকে এমন এক পবিত্র রহস্য ... ধরা হয় যে, কোন পুরুষের পক্ষে অন্য কারও স্ত্রীর নাম তার স্বামীর সম্মুখে উচ্চারণও করা পর্যন্ত বারণ। "বাড়ীর ওরা সকলে ভাল আছে তো?"—স্ত্রী শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ এইরকম সতর্ক রূপ পরিগ্রহ করে। বাহির-

বাড়ীর বৈঠকখানায় পুরুষেরা দিন অতিবাহিত করেন। বারান্দা এবং রোয়াকে পাড়া-প্রতিবেশিরা এসে গল্প-গুজব করেন। এসব তো সর্বসাধারণের জায়গা। এখানে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার জীবন-যাপন করা চলে, নাগরিক জীবনের কাজকর্ম চালান যায়। কিন্তু অন্দর মহলে মেয়েদের ঘরগুলির শীতল ধূসর চৌকাঠ পেরিয়ে, তবে 'গৃহের' জগতে প্রবেশ করা যায়। আর সেই জ্যান্ত দেওয়ালগুলির ভিতর দিয়ে সে কি আবেগে ভরা ভালবাসার সমুদ্রই না উত্তাল তরঙ্গে আলোড়িত হয়। এখানে স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগত স্বামীর পদশব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। যে আর কখনও ফিরবে না সেই স্বামীর জন্য কান্নায় বিধবা স্ত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। এখানেই ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি করে, মা, কাকী, জ্যেঠী, পিসীমা, গম্ভীর-প্রকৃতির দিদি বা সমপ্রাণ অভিন্নহৃদয় বন্ধুদের খোঁজ করে। এইখানে যৌবন তার পরিকল্পনা এবং জটিলতাগুলি উপস্থাপিত করে এবং বার্ধক্য তার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের শান্ত দৃষ্টি দিয়ে সাক্ষীর মত দেখে যায়। এক কথায়, মৃদু হাসি ও অশ্রু, হাস্য ও প্রার্থনার মোহিনী-মায়া এবং ক্লান্তির যে মিশ্রণ দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত মধুর রহস্য সৃষ্টি করে। তা সবই এখানে যাওয়া-আসা করে। গৃহ সম্পর্কে প্রাচ্যে যে তীব্র আবেগ দেখা যায়, কেবল মধ্যযুগের হল্যান্ডের শিল্পেই সেই আবেগের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচ্য সে আবেগ ধ্বনিত করার কণ্ঠ এখনও খুঁজে পায় নি।

দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার মধ্যে বাহিরে দাঁড়িয়ে, অন্দরমহলের আধা অন্ধকারের দিকে চাইলে মনে হবে যেন সন্ন্যাসিনীদের মঠের বিরল ; দুর্লভদর্শন এবং সুন্দর-ফুল দিয়ে ভরা পুষ্পোদ্যান বুঝি এক পলকের জন্য চোখে পড়ে গেল। এটা হল মেয়েদেরই সময়। তাদের অভিভাবকেরা কেউ উপস্থিত নেই ; তারা হয় ঘুমাচ্ছে বা কাজে গিয়েছে। কেবল বাহিরের মহলে তন্দ্রালস কোন ভৃত্য সদর দেউড়ী আগলাচ্ছে। নির্দোষ পরিহাসের, সূক্ষ্ম মার্জিত প্রাণচাঞ্চল্যের বায়ু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রীতি ও বিশ্বাস সহকারে গোপন কথা বিনিময় হচ্ছে, নির্দোষ কৌতুকে ভরা রঙ্গরস চলছে। এই সময়ে ফেরিওয়ালা বিষণ্ণ কণ্ঠে, টেনে টেনে হেঁকে যায়—"চুড়ি-ই চাই, বালা-চাই", "ভাল-ও ভাল-ও শাড়ী" আরও কত কী। ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালার সস্তার জিনিস গছাবার জন্য টোপ ফেলা আর দরদস্তুর দিয়ে সেই সময়কার মজা বাড়িয়ে তোলার জন্য তাকে হয়তো ডাকা হয়।

অপরাহ্ণ অতিক্রম হয় ; শাদা থানের ঘোমটা মাথায় টেনে ক্ষীণকায়া বিধবারা জপের মালা নিয়ে—সবার চোখ এড়িয়ে বসেন ; জপে নিমগ্ন হন। এখানে ওখানে মায়েরা উঠে চলে যান। ছেলেদের স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়েছে ; তার জন্য তৈরী হতে হবে। হাসি ও কথাবার্তার শব্দ ক্রমে ক্রমে থেমে যায়, অপরাহ্ণ গড়িয়ে সন্ধ্যায় আসে। এইভাবে দিবসের নাটক শেষ হয়। সে নাটকের মধ্যে কোমল

গোলাপের রং থেকে ছাইয়ের ধূসর বর্ণ মিশে আছে কিন্তু তাতে সব রংয়েরই তীব্রতা প্রশমিত। তবু গৃহের প্রায় সব বাতায়নগুলি ভিতরের দিকে চেয়ে আছে। এবং চারটি নিরেট দেওয়াল দিয়ে সে গৃহ ঘেরা। একথা অত্যন্ত সত্য যে, নিস্তব্ধতা এবং ছায়াই হল প্রাচ্যের নারীর জীবনের আদর্শ।

কিন্তু এই আদর্শ যাতে প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন তার সর্বোচ্চ পরিণতির নিদর্শন এবং কেন্দ্র, এবং তার নিজস্ব দীক্ষাপ্রাপ্ত নিবেদিতপ্রাণ এক সেবক সংঘ। যাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য হবে আদর্শের প্রদীপটি জ্বালা এবং বেদীর সম্মুখে পূজারত থাকা। ভারতের নারীজগতে এই মানুষগুলি হলেন বিধবারা। সাহিত্যে পুরুষকর্তৃক নারীর প্রশংসা বা স্তুতি গান প্রধানতঃ তার নিজের সঙ্গে নারীর সম্পর্কে অবলম্বন করে রচিত। কিন্তু এটা শাশ্বত সত্য যে পুরুষের এই নায়িকা হেলেন, ডেসডিমোনা, বিয়াট্রিস—সেই নারীরই একটু হেরফের মাত্র, যে নারী থাকে চোখের আড়ালে অদৃশ্য, যাকে নিয়ে সংগীত রচিত হয় না, যার নাম নেই, যার কাল কাটে নির্জনে, এবং যাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

প্রাচীন মিশরে রাণী হাতাসু ব্যক্তিরূপে নারীর যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সৃষ্টির গৌরব ইউরোপ অথবা আধুনিক মানসিকতা দাবি করতে পারে না। আরও প্রাচীন ক্যালডিয়াতে সেমিরামিসের তা ছিল। এ কথা সত্য যে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের কাহিনীগুলিতে কোন নারী অবিবাহিতা থাকে না। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম,—এশিয়ার জীবনের ভগবৎ নির্দিষ্ট কর্ম—যেই আমাদের মধ্যে দেখা দিল, অমনি মধ্যযুগের ইতিহাস তার হিলডা, টেরেসা, জোনদের মধ্যে, তার স্যাকসন্ মার্গারেট এবং তার স্পেনীয় ক্যাথারিনদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। প্রাচীন কালে জার্মানদের শাখা ফ্র্যাঙ্করা, স্যাকসন্‌রা, ল্যাটিনরা আর টিউটনরা বিশ্বাস করত যে, যে নারী বিবাহ করে না, তার গির্জার আশ্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। আর এশিয়ায় আজও পর্যন্ত এই বিশ্বাস বর্তমান যে, সেই নারীর জীবনের বহুলাংশ পরিবারের গৃহের মধ্যেই অতিবাহিত হলেও তার পক্ষে ধর্মজীবনের অনুমোদন দরকার। ভারতবর্ষে বিধবারাই ভর্তৃহীনা; আর ভর্তৃহীনা হল সেইসব কুমারীরা যাদের বাগ্‌দত্ত পতিরা বিবাহের পূর্বেই মারা গিয়েছে এবং তারপর তাদের আর বিবাহ হয় নি।

এর মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস নিহিত এবং তা পাশ্চাত্যে বিশ্বাসের প্রচলিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্যেও যদি দৃঢ় এবং বিরতিহীন স্মৃতির ধারা প্রবাহিত হয়; যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর আদর্শের প্রতি অবিচল থাকে; যদি সে স্বামীর নাম পতাকা রূপে বহন করে এবং তার আত্মোৎসর্গ থেকে উদ্ভূত শক্তি নূতন নূতন অনুগামী এনে দেয়, তাহলে পাশ্চাত্যে তাকে পরম বিশ্বাসের প্রকাশ রূপে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে

কিন্তু জটিলতাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। জীবনের সাথী যখন প্রাণ-হারায় তখন জীবন যেখানে ছিল, সেইখানেই জীবনকে স্তম্ভিত হয়ে থেমে থাকতে হয়, যতক্ষণ না আর এক মৃত্যু এসে সেই প্রাণটিকে মুক্তি দেবার কাজ সম্পন্ন করে, যা অপরের চোখে স্বতন্ত্র একটি জীবন রূপে প্রতিভাত ছিল।

মরণ কি বিচিত্র বিস্ময়ে ভরা। এত শীতল, এত স্তব্ধ। ইন্দ্রিয় থেকে মনকে অপসৃত করে তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্থির করা হয়, এবং তা মুহূর্তের জন্য তার সান্নিধ্যে উপনীত হয়। সেখানে যাদের বাস তারা এক পরম প্রশান্তির মধ্যে মুক্তির স্বাদ পায়। হিন্দু বিধবা জীবন যাপন করে বটে কিন্তু তার মন, তার আত্মা সতত শ্মশানেই পড়ে থাকে। তার শাদা থান, তার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, তার অলংকারহীন দেহ, তার স্বল্প আহার, এবং সুদীর্ঘ পূজা-উপাসনা, অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতে এবং আমোদ আহ্লাদ ও উৎসবে যোগদানে তার অসম্মতি—এসবই তার জীবনের স্থায়ী আলোকছায়াগুলির প্রতীক। সে যেন তার কাজ খুঁজে পেয়েছে এবং এখন থেকে উৎসর্গিতপ্রাণা সন্ন্যাসিনীর মত সে তার জীবন পরিচালিত করবে। যদি সে বালবিধবা হয়, তাহলে এটা তার পক্ষে আরও সত্য। তখন ধর্মের যে ভাবটি অবলম্বন করে সে তার দিন কাটায়, তাকে ভগবচ্চিন্তা বলাই বোধ-হয় সংগত হবে। কিন্তু যদি তার বৈধব্য জীবনে সে স্মরণ করতে পারে যে স্ত্রী হওয়া বলতে কি বোঝায়, তাহলে তার মৃত স্বামীর নামই তার পূজাবেদী হয়ে উঠবে এবং তার জীবনের কঠোর নিয়ম পালন এবং সংযম এই অবর্ণনীয় আনন্দের স্মৃতি বহন করবে যে, তার জীবনের কঠোরতাদ্বারা অর্জিত পুণ্যের অর্ধেকের অধিকারী তার স্বামী। দুটি আত্মার অতীন্দ্রিয় মিলনে বিশ্বাসই 'সতী' হওয়ার প্রেরণা দিত। মনে করা হত, এ এমন এক আত্মোৎসর্গ যার ফলে স্বামীর আত্মা এক কথায় এক উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত লোকে উত্তীর্ণ হবে এবং স্বামীর পাশে থেকে স্ত্রীও সহস্র সহস্র বৎসর ধরে সেই আনন্দ উপভোগ করবে। এইরকম একটা ভাব মনের মধ্যে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেলে, আগুন দেখে কে না উপহাসের হাসি হাসবে?

এটা স্পষ্ট যে, বিধবার জীবনের এই ছক এক পরম সারল্য থেকে উদ্ভূত। যে বিবাহের শুধু একটি মাত্র কর্তব্য কেবল সেই পরিণয়েই এমন এক বিচ্ছেদ আসতে পারে যার পরিণতি শুধু একটি মাত্র চিন্তা। তবু কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে প্রেমের এই শোচনীয় ক্ষয় ও ভীষণ অপচয়ের মধ্যেই সুদৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী তার আত্মবিকাশের প্রশস্ততম পরিধির সন্ধান পায়।

কথিত আছে গণিতবিদ ভাস্করাচার্যের একটিমাত্র সন্তান ছিল। লীলাবতী তার নাম। মেয়ের কোষ্ঠী অতি সাবধানে রচনা ও বিচার করে ভাস্করচার্য দেখলেন যে, মেয়ের জীবনে একটিমাত্র লগ্ন আছে, যে লগ্নে বিবাহ দিলে তার

বৈধব্যের ভয় থাকবে না। সেই গণনা অনুসারে বিবাহের আয়োজন হল, অনুষ্ঠানাবলীর সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্যার পিতা নিজে একটি যন্ত্র তৈরী করলেন। একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এক পাত্র থেকে অপর পাত্রে বিন্দু বিন্দু জল ক্ষরিত হবে এবং সঞ্চিত সেই জল নির্দিষ্ট একটি উচ্চ স্তরে উপনীত হলেই, বুঝতে হবে যে বিবাহের শুভলগ্ন সমুপস্থিত।

বিবাহের আচার অনুষ্ঠান আরম্ভ হল, কিন্তু কন্যা লীলাবতী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমোদ-আহ্লাদের খোঁজে এঘর ওঘর করছে। একটি ঘরের এক কোণে সে বিচিত্র গঠনের একটি পাত্র দেখতে পেল। পাত্রের কানায় ঝুঁকে সে লক্ষ্য করতে লাগল যে পাত্রের ভিতরকার একটা অংশ পাত্রের জলের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। লীলাবতী দেখছে তো দেখছেই; এরই মধ্যে তার বিবাহের মুকুট থেকে একটি মুক্তা তার অগোচরে পাত্রের মধ্যে খসে পড়ে গেল এবং জল নিষ্ক্রমণের ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। সময় বয়ে যায়, কিন্তু ভিতরের পাত্রের অংশটির চারপাশের জল আর বাড়ে না। লগ্ন পার হয়ে যাবার পর ভাস্করাচার্য দেখলেন যে মেয়ের মুকুটের মুক্তা তাঁর সকল সতর্কতা ব্যর্থ করেছে। ক্ষোভে দুঃখে ভাস্করাচার্য বললেন, "মানুষের পক্ষে নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নিস্ফল।"

কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই বালিকা লীলাবতী বিধবা হল। কিন্তু তার পিতা সংকল্প করলেন যে, মেয়েকে তিনি এমন বিদুষী করে তুলবেন যে, পার্থিব সুখের জন্য সে কখনও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করবে না; তাঁর এই সংকল্পে তিনি এমনই সিদ্ধিলাভ করেন যে, আজও পর্যন্ত লোকে জানেনা যে, 'লীলাবতী' নামে নিগূঢ় গ্রন্থ ভাস্করাচার্য লীলাবতীর নামে কেবল উৎসর্গ করেন না সেই গ্রন্থে লীলাবতীকর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন।

এই গল্প ইতিহাসের গল্প। কিন্তু প্রতি গ্রামেই সহজ সরল দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকের বাড়ীতে যে দয়াশীলা বিধবা পিসীমা বাস করতেন, তিনি কি তাঁর ভাইয়ের ছেলেমেয়ে সমেত কলকাতার ঐ গলির সব লোককে, নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের আপনজন বলে মনে করতেন না? আমাদের বাড়ীর কাউকে কাউকে তিনি যখন তখন বলতেন, "এ দেশ ছেড়ে যেয়ো না যেন; জানতো আমি তোমাদের সবাইকে নিজের সন্তান বলে মনে করি।" পাশের বাড়ীর একজন যখন কলেরায় মারা গেলেন, তখন আমরা ইউরোপীয় প্রতিবেশীরা নই, আমাদের এই পিসীমাটিই সবার আগে সংক্রামক রোগবীজনাশক ওষুধপত্র নিয়ে উপস্থিত হন। সমস্ত বাড়ীটা অবিলম্বে পরিষ্কার করার কথা যখন বুঝিয়ে বলা হল, তখন পিসীমার চেয়ে বৃদ্ধা এক মহিলা সব শুনে নিজের হাতে কাজটা করলেন। প্রয়োজনের সময় কাউকে ডাক দিলেই দেখা যায় যে বিধবার দল উপস্থিত আছেন। রোগীর সেবার এমন কোন কাজ নেই যা করতে এঁরা প্রস্তুত নন, এমন কি আগ্রহী

নন। এমন কোন ভয়ঙ্কর বা ঘৃণিত ব্যাধি নেই, যাতে আক্রান্ত শিশুকে এঁরা খুশি মনে বুকে টেনে নেবেন না ; এমন কোন মর্মভেদী আঘাত নেই যা আহতের যন্ত্রণা এবং ক্ষতির মুহূর্তে এঁদের সমবেদনায় উদ্গত অশ্রুকে নিরুদ্ধ করে দেবে।

সমাজের কাজের জন্য বিধবারা যে অন্যান্য নারীর চেয়ে বেশি বাধাবন্ধহীন হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। স্বামীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে স্ত্রীদের নজর রাখতে হয় ; সন্তানদের হাজারো রকমের কাজ মায়েদের দেখতে হয়। কিন্তু বিধবা, বিশেষ করে নিঃসন্তানা বিধবা, তাঁর নির্জনতাক্লিষ্ট বেদনার মধ্যে সেইসব শিশুদের রুদ্ধ ক্রন্দন শুনতে পান, যারা তাঁর নিজের সন্তান নয় ; তাঁর শোকের মরুভূমির ওপারে রোগার্ত, দারিদ্র্যপীড়িত ও নিঃসঙ্গ মানুষদের দিকে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। নিঃসঙ্গ নারীদের গত প্রজন্মে আজকের চেয়ে কাজের সুযোগ বেশি ছিল। আমি একজনের কথা শুনেছি যিনি যতক্ষণ না পরিচারকের মুখে খবর পেতেন যে গ্রামের সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, ততক্ষণ তিনি দুপুরে খেতে বসতেন না। মানুষ বা পশুর রোগ সারাতে পারদর্শিনী বৃদ্ধা মহিলা প্রায় সব পরিবারেই একজন না একজন আছেন বা ছিলেন। গোমড়কের সময়ে হিমালয় অঞ্চলে যেসব গো-দেবীর পূজা হয়, তাঁরা হয়তো এইরকম হিন্দু নারী ছিলেন। কালক্রমে তাঁরা দেবীর আসনে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু ভারতে গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ; এবং নিজের পুরাতন প্রণালীতে সমৃদ্ধির শীর্ণতা ও সংকোচ থেকে উপজাত এই ক্ষয়, সামাজিক এবং আর্থিক শক্তির দিক দিয়ে নারীর হতমান হওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলেছে। তবু এখনও বিধবারা নারীজাতির বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কেন্দ্র রূপে বিদ্যমান। তাঁরা যদি খুব আধুনিকা হন, তাহলে তাঁদের পক্ষে সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আওড়ানর সম্ভাবনা কম বটে, কিন্তু মাতৃভাষায় রচিত বইপত্র পড়ার সম্ভাবনাটা অবশ্য বাড়ে। সে যাই হোক, তাঁরাই সাধুসন্ত সন্ন্যাসিনী তৈরী করেন, এবং ভারতে সন্ন্যাসিনীদের স্থান এমনই যে, আশপাশের কেউ সেই অবগুণ্ঠিত নারীর সম্মুখে উপস্থিত না হয়ে, তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে এবং তাঁর মৃদু কণ্ঠের আশীর্বাদ না পেয়ে কোথাও যাত্রা করতে ভরসা পান না।

ভূমি ও সম্পত্তির প্রশাসিকারূপে মহিলারা, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, বারবার প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এই ধরনের একজন হলেন ইন্দোরের মহিয়সী মারাঠা-রাণী অহল্যাবাঈ। সিন্ধিয়া এবং আর একজনের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার সময় তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর প্রথম কাজ হল সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া এবং অন্য রাজাদের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি সহায়হীনা নারী, তাঁকে রক্ষা করার কেউ নেই এবং তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনা। এর প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল এবং সমস্ত বিরোধ ও শত্রুতার অবসান হল। তারপর রাণী অহল্যা-

বাঈ দীর্ঘদিন জীবিত থেকে রাজ্যশাসন করেন। হিন্দু বিধবার একমুষ্টি স্বপাক অন্ন ছিল তাঁর আহার এবং তিনি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যাপকতম হারে তাঁর রাজস্ব ব্যয় করেন।

পুত্রকে নাবালক অবস্থায় রেখে যদি পিতা মারা যান, তখন মৃতের বিধবা তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন ; আর যদিও পুত্র ইতোমধ্যেই সাবালক হয়ে থাকে, তাহলেও মার জীবৎকালে সম্পত্তির অবাধ এবং পূর্ণ মালিকানা কোনক্রমেই ছেলে পায় না। মাঝে মাঝে মার পরামর্শ না নিয়ে ছেলে যদি না চলে, তাহলে সারা জগৎ ছি ছি করে উঠবে এবং বিষয়সম্পত্তি পরিচালনায় ভারতীয় নারীর খ্যাতি ফরাসী নারীর খ্যাতির মতই এমনই সুবিদিত যে, দায়ে আবদ্ধ সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণতঃ বলা হয় যে সে সম্পত্তি দায়মুক্ত করার জন্য একজন বিধবা চাই।

এ বিষয়ে অবশ্য সমৃদ্ধিশালিনী নারীর সামনে একটা প্রলোভন থাকে। সারা বিবাহিত জীবনে তার বাপের বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিকট এবং ঘনিষ্ঠ। প্রতি বছর কয়েকবার, নিদানপক্ষে একবার সে বাপের বাড়ী গিয়েছে। তার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ তার বাপের বাড়ীতেই—মায়ের পরিচর্যায় ও তত্ত্বাবধানে। সে বাপের বাড়ী গেলেই তার বালিকা বয়সের বন্ধুরা তাড়াতাড়ি দেখা করতে আসে এবং পুরান দিনের কথা কয়ে তার ছেলেবেলার স্মৃতিকে নিরন্তর জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পরিচিত অনুষঙ্গের পুনরভ্যুদয় দেখে সে যে পুরোপুরি শিশুতে পরিণত হয়ে যায় নি। এমনটি হতে কিন্তু বহু বৎসর কেটে গিয়েছে ; যেমন ধরা যাক, মাথায় কাপড় না দিয়ে কোন প্রতিবেশির বাড়ীতে সে পাশের গলি দিয়ে ছুটে যাবে। পথে যেসব পুরুষের সঙ্গে তার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে তারা যে কার্যতঃ তার ভাই। তাদের সঙ্গে যে সে ছেলেবেলায় খেলা করেছে—এই অনভ্যস্ত স্বাধীনতায়, তার মন খুশীতে ভরে উঠবে।

কিন্তু তার শৈশবের গৃহ এবং অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক যদি এইরকম ঘনিষ্ঠ এবং সুন্দর হয়, তাহলে যে বন্ধন হিন্দু ভাই-বোনকে এক করে রেখেছে, সে সম্পর্কে আমরা কি বলব ? যে নারীর স্কন্ধে দায়িত্ব রয়েছে, এই বন্ধনই তার সামনে প্রলোভন এনে দেয়। কারণ যে মৃত স্বামীর অর্থসম্পত্তি তত্ত্বাবধান করে, তারপক্ষে সেই অর্থসম্পত্তি এই খাতে অর্থাৎ ভাইয়ের হাতে না দেওয়া শক্ত ; আবার না দেওয়াটাকে বাপের বাড়ীর খবরদারি এবং নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার না করাকে, এবং এক পরিবারের হাত থেকে অপর পরিবারের হাতে ধীরে ধীরে দখল যেতে না দেওয়াকেই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মেনে নেওয়া হয়। এই ধরনের কাজের সঙ্গে যে অসম্মান জড়িত, সেইটেই প্রলোভনপূর্ণ স্নেহ ভালবাসার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে নারী প্রয়োজন হলে বাবা, ভাই এদের ভুলেও স্বামীকে ভালবাসে, সে-ই আদর্শ স্ত্রী। কিন্তু এই আদর্শে উপনীত হওয়া কি কঠিন। হিন্দুদের

পঞ্জিকায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে একটি তিথি আছে। এই দিনটিতে ভাইয়েরা বোনের বাড়ী যায়, বোনেরা ভাইদের আশীর্বাদ করে, আশীর্বাদ নেয়, আর সেই-জন্য পিতার অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত বিবাহিতা নারীর জীবনেও বালিকা বয়সের সম্বন্ধগুলি পাক দিয়ে দিয়ে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক সর্বদা তার জীবনের অঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে ; এবং যদি জীবনের নিষ্পেষণে সে তাদের কাঁধের উপর গিয়ে পড়ে, তাহলে অন্ততঃ এই কথাটা সে উপলব্ধি করে যে, যাদের উপর ভর দিয়ে যে দাঁড়াতে চাইছে, তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করবে না। এবং যে যষ্টিতে ভর দিলে তা ভেঙে যায়, তেমন ভগ্ন যষ্টি এরা নয়।

তবু কিন্তু বৈধব্যের প্রথম দিনগুলিতে তার মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা হল, শ্বশুরের সংসারে থাকা অবশ্য শ্বশুরের দারিদ্র্য যদি বাধাস্বরূপ না হয়, কারণ এই বাড়ীতেই তো মৃতের প্রতি তার সকল আনুগত্য বর্তমান। এটা প্রায়ই দেখা যায়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বালবিধবাকেও যত্নের সঙ্গে রেখে দেন, যে চলে গিয়েছে, তারই একটা চিহ্ন যেন এই মেয়েটি। এই ধরনের জিনিসের মধ্যেই নারীত্বের সকল গৌরব নিহিত। নিজের বাপের বাড়ীতেও বিধবার মৃত স্বামী সম্পর্কে হাজারো রকমের চুল চেরা দাবি করার অধিকার আছে। তার শ্বশুর বাড়ীর দায়-দায়িত্বের দিনগুলির কথা কি তার বাপ-ভাইদের মনে পড়ে না? সেখানে কি উপহার পাঠাতে হবে না হবে, তা আগে ভাগে তাকে বলার কথা তো বাপ-ভাইয়েরই? তাদের কি এখন সেসব কথা মনে করিয়ে দিতে হবে? ও, তাহলে কি তারা শুধু তার সম্পর্কেই ভাবনা চিন্তা বন্ধ করেছে, না যে লোকটাকে তাদের নিজেদের দেহের রক্তের মত প্রিয় বলে মনে করা উচিত, তার মান-মর্যাদা এরা ভুলে গিয়েছে? আর যে বাড়ীর নামে তার নাম যাদের উপাধিতে তার উপাধি সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা সবই যে অধীর আগ্রহে দেখে যাচ্ছে। ও বাড়ীতে কি নতুন কোন বৌ এল? তার নিজের কমে-আসা গহনা থেকে বাড়ীর বিধবা বৌ নববিবাহিতা বৌকে ছোটখাট গহণা থেকে কিছু একটা পাঠাবে তো। তা, একজোড়া কানের ফুলই না হয় দেওয়া হোক। অথবা বাড়ীর কারও অসুখের খবর শুনে সে সেবা-শুশ্রূষা করতে আসে। সে বাড়ীর বুড়ো মানুষদের দেখা শুনা করতে আসে, অথবা বাড়ীর বড়রা যখন তীর্থবাসে যান তখন ছোটদের ভার নিয়ে সংসার সামলায়। এসবই একটা সামাজিক আদর্শজাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। জালের সেই বিস্তৃতি মৈত্রী ও আত্মীয়তা থেকে সমুৎপন্ন আয়কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করাটাকে কঠিন করে তোলে।

পক্ষান্তরে, যে সম্পত্তির পরিচালনাভার নারীর হাতে গিয়ে পড়ে, নারীর সাধারণ বুদ্ধি ছাড়াও সে সম্পত্তি একটা আর্থনীতিক সুবিধা পেয়ে থাকে।

সেটা হল ব্যক্তিগত ব্যয়বাহুল্য থেকে মুক্তি। বিধবা যেরকম প্রবলভাবে মিতাচার অবলম্বন করেন, তা সত্যই অসাধারণ। আজও পর্যন্ত তিনি তাঁর অভ্যাস দিয়ে গড়া এক প্রাচীন ভারতে বাস করেন। কলকাতায় তিনি গঙ্গাজল পান করেন, তাঁর বিশ্বাস ইউরোপীয়দের ব্যবহারের দরুন পুরসভার দেওয়া জল দূষিত। লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপবিত্রতার হাত এড়াবার জন্য তিনি সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করেন। অসুস্থ হলে তিনি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির চিকিৎসক বৈদ্য বা কবিরাজ দেখান এবং বারাণসী বা প্রাচীন বিদ্যার কোন কেন্দ্র থেকে ওষুধ আনান হলে সে ওষুধের জন্য অবিশ্বাস্য রকমের চড়া দাম দেন। সুস্থ থাকলে তিনি মধ্যাহ্নে বা তার পরে স্বপাকে আহার করেন; আর রাত্রে সামান্য কিছু দুধ, ফল এবং খমির না দেওয়া হাতে গড়া রুটি খান। তাঁর চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা (ভারতের কোন কোন অংশে তাঁর মাথা মুণ্ডিত); প্রথমে বোধহয় সৌন্দর্যের প্রলোভন দূর করার জন্য এটা প্রচলিত করা হয়, কিন্তু প্রথা থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে এটা করা হয়, যাতে করে তিনি আরও ঘন ঘন এবং সহজে স্নান করতে পারেন; প্রতিবার স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষার সময় পবিত্র বারির দ্বারা অভিসিঞ্চিত হবার ভাবটি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

এই হল তাঁর সাধারণ কাজের ছক। মাঝে মাঝে তাঁর অবসর বিনোদনের অন্যান্য উপায় হল তীর্থভ্রমণ, সকালে বা সূর্যাস্তের পর বাড়তি একবার কোন মন্দিরে যাওয়া বা মহাকাব্য থেকে পাঠ বা কথকতা শোনা তাঁর যে কোন ব্যয়বাহুল্য নেই—এ কথা কি ঠিক বলা হয় নি? তাঁর জীবন অন্যদের জীবনের চেয়ে পবিত্র বলে অন্য কেউ তাঁর খাবার স্পর্শ করবে না, যদিও তিনি পরিবারের রান্না করতে বা যেকোন লোককে খাবার পরিবেশন করতে পারেন। ঐ একই কারণে, কে আগে কে পরে—এ প্রশ্ন উঠলে সধবাদের চেয়ে উচু জায়গায় তাঁর আসন। ঊষার উদয়ের আগে উঠে কি তিনি মালা জপ বা এক ঘন্টা পুজো-ধ্যান ইত্যাদি করেন নি? তারপর তাঁর ঘর পরিষ্কার করা এবং গুছিয়ে ফেলার পরে তিনি কি প্রাতঃস্নানের জন্য নদীতে যান নি? প্রতিদিনের নিয়মমত নিজের হাতে কাচা ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরে তসরের থান পরে তিনি কি অন্ততঃ একঘন্টা ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পুজানুষ্ঠান করেন নি? সেই পুজো শেষ হলে তবেই তো তিনি নিজের রান্নার কথা ভাবতে পেরেছেন। অপরাহ্নবেলায় তিনি আবার মালা জপ করতে বসেন, তাঁর ডান হাত আর জপের মালা ছোট একটি থলির (কুঁড়োজালির) মধ্যে লুকোন থাকে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালার মুহূর্তে তিনি আবার ধ্যানে বসেন। তারপর ঘন্টাখানেক গল্পগুজব, রাতের সামান্য কিছু আহার, শয্যাগ্রহণ; আর পরদিন প্রত্যুষে আবার যথারীতি তাঁর দিনের কাজ চক্রবৎ আবর্তিত হয়।

হিন্দু পরিবারের ইতিহাসে সদ্যবিধবা যুবতী কন্যার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন

এমন একটা মুহূর্ত যার সঙ্গে অন্য কোন সময়ের তুলনা করা যায় না। তার প্রতি অবর্ণনীয় স্নেহ ও ভালবাসা উজাড় করে দেওয়া হয় বিশ রকম কারণ দেখিয়ে তার নিয়মপালনের কঠোরতাগুলি শিথিল করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। তার অনিচ্ছাসত্বেও তার বাপ-মা শ্বশুর-শ্বাশুড়ী জোর করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সারা পরিবারই কয়েক মাস তার জীবনযাপনের কঠোর নিয়মগুলি পালন করে এবং তার আত্মসুখত্যাগের সঙ্গে তাল রেখে চলে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থাটা ভেঙে দেয়। এইরকম একটা সংকটজনক মুহূর্তে তরুণী কন্যার সুখশান্তি নিঃশেষ হয়ে যাবার কথা ভেবে বৃদ্ধ পিতা বলেন, "তা আমারও তো সংসার ছাড়ার সময় হল; কি বল মা, আমরা দুজনে একসঙ্গে সংসার ত্যাগ করি না কেন?" আর যখন পিতার বলিষ্ঠ হস্ত তাকে ধরে রয়েছে, তখন মা পক্ষিমাতার ন্যায় পক্ষবিস্তার করে গৃহপ্রত্যাগত বাণবিদ্ধ পক্ষিশাবককে এমন দৃঢ়ভাবে বুকে টেনে নেন যেমনটি তিনি আগে কখনও করেন নি। প্রকৃতপক্ষে মা ও বিধবা কন্যার এই মিলনের কথা প্রবাদের সামিল হয়ে উঠেছে। যদি কোন ছেলে তার মার মুখ চেয়ে চলে, আর তাঁর দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য সতত যত্নবান হয়, তখন পাড়ার সহৃদয় প্রতিবেশীরা ঈষৎ পরিহাস সহকারে বলেন, "মা, ও তো তোমার ছেলে নয়। ও ঠিক যেন তোমার বিধবা মেয়ে।" এইভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। মার বয়স হয়, তিনি নিজেই হয়তো বিধবা হয়ে বিধবা কন্যার সঞ্চিত শক্তির উপর নির্ভর করেন। জীবনে ভাটা পড়ে; কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ তার পূর্ণ, পরিপক্ক ফলগুলি আহরণ করে চলে সরল, আড়ম্বরবর্জিত অথচ মহিমান্বিত, সুগম্ভীর এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনগুলি থেকে; গ্রাম ও জাতির গোপন শক্তির আধার চরিত্রগুলি থেকে; সাধুসন্তদের জীবনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা আদর্শ থেকে; এবং সৃষ্ট শক্তির সুযোগ থেকে।

আমরা কল্পনা করে থাকি যে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বৎসরগুলি খৃষ্ট জননী মেরী অতিবাহিত করছেন সেই ক্রুশকাষ্ঠের তলায় দাঁড়িয়ে, যাতে বিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের সে কল্পনা সত্য। কিন্তু একটু যে ধৈর্য ধরে থামতে হবে। তিনি তো অনন্তকাল এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। একদিন সুউচ্চ আকাশে এক নতুন দিনের উদয় হবে, যেদিন সেই একই বিনয়নম্রবস্ত্র পরিহিতা, সেই একই বিনীতভাবে আবৃতদেহা দুঃখের জননীর মাথায় মকুট পরিয়ে দেওয়া হবে এবং সে মুকুট ভূষণ পরিয়ে দেবেন তাঁর পুত্র নিজে।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় জীবনে নারীর স্থান

ভারতের গ্রামের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথের উপর উষার আলো পড়ার সময়টিতে পথচারী প্রতি গৃহের প্রবেশদ্বারে একটি নতজানু নারীকে দেখতে পাবেন। ঐ নারী প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের পূজায় রত। চৌকাঠের সামনের পথে পিটুলি গোলা দিয়ে, আলপনা দেওয়া হয়েছে। আলপনায় নিয়মিত ব্যবধানে ফুল আঁকা। আলপনা কয়েক ঘণ্টা থাকে এবং তা দেখলেই বোঝা যায় যে, সাফসুতরো নিকোনো-ঝুকনো এবং পূজা শেষ হয়েছে। আলপনার রুচিসম্মত শিল্পকার্য নীরবে গৃহের আনন্দকে অভিব্যক্ত করে। আলপনার নকসায় লাউ-কুমড়ো ফুলের সুন্দর ছক বা ঘাসের মধ্যে ফোটা দু-তিনটি সাদা ফুলের সিধা সারি অথবা অন্য কোন মোটামুটি সাধারণ উপচার দেখেই বোঝা যায় গৃহস্থ সম্পন্ন না দরিদ্র।

কিন্তু সর্বত্রই আমরা ভাবনার এমন এক রীতি লক্ষ্য করব, যার কাছে সবই প্রতীক-ভাবাপন্ন। দিনের মধ্যে বাড়ীতে আনাগোনার বহর কেমন হবে তার একটা অস্পষ্ট পূর্বাভাস এবং ইংগিতে দরজার সিঁড়ির উপরকার বাতাস যেন ভরা। আর সকালে দরজা খুলে উন্মুক্ত করে দেওয়া এমন একটা দায়িত্ব যার ভার শুধু তারই হাতে দেওয়া যায়, যে সে কাজ করার সময় তার প্রিয়জনের জন্য দেবতাদত্ত নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে।

"এ ধরনের চিন্তা অতি প্রাচীন এক জগতে প্রচলিত ছিল।—সেই জগতে পুরাণের কাহিনীগুলি জন্ম লাভ করত, যা থেকে ধর্মসমূহের আবির্ভাব হত, এবং 'ভাগ্য' সম্পর্কে রহস্যময় ধারণার সৃষ্টি হত। এই প্রথার ললাটে তার সুপ্রাচীন বয়সের চিহ্ন লিখিত রয়েছে, কারণ ভারতের নারী প্রবেশদ্বারের পূজার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর ধরে উষার আলো ফোটার সংগে সংগে জেগে উঠেছে। কৃষকের সরলতা ও ধৈর্যের মত, মাটির ঘাসের সরলতা ও সহিষ্ণুতার মত। সহস্র সহস্র বৎসরের সারল্য ও ধৈর্য এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। নারীর এই ধীর সহিষ্ণুতাই সভ্যতা সৃষ্টি করে। ভারতীয় নারীর এই ধৈর্য এবং এর সংগে তার স্বপ্নাবেশ সৃষ্টির পরমশক্তির মিশ্রণই ভারতীয় জাতিকে গড়ে তুলেছে এবং আজও গড়ে তুলছে।

আদর্শের দিক দিয়ে দেখলে ভারতীয় নারীর জীবন ভারতের মৃত্তিকার একটি

কাব্য। কারণগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য যেসব সুসামঞ্জস্য এবং সামাজিক সংহতি হারিয়েছে, তাদের সবই প্রাচ্যে এখনও পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কেবল তার অঙ্গগুলির একের সঙ্গে অপরের ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্যই নয়, নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি তাদের সকলের এজমালি যৌথ সম্পর্কের মত বৃহত্তর ব্যাপারের দিক দিয়েও প্রাচ্যের জীবন একটা অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ জৈব বস্তু স্বরূপ। এমন কি শহরেও হিন্দুগৃহের দৈনন্দিন কাজের ছককে পিতৃপুরুষের গ্রামের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বলা যায়। শহরের নিষ্ঠাবান জীবনপদ্ধতি গ্রামেরই জীবনধারা মাত্র, কিন্তু তাকে প্রতিকূল অবস্থায় অপরিবর্তিত আকারে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

পারিবারিক জীবনে গরুর স্থান সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে এ কথাটা যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমন বোধহয় অন্য কোন কোন ব্যাপারে হয় না। দেশে ভ্রমণ করার সময়, জেলাগুলির সমৃদ্ধি পরিমাপ বা হিসাব করার জন্য মানুষের চোখ পশু-চারণ ভূমিগুলির দিকে নজর দিতে শেখে। যে আবহাওয়ায় ঘোড়ার পক্ষে কৃষিতে সহায়তা করা দুঃসাধ্য, সেই আবহাওয়ায় নিরীহ ও সহিষ্ণু বলদ কৃষির বন্ধু এবং তার সাহায্য ছাড়া মাঠে লাঙ্গল দেওয়া চলত না। ভারতের অর্থনীতির একটা মূল নিয়ম হল যে গ্রামে চাষের জমির প্রতি একর-পিছু এক একর জমি বিনা খরচে পশুচারণের জন্য রাখতে হবে। বর্তমান প্রশাসকরা এই নিয়মটি বড় একটা জানেন না। এই নিয়মের কারণ এবং প্রয়োজন দুই-ই সুস্পষ্ট।

কাজেই ভারত আজ যা, তার সেই রূপ সৃষ্টি করেছে গরু এবং আর্যজাতি— এই দুইয়ে মিলে, আর কৃষক এই কথাটি কখনও ভোলে না। পক্ষান্তরে পাঁচ হাজার বৎসরের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা এই চতুষ্পদ প্রাণীর উপর মানবোচিত গুণ আরোপ করার পক্ষে পর্যাপ্ত। প্রাচ্যের ভূমিতে এই যে শান্ত প্রাণীটিকে আমরা দেখতে পাই, তার কোমল চোখ দুটি আত্মীয়তা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের যে পরিতৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে, তা দেখতে পাশ্চাত্যের বর্বর মোটেই প্রস্তুত নয়। গরুর প্রজাতি এবং আকার প্রায় অসংখ্য। উত্তরাঞ্চলের সমৃদ্ধ ব্যবসায়কেন্দ্র বারাণসীতে বিশ্বনাথের ষাঁড়গুলিকে প্রতিপালন করা হয়। তারা যথেচ্ছভাবে পথে বিচরণ করে এবং যেকোন দোকান থেকে যা খুশি মুখে তুলে নেয় ; কেউ তাদের গায়ে পর্যন্ত আঁচড়টি কাটে না। আবার দক্ষিণে এক ধরনের ষাঁড় আছে, যেগুলি নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুর নামে পরিচিত কুকুরের চেয়ে মাত্র একটু বড় ; কিন্তু তাহলে কি হয়, তারা দুজন লোকসুদ্ধ গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর গাড়ী টানা বা ভার বহনের জন্য মহীশুরের ষাঁড়ের চেয়ে ভাল পশু সারা জগতে নেই। কিন্তু ভারতের প্রায় সব গরুই পাশ্চাত্যের গরুর চেয়ে আকারে ছোট, এবং তাদের কাঁধে একটা করে বড় ককুদ আছে। এরই সামনে জোয়াল রাখা হয়।

যাকে আমরা হিন্দুত্ব বলি, সেই জাতীয় মঙ্গলের নকশায় গোজাতির জীবন

যে এত বড় একটা স্থান অধিকার করে থাকবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই দেশের মধ্যে গরুর সংখ্যা পর্যাপ্ত রূপে বৃদ্ধি করতে কত যুগ যে লেগেছে তার হিসাব কে রাখে? সেসব যুগে ক্ষুধাভারে প্রপীড়িত হয়ে এত মূল্যবা একটি প্রাণ বধ করাকে সমাজের বিরুদ্ধে প্রায়শ্চিত্তবিহীন অপরাধ বলে গণ্য ক হত। জাতির কাব্য যে এই প্রাণীগুলির ভিতর তার মূল ভাববস্তুগুলি একটির সন্ধান পাবে এটা খুবই স্বাভাবিক; কারণ আমরা, ইউরোপীয়রা কুকু ও বিড়ালকে সপরিবারে যে রকম আদর দেই, সেই মূক প্রাণীগুলিবে সাথী এবং গৃহের অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্তী বন্ধুতে পরিণত করি, সেই রক অবাধ স্নেহ এবং আদরই এদেশে গরুকে দেওয়া হয়। শহরে তো গরুর চরার একমাত্র জায়গা হচ্ছে শানবাঁধানো উঠান, কিন্তু সেখানেও লোকে গরু পোষে, এবং দরিদ্রের কুটিরে দুগ্ধপ্রদায়িনী এই জীবের গোয়ালটি ঠিক পরিবারের লোকেদের ঘরের মতনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উত্তরাঞ্চলে ফসল কাটা এবং ফলমূল সংগ্রহের উৎসবগুলিকে পুরোপুরি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে পৃথক করে দেখা বেশ শক্ত ভাব এবং কল্পনার এক উচ্চস্তরে উন্নয়ন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠত দুইয়ের মধ্যেই দেখা যায় এবং তা দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে হিন্দু পরিবারে নতুন একটি গরুকে অভ্যর্থনাসহ গ্রহণ অনুরূপ ভাবরসে পরিপ্লুত। নতুন প্রাণীটিকে স্বাগত জানাবার জন্য সারা পরিবার এসে দাঁড়ায়। সে যেই বাড়ীর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে, অমনি তাকে ফুল দিয়ে সাজান হয়, ভাল করে খেতে দেওয়া হয়; আর অচেনা বাড়ীকে সে যাতে আপন গৃহ বলে মনে করে, সেই চেষ্টায় তাকে নানাভাবে আদর করা হয়। এই মনোভাব আমাদের মত কিন্তু পুরোপুরি স্বার্থপ্রনোদিত নয়, আমরা বেড়ালের থাবায় মাখন মাখিয়ে দেই এই মনোভাব নিয়ে যে, বেড়াল যাতে আমাদের বাড়ীর অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে গিয়ে সুখ ও আরাম অনুভব না করতে পারে। মনই যে জীবনের নিয়ন্তা—ভারতে এই সত্যটির উপলব্ধি যেন একটা অভ্যাসগত বা প্রায় সহজপ্রবৃত্তিগত ব্যাপার এবং সরাসরি মনে কাছে আবেদন করা ভারতীয়দের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যাদের আমরা ইতর প্রাণী বলি, তাদের সম্বন্ধেও কোন হিন্দুকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে না যে, গরুর অনুভূতি যদি নতুন পরিবেশের প্রতিকূল না হয়ে অনুকূল হয়, তাহলে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং তার কাছে প্রত্যাশিত কাজ সে ভাল করে করবে। এটা হিন্দুর কাছে আপনা থেকেই স্পষ্ট। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সময় পরিবারের মধ্যে কোন প্রচণ্ড বা হিংস্র চিন্তা বা আবেগ দেখা দিলে, সেই অমঙ্গলজনক লক্ষণের আবির্ভাবে সবাই খুবই দুঃখিত হবে এবং শান্ত ও সৌজন্যপূর্ণ মানসিক আবহাওয়া বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রযত্ন চেষ্টা করবে।

বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটা লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত নজ পড়ে। গরু নারীর সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগী। সেইজন্য গরুকে কিভাবে চালা৷ হয়, তার সংগে কি রকম আচরণ হওয়া উচিত—এসব বিষয়ে মেয়েদে ভালভাবে জানা চাই। এই প্রয়োজনটি জনসাধারণের মুখের কথার এইভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সন্তান, সমৃদ্ধি এবং দুধ এই তিনটি দিক দি খুব কম পরিবারেরই কপাল ভাল বলা যায়।' গৃহ শিশুকণ্ঠের কলহাে পূর্ণ হলেও, এবং শিশুদের প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে কড়ার দুধ কি কেটে যায় না এবং গরুর বাঁটের দুধ কি অকালে শুকি যায় না? তাই ছেলের বৌ আনার সময় আমাদের এমন মেয়ে বাছে হবে, গরুর বেলা যার হাত 'পয়মন্ত'।' হাত 'পয়মন্ত' করার জন্য ছে ছোট মেয়েরা সকাল পাঁচটার সময় উঠে, এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় গরু সামনে বসে, গরুর গলায় মালা পরায়, তার পায়ে ফুল অর্পণ করে, তাকে ভ ভাল জিনিস খেতে দেয় এর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিসমন্বিত শ্লোকাদি আবৃত্তি করে। আমেরিকার মিনেসোটা কৃষি কলেজের অধ্যাপকদের ম নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতসমাজ আমাকে জানিয়েছেন যে, হিন্দুনারীদের অনুস এই প্রথা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। "যে দুগ্ধদোহনকারীকে গাভী নিজের বৎস বলে মনে করে, কেবল তাকেই সে তার পুরো দুধ দেয়।"

সত্যই গৃহস্থের ঋণের আর অন্ত নেই। একজন হিন্দু বলেছেন, "একমাত্র দুগ্ধ স্নেহ থেকে উপজাত খাদ্য।" যেদেশে মনের উপর খাদ্যের ক্রিয়া সম্পর্কে এত চিন্তা করা হয়, সেদেশে সম্ভবতঃ এই কারণেই দুধকে (এবং ফল ও মধুকে সাধুসন্ন্যাসীদের উপযোগী খাদ্য বলে ধরা হয়। কিন্তু গোমাতা জ্বালানি এবং সারও দিয়ে থাকেন। গোবরের বীজানুনাশের উপাদান এবং পবি করার গুণ আছে। নিজের হাতে গোবর নিকিয়ে ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাবট দূর করা এবং কৃষকের কাছে সদাসর্বদা সুবাস বলে পরিগণিত এক গন্ধ ঘরে আনা,—এ কাজ করতে দুরবস্থায় পতিত রাজকন্যা এবং দরিদ্র অথচ ভাল ঘরের মেয়ে কেউই নিজেদের ছোট মনে করে লজ্জা পাবেন না।

জাপানে সন্ধ্যার যে মুহূর্ত 'ও কে' বলে পরিচিত, এবং চীনে যাকে 'হলদে ধুলোর ঘণ্টা' বলা হয়। ভারতে পাঞ্জাব থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সেই সন্ধ্যাকে গোধূলি বলা হয়। সারা গ্রামের ছবি, সংকীর্ণ পথ দিয়ে গরুর পাল-গুলিকে তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার ছবি এই একটি কথায় ফুটে ওঠে।

এশিয়ার দেশগুলির শ্রেষ্ঠ গৌরবগুলির মধ্যে একটি হল যে, সে দেশগুলিতে বিদ্যার পবিত্রতা সম্পর্কে সর্বজনীন স্বীকৃতির পাশাপাশি সারা সমাজের সরল জীবন যাত্রাকেই সামাজিক আদর্শ রূপে গণ্য করা হয়েছে। রাজসভার কৃত্রিম এবং

বিলাসবহুল গতানুগতিক জীবন কিন্তু সেই স্থান পায় নি। সেইজন্যই প্রার্থনা এবং মাতৃত্বের পাশাপাশি রাজ্যশাসনের স্তরে উন্নতিশীল শ্রমই ভারতে নারীর সুযোগ এবং জাতীয় ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে তার অবদান রূপে বিদ্যমান। পশু-পালকের জীবনের সাংসারিক বাধ্য-বাধকতাগুলি কৃষকসমাজের গার্হস্থ্য প্রয়োজন-গুলির চেয়ে কম তীব্রভাবে তার জীবনে অনুভূত হয়, ফলে সূচীকর্মের দিকে মন দেবার জন্য বেশি সময় তার হাতে থাকে; কিন্তু ভারতের ন্যায় আরবদেশেও, আদর্শ অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হবে। আর আমাদের 'মোসলেমদের মহিয়সী-মহিলা' ফতেমা* পয়গম্বরের কন্যা হলেও, তবু কিন্তু তিনি অধিকতর ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী এই কারণে যে, তিনি তাঁর কমনীয় হাত-দুটি দিয়ে জাঁতা ঘোরাতেন। তাঁর যত্ন এবং তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভালর জন্য গৃহস্থালীর কাজকর্ম মিতব্যয়িতার সঙ্গে টেনে টুনে করতে তিনি ঠিক প্রায় ততটা খাটুনিই খাটতেন, যতটা পরিশ্রম তিনি করতেন 'সমস্ত মুসলমানের মুক্তি' কল্পে ঈশ্বর সকাশে তাঁর মধুর মধ্যস্থতার জন্য। রোজ কেয়ামতের দিনে, শেষ বিচারের সময় তিনি তাঁর যৌতুকরূপে 'সকল মুসলমানের মুক্তির' যে দাবি ঈশ্বরের কাছে জানাবেন, তাকেই তিনি মধ্যস্থতা বলতেন।

ভারতে গোশালা, ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতি গব্যসামগ্রীর ভাণ্ডার, রান্নাঘর, শস্যের গোলা, ঠাকুরঘর এবং অন্যান্য অগণিত কাজে বাড়ীর মহিলাদের সারাদিনের মনোযোগ ভাগাভাগি হয়ে যায়। সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন বাড়ীগুলিতে একটি বড় রান্নাঘর এবং পাচকদের জন্য বারান্দা থাকে; এবং তার উপরে মা-ঝি-বৌদের ব্যবহারের জন্য কেবল একটা নয়, অনেকগুলি রান্নাঘর থাকে। আর শাকসবজী লতাপাতা ফলপাকড়ের বাগানে কেবল অন্দর মহল দিয়েই যাওয়া যায়। এ সব কাজে যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ে তাহল কি তৎপরতার সঙ্গে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজটা সবাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কি শান্তিপূর্ণ উপায়েই না কার্য সমাধা হয়। ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা এবং পাকের ব্যাপারে এটা সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে। ভোজদ্রব্য তৈয়ারী করা এমন একটা কাজ, যাতে ভালবাসা এবং আতিথ্যের ঘনীভূত মাধুর্য উজাড় করে ঢেলে দিতে ভারতীয়রা শিশুকাল থেকেই শেখে। তাঁর খরচে এতগুলি লোককে খেতে দেখে গৃহস্বামীর আনন্দের কথা বা এতগুলি লোকের সেবা করে গৃহিণীর তৃপ্তির অনুভূতি বোঝাবার মত কোন একক প্রথা আমাদের নেই। সব নারীই রাঁধতে পারেন এবং প্রায়শঃই রন্ধননৈপুণ্যের

---

* হজরৎ মহম্মদ এবং খাদিজার কন্যা ফতেমা। ইনি পয়গম্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন।

দরুন তাঁদের পাকা রাঁধুনি বলা যায়। সেইজন্য আগেকার দিনে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠানে রান্না করার আমন্ত্রণ পাওয়াটা একটা মস্ত প্রশংসার কথা বলে ধরা হত। সে যাই হোক, এমন কি হিন্দু সমাজও এখন পাশ্চাত্য সমাজ-সংগঠনের আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং আজকাল কাজেকর্মে রান্নাবান্নার ভারটা ভাড়া করা বামুনঠাকুরদের ঘাড়েই দেওয়া হচ্ছে। এ'রা দৈনিক রোজে কাজ করলেও সমাজে এ'দের পরিচারক বা ভৃত্যরূপে দেখা হয় না।

সেইজন্য এমন একটি দৃষ্টিকোণ আছে যেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে ভারতীয় নারীদের জীবনকে প্রয়োজনীয় শ্রমসাধ্য কাজে নারীজাতি-কর্তৃক প্রদত্ত এক বিরাট সহযোগিতা বলে মনে হবে। সূক্ষ্ম রুচি, স্নেহকোমলভাব এবং আত্মসম্মান তাঁদের সেই পরিশ্রমকে মর্যাদা দান করে। আর এ কথাও বলা যায় যে, পৃথিবীতে শুধু নিষ্ঠাবান হিন্দুপরিবারই এমন একটি স্থান যেখানে উচ্চস্তরের সভ্যতা বর্তমান এবং যেখান থেকে পারিবারিক দাসত্বের সর্বপ্রকার রকমফেরই দূর করে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকা এশিয়ায় দাসত্বের যে রূপ দিয়েছে, বিরাট ধর্মসংগঠন এবং ধর্মব্যবস্থার আওতার মধ্যেও এশিয়ায় দাসত্ব বলতে নিশ্চয়ই কখনও তেমন কিছু বোঝাত না। এখনও এমন কোন কোন লোক বেঁচে আছে, যাদের বাল্যকালে রাজপুত এবং বাঙালী পরিবারে গোলাম হিসাবে কেনা হয়েছিল। এরা ছিল অনাথ কিন্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি তাদের মানুষ করা হয়, শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট ব্যাপারে তারা কাজেরও হয়ে ওঠে। একথা কারও মনে হয় নি যে, মজুরি, মাহিনা এবং রোজগারের দিন আসার সময় বাড়ীর কর্তা গিন্নী তাঁদের মুখাপেক্ষী এই লোকগুলির আয়ের ওপর কোন দাবি জানাবেন, অথচ এদের বিয়ে দিয়ে সংসারে এদের ঠিকমত স্থিতু করে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। প্রথার মধ্যে নিহিত এই মানবতাবোধের একটা বিচিত্র পরিণতি হল এই যে, দাস কথাটা ইউরোপীয়দের মনকে যতটা দংশন করে, এশিয়াবাসীদের চেতনাকে ততটা করে না।

যেসব অঞ্চল এখনও দুর্ভিক্ষে নিঃশেষ হয়ে যায়নি সেখানে ঘুরে দেখলে ভারতীয় কৃষকের মানসিক শান্তি আখছার চোখে পড়বে। উঁচু পোতার ওপর গড়া মাটির ঘরের কোলে চওড়া বারান্দায়; চালে খড় গোলপাতা শন বা টালির সুন্দর ছাউনি। নারিকেল গাছ, বাঁশঝাড় আর কলাগাছের ঝাড়ের আড়ালে বাড়ীগুলি প্রায় ঢাকা। বাড়ীর সামনে সবুজ মাঠে গরু চরছে, না-হয় সামনে রয়েছে ধান-ক্ষেত বা আম-বাগান। নিরবচ্ছিন্ন নীল নভোমণ্ডল দিগন্তে গিয়ে মিশেছে পর্ণপত্রের কম্পিত কোন রেখার পাশে। যেখানে নতুন বাঁশঝাড় কোন গ্রাম বা খামার-বাড়ীকে অবগুণ্ঠনে ঢেকে রেখেছে। ভারতীয়ের মন এই রকম চিত্রই ভালবাসে।

এমন কি সুদূরে শহরগুলিতেও প্রতিটি উৎসবের দিন এর স্মৃতি বহন করে আনে ; কারণ দেউড়ির থামের পাশে জলপূর্ণ ঘট আর তার মুখে কচিডাব, কলাগাছের তেউড়, বাড়ীতে ঢোকার দরজার মাথায় দড়িতে গাঁথা আমপাতার সারি—এগুলি হল মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং সেইজন্য উৎসবসজ্জায় এ জিনিসগুলি সর্বত্র ব্যবহার করা হয়।

ঝোপঝাড়, নদী এবং মাঠের প্রাকৃতিক পরিবেশ লাভের আকাঙ্ক্ষার দরুনই গৃহবধূ তার গৃহের সাদামাটা গড়নের কড়াকড়ি নিয়েই এত সন্তুষ্ট থাকে। গৃহ-সজ্জার অবান্তর খুঁটিনাটি সে আর খোঁজে না। প্রকৃতি সম্পর্কে যে সচেতন এবং গভীর আবেগ অনুভব করে না, তেমন ভারতবাসীর অস্তিত্বই নেই। রাজপুতানা এবং উত্তরাঞ্চলের মর্মরপ্রস্তরনির্মিত প্রাসাদগুলি পরিকল্পনামাফিক সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে ; সেগুলির মধ্যে এখানে সেখানে শুধু সুন্দর সুন্দর জিনিস বসিয়ে দেওয়া হয়নি। উপরে উল্লিখিত আদর্শ অনুযায়ী এই প্রাসাদগুলির বঙ্গ-দেশের কৃষকের কুটির এবং খামারবাড়ীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নারীর জীবন যথাযথভাবে অঙ্কিত করলে দেখা যাবে যে, কৃষক জীবনের সুদীর্ঘ চিত্রমালা দিয়েই তার রেখাচিত্র বা নকশা তৈরী করতে হবে। বিভিন্ন ঋতুতে প্রতিটি গাছ, ফল ও ফুল ইতিহাস বা কাব্যের কোন না কোন অনুসঙ্গ বা স্মৃতি বহন করে আনে। শক্ত গোলাকার কদম্ব ফুলের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন। এই গাছটি আমাদের প্রশস্তপত্রবিশিষ্ট সুদীর্ঘ প্লেইন গাছের মত। বটগাছের পাতাগুলি এমন চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে যে, বায়ুবেগহীন নিশ্চল অপরাহ্নেও তারা আমাদের কম্পমান পপলার গাছের পাতার মত স্পন্দিত হয়। এই বটবৃক্ষের বিশাল শীতল ছায়ায় বুদ্ধ গভীর রাত্রে নির্বাণ লাভ করেন। যে কোমল শিরীষ কুসুম 'মধুকরের ভার সইতে পারলেও খঞ্জনপাখীর ভার সইতে অক্ষম,' তা নারীর ওষ্ঠাধর, শিশুর হৃদয় প্রভৃতি সুন্দর কোমল বস্তুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমলকী ফল শুধুই স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সুস্বাদু নয়—আমলকীর গুণের দৌলতে এই ফল সংরক্ষণ একটা প্রশংসাযোগ্য কাজ বলে পরিগণিত।—সারা এশিয়ায় বৌদ্ধসমাজে আমলকীর নাম সুবিখ্যাত। যে যুগে আমলকী স্থাপত্য-বিদ্যার অলঙ্করণের উপাদান হিসাবে নিরন্তর ব্যবহৃত হত, সেই গৌরবময় যুগের কথা আমলকী আমাদের মনে করিয়ে দেয়। চ্যুতমুকুল বা আমের বোল মদনের পঞ্চশরের অন্যতম। আতা সীতার প্রিয় ফল ছিল।

বহু যুগ ধরে যেসব জটিল ভাবানুষঙ্গ সাধারণ ভারতীয় জীবনকে কেন্দ্র করে সঞ্চিত হয়েছে, এগুলি তাদেরই অল্প কয়েকটি মাত্র। স্বপ্নের এই ঐশ্বর্য যে গৃহকে সৌন্দর্য দান করে না, তেমন সজ্জাবিহীন গৃহ কোথায় ? এই সমৃদ্ধি তো ভাষার অবয়বের মধ্যে বহু দিন পূর্বেই সঞ্চারিত হয়েছে। কোন জাতই এত উচ্চ নয়

এবং কোন পতিত ব্যক্তিই এত নীচ নয়, যে, তারা এই ঐশ্বর্যের নাগালের বাইরে থাকবে। এ এক বিরাট জাতীয় সম্পত্তি, যা পারস্পরিক ভাবাবেগ এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্মৃতি সৃষ্টি করে, এবং ব্যক্তির রুচি এবং কল্পনার বিকাশের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত উপাদান উপস্থাপিত করে। সর্বোপরি নীরবে এবং কঠোরভাবে বিদেশী ভাবানুষঙ্গ বাইরে রেখে, ভারতীয় মনকে সকল অর্থে স্থায়ী সম্পর্কের সঙ্গে বিজড়িত করে, এ সম্পত্তি ভারতীয়ের চিত্তকে দেশের মাটির সঙ্গে চিরতরে যুক্ত করার এক জৈব এবং অবিনশ্বর বন্ধন রূপে কাজ করে।

পুরুষেরা অবশ্য এই উত্তরাধিকারের অংশটুকু শৈশবেই পেতে আরম্ভ করে। পরে লেখাপড়া শিখে তারা আরও নিখুঁতভাবে তাদের লোকগাথাগুলি নতুন করে দেখতে শেখে। নারীদের কিন্তু এই আবহাওয়াতেই বসবাস। এই বাস্তব সত্যের পটভূমিতেই তাদের সরল ধর্মানুরাগী জীবন বিন্যস্ত হয় এবং তারই দ্বারা এই সত্য ক্ষীণ না হয়ে নিজের আকার আয়তন বজায় করে জীবনধারা অব্যাহত রাখে।

আমরা তাই দেখছি জীবন ও সমাজের ভারতীয় সংগঠন সুসংগত এবং প্রয়োজনীয় এবং তার রীতি ও আদর্শগুলি সরাসরি দেশের মৃত্তিকা থেকে উপজাত হওয়ার দরুন সেগুলি তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানানসই। তার ফলে রীতি ও আদর্শগুলি একটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। সর্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপ্ত জাতিগুলির সুবিধাভোগী মানুষ হয়ে যাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁরা একথা বুঝতে পারবেন না।

পৌরাণিক কাহিনীতে বেশ মনোরম ভাবে জৈব দেহের সঙ্গে তুলনীয় এই সামাজিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন হলেন, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু থেকে জন্মলাভ করলেন, বৈশ্যেরা তাঁর উরু থেকে এবং শ্রমজীবী-সম্প্রদায় তাঁর পদদ্বয় থেকে নির্গত হলেন। কিন্তু প্রাচীন পর্যবেক্ষকরা নিজেদের দেশের বাইরে কিছু দেখেন নি বলে, ধরতেই পারলেন না যে, সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় কি ভাবে বাস্তব অবস্থা সমূহ স্বয়ং ব্রহ্মার উপরেও নিজেদের চাপিয়ে দিল।

ভৌগোলিক ধারণার সুবিস্তীর্ণ ক্রমবিন্যাসের জ্ঞান আধুনিক ছাত্র আহরণ করেছে। সেইজন্য সে ভারতীয় সংশ্লেষ এবং সমন্বয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখে চমকিত না হয়ে পারে না। সেটা হল ভৌগোলিক অর্থে এর সম্পূর্ণ জৈব এবং আঙ্গিক প্রকৃতি। ভারতের সুবিশাল সীমার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি প্রদেশ জাতিকে পূর্ণাঙ্গ করার কাজে কোন না কোন দায়িত্ব পালন করে। কোন একটা জায়গা অন্য কোন একটা জায়গার কাজ দোকর করে করছে না। আর যে কথা জেলাগুলি সম্পর্কে বলা যায়, তা দেশের তাবৎ নরনারীর পক্ষে বিশেষ করে নারীদের পক্ষে

প্রযোজ্য। জাতীয় চরিত্রে জাতীয় ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্তসার সব সময়েই পাওয়া যায়। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে যতটা সত্য, এমন আর কোন দেশের পক্ষেই নয়।

বাঙালী স্ত্রী তার স্বামীর পূজা করে এবং সাধুসন্তদের আত্মহারা মনোযোগ দিয়ে তার সন্তানদের এবং সংসারের সেবা পরিচর্যা করে। মহারাষ্ট্রের নারী পাশ্চাত্যের যে কোন নারীর মতই দৃঢ়চিত্ত এবং বাস্তবমুখী। রাজপুতানী নারীর গর্বের বস্তু হল তাদের অকুতোভয় সাহস। সেই সাহসের বলে নারী তার স্বামীর চিতানল পর্যন্ত স্বামীর অনুসরণ করত। তার দরুনই রাজা রানীকে নিজের প্রজা বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। মাদ্রাজের নারী আধ্যাত্মিক ধ্রুবতারায় উপনীত হওয়ার জন্য নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েও সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আধুনিক জগতের বাধাবন্ধহীন প্রবাহ তার প্রথার প্রাচীর ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, সে উভচর বীবরের মত যত্নে তার ভগ্ন প্রাচীরের অংশটুকু বার বার গড়ে তোলে। আর গুর্জরদুহিতারা অন্যান্য সব জায়গার ব্যবসায়ীদের কন্যাদের মতই কোমল। তারা ফুলের মত, রেশমের মত। তারা সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন এবং স্বপ্নের আবেশের মত মনকে জড়িয়ে থাকে।

আবার মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে আমরা সেই একই মাধুর্যমণ্ডিত ভারতীয় নারীর সাক্ষাৎ পাব ; তার পরনে কখনও শাড়ী, কখনও বা ছোট তুর্কী কুর্তা আর পায়জামা, কিন্তু তার মধ্যে সর্বদাই সেই একই শান্ত সুন্দর মা বা স্ত্রী বিদ্যমান। তার হিন্দু বোনেদের মতই সে যতটা বেশি পারে ধর্মের দায়দায়িত্বের তুলাদণ্ডে এবং যতটা কম সম্ভব কেতা ও কায়দা অনুসারে নিজেকে মেপে ওজন করে দেখে।

এই দৃঢ় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের নমুনাগুলির ভিতর কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কর্তব্যসম্পাদনে কোন ত্রুটি এবং অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনীগুলিতে যে হাজার হাজার বীর নারীর কথা বর্ণিত আছে, ব্রিনহিলডেকে তাদের কারও চেয়ে বেশি বীরত্বগৌরবমণ্ডিতা বলা চলে না। মৃত সিগার্ডের পাশে অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত সিংহাসনে তার অতীন্দ্রিয় রহস্যময় মৃত্যুই ব্রিনহিলডের জীবনের পরম কীর্তি। এই ধরনের কাজে কিন্তু অনেক নিরীহ শান্ত বাঙালী মেয়েকেই তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জোন অব আর্ক চাঁদবিবির* চেয়ে অথবা অদ্ভুত সেই ঝাঁসির রানীর চেয়েও বড় দেশভক্ত ছিলেন না। ঝাঁসির রানী ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ করেছিলেন। যারা এ

* বীর রানী চাঁদবিবি আহম্মদনগর রক্ষার জন্য আকবরের বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করেন এবং ১৫৯৯ সালে বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হন।

যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদের সন্তান-সন্ততি আজও বলাবলি করে যে, রানীর পিতা ইংরেজদের হাতে চাবি তুলে দেবার জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিল এই অপরাধে রানীর হুকুমে তার ফাঁসি হয় এবং ফাঁসির পর তার দেহ নগরের প্রাচীরের চেয়েও উঁচু জায়গায় ফাঁসি কাঠে ঝুলতে দেখা যায়। তারা আরও বলে যে, সৈন্যদের পুরোভাগে অবস্থিত লক্ষ্মীবাঈ তন্দ্রাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে শত্রুর শিবিরের উপর দিয়ে সহসা ঝড়ের বেগে চলে গেলেন ; তাঁর বর্শা শত্রুকে বিদ্ধ করার জন্য উদ্যত ; তাঁর পিঙ্গলবর্ণের ঘোটকী লক্ষ্মীর প্রতিটি মাংসপেশী প্রসারিত ; তাঁর আক্রমণ এমনই অপ্রত্যাশিত যে সেই আক্রমণের ধ্বনি শুনে বিভ্রান্ত কোনো কোনো গোরা সৈন্য এখানে ওখানে ছুটকো ছাটকা দুচারটে গুলি ছোঁড়ে বটে তখন অবশ্য রানীর অশ্বারোহী সৈন্যদল চলে গিয়েছে। আজও বৃদ্ধেরা অশ্রুপূর্ণচোখে রুদ্ধ কণ্ঠে রানীর গৌরবকাহিনীর গান গেয়ে থাকে।

কিন্তু রানী হলেও ঝাঁসির রানী পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি জাতিতে ছিলেন মারাঠা। দেশের জন্য আবেগে তাঁর প্রাণ পরিপ্লুত ছিল এবং বালিকা বয়স থেকেই তিনি শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর বিবাহের পর থেকেই তিনি রাজ্যের প্রকৃত প্রাণস্বরূপা ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন নামকা ওয়াস্তে রাজা। রাজ্যশাসনের জন্য বা পরিণীতা স্ত্রীকে যে সময় তাঁর দেওয়ার কথা, সে সময়ে তিনি দুর্বল ও নিস্তেজ কাব্য রচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবন মধ্যযুগের সন্ন্যাসিনীদের মতই নিঃসঙ্গ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কারণ ছিল দত্তক গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য মারাঠা নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক গুণাবলীর প্রভূত বিকাশ চিরকালই দেখা গিয়েছে এবং আজও পর্যন্ত সে বিকাশের গতি কোন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়েনি। একথা সুবিদিত যে ঝাঁসির রানীর বহু পূর্বে শিবাজী তাঁর অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাঁর মায়ের কাছে পিতার কাছে কিন্তু ততটা নয়। এই অনুপ্রেরণার ফলেই জাতীয় জাগরণ আসে।

প্রেমের কাহিনীসমূহের নায়িকাদের কথা যদি শুনতে চাই, তাহলে তাজমহল যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত, সেই সম্রাজ্ঞীর নাম উল্লেখ করাই কি যথেষ্ট নয় ? হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের কাছেই মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই প্রাসাদ পবিত্র। কারণ আদর্শ পত্নীর নীরব মুখরতা দিয়ে এই স্মৃতিমন্দির হিন্দু-মুসলমান উভয়ের উদ্দেশেই কথা বলছে। প্রাসাদের মুকুট বেগম আর্জুমন্দ বানু সম্পর্কে আমরা নিজেদের খুশিমত যত কম স্বপ্নই দেখি না কেন, দুটি জিনিস কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না। একটি হল, সেই নারীর প্রেম, যে নারী মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বামীর কাছে এই অন্তিম ইচ্ছা মুখ ফুটে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি স্বামীর প্রেমের উপযুক্ত এক স্মৃতিসৌধ চান। অপর জিনিসটি হল অস্তগামী

সূর্যের রশ্মিতে আলোকিত অলিন্দে শাজাহানের মৃত্যু। নদীর বাঁকে তুষারশুভ্র সমাধিমন্দিরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ। বিশ বছর ধরে তাঁর প্রিয়তমার জন্য যে সৌধ তিনি নির্মাণ করেছেন, তা যে শেষ পর্যন্ত সেই নারী নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন, এই সান্ত্বনা ও আনন্দেই তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। 'এমন কি আমি, এমন কি আমি বিয়াট্রিস' এই কথাগুলির মধ্যে বিজয়ী প্রেমের অবসানের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তার তুলনায় মোগলসম্রাটের মৃত্যুর চিত্রে বিজয়োৎসবসহকারে প্রেমের পরিসমাপ্তির অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি আছে।

তবু কিন্তু আমাদের মানতেই হবে যে, এশিয়ার সমাজ সাধারণভাবে বলতে গেলে সৌন্দর্য এবং মনোমুগ্ধকর সুষমার রাজ্যকে নারীর নিজস্ব রাজ্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে চায় না। মুসার পালিকা-মাতা, যীশুর মাতা। পয়গম্বরের স্ত্রী খাদিজা এবং তাঁর কন্যা ফতেমা মুসলমান নারীর প্রকৃত প্রতিনিধি স্থানীয়া। আর তেমনি হিন্দু নারীর আদর্শ কীর্তিও জ্ঞান, সেবা এবং ত্যাগে, ক্ষমতা ও প্রেমে নয়। হিন্দুদের প্রেমের গানগুলি গোপিনী রাধার মুখেই দেওয়া হয়। তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশে গান গাইছেন। প্রতি প্রেমিক বা প্রেমিকার মনোভাব কিভাবে যে তার প্রেমিকা বা প্রেমিকের মনে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হয় এবং এই নিয়ম থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই তা ভারতীয়দের রুচিকে যে কি দ্রুত আঘাত করে, সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। ইংরেজীতে নারী ও পুরুষের সর্বনামের স্বতন্ত্র রূপ আছে। মুসলমানদের চোখে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ফারসী কাব্যে পুরুষ এবং নারীর সর্বনামের, স্বতন্ত্র রূপের ব্যবহার যে কি চমৎকার উপায়ে এড়ানো হয়, সে কথা ফারসী কাব্যের সমঝদাররা বলে থাকেন ঃ "আমি হই তার, তুমি হও সুর। তুমি হও দেহ, আমি হই প্রাণ। এর পরে কেউ যেন না আমাদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, আমি ছিলাম একজন এবং তুমি ছিলে অন্য আর একজন।" এ কি দুই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা, না এ পুরোপুরি আত্মার কথা ?

সামরিক রাষ্ট্র নারীকে সব সময়েই আলাদা করে রাখতে চায়—এই ধারণার মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু সত্য আছে। অভিজাত সমাজের কড়াকড়ি বা নিভৃত নির্জনে নারীর বসবাসের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রথমেই মুসলমানীর স্থান, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রাজপুতানী, এবং বাঙালী নারীর স্থান তৃতীয়। এই থেকেই উপরের সিদ্ধান্তটি লাভ করে। কিন্তু ঝাঁসির রানীর দৃষ্টান্ত ভাল করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই প্রথা সর্বত্র প্রচলিত বলে যতটা বলা হয়, ততটা সর্বত্রগ্রাহ্য প্রথা এটা নয়। সব দেশেই নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা যথেচ্ছ ভাবে চলাফেরা করে, কারণ গৃহস্থালীর কাজকর্ম এবং জীবিকা অর্জনের তাগিদ রয়েছে যে, এবং হিন্দু নারীর বেলায় পর্দা মুসলমান নারীর পর্দার চেয়ে সহজে সরিয়ে নেওয়া হয়। হিন্দু নারীর বেলা পর্দার কড়াকাড়ি শিথিল করার হাজারো রকমের কারণ আছে। দক্ষিণ

এবং পশ্চিম ভারতে মুসলমান শাসন অল্পকালের জন্য ছিল এবং সেখানে মুসলমান ধরণধারণ কেতাকায়দার তেমন বোলবোলাও ছিল না। এইসব অঞ্চলে পর্দার কড়াকড়ি আসলে নেই বললেই চলে।

কিন্তু এ ধারণা যেন না জন্মায় যে, হিন্দু নারীরা তাদের পাশ্চাত্যের বোনদের মত স্বাধীনভাবে এবং অবাধে তাদের আত্মীয় স্বজনের বাইরের পুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। রামায়ণের খুব প্রাচীন এক রূপে দেখা যায়, দেবর লক্ষ্মণ মহাকাব্যের নায়িকা সীতার কেবল পদযুগলই দেখেছেন, সীতার দেহের, পায়ের উপরের কোন অংগে তাঁর চোখ পড়েনি। আরও দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না, এবং স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করলেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অবাধ সামাজিক মেলামেশা বলে যাকে মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার শক্তি সকল সমাজেই থাকার দরকার, এবং পাশ্চাত্য সমাজেও অনুরূপ রীতি আছে। যারা নিজেদের সুশৃংখলভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, কেবল তারাই স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এর সংগে আরও বলা যায়, পাশ্চাত্য সমাজের মত প্রাচ্য সমাজেও সুশীলা স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর সম্ভাব্য সন্দেহ উদ্রেক করার অবকাশ সমানভাবে সংকীর্ণ এবং সন্দেহের অকারণ আক্রমণ ও প্রকোপ উভয় সমাজেই একই রকম দুর্বলতা এবং অপমান বলে গণ্য হবে।

অবশ্য মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের পরিলক্ষিত স্বাধীনতা তার সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা বাস্তব সত্য। আর মালাবার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে নারীর তো আসলে তুংগে ওঠার লগ্ন সমুপস্থিত। এই বিচিত্র প্রদেশে নারীরা সংস্কৃতে পারংগম এবং এখানে রাজারা তাঁদের ভগ্নীদের প্রতিনিধিরূপে শাসন করে। ভারত যেদিন তার নিজের রক্ত থেকে জাত যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ সমাজতত্ত্ববিদ সৃষ্টি করবে, সেদিন এই বিচিত্র প্রদেশ জগতের সমক্ষে বহু তথ্যের আবরণ উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। সচরাচর বলা হয় যে এখানকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে বহুপতিত্ব প্রচলিত; কিন্তু ভারতের বেলায় এর হিমালয় অঞ্চলের কতকগুলি উপজাতি সম্পর্কে যে অর্থে কথা খাটে, মালাবারের বেলায় সে অর্থে খাটে না। কারণ কোন নারী নিজেকে একই সময়ে দুজনের স্ত্রী বলে মনে করে না। এখানে 'মাতৃতান্ত্রিক' কথাটা সঠিক ভাবে প্রযোজ্য কারণ স্বামী স্ত্রীর গৃহে গিয়ে স্ত্রীর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করে, এবং মায়ের মাধ্যমেই সন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। সেইজন্য সর্বত্র সমান একটা পদ্ধতিতে নারীকে দমন করার দেশ ভারত তো নয়ই, বরং নারীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ এক চক্র ভারতে বিদ্যমান। নারীর অধিকার এবং স্থান ও অবস্থা সম্পর্কে এমন কোন তত্ত্ব নেই, যার দৃষ্টান্ত ভারতের সীমার মধ্যে কোন না কোনখানে পাওয়া যায় না।

একটা কথা বলা হয় যে, শাসক জাতির অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্যই হিন্দু

নারীদের পর্দার আড়ালে আলাদা করে রাখা হত। এ উক্তির মূলে কোন ভাবনা চিন্তা নেই এবং এটা অসত্য। অবশ্য এই প্রথার এখনকার কড়াকড়ি নিঃসন্দে মুসলমান-শাসনের আমল থেকেই চলে আসছে। যেসব জায়গায় সেই শাসন দৃঢ় এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে হিন্দুদের প্রকৃতির মধ্যে এটা গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজে উল্টা রকমের অবস্থা থাকার দরুন সেখানে এই মনোভাবের ছোঁয়াচ প্রায় লাগেনি বললেই চলে। কালিদাসের নাটকগুলিতে, এবং সাধারণ ভাবে ধরতে গেলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগে প্রথা তার বর্তমান রূপে প্রচলিত ছিল না।

রাজপুতেরা জায়গায় জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে পর্দাপ্রথার প্রবর্তন করেছিল এবং সেই জায়গাগুলি বাদ দিলে এই প্রথা গজনী এবং ঘোরী আমল থেকে প্রচলিত তাহলেও কিন্তু আদবকায়দা এবং বাদশাহী খাতিরখাতরার প্রভাব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যে হিন্দুস্থানে নারীদের পর্দাপ্রথার বিস্তার হয়েছিল, তার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আগে হোক পরে হোক আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হয় : মুসলমানরা কিসের জন্য তাদের নারীদের পর্দাপ্রথা প্রবর্তন করল? ইসলাম আরবদেশ থেকে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের ধর্মসম্মত অনুমোদন আহরণ করে এবং বলা হয় যে, আরব নারীর প্রভূত স্বাধীনতা ও শক্তি আছে। সেইজন্য মাঝে মাঝে একথাও বলা হয় যে, মুসলমানরা পারশ্য থেকে বা চীন থেকে বা গ্রীস থেকে প্রথাটা গ্রহণ করে। এই ধরনের কৈফিয়ত, বদনাম ও দোষ দিয়ে পাল্টা অভিযোগের চেয়েও কিছুটা বেশি প্রাচ্যের কোন কোন অংশে যে প্রথা প্রায় সহজ প্রবৃত্তিবশে গৃহীত, কোন্ জিনিসকে বা মনোভাবকে আমরা তার মূল হিসাবে ধরব? আবহাওয়ার দরুন পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার কম হয় বটে, কিন্তু আবহাওয়াকেই এর সমগ্র রহস্য বা কারণ বলা চলে না, কারণ তাহলে বঙ্গদেশের চেয়ে মাদ্রাজেই এই প্রথা আরও গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত হত, অথচ আসলে এর বিপরীতটাই সত্য।

আচ্ছা, আমরা প্রশ্নটা একটু উলটে বিচার করি না কেন এবং নরনারীর সমতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণার কোন কারণ দর্শাবার চেষ্টা করি না কেন? ... প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে তা হল খাস ইউরোপে এই মত সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। টিউটন জাতি-অধ্যুষিত দেশগুলিতে এই মতটা যতটা প্রবল, ল্যাটিন দেশগুলিতে কোনক্রমেই ততটা প্রবল নয়। নরওয়ে-দেশীয় কাহিনীগুলিতে এই তত্ত্ব যতটা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে, জার্মানগোষ্ঠীভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ততটা

সুপরিস্ফুট রূপে তা পায়নি। মৎস্যজীবিদের জীবনই যে নরনারীর সকল সমতার উৎস আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের এই মতের উপর পূর্বোক্ত তথ্য দ্বারাই সম্ভাব্যতায় বর্ণপ্রলেপ প্রদান করে। পুরুষ সমুদ্রবিজয়ের অভিযানে গেল। যাবার সময় ক্ষেতখামারের সব কাজকর্ম দেখার জন্য তাকে তার স্ত্রীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেই হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে ঘরের বাইরে স্বামীর যে অধিকার, গৃহের ভিতরে সবকিছুর উপর স্ত্রীর অনুরূপ পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক-রূপে বিবাহের সময় নামাঙ্কিত অঙ্গুরী বধূকে দেওয়া হত এবং এই থেকেই বিবাহের অঙ্গুরী প্রদান প্রথার উৎপত্তি হয়। এটা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যে ভূমি ও সমুদ্রই একমাত্র সম্ভাব্য বিপরীত বস্তু নয়, কিন্তু যখনই কোন জাতি প্রকৃতি-বিজয়ের সুদীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য কাজে ব্যাপৃত হয়, তখনই তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা, আচার-আচরণের সাদৃশ্য এবং সমান অধিকারের দিকে ঝোঁক দেখা যায়, যা নরনারীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর অন্য সব বিষয় যদি সমান থাকে, তাহলে যে অবস্থা থেকে উদ্বেগ বহুলাংশে অপগত, সেই রকম দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী অবস্থায় নরনারীর কাজের ধারার মধ্যে ক্রমেই ভিন্ন পথে ছড়িয়ে পড়ার ঝোঁক দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের দেওয়া নিরাপত্তার কাছে আরও সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করে এবং নীতি এবং হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে নিজের সার্থকতা অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়।

এশিয়ার আবহাওয়ার প্রকৃতিই এমন যে তা শান্ত নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তাকে পরম বিলাসে পরিণত করে। সেইজন্য এশিয়ায় নরনারীর কর্মধারার ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়। সামরিক ক্রিয়াকাণ্ডজনিত ব্যস্ততার সঙ্গে এই মনোভাব যুক্ত হওয়ার দরুন তা নারীর নিরাপত্তামূলক স্বাতন্ত্র্য বা পর্দার আড়ালে বসবাসকে রাজপরিবারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গড়ে তোলে এবং একেবারে এইরকম সামাজিক মর্যাদা লাভ করার পর এপ্রথা দ্রুতগতিতে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারলাভ করে। সেইজন্য এটা বিজয়ী জাতির বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, এবং হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গদেশে বিশেষ তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে এর অনুকরণ করা হয়। আর বঙ্গদেশ যেসকল প্রদেশের মধ্যে আদর্শবাদের সর্বাপেক্ষা অনুরাগী তাই নয়, জমিদারশ্রেণী বিদ্যমান থাকার দরুন, রাজপুতানার পরেই বঙ্গদেশ বিশেষ তৎপরতা সহকারে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা অনুসরণ করে থাকে।

এই মত যদি সত্য হয়, তাহলে আর্যযুগের প্রথম দিকে ভারতীয় নারীর স্বাধীনতাকে মৃত্তিকা ও অরণ্যের সঙ্গে সংগ্রামের ফলরূপে ব্যাখ্যা করতে হয়। মধ্য এশিয়া থেকে কৃষিনির্ভর জাতিগুলির হিমালয় পার হয়ে ভারতে আগমনের সময় প্রকৃতির সঙ্গে তীব্রতম সংগ্রামে তাদের অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এই

দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্ত্রী ছিল স্বামীর সহায়, স্বামীর দোসর। স্বামী যদি বন পরিষ্কার শিকারে ব্যাপৃত থেকে থাকে, তাহলে স্ত্রীকে ক্ষেত এবং বাগানের কাজে সাহায্য করতে হয়েছিল। আর্যদের লোকসংখ্যা কমই ছিল এবং সেইজন্য পুরুষের জায়গায় প্রায়ই নারীকে গিয়ে দাঁড়াতে হত। নানারকম বিপর্যয়ও ছিল। সতর্ক হবার মুহূর্তের অবকাশ না পেয়েও, সাহস, প্রফুল্লতা এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে আপদবিপদের সম্মুখীন হত। এই ধরনের জীবনে নারীকে পুরুষের মতই সহ চলাফেরা করতেই হত।

তারপর যখন বন পরিষ্কার হল, আর্যদের রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষিকায সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং মানসপ্রকৃতিজাত সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে জাতির শক্তি অভিনিবেশ সহকারে কেন্দ্রীভূত হল, তখ অবশ্য অবস্থাটা অন্যরকম হতে আরম্ভ করল। হিন্দুনারীকে কিছুটা আলাদা করে আড়ালে না রাখলে, অন্য কোন অবস্থায় ভারতীয় দর্শন কখনও চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। "এ জগৎ স্বপ্ন, শুধু ঈশ্বরই সত্য" ইহুদীদের সমাজের মত সমাজে এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভ ছিল না। কারণ ঐ সমাজে প্রেম ও সৌন্দর্যকে সার্থক জীবনের উপর ঈশ্বরের অনুমোদনজ্ঞাপক চিহ্ন বলে গণ্য করা হত। ভারত যে এইসব সুখদায়ক দানে নিন্দায় মুখর ছিল তা নয়। কিন্তু ভারতের দৃষ্টিতে ওসব হল অনাধ্যাত্মিক উল্লাস আধ্যাত্মিক আনন্দ নয়। ভারতীয় নারীরা বলে পতিসেবাই পত্নীর ধর্ম; বিধবার ধর্ম ঈশ্বরসেবা। তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে এই দুইয়ের মধ্যে বিধব ধর্মই উচ্চতর-পর্যায়ের বস্তু।

নারীদের অন্তঃপুরের আড়ালে রেখে দেওয়াটা যেন একটা সত্য ঘটনা—এই কথা ধরে নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমাদের ভুল ধারণা সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। একথা সত্য যে সমাজে এবং ভারতের শহরগুলির পথে আমরা শুধু পুরুষদেরই দেখতে পাই। যাঁদের মা বলে সম্বোধন করা যায়, এমন নারীদের বাদ দিয়ে, অন্য কোন নারীর মুখদর্শন না করা ধর্মানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে এর দরুনই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। যদি আমরা অন্দর পর্যন্ত গিয়ে পড়ি, তাহ আমরা হয়তো বাড়ীর ভিতর নারী ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পাব না। কিন্ত যদি আমরা সেখানে দিনের পর দিন বসবাস করি, তাহলে আমরা দেখব যে প্রত্যেক নারীই পরিবারের এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে বেশ সহজ স্বাভাবিকভ কথাবার্তা কইছেন। দেওর-ভাজের সম্পর্কের সবটাই তো হাস্যপরিহাস আনন্দ এবং মাধুর্যে ভরা। মেয়েদের কাছে ননদের বাচ্চাকাচ্চার মত নিকটের জিনিস অন্য কোন ছেলেমেয়ে খুব কমই হয়ে উঠতে পারে। এই ভাগনে-ভাগনীদের বয়স যাই হোক না কেন, মামীকে তাদের পরিচর্যা করার দাসী বলে মনে করার গৌরবময় অধিকার

তাদের আছেই। শ্বশুর এবং পুত্রবধূর স্নেহ ও ভক্তির মধ্যে একটা বিশেষ কমনীয়তা দেখা যায়। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মামাতো মাসতুতো পিসতুতো ভাই-বোনেরা সবাই ভাইবোন। প্রতিটি নারীরই পরিবারে একটি ন্যায়সম্মত অধিকারজাত আসন আছে। লন্ডনের শহরতলীতে বা ইউরোপের অন্যান্য শহরে যে হাজার হাজার নারী একা বাস করে বা কোন বৃত্তি অবলম্বন করে নিজেদের জীবনের উন্নতির চেষ্টা করে, তাদের চেয়ে প্রায় প্রতি হিন্দুনারীর জীবনেই পুরুষের সঙ্গে মানুষ হিসাবে মেলামেশা ও আলাপ-পরিচয় সুস্থতর ভাবে হয়ে থাকে।

এই আলাপও মার্জিত এবং সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধে ভরা। যেসব ভারতীয় পুরুষ ইউরোপে গিয়েছেন, তাঁরা সবসময়েই বলে থাকেন যে, চটপট রঙ্গরসপূর্ণ জবাব দেবার শক্তিতে ভারতের পর্দানশীন মেয়েদের জুড়ি নেই। প্রাচ্য দেশবাসীর কানে ইংরেজের কৌতুক যেন কিছুটা উঁচু পর্দায় বাঁধা বলে মনে হবে। "অচল পেনী সবসময়েই ফেরত আসে"—এই ইংরেজী প্রবাদের বাংলা রূপটি কি চমৎকার। "আমি কানা কড়ি ; আমি সাত হাট ঘুরে আসছি।" এর মানে হল, "আমার যে কোন দাম নেই, আমি তা জানি।"

যা আমরা আকুলভাবে কামনা করি, যার দিকে আমরা অগ্রসর হতে চাই, আমরা তাকেই সাধারণতঃ আদর্শ বলি, কিন্তু যে পুঞ্জিত আদর্শগুলি প্রথার রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে, তাদের কথা আমরা প্রায় চিন্তাই করি না। যেসব প্রচলিত রীতি বা প্রথা ভারতীয় নারীর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাদের বিশ্লেষণ করলে, আত্মসংযমের অতি কঠিন নিয়ম আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গতা এবং ঘনিষ্ঠতা, এবং যেসব প্রভাব, মঙ্গল ও অধিকারের কথা বিবেচনা করতে হয়, তারা, নিঃসন্দেহে শান্তির খাতিরেই কঠিন শৃঙ্খলাকে অপরিহার্য করে তোলে। সেইজন্য অপরের সাক্ষাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ডেকে কথা কইতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর প্রশংসা করা দূরে থাকুক, স্বামীর নামই উচ্চারণ করতে পারে না। এই রকম আরও অনেক প্রথা আছে। কেবল শিশু এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই সামনে কোন প্রতিবন্ধক নেই, তারা যেখানে এবং যখন খুশি স্নেহভালবাসা দেখাক না কেন, তাতে কেউ কিছু মনে করতে পারে না। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লোকসমক্ষে জাঁক করে জাহির করার দরুন গোষ্ঠীমানস যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, যে উৎসাহ এবং আগ্রহের ভাগ নেওয়া গোষ্ঠীজীবনের কাছে আশা করা যায় না। তাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে, গোষ্ঠীর শালীনতাবোধকে যাতে নিপীড়িত না করা হয়, তার জন্যই এইসব বিধি প্রবর্তিত।

অপরের মুখ চেয়ে এই রকম খুশিমনে নিজেকে দাবিয়ে ছোট করে রাখাটা এতই নিখুঁত ভাবে করা হয় যে, সেটা আর লোকের চোখে পড়ে না। যে ব্যক্তির

মন বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে, এটা কেবল তারই বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ সমগ্র সমাজ মার্জিত ও ভদ্ররুচির সকল মাত্রাতেই এই আচরণ দাবি করে এবং তাকে স্বীকৃতি দান করে। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিমানসে স্বার্থবোধহীনতা এবং সেবার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রথা ও রীতির পটভূমিতে উপস্থাপিত করা হয়। এই গুণগুলি ব্যগ্র দয়া এবং সংগ্রামের এমন এক ধারণা বহন করে আনে, যা না থাকলে পৃথিবী নিশ্চয়ই এখনকার চেয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ত। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞাভরে বিরোধিতা করাটা প্রাচ্যের নারীর কাছে অজানা সে এক নীতিগ্রাহ্য সভ্যতার সৃষ্টি। পরহিতব্রত এবং দয়াদাক্ষিণ্য হল তার কাছে সংসারের দাবি। তার মানসিক-করা ব্রত এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তার স্বামীও জানতে পারে না, কিন্তু যে সমাজে সকলেই এই রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করছে, সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর ব্রত উপবাস প্রায়শ্চিত্তের কথা জানলেও কোন উচ্চবাচ্য করবে না।

এ কথা বলার মানে হল যে, প্রাচ্য নারী পাশ্চাত্যের নারীর চেয়ে নিজেকে লোকচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, এবং সে পাশ্চাত্যনারীর চেয়ে পরার্থপর। রোগীর সেবা তার কাছে এমনই মামুলি জিনিস যে, তারজন্য বৃত্তি বা প্রতিষ্ঠানের কথা, যেমন হাসপাতাল নির্মাণ বা রোগীর সেবার কাজ শেখার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এদিক দিয়ে অবশ্য সে অনেক কিছু হারাচ্ছে কিন্তু তার অভাবটা বুঝতে পারছে না, কারণ আধুনিক সংগঠন দক্ষতার উন্নতি-বিধানকল্পে রোগীর পরিচর্যা-শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এমনই কেন্দ্রীভূত মনোযোগ দিয়েছে যে তার ফলে অনেক রোগযন্ত্রণার হাত থেকে লোকে বাঁচছে। তবু আমাদের অতি অসতর্কভাবে এ কথা ধরে নিলে চলবে না যে, সকল ক্ষুধার্ত, রোগজর্জরিত এবং উন্মাদরোগগ্রস্তকে এক জায়গায় জড়ো করা এবং তাদের রোগের অনুরূপ ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট জগতে তাদের আলাদা করে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থাটা আমাদের উন্নততর পরোপকার প্রচেষ্টার ফল।

সারা বিশ্বে নারীরাই মানুষের নৈতিক আদর্শের অভিভাবিকা। তরুণ বালক শ্মশানে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কখনই অত আগ্রহী হবে না, যদি না তার মা তার শৈশবে এ কাজ সম্পর্কে তার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার না করে থাকে। স্ত্রী স্বামীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলি না বুঝলে, এবং সেগুলির প্রশংসা না করলে, স্বামী অত্যন্ত প্রফুল্লমনে বাড়ী ফেরার জন্য অত ব্যগ্র হয়ে উঠত না। কিন্তু এ সবকে অতিক্রম করে, নারীরা আদর্শের চিরন্তন দৃষ্টান্ত রূপে বিরাজ করে। "যে তোমাদের মধ্যে প্রধান, সেই তোমাদের ভৃত্য-হোক"—পাশ্চাত্যবাসীর কানে এ কথাগুলো কেমন যেন মহিমান্বিত অথচ আপাতবিরোধী উক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু যে সরল প্রাচ্য জগতে এই মহান বক্তা যীশু চলতেন, ফিরতেন, তারই এক স্বতঃসিদ্ধ সত্যমাত্র তাঁর মুখে উচ্চারিত হল। তিনি তাঁর শ্রোতাদের মনে বিস্ময়ের কোন

রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেন নি। কারণ তাদের সকলেরই জীবনে তাদের মা ছিলেন তাদের প্রধান অথচ তাদের পরিচারিকা।

প্রাচ্যকে জানার পর যাঁরা করুণার সাতটি দৈহিক কার্যের তালিকা পাঠ করেন, কল্পনা করতে পারেন যে তাঁরা হিন্দুগৃহে রয়েছেন। সেখানকার পরিশ্রমশীল ধর্মরত এবং দিবসের কর্মে ব্যাপৃত নারীদের তিনি লক্ষ্য করেছেন। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান প্রভৃতি কাজের প্রথম প্রয়োজন সম্পর্কে সেইসব নারী কখনও কোন প্রশ্ন করছেন না। সত্যই প্রাচ্য ধর্মের জননী, কারণ পাশ্চাত্য যাকে সরকারের কর্তব্য বা গীর্জার বাণী বলে মনে করে, প্রাচ্য তাকে সমাজের সাধারণ কর্তব্য হিসাবে আত্মস্থ করেছে, এবং যাঁরা এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন তাদের কাছে এটা মনে হতে পারে যে, এশিয়ার জীবনের নির্দিষ্ট কর্মসাধনের উদ্দেশ্য বলতে যা বোঝায়, ইউরোপে খৃষ্টধর্ম তার চেয়ে বেশি বা কম কিছু নয়;

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচ্যনারীর আশু সমস্যা

প্রাচীন গ্রীকদের বিভিন্ন পাত্র, আধার প্রভৃতি যে ছাত্রই মনোনিবেশ সহকা অনুধাবন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন, পাত্রগুলিতে অঙ্কিত চিত্রে একটি বিশেষ বিষয়ে বারংবার পুনরাবৃত্তি তাঁর চোখে না পড়ে পারে না ; সে বিষয়টি হল মেয়েদে মিছিলের মত দল বেঁধে কুয়োতে জল আনতে যাওয়া এবং কুয়ো থেকে জল নি ফিরে আসা। প্রাচীন গ্রীস, প্যালেস্টাইন এবং ভারতে বাড়ীতে এবং পথে ধারে কলের জলের যুগ আসা পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সেদিন পর্যন্ত, মেয়েদের একাট সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক কেন্দ্র ছিল। যেখান থেকে সকলে পানীয় জল নিয়ে যেত সেই কূপ হল এই সামাজিক মিলন ক্ষেত্র। সূর্যাস্তের ঠিক আগে বিভিন্ন পরিবারে কুমারী মেয়েরা, অল্পবয়সী বৌয়েরা হয়তো কোন বয়স্কা পিসী, খুড়ী, জ্যাঠাইয়ে বা শ্বাশুড়ীর সংগে বা নিজেরাই যে যার ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে পিতলকাঁসার কলস নিয়ে এই পাতকুয়াতলায় আসত। আর কথাবার্তা এবং জল নেওয়ার কাজ সা হলে মেয়েগুলি মাথার উপর দুতিনটি ভরা কলসী নিয়ে, চমৎকার লীলাভ সহকারে হেলে-দুলে বাড়ী ফিরত। বলা হয় যে, পথের মধ্যে নৈপুণ্য দেখানো জন্য তারা কলসী মাথায় নিয়ে লাফাবে, দৌড়বে, এমন কি নাচবে, অথচ এক ফোঁ জলও উছ্‌লে মাটিতে পড়বে না। এই সময়টির মূল্য অনেক। পুরুষেরা সময়ে মেয়েদের জল আনার পথ এড়িয়ে চলত এবং মেয়েরা বুঝিয়ে দিত যে তাদে সাজগোজ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করা, পুরুষে চোখের সামনে তাদের সৌন্দর্যের দীপ্তি প্রতিভাত করা নয়। রূপার জমকা পাঁয়জোর বা মল, মাথায় কলসী রাখার জন্য মুক্তা বসান বিড়া, গ্রীক ভাস্করে প্রস্তরোৎকীর্ণ নারীমূর্তিদের দেহে বেশবাস, প্রায় সেই রকম ভাবে শাড়ী পরা— সৌন্দর্যসৃষ্টির এই সব ধরনধারণ সখীদের চোখে সহানুভূতি বা ঈর্ষা উদ্রেকে জন্য, কোন পুরুষের নয়নানন্দ বিধানের জন্য নয়। পুরুষ নিজের স্ত্রী বা ভগ্নী সুন্দরী বলে মনে করলে তার কথা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিজের স্ত্রী বা বোনে কি গহনাগাটি বা কাপড়চোপড় পরছে না পরছে, সেটা মনে রাখা যদি তাদের প্রা মনোযোগ বা সম্মানের নিদর্শন হয়, তাহলে সে সম্মান পুরুষ দেখাতে অক্ষম।

প্যারিসে গিয়ে অনেক বেছে বেছে একটা গাউন পছন্দ করার পর একটা আ শ্লাঘা অনুভব করা যায়। ফরসা রংয়ের মেয়েকে যাতে "মধ্যরাত্রের আকা

পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখায়", সেজন্য তাকে ঘন নীল রংয়ের শাড়ী পরান, এই নাসাপুটে বা অন্য নাসাপুটে দুধের মত শাদা পাথর বা হীরের নাকছাবি পরান, গায়ের বাদামী রংয়ের আভার সংগে মিলিয়ে শাদা বা সবুজ রংয়ের কাঁচের চুড়ি পছন্দ করার মধ্যেও তার চেয়ে কম গৌরব বোধ বা আত্মপ্রসাদ নেই। তা আত্মশ্লাঘা কম না হতেও পারে, কারণ পরম দক্ষতা তো সর্বদাই চায় যে, পরম রসিক-জনের দৃষ্টি তার দিকে পড়ুক।

মেয়েদের জল আনার পাশাপাশি আর একটা ছবিও রয়েছে। কোন ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী এসে হয়তো গ্রামের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছের তলায় কদিনের জন্য আশ্রয় নিয়ে ধুনী জ্বালিয়েছে। সেইখানে ধুনীর চাপা আগুনের চারপাশে গ্রামের পুরুষেরা খোসগল্প বা তামাক খাবার জন্য জমায়েৎ হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আরও ব্যাপক, আরও উদার ও সর্বজনীন এক সম্পর্কের ইংগিত মেলে। প্রায়শঃই অন্য সব দেশ এবং সেই সব জায়গার অদ্ভুত সব প্রথা এবং প্রথা থেকে বিচ্যুতির কথা নিয়েই পুরুষেরা আল্যাপ-আলোচনা করে। তাদের আগ্রহটা সাধারণ ধরনের, বিমূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক। কারণ একথাটা মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের গৈরিক বসনধারী অতিথি হলেন প্রাচীন ধরনের পরিব্রাজক। তিনি রেলে চড়ে আসেন নি, হোটেলেও থাকেন নি। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে, তিনি সেখানেই ঠেক খেয়ে থেমেছেন, সেই জায়গারই জীবন-নাট্যের শরিক হয়ে পড়েছেন। তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অন্নসংগ্রহ করেছেন এবং সেই জন্য প্রতি জেলা বা অঞ্চলের নিজস্ব ধরনে রান্না এবং পরিবেশন করা খাবার তিনি খেয়েছেন। যে প্রজন্ম মানচিত্র অবলম্বন করে বেঁচে আছে এবং সংবাদপত্রের বিবরণ ও অন্য সব লোকের ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রদত্ত তথ্যপঞ্জী থেকে জ্ঞান আহরণ করে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভৌগোলিক চেতনা এইভাবে এই প্রাচীন ধরনের পর্যটকের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। আর যে গ্রামে তিনি কয়েকদিনের জন্য এসে ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং রাত্রি যাপন করেন, সেখানকার মানুষেরা তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের অংশ লাভ করে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে রাজারা এই রকম অতিথিদের স্বাগত জানানোর সময় প্রশ্ন করেছেন, "অন্য স্থানে আপনি কি দেখেছেন?" এবং তাঁদের রাজ্য থেকে অতিথিদের বিদায়ের আগে আবার জিজ্ঞাসা করছেন, "এখানে আপনি কি দেখলেন?"

কুয়োর ধারে যে সব নারী জমায়েৎ হত, তারা কিন্তু তাদের গ্রামের বা ছোট শহরের জীবনের কথা নিয়েই আলোচনা করত। এইখানে তারা স্থানীয় নারীদের একটা সুসংহত মত গড়ে তুলতে সক্ষম হত এবং স্থানীয় ব্যাপারে এই মতের গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। তাছাড়া তারা দিনের খবরাখবর নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। বর্তমানে জনসাধারণকে সুযোগ-সুবিধা দানের উপায় উপকরণ গুলি আরও ভাল ভাবে সংগঠিত হয়েছে বলে, আগেকার মত এত কষ্ট করে জমায়েৎ

হবার প্রয়োজন মেয়েদের আর নেই। কিন্তু প্রাচীন ধরনধারণ এবং প্রতিষ্ঠানগু নষ্ট হয়ে যাবার সংগে সংগে জমায়েৎ হবার নতুন উপলক্ষ্য এবং আলোচনার নতু বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবকে নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলে ধরা হবে। বর্তমানে ভারতীয়দের মানসিক আবেগ গৃহের মধ্যেই নিজেকে ক্রমে ক্রমে আরও নিঃশেষ ক ফেলছে। গৃহের মধ্যে নারীই কর্তৃত্ব করে এবং পুরুষের কাজকর্ম গণ্ডীর সীমাবদ্ধ করার ফলে নারী তার স্নেহ ও প্রেম দিয়ে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের সংগে সহযোগিতা করছে। সেইজন্য ধনী ব্যক্তিরা যদি পৌরুষবর্জিত এবং মেয়েলীভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ইউরোপের এই কথা বলে ভারতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের বা তাকে বিদ্রূপ করার কোন অধিকার নেই, যে, কই ভারত তো এখনও পাশ্চাত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অর্জন করতে সক্ষম হয় নি, ভারতের রাজা-রাজড়ারা তো দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের জন্য কোন অভিযান পাঠান নি এবং ভারতের যুবশক্তি তো প্রস্তর এবং নক্ষত্র সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল বুকে নিয়ে বৃদ্ধি এবং বিকাশ লাভ করেনি। জাতি যে সবে মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে অভ্যস্ত ইউরোপীয় সমাজ-সংগঠন তা সবই নিঃসাড়ে ধ্বং করে ফেলে, অথচ অন্য কোন রূপে তাদের চিত্ত ও চরিত্র যাতে যথোপযুক্ত প্রসার প্রেরণা লাভ করতে পারে এমন কোন নতুন দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সজাগ ও অবহিত করতে সক্ষম হয় না।

এটা বেশ স্পষ্ট যে সামাজিক ভারকেন্দ্র যদি কোন দিন সরিয়ে ফেলতে হয় ভারতের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির আবহাওয়াকে এখনও যদি নতুন আদর্শে ভরে ফেলতে হয়, তাহলে তার মধ্যে বিপ্লবনিহিত থাকবেই এবং ভারতের নারীসমাজকে যে শুধু সেই বিপ্লবের ফলসমূহের শরিক হতে হবে তাই নয়, সেই বিপ্লব সংসাধনে তাদের বেশ কিছু অবদান থাকা চাই। কারণ কারখানা নয়—গৃহই জীবনকে প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে তোলে। এবং বৃটিশ ভারতে স্কুলগুলি কারখানা বা এমন কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যেখানে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবনে কেরাণীগিরির জন্য প্রয়োজনীয় লেখার এবং পড়ার কৌশলটা আয়ত্ত করে। অন্যকোন শিল্পের কারিগরি পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াও তো এইভাবে শিখতে পারা যায়। মাথা গুণতি করার এবং সংখ্যাসূচী নিরূপণের যুগ মনে করে যে, সাক্ষরতা ব্যতীত শিক্ষা হয় না; স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন পড়াটা যেন শেক্সপীয়রের জননী হওয়ার চেয়ে বড় কাজ। হিন্দু নারীদের যে শিক্ষা আছে, সে সম্পর্কে এই যুগের সংগে যুক্তিতর্ক করা শক্ত। তবু, জাতীয় পদ্ধতিতে এবং অত্যন্ত জটিল জাতীয় পদ্ধতিতে জীবন নির্বাহের আগাগোড়া তালিম যদি শিক্ষা হয়, তাহলে ভারতীয় নারীর তার কিছু আছে। কারণ রান্নাবান্নার কাজ, অথবা গরুবাছুর দেখাশোনার কাজ থেকে শুরু করে শ'খানেক বা তারও বেশি লোকের সংসারে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার সকল কর্তৃত্ব এবং সকল ব্যাপারের তদারকি

পর্যন্ত সব কাজই সাধারণ গৃহবধূ করতে সক্ষম। ভাষা, কাব্য এবং লোকাচারের জ্ঞান এবং তারই সংগে যুক্তিযুক্ত ও কল্পনামণ্ডিত বিকাশ বলতে যা বোঝায়, সে সবের জ্ঞান যদি শিক্ষা হয়, তা হলে সে শিক্ষা সাধারণ গৃহবধূর আছে, মাঝে মাঝে দেখা যায় যে সে সংস্কৃত বই বুঝতে পারে এবং তা থেকে আবৃত্তি পর্যন্ত করতে পারে। তাছাড়া, এই সব নারী লিখতে পড়তে না জানলেও, প্রাচীন সংস্কৃতির মূল ভাবটি প্রগাঢ়ভাবে, এমন কি প্রচণ্ড আবেগের সংগে আত্মস্থ করেছে। মায়াবাদ প্রায়ই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিভ্রান্তির কারণ হয়, অথচ এই মায়াবাদ ভারতীয় নারীদের কাছে মোটেই দুর্বোধ্য নয়। নির্বাণ শব্দটির চুলচেরা অর্থ তারা জানে। কৃচ্ছ্রসাধন করে, আদর্শের প্রতীক ক্রুশকাষ্ঠ স্কন্ধে বহন করে আদর্শ অনুসরণ করার জন্য একটি বিশেষ নির্দেশ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; নিজের মুক্তি লাভের উপর ত্যাগের বিরাট বিধিবিধানের প্রভাবই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ সবের সংগে সমাজজীবনে লালিত-পালিত অভ্যাসগুলি যোগ করলে প্রতীয়মান হবে যে পুরাতন ব্যবস্থায় মেয়েরা কেবল শিক্ষা এবং শৃংখলাবোধই লাভ করত না, কর্মজীবনের একটা পথও খুঁজে পেত।

অবশ্য একথা সত্য যে, এই প্রস্তুতি এবং সুযোগ কেবল সেই মৃত্তিকারই উপযোগী, যাতে এই ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে। এই সীমাবদ্ধতা সমগ্র ভারতীয় সভ্যতাকে ব্যাপ্ত করে আছে। পৃথিবীর অন্যকোন দেশের রুচির তুলনায় ভারতীয় মন বোধহয়, গৃহের স্থাপত্য এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট। বাহিরের সাজসজ্জার খুঁটিনাটির আকাঙ্ক্ষা থেকে তা অন্যের চেয়ে বেশি মুক্ত। সেই জন্যই ভারতীয় মন দিবসের কর্মকাণ্ডের এমন এক চক্র রচনা করেছে, যাতে প্রতিটি কাজই যার যার নিজের জায়গায় যথাযথভাবে খাপ খেয়ে গেছে। ইংলণ্ডের সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে সম্ভ্রান্ত জমিদার ঘরের কর্ত্রীর যে স্থান ছিল, এখানে শ্বাশুড়ীর সেই স্থান। কিন্তু জমিদারবাড়ীর গৃহস্থালী প্রায় সম্পূর্ণরূপে যে কোন যুগে, যে কোন দেশে—জাপান, রাজপুতানা, তুরস্ক, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, স্পেনে যদি স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে প্রায় পুরোপুরি সমান সমান দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভারতীয় সংসারের বেলা কিন্তু একথা খাটে না। এখানে সংসারের মাথার চারপাশে যারা জড়ো হয়েছে, তারা তার ছেলেদের বৌ, তার স্বামীর প্রজা নয়। ছেলেদের বৌয়েরা নিপুণ হাতে সুতো কেটে এবং সুন্দর সূচীকার্যে সময় কাটায় না। শ্বাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে তারা ছেলেপিলেদের দেখে, পশুদের পরিচর্যা করে, রান্নাবান্না এবং ঘরের সব রকম কাজে ব্যাপৃত থাকে। এখানে জাতি, ভিক্ষুক এবং রাজার মর্যাদা সমান করে দেয়, এবং কাজের রূপ এবং ধরনধারণ কেবল অর্থের প্রশ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের সাংসারিক ব্যবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায্য হলেও

সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে, এই মুহূর্তে শিক্ষার একটা বিরাট পুনর্বিন্যাস দরকার ; হয়তো এই কারণেই এটা দরকার যে, যে চোখ বনের গাছ দেখতেই অভ্যস্ত, সেই চোখ পুরো বনটাকে দেখতে পায় না ; কিন্তু যখন গাছগুলির সংখ্যা খুব কমে যায়, তখন সারা বনেরই যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ প্রতি ভারতীয় নারী রান্না করতে পারে এবং ভালই রান্না করে। কিন্তু সে সেলাই করতে জানে না এবং দুপুরে এক ঘুম দেবার পর সময় কাটানর জন্য খোসগল্প এবং পুজার্চনা ছাড়া তার আর কিছু কাজ থাকে না। বর্তমান প্রজন্মের বৃদ্ধপিতামহীরা আমাদের বংশের প্রাচীনকালের মেয়েদের মতই সুতো কাটতে ব্যস্ত থাকতেন, এবং সংসারে একটা বড় আনন্দ ছিল সুতো আর তার সঙ্গে কাপড় বোনার জন্য পরিমাণ মত শস্য নিয়ে তাঁতীর কাছে যাওয়া, এবং কাপড় বোনার জন্য তাকে সুতো দিয়ে আসা। হায়, আজ দেখছে যে, সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ করে তাঁতীর দিন কাটান শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কাজের বাজার সংকুচিত হয়ে গেলেও, তার বাজার অবশ্য সব সময়েই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু মেয়েদের আট পৌরে শাড়ীর আজ সুদূর ম্যাঞ্চেস্টার বা গ্লাসগোতে কলে বোনা হয়, তার সুতোও কাটা হয় কলে। এদিকেও তাহলে আধুনিক সভ্যতা তাঁতীর ভাগ্যকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। সব দিকেই অনুরূপ ধ্বংস অনুভূত হচ্ছে আরামের উচ্চতর মান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেদের বালির ওপর লেখার দিন অনেক দিন হল চলে গিয়েছে। কলাপাতায় হাতের লেখা করাও স্মৃতিমাত্র খাগের বা কঞ্চির কলমের বদলে ইস্পাতের নিবের কলম, সস্তা কাগজ, তরতর করে লেখার কালি এখন সর্বত্র দেখা যায়। সাবান একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতবর্ষ অপরিচ্ছন্ন লোকের দেশ—এই কথাটা যাতে মনে না হয়। তার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্নানের জন্য মাটি ও তেলের ব্যবহারটা এদেশে বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীতে বোধ হয় অন্য এমন কোন জাতি নেই, যারা অঙ্গপ্রসাধনের দিকে এত বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে, বা যাদের দেশে অঙ্গপ্রসাধনে চর্চা এত সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু তৈরী করা সাবান দেহের ত্বকে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে বলে, তার ব্যবহার অনুমোদন করা হয় না। পরিষ্কার করা রান্না করা, এমন কি খাবার জন্যও ইউরোপীয় বাসনপত্রের ব্যবহার চালু হচ্ছে কেরোসিন, টিন এবং আধুনিক কাঁচ এখন প্রতি গ্রামেই দেখা যাবে। কিন্তু ত. মানে এই নয় যে লোকে নিজেরাই এ জিনিসগুলি যোগান দিয়ে নিজেদের প্রয়োজ মেটাচ্ছে। এ থেকে এ কথাটা আরও কম বোঝাচ্ছে যে তারা এ জিনিসগুলি ব্যবহার ভাল করে আয়ত্ত করে। সামগ্রীগুলিকে পুরানো জাতব্যবসার আওতায় এনে ভারতীয় রুচি এবং বুদ্ধি অনুসারে তাদের পাশ্চাত্য গড়নের পরিবর্তিত নতুন রূপ দিচ্ছে। আসল কথা হল দেশটা ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যরূপী পরগাছাকে

ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রণ করে এনে ঘরে বসিয়েছে। একচেটিয়া অধিকার এবং স্বত্বসংরক্ষণ আইন পুরোপুরি এবং মারাত্মকভাবে মেনে চলার ফলে এই দেশের লোক যে কোন নতুন সামগ্রীকে অদল-বদল না করে তার বর্তমান আকারেই গ্রহণ করে, গ্রামের কারিগরের কি হল না হল তা দেখে না, পুরানো ধরনের বাসনকোসন যন্ত্রপাতি তা সে যাই হোক না কেন ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়, এবং সংগৃহীত নতুন জিনিসপত্র-গুলি যতদিন থাকে, ততদিন তাদের কুৎসিত একঘেঁয়েমিকে রুচি এবং মানকে দোষ দুষ্ট করার সুযোগ দেয়। যারা পিতলের জিনিসপত্র তৈয়ারী করে, তারা পর্যন্ত শান্তভাবে মেনে নিয়েছে যে ইউরোপ থেকে পিতলের পাত কিনলেই দরে সবচেয়ে সস্তা পড়ে এবং গৃহিণীরা এখন বৃথাই আক্ষেপ করেন যে, তাঁদের সুন্দর সুন্দর পিতলের হাঁড়ি-কড়া প্রভৃতি বাসনকোসন এখন আর তাঁদের পিতামহী মাতামহীদের আমলের বাসন পত্রের মত বংশানুক্রমে রেখে যাবার মত মজবুত হচ্ছে না। এই সমস্ত ব্যাপারে ভারত ইউরোপের দেশগুলির চেয়ে কম সাবধানী নয় এবং ভারতকে তাদের চেয়ে অল্প আয়াসে দোষদুষ্টও করা যায় না। আসলে তাদের চেয়ে ভারতের ক্ষতির আশংকা বেশি, এবং ভারতের প্রতিরোধ শক্তিও তাদের চেয়ে কম এবং জাতীয় স্তরে এ সব প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে দেখতে ভারত এখনও শেখেনি।

অবশ্য লোকাচারের প্রতি আনুগত্য ধ্বংসের এই গতি পথে কিছু বাধা সৃষ্টি করে। সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তাঁর কোন বন্ধুকে যদি ইংলণ্ডে তৈরী সুতী কাপড় দেন, তাহলে এখনও তা স্থূল ও অমার্জিত রুচির পরিচায়ক বলে গণ্য হবে। শুভউদ্দেশ্যপ্রণোদিত মতের প্রবক্তারা সাবান, কেরোসিন তেল এবং জাজিম সতরঞ্চি মাদুরের বদলে চেয়ার ব্যবহার করার দিকে এখনও তির্যকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যে কেবল সংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের স্বাদটাই বড় বেশি পাওয়া যায়। সেই জন্য এর দ্বারা অশুভ জিনিসটাকে পিছিয়ে দেওয়া যায়, তাকে পরাস্ত করা যায় না। এ সম্পর্কে যা দরকার তা হল গতিবেগসম্পন্ন; দৃঢ়সংবদ্ধ এমন এক বিশ্বাস যা একটি সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সক্ষম। সে সিদ্ধান্ত হল, ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয়ের তৈয়ারী জিনিসপত্রই ব্যবহার করা উচিত। আর এ কথা বলার দরকার নেই যে, নারী সমাজের মধ্যেই এই ধরনের নিয়ম বা অনুশাসনকে তার শিকড় গড়তে হবে, সেখান থেকেই তাকে ব্যক্তি সংগ্রহ করতে হবে; কারণ মেয়েরাই জিনিসপত্র কেনা কাটা করে, তারাই খরিদ্দার, তারাই জিনিস ব্যবহার করে, সমাজ ও ধর্মের সংগঠিত প্রণালী দিয়ে তারাই কারিগরদের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। জাতির বিবেক একবার দৃঢ়মুষ্টিতে ধরতে পারলে, রাজনীতি বা ব্যবসাদারীর কোন স্তোক বাক্যই এই নীতির বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ হবে না, কিন্তু জনসাধারণ নারী, পুরোহিত, পণ্ডিত, জাতের প্রধান বা মুখিয়া, এবং শ্রমিকরা যদি এই ধরনের ভাব

বুঝতে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হত, তাহলে ইতিমধ্যেই সমস্ত সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেত, এবং ভারতকে যার হাত থেকে বাঁচতে হবে, তেমন কোন সমস্যাই থাকত না।

এ কথা স্পষ্ট যে যখন ভারতীয় নারীদের পুরাতন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন, তখন নতুন শিক্ষার লক্ষ্য তার চেয়ে নীচু হতে পারে না। সেইজন্য পড়তে এবং লিখতে শেখাই তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হবে না—যদিও লিখতে পড়তে জানা নিঃসন্দেহে ক্রমেই আরও মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, এবং জাতীয়তা, জাতীয় স্বার্থ, জাতি এবং দেশের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব প্রভৃতি ধারণা স্পষ্ট করে এবং উৎসাহের সংগে শক্তি অর্জন করাই হবে সে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। এমন কি ইউরোপেও প্রাচ্যের মতনই, অভ্যাস এবং মতামতগুলির একঘেঁয়ে হয়ে পড়ার এবং নমনীয়তা হারিয়ে কঠিন হয়ে পড়ার ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুটা নমনীয়তা আছে। কোন সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের চেয়ে এই নমনীয়তাই প্রাচ্যের প্রয়োজন। এ এক রকম স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব। গঠনের এই সচলতার ফলে নূতন অথচ স্বীকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার জন্য বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত সহযোগিতার শক্তি ইউরোপীয় সমাজগুলির আয়ত্তাধীন এবং সেটা সকলেরই কাম্য। ভারতের কর্মের শক্তি আছে। কিন্তু লক্ষ্যটির সংগে ভাল পরিচয় থাকা চাই। জনসেবার উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য নারীদের যদি লঙ্গরখানায় সুরুয়া তৈরীর কাজ করতে হয়, তাহলে তাদের শক্তির অপব্যয় করতে এবং মেজাজ হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়। সে সব কিছুই না করে গুটিকয়েক মাত্র ভারতীয় নারী মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করে কয়েক শত বা কয়েক হাজার অতিথির রান্নার কাজ গুছিয়ে ফেলবে। কিন্তু এদের অতিথি হিসাবে গণ্য করবার প্রস্তাব করলে আমরা কেমন হতভম্ব হয়ে যাই। অথচ একথা স্পষ্ট যে, এই অতিথিদের "বেকার" বলে অভিহিত করলে, এবং তাদের "একটা সামাজিক সমস্যা" বলে উল্লেখ করলে, প্রাচ্যের মানুষ ঠিক তেমনই বিভ্রান্ত বোধ করে। পাশ্চাত্য রীতিতে এই ধরনের কাজকর্ম করার ব্যবস্থা যদি হয় তো ভারতকে সেই পদ্ধতি এক সম্প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে।

দেশের মাটির সংগে সম্পর্কে আবদ্ধ, স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে, দেশের যে অতীত থেকে তারা উদ্ভূত, তার সংগে সম্পর্ক সম্পন্ন মানুষ হিসাবে নারীরা যখন নিজেদের দেখবে ; যখন তারা জাতির বিরাট প্রয়োজনের পরিমাপ অনুযায়ী দেশের মানুষের প্রয়োজন-সম্পর্কে অবহিত হবে, যখন তাদের মাতৃহৃদয় জাগরিত হয়ে কেবল পরিবার, গ্রাম ও ভিটার বদলে দেশ ও জাতির জন্য স্পন্দিত হবে ; এবং সেই হৃদয়ের সেবার্থে যখন মন তথ্য এবং ঘটনাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা এবং বিচার করবে,—কেবল তখনই ভারতীয় নারী সমাজের ভবিষ্যৎ তার আপন

মহিমায় জাতির সমক্ষে উদিত হবে ; তখনই প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষা আরম্ভ হবে ; তখনই প্রকৃত জাতীয় আদর্শ উদ্ঘাটিত হবে।

পুরানো ধারণাসমূহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত এবং বিকাশ প্রাপ্ত হলে তবেই এ ধরনের পরিবর্তন সম্ভব। জাতীয় ভাব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না— তাকে ভিতর থেকেই বিকাশ লাভ করতে হবে ; এবং জাতির ধর্মগুলির সঙ্গে এটা পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হবে। ইসলামের শক্তির দিনে ইসলাম ভারতের মাটিতে ভারতীয় ধর্ম রূপে নিজেকে সানন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মোগল সম্রাটদের স্থাপত্যকীর্তিগুলি ভারতের অতীত সম্পর্কে উৎসাহে ভরপুর ; কারণ ভারত-সারাসেনীয় স্থাপত্যরীতি মক্কা এবং কনস্টান্টিনোপলের কাছে যতটা ঋণী, রাজস্থানের কাছেও ঠিক ততটা ঋণী। মুসলমান বিজেতারা ছিলেন এশিয়াবাসী, বিজিত ভারতীয়েরাও এশিয়াবাসী ; তাই বিজয়ী মুসলমান এবং বিজিত হিন্দুদের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান ছিল না ; রুচি অথবা নীতি অথবা চিন্তা এবং শিক্ষার রীতির মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাটল ছিল না। নবাগত দেশের সন্তানরূপে নিজেরই ঘরে নিজেকে স্থায়িভাবে পত্তন করল। তার সন্তানসন্ততি সর্বপ্রথমে ভারতীয় এবং তারপর তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্য। আজ ধর্মনিরপেক্ষভাবে মত প্রকাশের প্রয়োজনের দরুণ দেশের হিন্দু ও মুসলমান জন সাধারণের স্বার্থ এবং লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার পথে তার কোন বাধা নেই ; যে ব্যক্তি দিয়ে তার পিতৃপুরুষরা একদিন আরবের মরুভূমিকে ধ্বনি-মুখর করে তুলেছিলেন, সেই ব্যক্তিকে জাতীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োগ করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার কিছুই নেই। হিন্দুর কাছে ব্যাপারটা আরও সহজে বোধগম্য হওয়া উচিত। তার অবতারেরা সকলেই মানুষ। জাতির প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের আবির্ভাবের পর জনসাধারণের মধ্যে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্যৌবনলাভের বন্যা বয়ে যায়। দেশের মৃত্তিকার দাবি উপস্থাপিত করতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করে নি। ধর্মগ্রন্থে এতদূর পর্যন্ত বলা হয় যে, দেশের জন্য যে প্রাণদান করে তার অবিলম্বে স্বর্গসুখ প্রাপ্তি হয়। মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে প্রেরণার ক্ষেত্রে দুটি ধর্মই সমকেন্দ্রগত গোলন্দাজবাহিনীর মত ব্যূহসন্নিবদ্ধ ; মাতৃভূমির পুনর্গঠনের মহৎ সর্বজনীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে কামানের গোলার ন্যায় নিক্ষেপ করতে তারা প্রস্তুত।

কিন্তু এই সবের জন্য, সাবেকী লোকাচারকে নতুন করে বিচার করতে হবে, মূল উপাদানগুলি আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে। যে বিপ্লব এই কাজ সম্পাদন করবে তা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে দারিদ্র্যকে পরাস্ত করতে হলে, এবং জাতীয় দক্ষতা অর্জন

করতে হলে, অন্ধভাবে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যানের মনোভাবকে আর বেশিদিন গৌরব-মহিমা দিয়ে অলংকৃত করা চলবে না। সঞ্জীবনী লোকাচারনিষ্ঠার আমরা যে সংজ্ঞাই দিই না কেন। সেই নিষ্ঠা কেবল ভয় থেকে সমুৎপজাত হতে পারে না; তা সদাসর্বদা শুধু আত্মরক্ষার ভাব অবলম্বন এবং আক্রমণাত্মক ভাব বর্জন করে থাকতে পাবে না, এবং সহ্য করা ও হাল ছেড়ে দেওয়াতেই তার পরম শৌর্য প্রকাশ পায় না। যার মনোভাব অগ্রগতি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, সে ইতিমধ্যেই পিছনে হঠতে আরম্ভ করেছে। একটা সময়ে ভারতের সবই ছিল তার নিজস্ব। সেদিন ভারত অবাধে অগ্রসর হত, নতুনকে শক্তি এবং জ্ঞানের অগ্রগতিরূপে স্বাগত জানাত, তাকে দোষমলিন বিকৃতি মনে সভায় তার সামনে দাঁড়াত না। সেইজন্য ভারতের নিষ্ঠাকে আবার সংগ্রাম করে এগিয়ে যাওয়া শিখতে হবে। কিন্তু আমাদের সামনে বহু প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পথের মধ্যে কোন পথটি আমরা বেছে নেব? কোন লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হব? কি উপায়ে? কি কি সঙ্গে নিতে হবে? কি বাদ দিতে হবে? এইগুলিই হল আসল মুস্কিল। কিছু কিছু কাজ যে করতে হবে এ বিষয়ে সবাই একমত, কিন্তু কি ভাবে যে করতে হবে সেটা ছক করে কেউ স্পষ্ট ভাবে বলতে পারছেন না।

অথচ দুর্বলতাটা পরীক্ষা করে দেখা সহজ। একদিকে, পাশ্চাত্যকে স্পর্শ করলেই নিজে দোষদুষ্ট হয়ে যাবে ভেবে প্রাচ্য যতক্ষণ পাশ্চাত্যকে পরিহার করে চলছে এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যকে ঘুস হিসাবে বিবেচনা করে গ্রহণ করছে, ততক্ষণ পাশ্চাত্যের হাতে প্রাচ্যের পরাজয় হবে। পাশ্চাত্য প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পণ্যের বাজারে ভারত যাতে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়, ভারত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবে—এই ধারণা যতটা ভ্রান্ত ততটা হীনতা সঞ্জাত। পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রয়োগ করব না এবং প্রয়োজন হলে অনাহারে মৃত্যু বরণ করে জাতীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য শহীদ হব—এই আদর্শ গ্রহণ করা জনসাধারণের পক্ষে একটা অবাস্তব ব্যাপার, এবং আর্থনীতিক সর্বনাশের জোয়ার তো এই ধারণাকে সম্প্রতি সকলের নাগালের বাইরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাহলে হবে কি?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে পূতপবিত্র বলে স্বীকার করতে হবে। সেই বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই ধ্যানধারণার জন্যই তাকে অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাকে এই কথা ঘোষণা করতে হবে যে পাশ্চাত্যের মত প্রাচ্যেও এই বিজ্ঞানের "তারা প্রমত্ত" প্রবক্তাসমূহ থাকা চাই। ভারতকে বুঝতে হবে যে, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান এবং সার্বভৌম ও ক্রমবর্ধমান মানবিকী বিজ্ঞানগুলি, ইতিহাস ও নীতিবিজ্ঞান সত্য উপলব্ধির নতুন পদ্ধতি এবং এমন ধর্মের অভিজ্ঞতা যেভাবে অনুসরণ করা হয়, সেই ভাবে যে কোন মূল্যে এবং

শুধু কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গভীর আবেগের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে।

এই ধরনের মনোভাব এশিয়ার মানস প্রতিভার মূল উপাদান। ইউরোপে গণিত-বিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে মাপ পরিমাপের একটা সুবিধাজনক উপায় হিসাবে গণ্য করার ঝোঁক দেখা যায়। এশিয়ায় গণিত শাস্ত্র কিন্তু সেই রকম নীচু জায়গায় কখনও নেমে যায় নি। সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং ব্যাপার সমূহের মূল ঐক্য প্রকাশের পবিত্র অলংঘনীয় রীতি হিসাবে গণিতশাস্ত্র সর্বদাই পরিগণিত হয়েছে। গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তির কণ্ঠে আবেগের সে রকম কম্পন আসবে, যা মহৎগুণসম্পন্ন চিত্র বা হৃদয় অভিভূত করা কোন কবিতা আলোচনার সময় আমরা হয়তো অনুভব করতে পারি। ভারতীয় কল্পনা সকল জ্ঞানকে দিব্য দর্শনের সংজ্ঞা বলে মনে করে। আর জগতের অন্য ধীশক্তি এবং প্রজ্ঞা এর চেয়ে বেশি প্রগাঢ়ভাবে যুক্তিসহ এবং অনুসন্ধিৎসু নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির দিক দিয়ে এর চেয়ে বেশি নিরপেক্ষ এবং ব্যাপক নয়। সেই কারণে ভারতীয় বিজ্ঞানের মহৎ এক সংঘ ও সংগঠন অসম্ভব বস্তু নয়, বরং প্রয়োজনীয় পরিবেশ পেলে এই অভীষ্ট সবল উচ্চাভিলাষের মধ্যে সিদ্ধিলাভের সবচেয়ে উপযোগী একটি মহৎ কার্য। হিন্দুকে শুধু এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্ব আধুনিক জ্ঞানের একশত আটটি উপনিষদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। মুসলমানকে শুধু এই কথাটি বুঝতে হবে যে, আভেরহোস্ ও আভিসেন্নার পুনরাবির্ভাবের সময় পূর্ণ হয়েছে এবং এঁরা দুজনেই কেবল নিজেদের সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করবেন না, সংস্কৃতির এক নতুন যুগও প্রবর্তন করবেন।

এটা কেবল আত্মরক্ষার অনুপ্রেরণা নয়। আচরণের উন্নতি ও মানসিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রসারসৃষ্টির কাজে প্রাচ্য পদ্ধতিসমূহ অতুলনীয় সাফল্য লাভ করেছে। ভারতে মফঃস্বলের যে কোন বড় শহর ধরে সেখানকার সাধুসন্ত ও পণ্ডিতদের নাম গণনা করা যাক। ব্যবসায় এবং বিজ্ঞানের দিক এদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত লন্ডনের সবচেয়ে নামকরা শহরতলীও এত বড় বড় নামকরা পণ্ডিতদের নিয়ে গর্ব করতে পারবে না। কিন্তু ভারতের প্রাচীন বিদ্যা এখন সম্পূর্ণ; তার কাজ সাঙ্গ হয়েছে। জাতির মন যে এখন তাতে নতুন কিছু যোগ করবে, তেমন কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

সেইজন্য ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার যে বলিষ্ঠতাকে তা সৃষ্টি এবং লালনপালন করেছে, তাকে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপাদন করার জন্য মানসিক বিজয়ের নতুন জগৎ খুঁজে বার করতে হবে, নতুন নতুন বিষয় উন্মোচন করতে হবে, এবং নতুন এক বিকাশ

প্রবর্তন করতে হবে, যার মধ্যে সাধারণ মানুষ আধুনিক জগতের পটভূমিতে নিজের শক্তি পরিমাপ করবে এবং নতুনজগতের শক্তি জানবে।

এই রকম একটা বিপ্লব থেকে, তার অনুষঙ্গ রূপে, মূল লক্ষ্য রূপে নয়, যান্ত্রিক দক্ষতার একটা বিকাশ অনিবার্যভাবে আসতে বাধ্য। অন্যত্র উপযোগিতা সুযোগ এবং সুবিধার পূজা যে আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং নীতিভ্রংশ সৃষ্টি করেছে, প্রাচ্যে যান্ত্রিক নৈপুণ্যকে তা পরিহার করতে হবে। এটা সুনিশ্চিত যে, ভারত যদি একবার যন্ত্র যুগে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে সে কারখানার মজুরকে সেই সব মানবিক গুণ এবং নৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেবে যেগুলি সেই মজুর পাশ্চাত্যে ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

অবশ্য এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভব করে তোলার জন্য, দেশের বিভিন্ন অংশে এমন সব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব প্রয়োজন, যাদের মন ও হৃদয়ের সমন্বয় সাধনের অভ্যাস আছে। ভারত প্রকৃতপক্ষে এক এবং অখণ্ড, কিন্তু অল্প ভারতীয়ই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে এবং আরও কম লোক এ সম্পর্কে যথোচিত আবেগ অনুভব করে। এই সন্ধিক্ষণে কোন সংকীর্ণ উচ্চাশা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। মারাঠারা মহারাষ্ট্রের মঙ্গল এবং শিখেরা পাঞ্জাবের কল্যাণ না চাইলেও পারে, এবং বিস্মৃত বিরোধগুলি যেন নতুন করে জীইয়ে তোলা না হয়। এই রকম জিনিসে জাতীয়তার শিহরণ থাকে না। বরং, একযোগে ভারতকে এবং ভারতের সমগ্র অতীতকে গৌরবসমুজ্জ্বল করার কাজে সকলকে মিলিত হতে হবে। অপরে কি দিয়েছে, সেটা প্রত্যেকের জানা এবং স্বীকার করা চাই। স্থানীয় ইতিহাসের প্রতিটি সহসালব্ধ ঘটনার সুযোগ নেবার মত এবং তাকে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভালভাবে ব্যবহার করার মত লোক নিশ্চয়ই আছে। পাঞ্জাবে, রাজপুতানায়, শিবাজীর নেতৃত্বাধীনে জাতীয়তার আবেগ এমনই প্রচণ্ড ছিল যে তা মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। বঙ্গদেশের নিজের কখনও কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুসংহত রূপ ছিল না বলে, সেইটেই হয়তো বঙ্গদেশের ইতিহাস সন্ধিক্ষণের উপাদান রূপে কাজ করে বঙ্গদেশকে আজ সকল প্রদেশকে গলিয়ে মিশিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি এবং নিমিত্তরূপে পরিণত করছে।

এই রকম অনুপ্রেরণা সামাজিক তথা রাজনৈতিক। সর্বোচ্চ অর্থে এ অনুপ্রেরণা ধর্মেরও বটে। গৃহ, বিদ্যালয় এবং হাটবাজার এই দিয়ে ভরে তোলা চাই। সেইজন্য এ বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে নারীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। নারীরও নতুন এবং মহত্তর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার উদ্ভব হয়েছে। নারীকে লোকাচার যে রূপ দিয়েছে, এখন তাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তাই হয়ে উঠতে হবে। প্রাচ্যের ধর্মানুরাগকে অনেক সময় বেশ ভাল রোগ-বীজানুবিজ্ঞান বলা যায়। বসন্তের দেবী শীতলার বাহন গাধা একটি অপরিচ্ছন্ন

জীব, কিন্তু শীতলার পুজা হয় জল এবং ঝাঁটা দিয়ে, এবং বসন্তের রোগীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হয়। এই লোকাচার সম্মত কাহিনীটি চমৎকার। এই ধরনের এত ভাল জিনিস ইউরোপ দেখাতে পারবে না। কিন্তু স্পষ্টতঃই এর পরের ধাপ হল সরাসরি তথ্য সংগ্রহ ও বিচার। খাদ্য, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল প্রশ্ন সম্পর্কে জানার, চিন্তা করার স্বাধীনভাবে বিচার করার সামর্থ্য নারীকে দিতে হবে। আধুনিক শ্রমিকের কঠোর প্রয়োজন মেটাতে পুরানো ধরনের খাদ্য এবং রন্ধনপদ্ধতি এখন পুরোপুরি অনুপযোগী এবং অপর্যাপ্ত। অজীর্ণ রোগ জাতির পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ এ এমন একটা প্রতিবন্ধক যাকে নিশ্চয় বাগে আনা যায়। আরও নানারকম খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে পছন্দসই খাদ্য বেছে নেওয়া, এবং বিকল্প হিসাবে আরও সরল উপায়ে রান্না এ দুইই পুরানো প্রথার সঙ্গে পুরোপুরি সংগতি বজায় রেখে করা যায় এবং লোকাচারের তো সর্বদাই এই লক্ষ্য যে, দেহ মানুষের ভৃত্য হবে, প্রভু হয়ে উঠবে না।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং পরিবারগুলি ভেঙে ভেঙে ছোট করে ফেলার দিকে ঝোঁক আসার দরুন পরিবারের মধ্যে কাজের পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। জাতীয় ও সম্প্রদায়গত দায়িত্বগুলি বিচার-বিবেচনার শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি করে এদিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। জাতির সংস্কৃতির জনপ্রিয় রূপ মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি আচার, প্রতিটি অনুষ্ঠান অলিখিত ইতিহাসে ভরা। কিন্তু বর্তমান যুগ তথ্যের আধার এবং বাহন সম্পর্কে জ্ঞানের চেয়ে তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং সরল জ্ঞান চায়। সেই দাবি মেটান অবশ্য নিষ্ঠার উপর আঘাত হানা নয়; তা হল নিষ্ঠা ও বিশ্বাসকে সিদ্ধ ও সফল করে তোলা, তাদের শক্তির শীর্ষে তাদের বহন করে নিয়ে যাওয়া।

যে মন ও বুদ্ধি এতদিন বর্বরোচিত অজ্ঞানের মধ্যে পরিত্যক্ত ছিল, তেমন কোন মন এবং বুদ্ধিকে শিক্ষাদানের প্রশ্ন এখানে উঠছে না। বর্তমান প্রথা এবং অতীতের প্রতি ভারতীয় নারীর পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে যারা উপলব্ধি করে যে পুরানো শিক্ষা এবং তালিমের কল্যাণে ইতিমধ্যেই বিকাশপ্রাপ্ত কিন্তু অন্যরূপে অভিব্যক্ত গুণাবলীর প্রকাশের নতুন পথ মাত্র তারা দেখিয়ে দিচ্ছে, তারাই কেবল ভারতীয় নারীকে সঞ্জীবনী সেবা দান করতে সক্ষম হবে। সেইজন্য পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণা উপলব্ধি এবং প্রচারের দায়িত্ব বিদেশীদের নয়;—সে দায়িত্ব প্রাচ্যবাসীদের স্বার্থে প্রাচ্যবাসীকেই নিতে হবে।

এই রকম প্রক্রিয়াজাত ফলাফলের কোন অর্থেই 'বিজাতীয়করণের' রূপ পরিগ্রহ করা উচিত হবে না। একটা আদর্শ আত্মস্থ করে, আমাদের নিজেদের দেহমন দিয়ে তার শক্তির প্রমাণ দেওয়া অনুকরণ নয়। শুধু অনুকরণ করে পাশ্চাত্যকে বোঝার চেষ্টা,—যেমন অফিসে কেরাণীর, রাজনীতিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীর,

ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দেবার জন্য যতটুকু যন্ত্রশিল্প জানা দরকার ঠিক ততটুকু জ্ঞানসম্পন্ন উৎপাদনে উদ্যোগী ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের মৃত্যুর জনকজননী। কিন্তু জীবন্ত ও সতেজরূপে এবং আন্তরিকভাবে পাশ্চাত্যের শক্তিকে গ্রহণ এবং প্রাচ্যের নিজস্ব ধরনে অবিলম্বে তার প্রয়োগ মৃত্যু নয়, জীবন।

বলা হয়েছে, প্রাচ্যের বিধিবিধান, সূত্র ও সংকেত এত নিখুঁত বলেই প্রাচ্যকে ভুগতে হয়। পাশ্চাত্যের সুভাষিতাবলীর একটি হচ্ছে, "সত্য বলবে।" আবার বলা হয়েছে, "ভদ্রভাবে, সৌজন্যের সঙ্গে কথা বল" আমরা তো আখচার দেখে থাকি যে, এই বিরোধী নীতিবাক্যগুলির সমন্বয়ের জন্য অমার্জিত কলাকৌশলহীন যুক্তি অন্ধের ন্যায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং সে চেষ্টায় সফল হচ্ছে না কিন্তু প্রাচ্যে মানুষ দুহাজার বছরেরও বেশি মনুর বিধানের ছায়াতলে জীবনযাপন করে আসছে। "সত্য বল কিন্তু অপ্রিয় সত্য বোলো না। প্রিয় বাক্য বল কিন্তু যা অসত্য তা বোলো না।" হায়, এই বিধান এমনই পূর্ণাঙ্গ যে তাতে নতুন কিছু যোগ করা যায় না। পূর্ণ শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের জন্য চিত্ত যে অবিজিত ব্যাপ্তি-স্থান চায়; সেই ঊষর প্রান্তরের খণ্ডটি যাকে পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, পুনরুদ্ধার করতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়; সত্যের মহাসাগরে দুঃসাহসিক অভিযানে সংশয় ও নেতিবাচক মনোভাবের ঝটিকার সম্মুখীন হয়ে, ধীরে ধীরে জ্ঞান সংগ্রহ করে সে ঝড় কাটিয়ে উঠতে হয়;—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মহাবিশ্বের যে ধারণাটি উপস্থাপিত করে, তাতে এ সব পাওয়া খুবই সম্ভব।

যাকে শিক্ষা বলা যায়, তার খুব কমই আধুনিক ভারতে প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে। একটা যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে; একটা সংগঠনও তৈরী; কিন্তু এ সবের মধ্যে দেশের মানুষের কিছু নেই; দেশের মানুষ 'স্বতস্ফূর্তভাবে যাকে ভাল বলে অনুভব করে, তেমন কোন উদ্দেশ্য এদের দ্বারা সাধিত হয় না। তাছাড়া, শিক্ষার অর্থ সম্পর্কে উদার আদর্শেরও অভাব। এ কথা স্পষ্ট যে, যতদিন না ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, তার সকল রূপ, স্তর ও পর্যায়ে, বর্তমান ধর্মানুসারী সংস্কৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিয়ে ক্রীড়ারত শিশু থেকে জ্ঞানের পর্বত শিখরে দণ্ডায়মান নির্জনে কালযাপনকারী ছাত্র পর্যন্ত, সর্বত্র বিরাজমান হচ্ছে, ততদিন কোন ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ছাত্র একা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই শৈল চূড়ায় তার আসার পূর্বে মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি; অথচ সেখান থেকে ফিরে এসে সেই ছাত্র তার দিব্য দর্শন এবং পর্যটনের স্মৃতিচারণার সময় দেখে যে, সমাজের যে ছাঁচ থেকে সে বাইরে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল, সেইখান থেকেই সে আবার অজস্র সহানুভূতি এবং উদ্দীপনা লাভ করছে।

কোন প্রাচ্য দেশের সমৃদ্ধ সভ্যতা এবং ধর্ম থেকে একটা বিরাট জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া কোন ক্রমেই সরল নয়। অথচ তার জন্য প্রতিটি অস্ত্রই হাতের সামনে রয়েছে। দীর্ঘ যুগব্যাপী শান্তি (বিভিন্ন রাজবংশের নগণ্য বিরোধগুলি কৃষিজীবি জনসাধারণের মূল শান্তিকে ব্যাহত করে না) ধর্মগুলির মধ্যে নিহিত সামরিক দিক গুলিকে অনেকটা ছেলেমানুষিতে পরিণত করেছে। তবু কিন্তু মহরমে এখনও তলোয়ারের খেলা দেখান হয় ; দুর্গাপুজার সময় এখনও শোভাযাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গ দেশের বড় বড় কায়স্থ* পরিবারে এবং রাজপুতানায় ক্ষত্রিয় পরিবারে প্রতি বৎসর অসি পুজা হয়ে থাকে। আর নভেম্বর মাসে দেব-সেনাপতির জন্মদিনের আগের দিনে মেয়েরা মাথায় জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে মন্দিরে জমায়েৎ হয়। ঐ দিনটিকে বছরের সবচেয়ে জাঁকজমকে ভরা মনোরম দিন করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। আর তার চেয়েও অসাধারণ এবং আপাতবিরোধী ব্যাপার হল যে শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, এবং সম্পূর্ণ নিরীহ ও বাধ্য ভারতই রণক্ষেত্রে অবস্থিত রথ থেকে জগতের মধ্যে সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উদ্দীপনাময় আহ্বান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রচার করেছে।

একটা মহান জাতি গড়তে হলে আর একটি জিনিসের প্রয়োজন। তা হল সকল শ্রেণীর মধ্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মনোভাব-বা সমচিত্ততা। জাতি এবং আচারের সুতীব্র পার্থক্য দক্ষিণের অন্তজ অস্পৃশ্যদের বিভিন্ন জাতির কাছে প্রবাদে পরিণত করছে এবং ভারতের নামকে জাতির বদলে কদর্থে প্রযোজ্য 'জাতে'র সঙ্গে সমার্থক করে তুলেছে। মহান ধর্মনেতা রামানুজের সমগ্র জীবন ঘৃণিত, দলিত, পরিত্যক্ত শ্রেণীসমূহের জন্য গ্যালিলির শিক্ষক খৃষ্টের জীবনের মতই সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। জাতীয় সংহতি হিন্দুদের কানে কোন নতুন সুর রূপে ধ্বনিত হয় না। ইসলাম যদি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে সৃষ্ট মহৎ প্রতিষ্ঠান না হয়, তবে তা কিছুই নয়, উত্তরে গুরু নানক (ক) এবং দক্ষিণে রামানুজ (খ) সেই একই বাণী কথা দিয়ে, এবং জীবন দিয়ে প্রচার করেছেন, যার ফলে তাঁদের জীবন আরও স্মরণীয় হয়ে আছে। আর ভারতের হৃদয় যদি কখনও তার ইতিহাসে এই ঘটনাগুলির অর্থ এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে (ক) গুরু নানক পাঞ্জাবের শিখ জাতির সংগঠন দশটি গুরুর মধ্যে প্রথম গুরু। ১৪৬৯ সালে তাঁর জন্ম হয়। (খ) অদ্ভুত প্রেম ও দয়ায় সাধু রামানুজের মন পরিপূর্ণ ছিল। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। আমরা দেখব যে সব বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে, সমস্ত অসুবিধা জয় করা হয়েছে

* বঙ্গদেশে কায়স্থরা জাতি হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তারা প্রাচীন কালের শস্ত্রব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় জাতি থেকে উৎপন্ন বলে দাবি করে, কিন্তু এই বংশপরিচয়ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে।

এবং নতুন এমন এক যুগের আবির্ভাব হয়েছে, যে যুগ একই সঙ্গে অতীতের সকল কীর্তি এবং উপলব্ধির কুসুম প্রস্ফুটিত করার পাত্র রূপে এবং প্রস্ফুটিত কুসুম রূপে বিরাজ করবে।

কিন্তু জাতি সম্বন্ধে এই বিরাট ভাব ও ধারণা যাতে ভারতীয় নারীরা বুঝতে পারে—তার জন্য আমাদের প্রস্তাব কি ? এর সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তারা কি ভাবে অর্জন করবে ? এবং তারা কি করে মূল তথ্যগুলি স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে আয়ত্ত করে অগ্রসর হবে ? তাদের শিক্ষার সাবেকী সনাতন প্রণালীগুলি সেই সব গায়ক যারা হোমারের যুগের চারণদের মত বাড়ী বাড়ী মহাকাব্যের কাহিনী গান গেয়ে ফেরে—তারা যে এক কথায় ভালোমানুষ গাইয়ে থেকে বীর গাথাকার চারণ হয়ে উঠে—জাতির গান গাইতে আরম্ভ করবে—এটা কি আশা করা যায় ? না, এটা বেশ পরিষ্কার যে, এই ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে কেবল বিরাট কোন ওলটপালট বা উৎক্ষেপের ফলেই—তার কারণ রূপে নয়। সেই উৎক্ষেপ থেকে জাতি নির্গত হবে দীপ্তি বিকীর্ণ করে, বিজয়ী হয়ে, সকল সন্তানের কল্পনার উপর নিজের মূর্তি গভীরভাবে অঙ্কিত করে এবং সে ছাপ যুগ যুগ ধরে তাদের মনে আঁকা থাকবে। কিন্তু এই রকম উৎক্ষেপ বা পরিবর্তনের উৎস কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে ?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু নিজেদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, যখন বিশ্ব কোন যুগান্তকারী ভাবের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ভারত আজ তার জন্য সুনিশ্চিতভাবে প্রস্তুত—তখনই সেই ভাবধারা প্রতীক্ষারত চেতনার উপর সকল দিক থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রস্তরগুলি পর্যন্ত সেই কথা কয় এবং দেয়ালের কাটগুলি উচ্চকণ্ঠে প্রশ্নের জবাব দেয়। সর্বসাধারণের হিতার্থে এক বিরাট সংগ্রাম ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। ভাব ও সংগ্রামের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হতে থাকে এবং উভয়েই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত একে অপরকে স্পষ্টতররূপে প্রকট করে তোলে।

এখনকার টেলিগ্রাফ ও চিঠি পত্রের দিনে, একটা সাধারণ ভাষা ও সুলভ মুদ্রনের দিনে এ কথাটা আরও সত্য। অশোকের ভারতে যে প্রক্রিয়া শেষ করতে অন্ততঃ দুশো বছর লাগত, এখন দশ বছরের মধ্যেই তা করা যায়। এবং যেখানেই একটি ইংরেজী কথা যায়, সেখানেই জাতীয় ভাব নিজের প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করে' সেই প্রয়োজনকে সংগঠিত রূপ দিতে চেষ্টা করে। নারী সমাজে ঠিক কি ভাবে এটা ভূমিষ্ট হবে সে কথা কেউ বলতে পারে না। কোন কোন নারী হয়তো নিজেরাই উপলব্ধি করবে। আবার কেউ কেউ পুরুষদের কাছ থেকে ভাবনা গ্রহণ করবে। কারও কারও ভিতর ইতিমধ্যেই জিনিসটা রয়েছে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, সুনিদিষ্টভাবে সমন্বয়মূলক আগ্রহ ও প্রবণতা নারীর মধ্যে থাকার ফলে, নারী সব কিছু পূর্ণভাবে বিচার বিবেচনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দীর্ঘকাল ধরে

অস্বীকার করে যাবে। জননীর স্বার্থ চিরকালই ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। নারী সহজেই বুঝবে যে এক প্রজন্মে পরাজয় হলে, সে পরাজয় একটা জাতিকে চিরকালের জন্য পৈত্রিক উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, এবং নারী ঠিক এমন ভাবে সমস্যাটার নিষ্পত্তি করে দেবে যাতে তার নিজের সন্তানদের ভাগ্যে জয়ই লেখা থাকে, আত্মসমর্পণ নয়।

প্রাচ্যে নারী এইভাবে যদি একবার তরীর হাল ধরে, তার দেশের সকল সমস্যার সমাধান করে, তাহলে সে নিজের অনুযোগ-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য আর কার কাছে আবেদন নিবেদন জানাতে যাবে ?

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের মহাকাব্য

প্রতি মানবগোষ্ঠীর জীবনে অদৃশ্য কিন্তু সর্বব্যাপী মহৎ আদর্শাবলী বিরাজমান। একটি নাটক বা কাহিনীর একটি মাত্র পৃষ্ঠা মানুষের আচার আচরণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, মুসার মাধ্যমে প্রেরিত দশটি ঐশ বানীর একটিরও তার অর্ধেক প্রভাবও নেই। মধ্যযুগের ইউরোপের বীরধর্মের তত্ত্ব আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে বটে, কিন্তু রাজা আর্থারের কাহিনী অবলম্বনে টেনিসন কর্তৃক রচিত 'রাজ-কাহিনী নামে কাব্য আমাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

সমগ্র ইতিহাস অবশ্য তার যতটুকু জানা যায়—সারা জাতির এজমালি যৌথ সম্পত্তি ; কিন্তু তা ছাড়াও প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যিক সৃষ্টিকার্যে নিজস্ব কিছু না কিছু দিয়ে থাকে এবং সেই দানগুলি সমাজের সকল শ্রেণী কতটা পাবে এবং তার ফলে সেগুলি জাতীয় চরিত্রের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—সেটা নির্ণয় করবে জাতির লোকাচার। শেক্সপীয়রপ্রীতি আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ইংলণ্ডের সাধারণ জীবনের মহত্ত্ব-সাধন এবং তাকে মর্যাদামণ্ডিত করার কাজ কতটা হতে পারে, সে কথা অল্প লোকেই চিন্তা করে দেখেছেন। বর্তমানে বাইবেলই একমাত্র গ্রন্থ যা এই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং আমাদের দেশের প্রতিভার সন্তান এবং সেই কারণে কোন কোন অর্থে ইংরেজের জন জীবনেরই ফল-স্বরূপ মহান ব্রুটাস, ডেসডিমোনা, হোরেশিও এবং তাদের সবগোত্র অন্যান্য চরিত্রের চেয়ে আমাদের কাছে সিরিয়ার কয়েকজন পশুপালকের জীবন ও মতামত বেশি শক্তি-সম্পন্ন ও প্রভাবযুক্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

বলা হয় যে, আজও গ্রীসে দরিদ্র শ্রেণীসমূহের কাছে হোমর এবং ইউরিপিডিসের কাব্য সুপরিচিত ; এবং প্রতি দেশের উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে সকল দেশের সাধু-সন্তদের জীবনের প্রভাব দেখিয়ে দিয়ে ক্যাথলিক গির্জা একটা বিরাট কাজ করেছে, অথচ সে কাজের মূল্য খুব অল্প লোকই উপলব্ধি করে। প্রত্যেকেই অভ্যাস বসে একটা আদর্শের সংগে নিজেকে তুলনা করে নিজের পরিমাপ করতে অভ্যস্ত। সেইজন্য

বর্তমান আদর্শ ও নমুনার সারিতে নতুন আদর্শ যোগ করাটাকে স্বাগত জানান দরকার। রাজা মনে করেন যে তিনি নৃপতিশ্রেণীর একজন এবং সেই রাজন্যবর্গের শুধু কর্তৃত্ব থাকলেই চলবে না, আচারে ব্যবহারে তাদের ছবির মত বর্ণাঢ্য হতে হবে। আর তিনি জানেন যে তাঁর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এই মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁর বিচার হবে, তাতে তিনি খাড়াই থাকুন বা পড়েই যান। তাঁর পদ-মর্যাদাই আদর্শের ছাঁচটা তাঁর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়। রাজার চেয়ে যাদের পদ-মর্যাদা কম এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেশি, তাদের মধ্যে কিন্তু যোগ্যতা আরও চটপট করে নিজের গায়ের রংটা দেখিয়ে দেয়। আমাদের সাধারণ গুণগুলি যদি দিব্য অগ্নি-শিখার স্পর্শ লাভ করে, তাহলে আমাদের কেউ কেউ হয়তো দেখতে পাব যে, আদর্শ ব্যবসায়ী শাসক ও পরিচালকের গুণাবলীর মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নিহিত। সততা, মর্যাদা এবং জ্ঞানের যে বিশেষ রূপ এই ধরনের কাজের অংগ স্বরূপ, তা হয় আমাদের থাকবে, না হয় তা আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজের জাতীয় জীবনে এইটেই সবচেয়ে সাধারণ ও যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন হলেও, এর পিছু পিছু কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আসে না যে, প্রত্যেক ইংরেজ এতে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম। এখানে সেখানে বিশেষ করে বোধ হয় কেলট জাতির মানুষদের এমন একআধজন হয়তো চোখে পড়বে, যাঁদের পুরোপুরি মধ্যযুগের বীরব্রতধারী নাইটের জীবন অবলম্বন করে, ভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যই জন্ম হয়েছে। নেতা এবং সহযোগীর প্রতি আনুগত্য, অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি, বিস্তীর্ণ ভাবে দীপ্তি বিকীর্ণ-করা ভয়শূন্যতা—এই গুণগুলি বীরধর্মসমন্বিত যুগের বৈশিষ্ট। যাঁদের এই গুণগুলি আছে, তাঁরা ঐ ধরনের যুগের প্রতিনিধি এবং তাঁদের গুণগুলি ব্যবসায়ী-রাজা এবং বাণিজ্য শকটযূথের অধিপতির গুণাবলীর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর নয়, আবার কম বিস্ময়করও নয়। একটি মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তাকে সাধুসন্ত হবার পথে পরিচালিত করে, আর একজন যায় কাব্যের দিকে, এবং তৃতীয় ব্যক্তির সম্ভাবনা তাকে বিজ্ঞান বা কলাবিদ্যা বা যন্ত্রনির্মাণবিদ্যার দিকে নিয়ে যায়। একজন যেন অভিকর্ষের শক্তির দ্বারা নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর একজন তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনুগামী হয়। একজন জ্ঞান উপভোগ করে, অন্যজন উপভোগ করে জ্ঞানহীনতা।

আমরা সকলেই যদি চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভ করতাম, তাহলে ধরে নেওয়া যেত যে, জীবনের প্রতিটি স্থানই পূর্ণ হয়ে যেত, বিশ্বনাট্যের প্রতিটি ভূমিকাই

অভিনীত হত, কিন্তু তা হত সুদৃঢ় এবং পরিপক্ক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এমন সব নরনারীর দ্বারা যে, আমরা একজনকে আর একজন মনে করে বিভ্রান্ত হতাম না, যেমন আমরা ট্রয়ের হেলেনের আচরণকে হাঙ্গেরীর এলিজাবেথের আচরণ বলে বা হাঙ্গেরীর এলিজাবেথের আচরণকে ফাউস্টের গ্রেচেনের আচরণ বলে ভুল করি না।

তার ওপর আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, ইউরোপীয় জীবনে, আদর্শবাদ নিয়ে যারা জন্মেছে, কেবল তারাই ইতিহাস এবং সাহিত্যের বিবিধ চরিত্রের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আমাদের সমাজে একমাত্র ধর্মই বিস্তীর্ণ ভাবে এই বাধ্যতামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। আর যে জিনিসের সঙ্গে এটা জড়িত তা হল এই যে, একমাত্র ধর্মই আদর্শগুলিকে প্রেরণা প্রদান করে। বহু ক্ষেত্রে ঘটনা এমন সব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে একটা জীবন প্রদীপ্ত ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে, এবং স্বাতন্ত্রের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু সাধুসন্তদের মনের ইচ্ছা কখনও পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। ট্রয় অভিযানের নেতা গ্রীক রাজা আগামেমনের কুমারী কন্যা আইফিজিনিয়া আত্মবলি দিতে অস্বীকার করতে মোটেই পারত না। পক্ষান্তরে ফরাসী কন্যা জোন অফ আর্ক নিশ্চয়ই সর্বদা অনুভব করেছে যে, মাইকেলের তরবারি আরও অকলঙ্কভাবে এবং আরও সাহসের সঙ্গে ধারণ করা যেতে পারত। এই সত্যই ধর্মের আদর্শগুলিকে তাদের স্বাতন্ত্র্যের পরম শক্তি প্রদান করে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সর্বজনীন আবেদনের সময়েও তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। শেক্সপীয়রের ভিনিসের সওদাগর নামক নাটকের নায়িকা পোর্শিয়া হয়ে ওঠা যে বালিকার লক্ষ্য, সে দম্ভ এবং অহংকারের দোষে দোষী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ-ধন্য কুমারী খৃষ্ট জননী যার আদর্শ, সেই বালিকা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সক্রেটিসের অনুকরণ যৎপরোনাস্তি কৃত্রিমতা বলে গণ্য হবে; কিন্তু ধর্মের জন্য যাঁরা বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের অনুকরণ সকলের পক্ষেই কর্তব্য বলে পরিগণিত। সাধুসন্তদের জীবনের এই বিচ্ছুরিত তেজোময় কর্মশক্তি দিয়ে সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের মন্ডিত করা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভারতে, এবং কতকটা আইসল্যাণ্ডে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কারণ ভারতও কাহিনীর দেশগুলির মধ্যে একটি। তার ইতিহাসের প্রতিটি স্থির শান্ত সময়ে আমরা তার চারণদের সঙ্গীত এবং দেশের অতীত কাহিনীতে তার জনসাধারণের হর্ষধ্বনি শুনতে পেতে পারি। এই ধরনের সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে উত্তরের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা দক্ষিণের গভীর এবং প্রথম দিনের রাত্রির চেয়ে বেশী উপযোগী

নয়। সারা শীতের মাসগুলি সন্ধ্যাবেলা ভ্রাম্যমান কথকের আসনের চারপাশে জড়ো হয়ে, বারান্দায়, উঠোনে মেয়েরা আবার চিকের আড়ালে বসে, কথকের উদ্দীপনাপূর্ণ কাহিনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শোনা তো ভারতের শত শত বৎসরের রেওয়াজ। চারদিকে আলো ও ফুল, রং বেরংয়ের সতরঞ্চি, জাজিম পাতা এবং জ্বলন্ত ধূপের সৌরভ। এই পরিবেশের মধ্যে কথকের কথকতার ভিতর পাওয়া যায় পাঠ, গান এবং কাহিনীর মিশ্রণ। এ যেন একাধারে সংগীত প্রধান নাট্যাভিনয়, গির্জার বক্তৃতামঞ্চ থেকে দেওয়া ধর্মোপদেশ এবং সাহিত্য।

আমাদের খৃস্টীয় যুগের আরম্ভের দিন থেকেই মহাভারত ও রামায়ণ এই দুটি মহাকাব্য তাদের বর্তমান রূপে হিন্দুদের কাছে পরিচিত।* আমাদের কাছে হোমর রচিত ট্রয় যুদ্ধের বিবরণ।

ম্যালরি রচিত রাজা আর্থারের মৃত্যু যা, প্রথম বইটি হিন্দুদের কাছে হল তাই। অর্থাৎ এই গ্রন্থ হল বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং বীরদের যুদ্ধের বিবরণ। জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কৃতি এবং সকল সাহিত্যকেই 'পবিত্র ধর্ম' গ্রন্থের মর্যাদা দান করার কল্যাণ, হিন্দুদের জীবন গঠন এবং উচ্চাভিলাষকে রূপ দানে আজও মহাভারতকে প্রবলতম প্রভাব বলে গণ্য করা হয়।

মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ যদি হয়ে থাকে, তাহলে সে যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্ট জন্মের প্রায় পনেরশ বছর আগে। অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নাম ছিল কুরুক্ষেত্র। দিল্লীর কাছে যে বিরাট সমতলভূমিতে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলির মীমাংসা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র তারই মধ্যে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বহু শতাব্দী ধরে ভ্রাম্যমান চারণের দল সারা ভারতে এই মহাযুদ্ধের কাহিনী গান করে শোনাত এবং নতুন কোন বিষয় তাদের সৃষ্টি শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, মূল কাহিনীর কোন বিশেষ সময়ে একজন নায়ক যেন অপরের কাছে প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানটি বলছে—এইভাবে সেটি বলা হত। এই ভাবে সমগ্র মহাকাব্যের মর্মবস্তু ভগবদ্গীতা (কোন কোন পণ্ডিত বইটি ইংরেজীতে অনুবাদিত নাম দিয়েছেন গসপেল অব দি ভাগবতম বা ভাগবতের সুসমাচার) এক সঙ্গে দুটি নাটক উপস্থাপিত করে। অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যুদ্ধের প্রাক্কালে দুই

*এই অধ্যায়ে মহাভারত ও রামায়ণের কাল সম্বন্ধে মতামত শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের।

বিবদমান বংশের বীর নায়ক এক পক্ষের এবং তার রথের সারথি নরদেহে নারায়ণ কৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথন গীতায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যে কৌশল অবলম্বন করে কথোপকথনটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা গেল তা হল, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠীর একটির প্রধান এক বৃদ্ধ অন্ধ রাজা কয়েক মাইল দূরে বসে আছেন এবং উদ্বেগাকুল রাজার সন্নিধানে অবস্থিত অন্য এক ব্যক্তি কথোপকথনগুলি যেমন যেমন হচ্ছিল, তেমন তেমন ভাবে যোগবলে বা আধিদৈবিক শক্তির সাহায্যে প্রতিটি কথা বলে যাচ্ছেন।

তেমনি পঞ্চপান্ডবের বনবাসকালে একদিন দিবস শেষে এক ঋষি সাবিত্রীর চমৎকার কাহিনীটি যুধিষ্ঠিরকে বলেন।

খৃষ্টের তিন চার শতাব্দী পূর্বে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি যখন মহাভারতের একটা রূপ প্রদান করেন, সেই সময় উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত অর্ধেকেরও বেশি গল্প এই ভাবে প্রায় বস্ত্র বয়নের পদ্ধতিতে মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে যায়। এর পর দুই বা তিন শতাব্দীর মধ্যে মহাভারতের মূলকাহিনীর ঘটনাবলীর প্রায় পনেরশ বছর পরে মহাভারত তার সংশোধিত চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মহাভারতের কাহিনীতে যে শ্রেষ্ঠ-মহাকাব্যের প্রতিটি লক্ষণই বর্তমান সেটা সহজেই দেখা যায়। চারণ এবং দেশের মানুষের কল্পনা শত শত বছর ধরে এই মহাকাব্যে কথিত গল্পগুলিকে পরিণত রূপ প্রদান করেছে। সেগুলি সরল, স্পষ্ট এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। যে জাতি তখনও আত্মসচেতনতার স্বপ্ন দেখছে না, এমন এক জাতির হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে গল্পগুলি উৎসারিত এবং বর্ণিত হয়েছে। তারা যদি পরম আন্তরিকতায় পূর্ণ না হয়, তবে তারা কিছুই নয়।

ইলিয়াড এবং অডিসির সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখব মহাভারতের গঠন তেমন পরিণত নয়, তেমন বেশি গড়ে পিঠে তাকে পরিপাটি করে তৈরী করা হয়নি, তার আকার কেমন যেন ছাড়া ছাড়া মত; কিন্তু তা অধিকতর দীপ্তিসম্পন্ন, এবং অধিকতর আবেগে পরিপূর্ণ। ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে একজন বড় লেখকের কথার উদ্ধৃতি সহকারে বলা যায়, "বর্ণাঢ্যতার মধ্যে সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়।"

ভারতের দ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণ সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক ততটা প্রযোজ্য নয়। একটি ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবধারা সমগ্র রামায়ণের মধ্যে প্রবাহিত। সীতা এবং রামের বনে নির্বাসনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই মহাকাব্য বৌদ্ধ

যুগের প্রথম দিকে যখন তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে, সে সময়টা মহাভারতের খুব পরে নয়। অনুমান করা হয় যে বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে, সন্ন্যাসীর জীবন এতই মর্যাদা এবং সম্মানের ছিল, যে জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি দায়দায়িত্ব ও সুখের মিশ্রণে ভরা গৃহাশ্রমের চেয়ে সন্ন্যাসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হত। আদর্শের ক্ষেত্রে এর অবশ্যম্ভাবী রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া অযোধ্যার রাজবংশের যুবরাজ এবং তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলির সংগে রাজধর্ম ও প্রেমের সর্বাপেক্ষা কাম্য বিষয়গুলি এই দম্পতির মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। এই বলিষ্ঠ এবং সরল শান্ত কাহিনী সরাসরি জনসাধারণের হৃদয়ের সংগে কথা কয়। আজও পর্যন্ত রামায়ণের চরিত্রগুলির চেয়ে অন্য কোন চরিত্র জনসাধারণের এত ভালবাসা পায়নি এবং সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যিনি অযোধ্যার রানী ছিলেন, সেই সীতার ক্ষুদ্র কমনীয় হস্তের চির-প্রাণবন্ত স্পর্শের চেয়ে অন্য কোন শক্তি ভারতের নারীত্বের আদর্শ গঠনে এত সহায়ক হয়নি।

তাহলে রামায়ণ হল একটি প্রেমের গল্প যা খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে বিকাশ লাভ করে পুষ্পপল্লবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের সূক্ষ্মতা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এবং জীবনের জটিল ব্যাখ্যার দিক দিয়ে সেই গোড়ার দিকের যুগের অন্য সব প্রেমকাহিনীর তুলনায় রামায়ণ অন্য ধরনের। কারণ যদিও যুগে যুগে মানব চরিত্রের অতি অল্পই পরিবর্তন হয়, তবু আমরা মানুষের সাহিত্যিক আত্মচিন্তা এবং আত্মপ্রতিফলনের একটা সুনির্দিষ্ট বিকাশ দেখতে অভ্যস্ত। আমরা আশা করি যে আদিম কাব্য ঘটনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এবং সরল মহিমা সহকারে নিয়তি-নির্দিষ্ট ভাগ্য অভিমুখে অগ্রসরমান নরনারীর চরিত্রের রূপরেখাগুলি অঙ্কিত করবে। উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তির জীবনের পানপাত্রে তিক্ত-মধুরের মিশ্রণ আমরা আদিম কাব্যে অন্বেষণ করি না। আমরা মনে করি যে, এ যাবৎ সাহিত্যের অগ্রগতি মুখ্যতঃ একটা নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মানুষের পার্থক্য ও পরিবর্তনের তীব্র ও প্রগাঢ় ভাবে বর্ধমান উপলব্ধির রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং এই রকম একটা উক্তি করার সময় আমরা "অগ্রগতি" শব্দটি থেকে উন্নতির সকল অর্থ বাদ দিই, কারণ হোমর চিরকালই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ব্রাউনিংয়ের চেয়ে বড়। জাতি যেমন দৃঢ় পারিবারিক এবং গোষ্ঠীগত ছাঁচ বা নমুনা থেকে সর্বত্র ব্যক্তিরূপে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আমরা শিল্পে তারই একটা সাদৃশ্য মাত্র দেখতে পাই। ইউরোপে যাকে "আধুনিক ভাব ও মানস" বলতে আমরা প্রস্তুত, তা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর গুণগুলির এমন এক উপলব্ধি যা মনকে আচ্ছন্ন

এবং অভিভূত করে ফেলে। যখন ভারতীয় মহাকাব্যগুলির সঙ্গে আরও বে পরিচয় হবে, তখন এই নামটি আর টেঁকবে কি না সেটাই একটা প্রশ্ন; কারণ বিস্ময়ের কথা হল যে, তাদের প্রাচীনত্ব সত্বেও এবং বিষয়বস্তু বীরধর্মসমন্বিত হও সত্বেও মহাকাব্যগুলি ঠিক এই গুণ ও লক্ষণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বিশেষ করে রামায় যখন একটি ঘটনা অন্য ঘটনার পথে পরিচালিত করে, তখন আমাদের বুঝতেই যে, এতো আমাদের আনন্দ বিধানের কাহিনী নয়। এ হল আমাদের চোখের সাম এক নারীর আত্মা উদ্ঘাটনের কাহিনী নয়। ত্যাগের দুরারোহ পথ থেকে আর দুরারোহ পথে তিনি উঠে চলেছেন এবং তার আত্মা আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটি হচ্ছে।

জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে কেবল তাঁরাই যে হয় এর নাটকের সুডোল বৃত্তাকৃতি এবং গঠনবিন্যাস ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু রামায়ণ যিনি খুব উপরে উপরে ভাসাভাসা ভাবে পড়বেন মহাকাব্যের অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কমনীয়তা তাঁকে বিমুগ্ধ করবেই।

আজ রামায়ণ সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্পবস্তুর চেয়েও বেশি কিছু। এখনও মহাকাব্য জনসাধারণের কল্পনা বিকাশের একটা মাধ্যম এবং উপায়। এর বিভি লিখিত রূপের কোন একটির অপরটির সঙ্গে মেলে না। রামায়ণের কাহি শুনিয়ে সকল শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়, অথচ সংস্কৃতে রচিত মূল রামায়ণ পড়তে সক্ষম লোকের সংখ্যা খুব কম। এই জন্য বিভিন্ন সময়ে বড় বড় কবি বিভি ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ লিখেছেন, যেমন কৃত্তিবাস লিখেছেন বাংলা ভাষায় তুলসীদাস লিখেছেন হিন্দীতে। বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন করে কবিরা বড় বড় নাটক রচনা করেছেন, যেমন ভবভূতির সীতার বনবাসাশ্রিত উত্তররামচরিত অথ মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য।

কাহিনীর বিভিন্ন আকারে গল্প ক্রমেই আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ কর মানুষ স্বামী এবং রাজা রূপে রামের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা বিভিন্ন কবি রচিত সং রামায়ণেই স্পন্দিত এবং অনুরণিত হয়। এই শ্রদ্ধা হয়তো প্রকাশের নানা অন্বেষণ করতে পারে, কিন্তু তা কখনও এ কথা স্বীকার করে নেবে না যে, রাম বর্ণিত বিষয় কোন কালে আদর্শের চেয়ে নূ্যন ছিল। অথচ আমাদের রাখতে হবে সেই আদর্শ প্রাচীন প্রাচ্য ভাব অনুযায়ী বিবৃত হয়েছে, পাশ্চাত্য অনুযায়ী প্রকাশ লাভ করে নি। কর্তব্যের যে ধ্যান-ধারণা সমাজকে ব্যক্তির বহু উর্ধ্বে স্থাপন করত এবং আদর্শ রাজাকে নিজের বা তার স্ত্রীর সুখের

চিন্তা না করে প্রজাদের মংগলবিধান প্রবৃত্ত করাত, এ হল সেই কর্তব্যবোধের অংগ স্বরূপ। সাধারণের মঙ্গলার্থে সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ স্বামী-স্ত্রীর দুজনের পক্ষে যতটা সম্ভব, তাদের একজনের পক্ষেও ঠিক ততটাই সম্ভব—এইটে স্পষ্ট করে পুরোপুরি দেখিয়ে দেওয়ার ফলেই রামের বিবাহ অত সফল ও সম্পূর্ণ। সীতার মৌন সম্মতি তো তাঁর বিশ বৎসরের নীরব নির্বাসনেই দেওয়া হয়েছিল। এক আঞ্চলিক কবি বলেছেন যে, নির্বাসনকালে সীতা একবার তাঁর বনবাসের স্থান দিয়ে স্বামীকে যেতে দেখেও নীরব রইলেন। যদিও এই ঘটনাটি মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, এবং এটি পরে যোগ করা হয়েছে, তবু এই সংযোজন মূল কাব্যের অভিপ্রায় আরও সুপরিস্ফুট করে তোলে, কারণ মূল রামায়ণে সেই বিশ বৎসরের প্রতিটি মূক মুহূর্ত স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীর মৌন সম্মতিকে কথার চেয়ে উচ্চরবে ঘোষণা করে।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদকদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই সব প্রাচীনা ধাত্রী এবং পিতামহীমাতামহীরা যাঁদের কোলে বসে কবিরা প্রথমে এই মহাকাব্যের কাহিনী শুনেছিলেন। প্রকৃত ঘটনা স্মরণ করে বলার সময় আমরা যেমন যে যার নিজের মত করে বলি, তেমনি প্রতিটি উপাখ্যানের এমন নিজস্ব রূপ দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা কবিদের ছিল। যাতে গল্পটি সতেজ এবং প্রাণবন্ত থাকে এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে কাহিনীর বর্ণের পরিবর্তনগুলি বিশদভাবে বোধগম্য হয়।

মহাকাব্যের বিষয়ের উপর গোষ্ঠীচেতনার এই ক্রিয়া উপলব্ধি না করলে রামায়ণের কোন পূর্ণাংগ সমালোচনা হতে পারে না, কারণ এ থেকেই কাহিনীর নব নব রূপ ও অনুলেখন জন্ম লাভ করেছে। মোটামুটি এইভাবে প্রাচীন গল্পটি বলা হয়ে থাকে।

বহু পূর্বে বীরদের যুগে অযোধ্যায় এক রাজবংশ রাজত্ব করত। এই বংশে রামের জন্ম হয়। রামের বিশাল হৃদয়, তিনি নয়নাভিরাম। জনকনন্দিনী সীতার সংগে রামের বিবাহ। সীতা ছিলেন সকল মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং পূতচরিত্রা। সেকালের রাজকুমারদের শিক্ষণীয় সকল বিদ্যা এবং ক্রীড়াকৌতুক রাম আয়ত্ত করেন এবং সেকালের প্রথা অনুযায়ী এক মহর্ষির তত্ত্বাবধানে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গিয়ে বাস করেন। তারপর গৃহে ফিরে সীতার সংগে তাঁর বিবাহের পর তাঁর পিতা দশরথ এবং কৈকেয়ী নামে দশরথের এক রানীর মধ্যে মতান্তর হয়। কৈকেয়ীর বাসনা যে তাঁর ছেলে ভরত রাজা হন এবং

তিনি বলেন যে রাজা এক সময়ে তাঁকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তিনি যা চাইবেন তাই তাঁকে রাজা দেবেন। এই বিবাদ বার্ধক্যে তাঁর পিতার জীবনকে তিক্ত ও বিড়ম্বিত করছে জানতে পারা মাত্র রাম প্রতিজ্ঞা করে বললেন যে, তিনি সিংহাসনের অধিকার পরিত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবেন। তিনি বললেন তাঁর এই প্রতিজ্ঞা তাঁর বিমাতা কৈকেয়ীর আনন্দ বিধান করবে এবং এর ফলে তাঁর ছোট ভাই ভরত রাজ্য এবং রাজ্যের ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবেন বলেই তিনি সানন্দে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়েছেন। সীতা রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে স্বামীর প্রতিজ্ঞার সঙ্গে নিজের বনগমনের প্রতিজ্ঞা যোগ করলেন এবং রাজপুরী ত্যাগ না করার জন্য স্বামীর সকল অনুরোধ ও মিনতি সত্ত্বেও সংকল্পচ্যুত হলেন না। ভাই লক্ষ্মণ বললেন, যে তিনিও বড় ভাইয়ের বিচ্ছেদ সহ্য করবেন না। তাই তাঁরা তিনজন একসঙ্গে বনে গেলেন। কিছুদিন পরে ভরত বনে গিয়ে তাঁদের জানালেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি অবিচারে শোকাহত বৃদ্ধ রাজা প্রাণত্যাগ করেছেন। ভরত কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি; তাই তিনি রামকে মিনতি সহকারে বললেন যে, রাম ফিরে গিয়ে তাঁর নিজের রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু রাম বললেন যে, প্রতিজ্ঞার কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না, তবে চৌদ্দ বৎসর কেটে গেলে তিনি ফিরে গিয়ে রাজত্ব করবেন। তখন ভরত খুবই অনিচ্ছাভরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন কিন্তু যাবার সময় তিনি রামের দুটি পাদুকা নিয়ে এই কথা বলে গেলেন যে, এই পাদুকা দুটিই সিংহাসনে স্থাপিত হবে এবং তিনি পাদুকাতলে উপবেশন করে তাঁদের নামে রাজ্যশাসন করবেন।

বনবাসকালে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের জীবন মৃদু স্বভাব। ঋষিদের জীবনের মত চলতে লাগল। অরণ্য এবং অরণ্যজীবন সম্পর্কে তাঁরা এমন জ্ঞান লাভ করলেন যে, অরণ্যচর হিংস্র জীবজন্তুও তাঁদের ডাকে সাড়া দিত। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণ কখনও তাঁদের বীরধর্ম বিস্মৃত হন নি; বিপদাপন্ন আর্তের সেবার জন্য তাঁরা সর্বদাই ধনুর্বাণ ও অসি হস্তে প্রস্তুত থাকতেন। বীরধর্মপ্রণোদিত এক অভিযানেই তাঁরা এক রাক্ষসীর ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং রাক্ষসীর শক্তিশালী আত্মীয় লংকা বা সিংহল দ্বীপের রাজা দশানন রাবণকে তাঁদের শত্রু করে তোলেন। এটা হতে বাধ্য যে, যে সব প্রাচীন কবি রামের কীর্তি কাহিনী গান করে ফিরতেন, তাঁদের কেউ কেউ পৌরাণিক অতিকথার এই রাবণ চরিত্র নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করবেন এবং তার সঙ্গে জড়িত সকল কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। তাই, হোমরের ইলিয়াডে হেক্টর ও হেক্টরজায়া এণ্ড্রোম্যাকী যেমন সর্বাপেক্ষা সুন্দর

চরিত্রগুলির মধ্যে পড়ে, তেমনি এই ভারতীয় কাব্যে অন্ততঃ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে রাবণ-পত্নী মন্দোদরী সবচেয়ে দৃঢ় চরিত্রগুলির মধ্যে একটি। আজও পর্যন্ত বৃদ্ধারা গল্প প্রসঙ্গে এমন একটি ঘটনার কথা বলেন, যা এই কাব্যের কোন প্রকাশিত রূপের মধ্যে কোন ক্রমে প্রবেশ লাভে সক্ষম হয় নি, তাঁরা বলেন যে, রাম যখন তার শত্রু দশাননকে জয় করে তার প্রাণ সংহার করলেন, তখন বিধবা মন্দোদরীকে আর কিছুতে শান্ত করা যায় না। এই সময় মন্দোদরীকে বলা হল যে, তাঁর স্বামীর চিতাগ্নি না নেভা পর্যন্ত তিনি বিধবা হবেন না এবং রাবণের চিতার আগুন চিরকাল প্রজ্বলিত থাকবে। সেইজন্য দুকানে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করলেই আমরা রাবণের চিতাগ্নিশিখার গুরু গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পাই।

কাজে কাজেই রাবণের দ্বারা অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করার জন্য রামকে এই দুষ্ট রাজার প্রাণ সংহার করতে হয়। সীতা হরণের কাহিনী গ্রীক পুরাণের রসাতলাধিপতি প্লুটো কর্তৃক প্রসারপাইন হরণের গল্পের মতই সুন্দর।

বনে দিন শেষ হয়ে আসছে। সীতা কুটিরে একা। বিশ্বের সমগ্র গল্প সাহিত্য 'সর্বাপেক্ষা ভদ্র' শীলযুক্ত বীরদের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মণ সীতার সনির্বন্ধ অনুরোধে রামের অন্বেষণে গিয়েছেন কিন্তু যাবার আগে তিনি প্রথমে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে সীতাকে ঘিরে তিনটি দণ্ডী কেটে দিয়ে সীতাকে ঐ চিহ্নিত স্থানের বাইরে পা দিতে নিষেধ করে যান। সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। এমন সময় গৈরিকবসনধারী জটাজুটসমন্বিত এক সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষা চাইলেন। সীতা বিনীতভাবে বললেন, বেলা ইতিমধ্যেই পড়ে এসেছে, কুটিরে তিনি একা, কাজেই সন্ন্যাসী আজ যদি ফিরে যান, তাহলে ভাল হয়। সন্ন্যাসী বললেন, সীতা যদি বাইরে এসে তাঁকে কিছু খাদ্য ভিক্ষা দেন, তাহলেই তিনি চলে যাবেন। সীতার মন অনিষ্টের আশংকায় পূর্ণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দয়া আশংকাকে জয় করল। ভিক্ষা দেবার জন্য তিনি মন্ত্রপূত গণ্ডীর বাইরে পদক্ষেপ করলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে রাবণ নিজরূপ ধরলেন এবং সীতাকে হরণ করে রথে তুলে নিয়ে নিজের রাজ্যে প্রস্থান করলেন। যাত্রার ভয়াবহ সেই প্রথম ক্ষণে সীতা তাঁর অলংকারগুলি গোপনে মাটিতে ফেলে দেন, যাতে পরে সেই অলঙ্কার দেখে তাঁর যাত্রা পথ খুঁজে বার করতে পারা যায়।

বনবাসে তাঁর পর্ণকুটিরের দীর্ঘ ছায়াগুলির মধ্যে দণ্ডায়মান, এবং অতিথি সৎকারের অভিলাষ ও নারীত্বের অদৃশ্য রক্ষাকবচসমূহের মধ্যে সংগ্রাম নিরত

এই নির্বাসিতা রানীর চিত্র নিঃসন্দেহে কোন মহান চিত্রশিল্পীর অংকনলেখনী বা তুলিকার উপযোগী।

সীতা বহু বৎসর লংকায় অবরুদ্ধ ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের উষর প্রান্তর এবং অরণ্যভূমিরূপে বর্ণিত অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে রাম-লক্ষ্মণ সীতার সন্ধান পান। সীতার সন্ধান লাভ এবং শেষ পর্যন্ত সীতা উদ্ধারে সাফল্যের জন্য তাঁদের পরম মিত্র বানর সেনাপতি হনুমানের সহায়তার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। অনুমান করা হয় যে, রামায়ণের কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি যদি থাকে, তাহলে হনুমান বলতে কোন শক্তিশালী আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিনায়ককে বোঝায়। যাই হোক তিনি আজ শিষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রতীকরূপে স্বীকৃত। রামের প্রতি ভক্তিতে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। রামের সেবায় তিনি শিশুর দ্বিধাহীন বশ্যতা এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিভা নিয়োগ করেন। তাঁর এবং লক্ষ্মণের চোখের সামনে সীতা নিজেরই প্রস্তাবমত তাঁর চরিত্রের কলংকহীনতা প্রমাণের জন্যে অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং মৃত্যুকালে হনুমান বলে যান যে, দেখা যাবে তাঁর হৃদয়ে রাম-সীতার নাম লেখা আছে।

এখন রাজ্যে ফিরে যাবার সময় হয়েছে এবং রাম সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে পরম সুখে প্রায় এক বছর রাজ্যশাসন করলেন। তারপর সীতা সম্পর্কে প্রজাদের সন্দেহের প্রতি রামের শ্রদ্ধার ফলে তাঁদের জীবনে বিচ্ছেদের গভীর সংকট ঘনিয়ে আসে। সীতা দূর বনে চলে যান এবং সেখানে বৃদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করেন এবং রামকে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল একা অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করতে হয়। মাত্র একবার রাম তাঁর বিচ্ছেদজনিত ক্ষতির কথা বলেছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান একা করা যায় না, সস্ত্রীক করতে হয়; সেইজন্য প্রজারা রামকে নতুন রানী আনার কথা বলে, কিন্তু এইবার রাজার ক্রোধ অগ্নি শিখার ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। না, সীতার স্থানে অন্য কোন নারী আসতে পারে না। সেইজন্য স্বর্ণসীতা নির্মাণ করা হয় এবং এই স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তি যজ্ঞের যথানির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে সীতার ভূমিকা গ্রহণ করে।

বনে আগমনের কিছুদিন পরেই নির্বাসিতা সীতা দুই যমজ পুত্রের জননী হন তাঁদের পালক বাল্মীকি তাদের রাজকুমারের মত করে লালন পালন করেন; তবে নিজের মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনী তিনি বালকদ্বয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের জননী যে জীবিত নেই, এ ধারণা সৃষ্টি হতে তিনি দেন। ছেলে দুটির

বয়স যখন প্রায় কুড়ি বছর, সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে অযোধ্যার রাজসভায় বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মহর্ষি নির্বাসিতা সীতা এবং তাঁর পালিত ছেলে দুটিকে গায়ক হিসাবে নিয়ে অযোধ্যায় যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

গল্পের বাকি অংশ অবশ্যম্ভাবী। যুবক দুটি যখন রামের সমক্ষে তাঁরই অতীত কীর্তিকাহিনী গান করছে তখন রামের দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়। বাল্মীকিকে ডেকে তিনি আশাহীন ঔৎসুক্যের সঙ্গে সীতার নাম উল্লেখ করলেন। বৃদ্ধ মহর্ষি সীতাকে রামের সামনে আনলেন এবং সীতা স্বামীর সমক্ষে মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করলেন। যে মুখ বিশ বছর প্রীত চিন্তায় পরস্পরের কাছে অবিরত উপস্থিত ছিল। পরস্পরের সেই মুখের দিকে রাম ও সীতা চেয়ে আছেন, ঠিক সেই ক্ষণে প্রজাদের সন্দেহের গুঞ্জন আবার শোনা গেল এবং রব উঠল "সীতার অগ্নিপরীক্ষা হোক।"

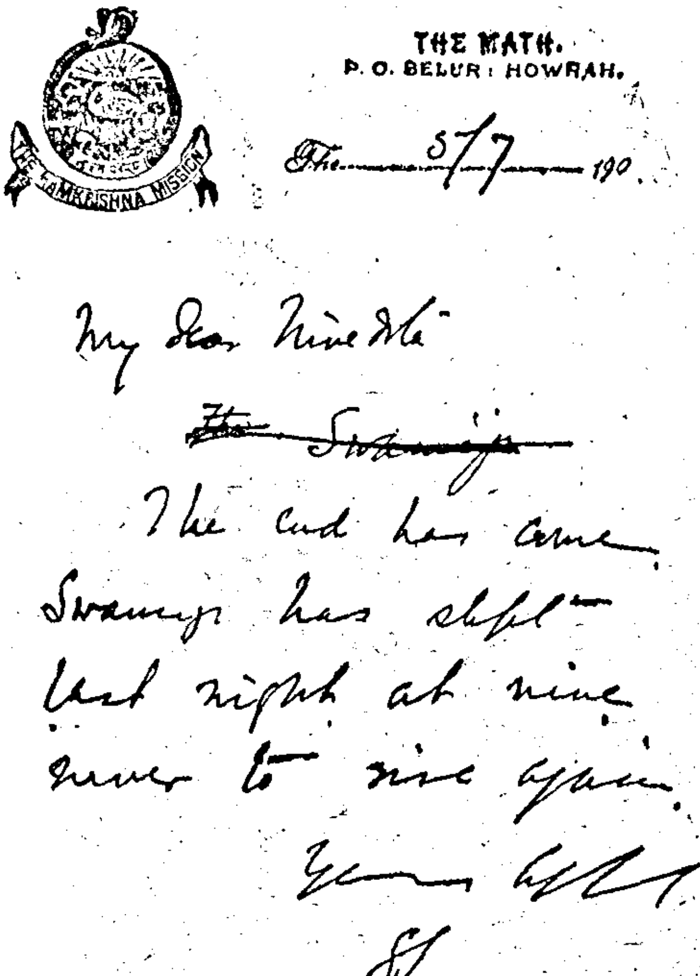
নারীর আত্মসম্মান এই নূতন অপমান সহ্য করতে পারে না। আত্মমর্যাদাদৃপ্ত, নীরব, অকলঙ্ক সীতা মৃত্যু চাইলেন। তাঁর কথায় ধরণী দ্বিধা হলেন, এক রথ আবির্ভূত হল এবং জননী ধরিত্রী বাহুবন্ধনে আবদ্ধ সীতা মানুষের পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। পুত্রদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করা পর্যন্ত রাম অযোধ্যায় রইলেন, এবং তারপর বনে চলে গেলেন। মানুষের কাছে তিনি চিরতরে হারিয়ে গেলেন।

মহাভারতের গল্প এত সহজে বলা শক্ত। বীরযোদ্ধার দল, সুন্দরী রমণীকুল, মহান সাধুসন্ত সবাই মহাভারতের ঘটনামঞ্চের বর্ণাঢ্য দৃশ্যে যাওয়া আসা করছেন। স্থানীয় বর্ণের প্রলেপ এত সমৃদ্ধ যে তা প্রায় দোষের সামিল হয়ে উঠেছে। সামাজিক প্রথা, পারিবারিক আরাম সুখস্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচীন বর্ম প্রভৃতির গঠন এবং এই ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় মহাভারত পরিপূর্ণ। কিন্তু চরিত্রের ধ্যানধারণার যে রূপ মহাভারতে প্রকাশিত, সেইটেই এই মহাকাব্যকে গভীর তাৎপর্য দান করেছে। ইংলন্ডের রাজা আর্থার যেমন মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ বীর, এখানে ভীষ্মও তেমনি এক চরিত্র। তাঁর বীর ধর্মে কোন খুঁত, কোন ত্রুটি নেই; তার মনের পবিত্রতা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। রাজা আর্থারের সভার সবচেয়ে অকলঙ্ক চরিত্র সম্পন্ন বীর হলেন স্যর ল্যান্সলট, তবে তাঁর চরিত্রেও শেষ দিকে খুঁত দেখা দেয়। মহাভারতে রয়েছেন তরুণ রাজা যুধিষ্ঠির যাঁকে আরও "মহিমান্বিত" ল্যান্সলট বলা চলে। তাঁর এক মাত্র দোষ হল, ভুল ধারণা সৃষ্টি ও ভুল পথে পরিচালনার একবার মাত্র অর্ধসত্যের আশ্রয় গ্রহণ। ভারতীয়

খৃষ্ট কৃষ্ণও নৃপতি এবং নেতা রূপে বিরাজমান। তাঁর এই রূপ এবং কর্মকাণ্ডের দরুণ ভারতের মানুষ তাঁকে পূর্ণ অবতার আখ্যা দিয়েছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের মধ্যে একটির সন্তানসংখ্যা একশর একজনও কম নয়; কাজেই চরিত্র এবং ঘটনার বাহুল্য বিচারের দায়িত্ব কল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবু সকল চরিত্রের রচনা ও বিকাশে কয়েকটি মূল উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ আত্মার যে অদৃশ্য শৃঙ্খলে আমরা সকলে বাঁধা কবি-ইতিবৃত্তকারের দৃষ্টি তার উপরেই নিবদ্ধ। তিনি বিরাট ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন বলে মনে হলেও, তিনি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না যে, তিনি বিভিন্ন আত্মার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত এবং সেই সব আত্মার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বহির্বিশ্বের উপর কি ভাবে আপতিত হয়েছে—তা দেখানই তাঁর কাজ।

একটি গল্প খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তরুণ রাজকুমারেরা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করছেন এবং মাটিতে গড়া একটি পাখী লক্ষ্যস্থলে রাখা হয়েছে। তাঁরা কি লক্ষ্য করছেন —গুরু একে একে প্রত্যেক রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা কি দেখছেন। তাঁরা উত্তর দিলেন—"একটা পাখী", "একটি শাখার উপর অবস্থিত পাখী।" এই রকম আরও সব জবাব এল। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজকুমারদের মধ্যে বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন। অর্জুন উত্তর দিলেন, "একটা পাখীর মাথা এবং সেই মাথার মধ্যে কেবল তার চোখ।" ভারতের বালকবালিকাদের কাছে এই কাহিনী বলার ক্ষণটি আবেগে এবং চাপা উত্তেজনায় ভরে ওঠে, কারণ হিন্দুদের চোখে মর্যাদা, সম্মান, সাহস এবং যে কোন প্রকার বীরত্বের মধ্যে মহত্বের যে পরম প্রকাশ প্রতিভাত হয়, জাতির সেই সর্বোচ্চ আদর্শই এই কাহিনীর মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীষ্ম একটি অতি সূক্ষ্ম দাবি পূরণ করেন। ভীষ্ম চরিত্র নৃপতি এবং বীর রূপে পরিকল্পিত। বীর ধর্ম বলতে বহু আঘাত হানা, বহু দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা মনে পড়ে এবং বিবিধ ভিন্নমুখী স্বার্থ রক্ষাই রাজধর্মের কাজ, কিন্তু পরিপূর্ণ উৎকর্ষ চায়, যে কোন কিছুই নিজের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হবে না। এই সব সম্বন্ধের সঙ্গে জড়িত হয়েও মানুষের পক্ষে চরিত্রে যে মহত্ত্ব অর্জন করা সম্ভব, তা দেখানর জন্যই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ভীষ্মকে দিয়ে তার জীবনের প্রারম্ভে রাজ্যের উত্তরাধিকার এমন কি বিবাহের অধিকার পর্যন্ত ত্যাগ করান হয়। ফলে ভীষ্মের পিতা তাঁর মনোমত কন্যাকে বিবাহ করার এবং ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী করার স্বাধীনতা লাভ করেন।


THE MATH.
P. O. BELUR : HOWRAH.

The 5/7 190

My dear Nivedita

~~The Swamiji~~

The end has come. Swamiji has slept last night at nine never to rise again.

Yours affly
SS

এক ঐতিহাসিক চিঠি—ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে লেখেন স্বামী সারদানন্দ

পিতা এবং রাজার বিশেষ অধিকারগুলি ভোগ করতে অস্বীকার করার পর, ভীষ্মকে দিয়ে এই সময় থেকে পিতা এবং রাজা দুইয়েরই দায়িত্ব বহন করান হয়, এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব গৌরব এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে তাঁর বধের বিধান সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন তিনি নিজের মুখে তাঁকে পরাজিত করার উপায় বলে দেন। সেই জন্য ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে আমরা এমন এক জাতির সৃষ্টি কর্মের পরিচয় পাই, যারা ইতিমধ্যেই বাসনা বিরহিত মনোভাবকে নৈতিক মহত্ত্বের একটা প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে বিবেচনা করতে শিখেছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম যতদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ততদিন তিনি সেই পক্ষের সেনাপতি ছিলেন, যাদবের উদ্দেশ্যকে তিনি অধর্মজাত বলে মনে করতেন। এটা আমাদের চোখে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে কিন্তু উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এর পূর্ণ সঙ্গতি আছে। যুদ্ধ নিবারণের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হবার পর তিনি তাঁর রাজার আদেশ মেনে তাঁর স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হলেন। ভারতের মহাকবি ভীষ্ম চরিত্র অঙ্কনের সময় দেখাচ্ছেন যে নিজ পক্ষের নিশ্চিত পরাজয়ের অতিপ্রাকৃত লক্ষণাবলী দেখে, তিনি যুদ্ধকালে সমূহ পরাজয়ের কথা জেনেও একটিও কম বা একটিও বেশি শরসন্ধান করেন নি বা আঘাত হানেন নি। অনুরূপভাবে কৃষ্ণ সম্পর্কেও বলা হয় যে, ন্যায়ধর্মের খাতিরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ সর্বতোভাবে চেষ্টা করলেন এবং তারপর উভয়পক্ষই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন; কিন্তু জীবন সম্পর্কে কৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই প্রশান্ত যে, তিনি ব্যাপারটিকে একটি নৈতিক পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। তিনি বললেন যে, এক পক্ষকে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী দেবেন; এবং অপর পক্ষে তিনি নিজে থাকবেন কিন্তু অস্ত্রধারণ করবেন না। দুপক্ষকেই তিনি দুটি প্রস্তাবের একটি বেছে নিতে বললেন। এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তির লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ জাতিসমূহকে যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করতে উদ্যত, বিরাট বাহিনীর বদলে দিব্য পুরুষকে নিজের সহায়রূপে বেছে নেওয়ার মত আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি তার থাকবে না; এবং সে কৃষ্ণকে সহায়রূপে বেছে নেয়ওনি।

একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের সম্পর্ক বিচার এবং যা আমাদের প্রত্যেককে তার নিয়তির উপর সবলে নিক্ষেপ করছে, ভিতর থেকে ক্রিয়াশীল সেই অপ্রতিরোধ্য নিয়তিকে বিরোধিতাপূর্ণ আচার-আচরণের মধ্যে উপলব্ধির জন্য হিন্দুদের চেষ্টাই এই ধরনের গল্প দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়ে দেয়। হিন্দুদের যে সহনশীলতা পর্যবেক্ষকদের এত হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, তার প্রকৃত রহস্য এই চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। হিন্দুদের মধ্যে যে কখনও ধর্ম নিয়ে অত্যাচার হয় নি তাই নয়, অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী বা খৃষ্টান প্রচারক—এরা সবাই ঈশ্বর এবং দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী পুরোহিতের মতই মন্দিরের সোপানে দাঁড়িয়ে অবাধে প্রচার করতে পারে। ইউরোপে

এই লক্ষণটির সঙ্গে তুলনীয় লক্ষণ দেখা যায় প্রতিভাশালী নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকে মধ্যে, যাঁরা পরস্পরবিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্য এমনভাবে উপস্থাপিত করতে সক্ষম যাতে দুপক্ষই আমাদের সহানুভূতি সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু গুণটি আমাদের মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যতিক্রমরূপে দেখা দিয়েছে, এবং এটা আমাদে মনের একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব নয়। মহাভারতে কৃষ্ণের শত্রু শিশুপালে গল্পে বোধ হয় বিপরীত ও বিরোধী ভাবের সমন্বয় সবচেয়ে নিখুঁতভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। শিশুপালের মা কৃষ্ণের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে একশত অপরাধ করলেও, কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষমা করবেন কিন্তু শিশুপালের চরম অপরাধের সময়, তাঁর শত অপরাধের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। শ্রে বীরকে সম্মান প্রদানের এক অনুষ্ঠানের সময় ঘটনাটি ঘটে। নররূপে নারায়ণ কৃষ্ণে ইতিমধ্যেই শ্রেষ্ঠ বীররূপে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যজ্ঞের বলি যে তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত হবে তাও বলা হয়েছে। শিশুপালের কৃষ্ণবিদ্বেষের মূল বহুদূর বিস্তৃত। কাছে এ প্রস্তাব অসহ্য এবং তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রতিবাদ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন অর্থে কৃষ্ণকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে? সভায় কি ভীষ্ম উপস্থিত নেই, যুধিষ্ঠির কি মহারাজ নন? এঁদের একজনকেই শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হোক।

এই নিদারুণ অপমানজনক উক্তিতে স্তম্ভিত এবং হতবাক হয়ে সবাই ঐ দুষ্কৃতকারীর শাস্তিবিধানের আশায় ভীষ্মের দিকে চাইলেন; কিন্তু বৃদ্ধ কুলপিতামহের মুখ অবতার শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফেরান। তারপর সবাই যখন উৎকণ্ঠায় কাল গণনা করছেন, তখন সেই মহিমান্বিত বীরের পিছন দিক থেকে বিষ্ণুর উজ্জ্বল চক্র সহসা বিদ্যুতের ন্যায় আবির্ভূত হল এবং শিশুপালের শিরস্ত্রাণে আঘাত হেনে শিশুপালের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ভূতলে পাতিত করল। আর কি বিস্ময়ের কথা, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে পাপী শিশুপালের আত্মা তার দেহ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিশিখার ন্যায় নির্গত হয়ে কৃষ্ণের পদতলে পতিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল। প্রাচীন ইতিবৃত্তকার বলেছেন, "ঈশ্বর সম্পর্কে নিয়ত চিন্তা করলে ভগবানের শত্রুও মুক্তিলাভ করে।" পরের এক ব্যাখ্যায় ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব কোন এক যুগে এক মহান ও প্রবুদ্ধ আত্মা শাপগ্রস্ত হন —অর্থাৎ ভাগ্যচক্রে পথভ্রষ্ট হয়ে এমন একটা অবস্থায় পড়েন যে, তাঁকে মানবজন্ম গ্রহণ করতে হয়। দয়াময় ভগবান করুণা পরবশে তাঁকে পথের নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, ভগবানের মিত্ররূপে নরজন্ম গ্রহণ করলে, তাঁর মুক্তিলাভ করতে সাতজন্ম লাগবে, এবং শত্রুরূপে জন্মলাভ করলে, তিন জন্মেই তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন। তিনি অবিলম্বে দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নিলেন। এক জন্মে তিনি হলেন রামের শত্রু রাবণ; দ্বিতীয় জন্মে এক অত্যাচারী রাজা; এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল, যিনি মৃত্যুর পর পুনরায় অনন্ত স্বর্গসুখের অধিকারী হন।

সাহিত্যে খুব কম চরিত্রই তরুণ বীর কর্ণের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আসন পাবার যোগ্য। অস্ত্র পরীক্ষার সময় কর্ণকে তাঁর সূতবংশে জন্মের জন্য অপমান করা হল। এই অপমানে ক্রোধে ক্ষোভে কর্ণ ফেটে পড়েছেন, কিন্তু বীরধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। যে বৃদ্ধ সূত অধিরথ তাঁর পিতা বলে পরিচিত, তাঁকে দেখামাত্র রাজকুমারদের প্রশংসা ধ্বনির মধ্যে কর্ণ তাঁর পাদবন্দনা করেন। পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীও স্পন্দনশীল মানবতাবোধে পূর্ণ। তিনি সুন্দরী এবং দৃপ্তচরিত্রা হলে কি হবে, অন্য সব নারীর মতই কথা গোপন রাখতে তিনি অক্ষম এবং তাঁর বিচারবুদ্ধিহীন গর্ব অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ হবার পূর্বেই ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডবের স্বরূপ প্রায় প্রকাশ করে দিয়েছিল আর কি। এইরকম চরিত্রগুলির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল তাদের বাস্তবমুখিতা। এদের মধ্যে অবিশ্বাস্য কোন মহিমা নেই; তারা বীর হলেও, আমাদের আর পাঁচজনের মতন তাদের প্রকৃতিতেও দোষগুণের টানাপড়েন রয়েছে।

ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ যেন প্রাচীন নরওয়ের কোন বীরের মৃত্যু। রণক্ষেত্রের যেখানে তিনি ভূমিশয্যা লাভ করেন, সেখান থেকে তাঁকে সরানর প্রস্তাব তিনি মানেন না এবং ধনুর্ধর বীরের উপযুক্ত শয্যা এবং উপাধান দিতে বলেন। তরুণ বীর অর্জুন তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পেরে ভূমিতে শরনিক্ষেপ করে ভীষ্মের ইচ্ছা অনুযায়ী শয্যা এবং উপাধানের ব্যবস্থা করে দেন এবং সেই শরশয্যার উপরেই ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করেন।

এইগুলি হল হিন্দু-পরিবারের আদর্শস্থানীয় কিছু কিছু চরিত্র। "ভগবানের চরণ বন্দনায় নিমগ্ন" ছোট মেয়েটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার গৃহকোণে বসে প্রার্থনা করে, "সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব।" বিদ্যালয় থেকে যে বালকটি হাড়াহুড়া করে বাড়ী ফিরেছে, তার প্রতিটি কথা ও কাজ হয়তো অর্ধেক কৌতুক ও অর্ধেক প্রশংসা মিশ্রিত ভাবের সঙ্গে যুধিষ্ঠির অথবা লক্ষ্মণ, কর্ণ অথবা অর্জুনের কথা মনে করিয়ে দেবে। পরিবারের প্রতিটি লোকের মনোমত এই রকম এক একটি চরিত্র থাকে এবং তাকে যদি গল্পটা বলতে বলা হয়, তাহলে তার মনোমত সেই চরিত্রটিকে গল্পের কেন্দ্রস্থলে দেখা যাবে। এইভাবে রামায়ণ-কথা বলার সময় কেউ রাবণকে নায়ক হিসাবে উপস্থাপিত করে; আর একজনের মুখ্য চরিত্র হলেন হয়তো হনুমান; কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থে রামসীতাই নায়ক-নায়িকা। নির্বাচিত আদর্শ চরিত্র যে উক্ত চরিত্রের গুণগ্রাহী ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করবে তাতো বোঝাই যায়। অন্যের প্রয়োজন সম্পর্কে নম্র শিষ্টাচার এবং সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার দ্বারা নিজের চরিত্রকে পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ না করে লক্ষ্মণকে শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসা সম্ভব নয়। রাম যার শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, সে পরম অনুগত এবং সতত সেবাপরায়ণ না হয়ে পারে না। ন্যায় বিচারই যুধিষ্ঠিরের ভক্তের হৃদয়ের অধিপতি।

ভারতের দর্শন যে মহাকাব্য রচনার পূর্বেই পূর্ণতা লাভ করেছিল, মহাভার ভীষ্ম-চরিত্র এবং রামায়ণের সীতা চরিত্রই তার প্রমাণ। কিন্তু আমাদের মনে রাখ হবে যে সেই দর্শন সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল সারা জাতি কেন যে এইসব ধারণা স্বীকার করে নিয়ে, সেগুলিকে স্বাগত জানিয়ে তার ব্যাখ্যা এই থেকেই পাওয়া যায়। সীতার পতিপ্রেমের কাহিনীটি ধরা যা পূজার দ্বারা পূর্ণ বনবাসের দীর্ঘ দারিদ্র্যক্লিষ্ট বৎসরগুলি তাঁর প্রেমকে পবিত্র করে তো এবং এইভাবে প্রেমের প্রতিষ্ঠার পর তিনি রাবণের পরুষ অত্যাচার সহ্য করেন লঙ্কায় বন্দিনীর জীবনযাপন করেন। প্রতিক্ষণে তিনি রামের নাম জপ করেন শেষ পর্যন্ত যে তাঁকে উদ্ধার করা হবেই তাঁর এ বিশ্বাস কোনদিন টলেনি। তিনি নিজেই অগ্নিপরীক্ষার কথা বলেন এবং অদম্য সাহস সহকারে অগ্নিপরীক্ষ উত্তীর্ণ হয়।

তাঁর অল্পকালস্থায়ী একটি বছরের মধ্যে, জায়া, মহিষী, এবং ভবিষ্যৎ মাতারূ পার্থিব সকল সুখই তিনি ভোগ করেন এবং প্রজানুরঞ্জনকল্পে তাঁর স্বামীর ক প্রতিজ্ঞা দ্বারা পুনরায় গৃহ থেকে বিচ্যুত হবার জন্যই যেন সে সুখ তাঁর জীবনে আসে মৌন প্রেমের বিশবৎসরব্যাপী নীরবতার মধ্যেও তিনি তাঁর সেই প্রেম সম্পূর্ণভ বজায় রেখেছিলেন যে প্রেম তাঁকে বনে নির্বাসনের সময় রামের সঙ্গিনী হতে প্র করেছিল; অথচ সন্দেহের গুঞ্জনবাহিত অপমানে তিনি যখন প্রাণ বিসর্জন দে তখন তাঁর নারীত্বগর্ব পরম মহিমায় প্রকাশ লাভ করে। আমরা আবছা আবছা বিশ্বাস করি যে, ত্যাগের শক্তিই মানুষের জীবনকে আমাদের জানা অন্য সকল প্র জীবন থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু ত্যাগের যে ধারণায় এত পরীক্ষা, এত কঠোর, তা আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে। স্পষ্টতঃই আত্মশৃঙ্খলাবিধা নিয়ন্তা রূপে কোন দর্শন এর পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল, তা-না হলে লেখনী এত নির্মম হতে পারত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, সেই দ জাতির হৃদয় এবং কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে জীবন্তরূপে বিরাজ করত, তা না হলে সীত রাম এত ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র হতে পারতেন না।

এই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে আশ্রয় এবং পথনির্দেশ লাভের পূর্বে, ভারতে জী কেমন ছিল, সে বিষয়ে আমরা বৃথাই প্রশ্ন করি। কারণ ভারতের জীবন সেই সব স্বপ্নের সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে পড়েছে যে, তাদের আবির্ভাবের পূর্বে যে উদয় হয়েছিল, তার সকল চিহ্নই আজ অবলুপ্ত। সেই স্বপ্নগুলি দেশের প্রতি অ সমাজের সকল শ্রেণী-শিক্ষার প্রতি স্তরে পরিব্যাপ্ত।

নিশাগমের সময় পার্বত্য অঞ্চলে এক শস্য ব্যবসায়ীর ক্ষুদ্র উন্মুক্ত কুটিরে এ পর্যটক দেখবেন, ছোট একটি প্রদীপের সামনে এক বালক তার গুরুজনদের স্থানীয় ভা রচিত রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছে। কাব্যের প্রতি স্তবকের পর তারা মাটিতে মাথা ঠেক

গেয়ে উঠছে, "সীতাপতি রামজী কি জয়।" শহরের দোকানদার খরিদ্দারকে জিনিসপত্র দেবার সময় কত পাল্লা জিনিস হল, তা এইভাবে গুণতে থাকে, "রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন" এবং ওজন হয়ে গেলে, আবার পূজার স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়। শোনা যায়, যে পরপর বার বার এই পুণ্য নাম উচ্চারণ করার ফলে এক ব্যক্তির হৃদয়ে এমনই ভাবের উদয় হয় যে, সে তখনই উঠে পড়ে, সংসার ত্যাগ করে। বজ্র গর্জনের ফলে আতঙ্কিত নারী 'সীতারাম' উচ্চারণ করে এবং শববাহকেরা 'রামনাম সৎ হ্যায়' এই ধ্বনির তালে পা ফেলে অগ্রসর হয়।

সাধারণ লোকের জন্য দর্শন যা কোনকালে করতে পারত না। মনুসংহিতা যা অল্প লোকের জন্য অল্প পরিমাণে করেছে, মহাকাব্যগুলি অগণিত যুগ ধরে সেই কাজ করে এসেছে এবং আজও সকল শ্রেণীর জন্য করে চলেছে। মহাকাব্যগুলি মানুষকে অবিরত ভাবে "হিন্দুতে পরিণত করে চলেছে", কারণ তারা হল জীবনের সেই রূপ, আচার-আচরণের সেই ধারণা, সংহিতা মতবাদ ও তত্ত্ব যাদের কেবল সংক্ষিপ্ততম সারটুকুর পরিচয় দিতে অক্ষম, অথচ যাদের দিকে প্রতি হিন্দু বালকবালিকার আশা এবং প্রচেষ্টা পরিচালিত করা অবশ্যই প্রয়োজন।

আমরা পরিবর্তনহীন প্রাচ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে অভ্যস্ত। এই শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও, ভ্রান্তধারণাও বহুল পরিমাণে রয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হিন্দু সমাজের একটা মস্ত বড় লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, এদেশের লোক তৎপরতার সঙ্গে একটা বিদেশী সংস্কৃতির রূপ গ্রহণ করে এবং সেই সংস্কৃতির সন্তানদের সঙ্গে সমান শর্তে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এমন কি সুযোগ থাকলে শিল্পক্ষেত্রেও, এই জাতির বুদ্ধি দিয়ে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা দেখে আমরা বিস্মিত হই। আমরা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, ব্যাবিলন এবং নিনেভের সমান প্রাচীন চিন্তা ও মতকে পরাভূত এবং ধ্বংস করার পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর আঙুলের ইশারাটুকুই কি যথেষ্ট ? কোন মতেই নয়। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি মাটির উপরকার স্তরের চেয়ে গভীর নয়। প্রাচ্যের উদ্ধত মনোভাবের মূলই হল এই যে, নবীনদের সামাজিক এবং জ্ঞানগত পরীক্ষা থেকে, অথবা নূতনতর জাতির মধ্যে যা চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করবে। মানসিক পরিচ্ছদের তেমন পরিবর্তন থেকেও, তার শঙ্কার কোন হেতু নেই ; কারণ প্রাচ্য সভ্যতা ব্যক্তিকে নীতিবাদী করে তোলার দিকেই তার চেষ্টা সতত প্রয়োগ করে এসেছে এবং এদিক দিয়ে প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গঠন ও রূপ থেকে মূলতঃ স্বতন্ত্র, কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রীতি ও প্রণালী বস্তুর সর্বাপেক্ষা দক্ষ এবং ফলপ্রদ ব্যবহার করার চেষ্টা করে এসেছে। সামরিক, বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক এই তিন সমবেত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বহুসংখ্যক লোককে সার্থকভাবে সুসংবদ্ধ করে প্রতিকূলতাপূর্ণ ভূখণ্ডে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করার মত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ আলেকজাণ্ডার সুসম্পন্ন করেছিলেন। সেই আলেকজাণ্ডারকে যদি পাশ্চাত্য

প্রতিভার আদর্শস্থানীয় পুরুষ বলে গণ্য করা হয়। তাহলে প্রাচ্য প্রতিভার সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে বুদ্ধকে ধরতে হবে, কারণ পরম ত্যাগের এবং আত্মার দ্যুতির সুস্পষ্ট এবং তীব্র আবেগসমন্বিত ধারণাই হল হিন্দু জীবনের সেই গোপন উৎস, যাকে ঘিরে হিন্দু গৃহ ও সংসার রচিত হয়। মহাকাব্যগুলি এই ধারণাগুলির জনপ্রিয় বাহন; এইগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় সভ্যতাকে তার অটল অস্তিত্ব প্রদান করেছে, এবং সেই কারণেই পরীক্ষার কোন পাঠ্যক্রম, কোন বিদেশীর করুণাসঞ্জাত অনুপ্রেরণা, কোন বিদেশীর প্রশংসা অথবা অবজ্ঞা, জাতীয় শিক্ষার মর্মস্থলে এক বিন্দু স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টির আশা করতে পারে না।

যে লোককাহিনীগুলি মহাকাব্যগুলিকে বেষ্টন করে পুরাণসমূহে এবং অন্যান্য সাহিত্যে বৃদ্ধি লাভ হয়েছে, ধর্মে ও আচারে নিষ্ঠাবানদের মধ্যে সেইসব লোককাহিনীর চর্চা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়গুলি কিন্তু কাহিনীগুলি সহজেই বাতিল করে দিতে উদ্যত। অথচ সকলেই মহাকাব্যগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন। সেগুলি যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ বহন করে—একথা উপলব্ধি করতে কারও ভুল হয় না, এবং সেই হেতু কাব্যগুলি অপরিবর্তনীয় উপাদানরূপে বিরাজ করতে থাকে। জীবনের সকল মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার মত মহাকাব্যগুলিও বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করা যায়। হোমরের ইলিয়াডে মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয় একিলিসের ক্রোধ বা—দান্তের 'প্রায়শ্চিত্ত-স্থানে অবতরণের' বা এই রকম যে কোন কাব্যের চেয়ে এই মহাকাব্যগুলির ভাবধারা জীবনে ঢের বেশি প্রয়োগ করা হয় এবং সেইজন্যই তারা ঐশ্বর্য হিসাবে আরও বিরাট, আরও সমৃদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়

আভিজাত্যের মর্যাদা : ভারতীয় বর্ণের আলোচনা

'জাতি' শব্দটির সঠিক অনুবাদ না হওয়ার কারণে যে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে তার চেয়ে গভীরতর কিছু সচরাচর দেখা যায় না। এই ভাবটির ইংরাজি প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব এই অনুমান এমনধারা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু রহস্যময় ও অভূতপূর্ব ব্যাপার আছে। এটি ধর্মীয় না সামাজিক প্রথা তাই ভেবেই লোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই সংস্কারকদের কাছে দাবি জানায় এই প্রথার সঙ্গে সংগ্রামের। সমস্ত বিষয়টিই হয়ে ওঠে অস্পষ্ট ও বিরক্তিকর।

অথচ এই শব্দটির উপযুক্ত প্রতিশব্দ আমাদের সব সময়েই আছে এবং সেই সমার্থকটি এর খুবই নিকটতর, কারণ আমাদের সেই শব্দটি নীতি ও সুরুচির মধ্যে বিংকিত সীমারেখাটিকে প্রকাশ করে। জাতি বা বর্ণকে 'মর্যাদা' বলেই অনুবাদ করা উচিত ছিল। এটি সত্য যে প্রাচ্যের রহস্যময়তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ এই ধারণাটিকে নিশ্চিত দৃঢ়তা দান করেছে, এই বিষয়টিকে নিয়ে তার বিশ্লেষণ যেমন গভীর তেমনি তীক্ষ্ণ।

সৎ বা অসৎ এই বিবেচনার চেয়ে সামাজিক অভ্যাসের দ্বারাই আমাদের আচরণ সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বিষয় নিয়ে যখন নীতিগত সংগ্রামের বন্যা বয়ে যায়, তখন আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের অর্ধেক পরাজয় ঘটে গেছে। কেন আমার বন্ধুর খোলা চিঠি আমার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরাপদ, যদিও তাদের প্রদত্ত তথ্য সম্বন্ধে আমি জানতে ইচ্ছুক? কেন এক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ অন্য বিষয়ে ব্যবহার করা চলে না। যখন সাধারণ বুদ্ধি ও উপযুক্ততার সকল নিয়ম সেটি করা উচিত বলে দাবি করে? যে কোন মূল্যে সত্য বলার প্রচেষ্টাকে কে স্বীকার করবে? যখন আমি রেগে যাই তখন কেন আমি মেছো-বাজারের কুৎসিত ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করি না? এর প্রতিটি প্রশ্নে কেউ হয়তো কিছুটা রাগতভাবে জবাব দেবে যে কথাটা হচ্ছে মর্যাদার কিংবা এটা হচ্ছে একজনের শ্রেণীগত আচরণ।

তবু যদি আমরা মর্যাদার সুবিধাগুলি পরীক্ষা করি দেখব, জাতিচ্যুত করার বিরল ক্ষমতার বেশি কিছু এর বিপক্ষে নেই। চার্চ ধর্মচ্যুত করে, আইন বন্দী করে, কিন্তু সমাজ অপরাধীর শুধু পথ বন্ধ করে দেয়। তবু এই তিনটির ভেতর কোনটি সবচেয়ে গভীর আঘাত দেয়? এটা লন্ডনের পক্ষে যেমন সত্য, তেমনি বারাণসীর পক্ষেও যে জাতপাতের বিধি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার শেষতম ও সূক্ষ্মতম উপায় কারণ এটি সেই নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকর হয়, যখন বিচারপতিরা ব্যর্থ হন। এটি সেই অপরাধগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়, যার জন্যে কোন বিচারক সাজা দিতে পারেন না। এটি মানকে উন্নত করে এবং সেই গুণগুলি দাবি করে, যা প্রতি মানুষ তার অহংকারের মাত্রা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবে এবং তা সত্ত্বেও কেউ নিজে এটা পূর্ণভাবে সার্থক করেছে বলে মনে করতে পারে না। ধীশক্তির আলোড়ন একবারও সৃষ্টি না করে ওই সবই এটি করে। সবকিছু করার পরে মানুষ অলাভজনক সেবক হিসাবেই থাকে। কারণ সময়মতো ঋণ পরিশোধ (সকল ঋণই মর্যাদার ঋণ) করাকে কেউ গণনা করে না, মহানুভবতা নামে কোন কলংকের দাগ ফেলে না, যে নৈতিক নিয়ম আত্মসম্মানের উপর গড়ে উঠেছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মতোই। আমরা বলি এই জিনিসগুলির কারণ হচ্ছে আমাদের জন্ম বা রক্ত বা লোকের কাছে আমাদের অবস্থা। এ কথা সত্য যে এগুলি পূরণ না করলে বিবেকের উপর এক দাগ থেকে যাবে এবং এটিও সত্য যে মর্যাদার বাধাবাধকতা পূরণ করার প্রচেষ্টা অবশ্যই হবে একজনের আন্তরিকতার

আশু পরীক্ষা, যে সাধারণের চেয়ে মহত্তর ভক্তি ও আন্তরিকতার জীবন-যাপনে ইচ্ছুক। তথাপি বর্ণ আর ব্যক্তিগত পবিত্রতা এক জিনিস নয়, এবং সম্ভবত এই কারণে এ দাবি ও সুবিধাগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হচ্ছে ভারতে সন্যাস-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

আভিজাত্যের মর্যাদার আমাদের পাশ্চাত্য ধারণা সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য আছে। নিজের ভাবপ্রবণতাকে ব্যাখ্যা করার মতো ব্যক্তি খুব কম হতে পারে, সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সত্য পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেক শ্রেণীরই তাদের নিজস্ব মর্যাদা আছে। যদি কোন মর্যাদাসম্পন্ন মনিব তাঁর কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তা করতে বাধ্য বলে অনুভব করেন তাহলে মর্যাদাসম্পন্ন কর্মীরাও সমানভাবে অনুভব করবে তাদের মনিবের ব্যাপারে মুখবন্ধ করে থাকা এবং তাঁর আদর্শের নামে আবেদন করলে তাতে সাড়া দেওয়া। পুরোহিত তাঁর জীবিকার সম্মানের সঙ্গে এক গোয়েন্দার জীবিকার সম্মানের বিরোধ দেখতে পারে, কিন্তু উভয়েরই বিশ্বস্ততাকে সমস্ত জগৎ সম্মান করবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক দ্বারা তাঁর আদর্শের কার্যকর উপলব্ধি মাঝে মাঝে ক্ষমা প্রদর্শনের সঙ্গে জড়িত হতে পারে, এমন কি খুব গুরুতর অপরাধেও, যদি তিনি ধারণা করেন ক্ষমাই হচ্ছে সংশোধনের শ্রেষ্ঠ প্রভাব, যা তিনি সেই মুহূর্তে জারি করতে পারেন। ব্যবসায়ীর পক্ষে এই একই প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হবে ন্যায় ও কষ্টকর শাস্তি বিতরণ, যেহেতু শৃংখলা, সংহতি ও অবিচল সহযোগিতা—চরিত্রের উন্নয়ন নয়—তাঁর লক্ষ্য। এইভাবে প্রত্যেক মানুষ জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তার সমকক্ষদের বিচারই নীরবে আহ্বান করে এবং অন্য সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে।

জাতিবিভেদের দুর্বলতা সর্বত্রই বহুপ্রকার। কারণ ব্যক্তির মতো সমাজও সর্বদা অর্থ ও শস্যের উপর অংশ দাবি করতে পারে এবং আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি অবহেলা করে। কিন্তু এর সবচেয়ে ব্যর্থতা শুধু শহীদরাই সচরাচর লক্ষ্য করে। সে হচ্ছে কাকদের দ্বারা পরিত্যক্ত সাদা কপোত, তার অর্থ হচ্ছে, নিম্নবর্ণের অভিমত দ্বারা বিচার করা উচ্চবর্ণের সমাজের এক সদস্য। এখানে আমরা পাই সমাজের কাজের উপর সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের একটি বিষয়, ঠিক যেন ছেলেদের ঝগড়ার মধ্যে প্রধান শিক্ষক তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছেন। কারণ মর্যাদার প্রকৃত ধারণার .. এটি প্রয়োজনীয় যে প্রতিটি বর্ণই হবে স্ব-শাসিত। বর্ণের প্রকৃত ব্যর্থতা সেই.. ঘটে, যেখানে ব্যক্তির বিবেকের চেয়ে সমাজের অভিমতকে এটি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, যাতে তার উন্নতির শক্তি বাধাগ্রস্ত হয় এবং সে সম্পূর্ণ মানব বা সামাজিক.. প্রকৃত উপকারক কমই হয়ে ওঠে। মোটামুটি ভদ্রলোকরূপেই থাকে—যে ... আমাদের মধ্যে খুব অসাধারণ নয়। কারণ আমরা গণ্য করতে পারি যে ... আদর্শই মানুষের কাছে ততদূর উপকারী, যতদূর সেইগুলি মানুষের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন...

সাহায্য করে এবং যে মুহূর্তে সেগুলি তার নিজের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাকে প্রকাশ করার কম সক্ষম করে তখন সেগুলি ক্ষতিকারক। অতএব তারই শহীদ হওয়া উচিত যে প্রকৃত এই বর্ণভেদের শিকার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নায়ক নয়।

আমরা সবাই জানি, এটিই হচ্ছে প্রকৃত বিপদ। কোন প্রোটেস্টান্ট কখনও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে তার ধর্মীয় নীতিকে তুলে ধরেনি? কোন ক্যাথলিক কখনও আধ্যাত্মিকতার উপরে আরামকে স্থান দেয়নি? কোন রাজনীতিবিদ নীতির চেয়ে দলের পক্ষপাতী নয়? কোন বিজ্ঞানের ছাত্র কখনও নতুন সত্যের প্রতি বিরূপ হয়নি? যদি আমরা বাইরে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে কি দেখি না যে কেবলমাত্র গতানুগতিকতা ভঙ্গকারী বলেই একজনের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব নেই? কোথায় আমরা দেখি না যে লোকেরা কোন আচরণ তাদের কাছে বিরক্তিকর হলেও মেনে নিচ্ছে শুধু এই কারণে যে বিরোধীতায় তারা অসুবিধায় পড়বে।

এমন ধরনের ঘটনাগুলির কিছু ব্যাপক ন্যায্যতা দাবী করা হতে পারে, যেমন কিছু পরিস্থিতি আছে যেখানে কয়েক ব্যক্তির স্বাধীনতা সমষ্টির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিত্যাগ একান্ত প্রয়োজনীয়। আর বিনা কারণে নিয়ম-আচার স্বভাবগত ভাবে লংঘন করা বোধহয় ঠিক মতোই বিবেচনা করা হয় যে সেটি দস্যুতার মতোই অসামাজিক কার্য। যাহোক, শেষ আশ্রয়রূপে সামাজিক চাপ সীমার মধ্যেই রাখতে হবে, কারণ মানুষের নিজেকে পরীক্ষা করার অধিকারে কিংবা তার স্বাধীনতার মূল শোষণ করায় কোন কিছুরই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আর সমাজ হচ্ছে অনির্দিষ্ট দায়িত্বহীন বিচারক, যার নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি এত কম স্পষ্ট যে সে প্রায়ই ভুল করে পথিকৃৎদের নতুন অভিযান সম্পর্কে এবং মহাপুরুষদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপের আদেশ দেয়, যাঁদের স্মৃতিফলক ও সমাধি তাঁদের উত্তরপুরুষদের দ্বারা নির্মিত হবে।

সামাজিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ধারা বা অভিপ্রায়ের প্রশ্নটিই আইনরূপে অবশ্যই পরিণত হবে, যার দ্বারা সকল সন্দেহজনক বিষয়ের বিচার করা হবে। আর নিজেদের লোক দ্বারা এই বিষয়টি নির্ধারণ করা কখনই সহজ নয়, হিন্দু জাতির ব্যাপারে তাদের অতীত ক্রমবিকাশের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট। এমনকি মনুর বিধানে চোখ বুলালেই দেখা যায় যে ভারতীয় সমাজ প্রাচীন জাতীয়-সম্পদ সংস্কৃত-সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য বিরাট সহযোগিতায় একত্রিত হয়ে আছে।

এই অনুভূতি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে যখন শুধুমাত্র বেদগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন ছিল এবং বিভিন্ন অংশের ভারপ্রাপ্ত পরিবারগুলিকে সম্প্রদায়ের উপর সর্বপ্রকারে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো, যাতে সর্বশক্তি ভারপ্রাপ্ত কর্তব্যের প্রতি নিয়োগ করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণের পদতলে লুটিয়ে পড়ার, তাকে ভোজন করানোর

মহাপুণ্য এবং তাকে হত্যা করার মহাপাপ ভয়—এগুলির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ওটাই। ওই সব কার্যের দ্বারা মানুষ নয়, জাতীয় সংস্কৃতিই বিনষ্ট হয়।

যত যুগ কেটে যায় উপনিষদ ও অন্যান্য বিষয়গুলি এই ভাণ্ডারে যোগ করা হয়, যা কিছু এতকাল মুখস্ত করে রাখা হতো তা লিখে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেদ হয়ে ওঠে শাস্ত্র—আর তখন মনস্তত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতের প্রণালীগুলি আর্যদের সম্পদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল, সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে এক হয়ে গেল। এটাই সংস্কৃতির ধারণাকে ব্যাপক করে তুলল প্রশ্নটির সামাজিক সম্পর্কে উদার না করে এবং ব্রাহ্মণ বর্ণকে সকল বিদ্যার স্বাভাবিক কর্তারূপে গণ্য করা চলতেই থাকল, প্রাচীন ধর্মীয় সংগঠনকে এখনও আদর্শ বলে মানা হতে থাকে।

যদি আমরা প্রশ্ন করি কেমন করে এটা ঘটল যে আর্যজাতিরা অতি প্রাচীনকালেই সংস্কৃত লিপির ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, তাহলে তার উত্তর মাত্র একটিই হতে পারে। তারা অন্যান্য ও অশিক্ষিত জাতির উপস্থিতির মধ্যে নিজেদের দেখতে পেল। এই বিষয়টি আমাদের সাধারণভাবে নিয়ে আসে সুদৃঢ়রূপে বিভক্ত বর্ণগুলির উৎপত্তির প্রশ্নের কাছে। বর্ণের প্রকৃতি হচ্ছে মর্যাদা, যা আমরা দেখেছি, অর্থাৎ এক আদর্শ ভাবপ্রবণতা যার দ্বারা সমাজ নিজেকে কিছু বিপদ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ষা করে, এটি ছাড়া সেই বিপদের বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টেক্সাসের জীবনযাত্রা বহু বৎসর ধরে ঘোড়ার মালিক হওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং ঘোড়াচোরদের হতে নিরাপত্তা কষ্টকর ও কমই ছিল, তারা ছিল সমাজের নজীরহীন ভীতির বস্তু। ঘোড়াচুরি হচ্ছে সর্বোচ্চ অপরাধ যা কোন দুরাত্মা করবে। অনেকে মনে করে ঠিক সেইভাবে গোহত্যা সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাবটি গড়ে উঠেছে। যদি অভাবের সময় খাদ্যের জন্য গোহত্যা করা হয়, তাহলে নতুন করে কৃষিকার্যে অক্ষমতা আসবে এবং তাই বোধহয় গোমাংস গ্রহণে অভ্যস্ত লোকেরা অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু যেহেতু এই দুটি মনোভাব সমগ্র জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, আমরা বর্ণ সম্বন্ধে যা ভাবতে অভ্যস্ত তা ততটা ঠিক নয় যতটা শেষের ব্যাপারে বর্ণের সুস্পষ্ট বিন্যাসের মনোভাবের সঙ্গে জড়িত। ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের প্রতিযোগী শ্রমিক সম্পর্কে 'দালাল' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে আমরা যে ধরনটি চাই, তার এক দৃষ্টান্ত পাই। এখানে আমরা পাই পেশাগত এক গোষ্ঠী তার নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় এক আদর্শ তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করছে। প্রেমের, যুদ্ধের, কর্মের সমগ্র জগৎব্যাপী প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা হচ্ছে খুব শক্তিশালী এক সহজপ্রবৃত্তি। কত কম লোক গুপ্তচররূপে শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয়। ভৃত্য ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীগত-বাধ্যতার অনুভূতি কত শক্তিশালী। এই বস্তুটি ভারতীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই প্রকট, যা প্রায়ই হচ্ছে সহজ বংশগত ট্রেড-ইউনিয়ন। কোন ইংরাজই এত শক্তিশালী নয় বা কোন হিন্দুই এত ক্ষুধার্ত নয়, যাতে একজনকে উৎকোচ দিয়ে

অন্যজনের ব্যবসা গ্রহণ করানো যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোন গোয়ালাকে ঘোড়ার দায়িত্ব নিতে বা কোন রজককে গৃহকর্মে সাহায্যের ভার নিতে আগ্রহী করানো যাবে না।

কিন্তু বর্ণের সম্ভাব্য সকল মূলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং হয়তো সবচেয়ে কুৎসিত হচ্ছে জাতিবোধ, জন্মগত বর্ণভেদ। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই যুক্তরাজ্যে সাদা চামড়ার মানুষ ও নিগ্রোদের যে শত্রুতা বিভক্ত করে এবং আমরা অন্যান্য দৃষ্টান্তও পাই ব্রিটিশ অধিকৃত আমাদের বিশাল স্থানের সর্বত্র, যদিও সেটি কম আলোচিত। বোধহয় আর কোন এমন অমানবিক আবেগ নেই, যা এটির মতন এমন সার্বজনীন সহানুভূতি লাভ করে। কারণ এটি হচ্ছে মূলত সম্মিলন হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এক সবল শ্রেণীর সহজাত প্রবৃত্তি। আর উভয়পক্ষই এই প্রতিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এখানেই আমরা সুদৃঢ় বর্ণভেদের গোপন কথাটি পাই, কারণ শুধু সুদৃঢ় বর্ণভেদ হচ্ছে বংশগত এবং বংশগত বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি।

তাহলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে—যা ভাল মতে অস্বীকার করাও চলে না—যে ভারতবর্ষে আর্য পূর্বপুরুষরা নিজেদের মুখোমুখি হতে দেখেছিলেন এক নিম্নস্তরের ও আদিম জাতির সঙ্গে, যা আমরা আজকের জাতিপ্রথার প্রকৃতি হতে বুঝি যে সমস্যার বস্তুগুলি তাঁরা এমনি ধারাই কম-বেশি পরিষ্কারভাবে ধারণা করেছিলেন।

আমরা অনুমান করতে পারি সেই বস্তুগুলি সংখ্যায় চারটি ছিল ঃ

(১) সবার উপরে তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের কন্যাদের মর্যাদা রক্ষা করতে অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের বিয়ে করার থেকে। সুদৃঢ় নিয়ম হলো যে নিজের জাতির বাইরে বিবাহবন্ধ, এই বিষয়ে কোন স্ত্রীলোককে অসতর্ক হবার অনুমতি যে পিতা ও পরিবার দেবে, তাদের শাস্তি পেতে হবে। বর্তমানকালেও কোন পুত্র যদি নীচ জাতে বিয়ে করে তো নিজেকে হীন করে, কিন্তু কোন কন্যার যদি নীচ জাতে বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সমগ্র পরিবারটিকে জাতিচ্যুত করা হয়।

(২) মনে হয় তাঁরা চেয়েছিলেন আদিম জাতিগুলিকে সংরক্ষণ করতে, একদিকে তাদের ধ্বংস হতে রক্ষা করতে, অন্যদিকে দাসত্ব হতে বাঁচাতে—দুটি সমাধান যা পরে মনে হয়েছিল ওই ধরনের অবস্থায় আর্যদের কাছে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা।

অতএব আর্য জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া ওই আদিম জাতিগুলি শ্রমের কোঠায় তাদের জন্য এক নির্ধারিত স্থান পেল এবং তাদের চেয়ে উন্নত জাতের ঘৃণা দ্বারাই তাদের কাছে জীবিকার নিরাপত্তা রইল।

এই প্রথার আপাত কঠোরতা দেখে আমাদের ভোলা উচিত নয় স্বাস্থ্যজনিত সাবধানতা এর বড় কারণ। আদিম জাতিরা প্রায়ই ছিল বাসী পচা মাংসভোজী এবং

তাদের প্রতিবেশীদের তুলনায় সর্বদাই অপরিষ্কার। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে তাদের সঙ্গে একই জল পানে বিধি-নিষেধ ইত্যাদি থাকবে।

অন্যদিকে সব জায়গাতেই এই জাতি-বিভেদের একটা ভুল হচ্ছে যে অসাম্যকে অনেক কম করা যেতে পারত, তাকেই স্থায়ী করাও এক প্রতিষ্ঠানগত রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিশ্চয় ভোলা উচিত নয় যে ভারতীয় প্রথার ক্ষেত্রে দুটি বৃহত্তর মন্দকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো গেছে।

(৩) আর্যরা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝেছিল যে শুধু তাদের জাতি নয়, তাদের সভ্যতার পবিত্রতাও অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আর্য শব্দটির অর্থই হচ্ছে কৃষি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি—এলিজাবেথীয় যুগের শব্দ ব্যবহারে বলা যায় এক 'ইয়ারার অফ দি গ্রাউণ্ড,'—তাই সে অভ্যস্ত হ'ল এক নির্দিষ্ট ও শ্রমবদ্ধ জীবনযাত্রায় যা তুলনামূলকভাবে অন্যদের ছিল না।

আগুন এবং খাদ্য রন্ধন ও আহারের প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত জীবনের ও প্রতিষ্ঠানের মূলরূপে সহজেই বৈশিষ্ট্য লাভ করে ভারতের মতো এমন এক আবহাওয়ার স্থানে, যেখানে অভ্যাসগুলিকে যে কোন সময়েই খুব সহজ করে তোলা চলে। এগুলিকে কখনও পরিত্যাগ করা চলে না, যদিও এগুলির ব্যবস্থা আজ রাত্রের জন্য একস্থানে করা যেতে পারে এবং পরদিন জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের তলায় হতে পারে।

তাহলে আচার-আচরণ প্রথা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য রাখায় গড়ে উঠল নীচ জাতির সঙ্গে আহারের বিধি-নিষেধ আর তাদের চেয়ে উচ্চবর্ণের আহার্য ও পানীয় স্পর্শের অনুমতি। আর্যের হাতের রান্না আর্য খেতে পারে এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে স্নানের প্রাথমিক নিয়মগুলি খুব কঠোরভাবে প্রতিপালিত হতো।

জাতিভেদের সকল নিয়মগুলি—আর্য ও অনার্যের মধ্যে পার্থক্যের মোটামুটি নীতিগুলি—ক্রমাগত ঘনীভূত হয়ে একই জাতির মধ্যে এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর রীতিমত জাতিভেদ সৃষ্টি করল। এইভাবে তারা তাদের ব্যষ্টিগত চরিত্র হারিয়ে ফেলল।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে রান্নাঘরের এই জাতিবিভেদ, যাকে এক আধুনিক হিন্দুনেতা পরিচ্ছন্ন করে নামকরণ করেছেন 'ছুৎমার্গ', নিন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠল এবং অসবর্ণ বিবাহের নিয়মের চেয়ে আরও সহজে তুচ্ছ সাজা দেওয়ার উপায় হয়ে উঠল। বর্ণবিভেদ ব্যবস্থার ব্যর্থতার কিছু দুঃখজনক দৃষ্টান্তের ঘটনা এখানে ঘটল। তা সত্ত্বেও মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও সত্য রইল এবং কোনক্রমেই তা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল না, এমন কি বহুকাল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও।

(৪) যাহোক, সমস্যার এই চতুর্থ বিষয়টির ধারণাতেই প্রাচীন আর্যেরা মানবতার প্রহেলিকাকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছিল। বোঝা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল যে ভারতের আদিম জাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার

সামাজিক বিকাশ ইতিপূর্ব হতেই বিরাজিত এবং সেগুলিতে সংরক্ষিত করতে হবে ও উন্নতিতে উৎসাহিত করতে হবে।

অবস্থার এই ধরনের উপলব্ধি থেকে গড়ে উঠল অনার্য জাতির দীর্ঘ ও এখনও বর্ধমান স্তর বিভাগ ; যার মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘ কালক্রমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে আর্যদের গণ্ডীর মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এক বিরাট ও ব্যয়বহুল সামাজিক অনুষ্ঠান। কিন্তু যতই আমরা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নামি ততই এটি সহজ হয়ে ওঠে, শেষে বাগদি, বাউরি ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিগুলির মধ্যে প্রায় যে কোন সম্পর্কই স্ত্রী ও শিশুদের পরিচিতির মধ্যে দিয়ে স্থায়ী করা হয়। এই বিষয়ে পাশ্চাত্যের সামাজিক বিকাশের উপর প্রাচ্য টেক্কা দিয়েছে ; কারণ ইউরোপে চার্চকে গণ্য করতে হবে নইলে দুর্নীতি বলে মনে করা হতে পারে, যেটিকে দর্শনের দিক থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে জাতিস্তরে অর্ধসংগঠিত আচরণের রেশ।

যেমন জাতিভেদের প্রকৃতিতে হচ্ছে সামাজিক মর্যাদাই উন্নতির জন্য এক চিরন্তন প্রেরণা ও আহ্বান, এক্ষেত্রে যার অর্থ হচ্ছে দৈনিক স্নানের সংখ্যা বৃদ্ধি, রন্ধনে পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যবস্তুর পবিত্রতা ও দ্রব্যগুণের মানবৃদ্ধি, যা ব্রাহ্মণত্বের সীমার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাবে। এটাই কি প্রকৃত আভিজাত্যের মর্যাদা নয়? এই তথ্যই হিন্দুত্বকে সর্বদা এক সজীব শক্তিশালী বটবৃক্ষের মতো করে তুলেছে, যা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সভ্যতাকে, ব্যাপকতর ও গভীরতর করেছে এবং স্থবির শিলীভূত হয়নি, যা অগভীর পর্যবেক্ষকরা অনুমান করেছিল।

তাহলে এই হচ্ছে জাতিভেদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক চিত্র। এইভাবে উদ্ভূত সমাজ চারটি প্রধান বিভাগের মধ্যে পড়েছিল ঃ

(১) পুরোহিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা—ব্রাহ্মণ ;

(২) রাজকীয় ক্ষত্রিয় শ্রেণী ;

(৩) জীবিকানির্বাহী ব্যক্তিরা ও ব্যবসায়ীরা—মধ্যবিত্ত বা ইউরোপে আমরা যাদের বলি বুর্জোয়াজি ;

(৪) শ্রমজীবী মানুষেরা বা শূদ্রেরা, তাদের সমস্ত বিভাগ সহ।

(দ্বিতীয় বিভাগে শুধু রাজপুত শাখাই এখনও পর্যন্ত টিকে আছে। কারণ মৌর্যবংশের সময় ক্ষত্রিয় শ্রেণী নিজেদের নেতাবিহীন দেখে শোনা যায় বিদ্যাচর্চাকারী হয় এবং বর্তমান কালে নিশ্চয়ই বুর্জোয়াজির মধ্যে বিলীন হয়েছে।)

যাহোক, এই কর্মানুসারে বিভাগ সাম্প্রতিককালে বর্ণভেদের বিষয়ে সবদিকেই উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। পার্বত্য-অঞ্চলে এই দৃশ্য খুব অসাধারণ নয় যে ব্রাহ্মণ মজুরের কাজ করছে কুলিরূপে বা কৃষকরূপে কাজ করছে। এবং সহরে সে পেশাদার পদে বেশির ভাগ আছে। অন্যদিকে ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সক্রিয় সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তৃতীয় বিভাগ, এমন কি চতুর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর নতুন

জাতিগুলির, যা সমানে বেড়ে চলেছে, পুরানোগুলির চেয়ে তাদের শ্রেণীবিভেদ করা অনেক সহজ।

ভারতে এখনও প্রতিটি নতুন সম্প্রদায় মানে এক নতুন জাতি। এইভাবে আমরা পাই মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং আধুনিক সংস্কারবাদী জাতি—এদের মধ্যে সকলেরই এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতিভেদের নীতিতে অবিশ্বাস। কারণ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মুসলমানরা তাদের কৃষক, নাগরিক ও রাজাদের নিয়ে চারটি প্রধান বিভাগের মধ্যে কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত হবে তা কে নির্ধারণ করবে?

ব্যাপার হচ্ছে যদি কোন মানুষের জীবনযাত্রার ধরন তার নিজের জাতির লোকদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে বাকি ভারতীয় সমাজের সঙ্গে কোন বিবাদ নেই। আর জাতির এই স্বাধিকার হচ্ছে সামাজিক নমনীয়তা ও মূলগত সাম্যতার প্রকৃত প্রয়োজনীয় বস্তু। এই বিষয়ের উপর কিছু উক্তির সর্বদাই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন বুদ্ধের বাণী হচ্ছে যে 'যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ'। যখনই ধর্মের কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য বোঝাবার প্রয়োজন হয়েছে, তখনই এই কথাটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিভার পক্ষে এর চেয়ে বিজাতীয় উক্তি সম্ভব নয়। যখন আমরা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ততম ও মহত্তম গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' অধ্যয়ন করি (ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত কাব্যগ্রন্থ, ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংরক্ষিত এবং সারাদেশব্যাপী সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই প্রচারিত), তখন আমরা এক সর্বজ্ঞ মনের অস্তিত্ব অনুভব করি, যে এককালে হিন্দু জীবন নিয়ে চিন্তা করেছিল। বহুযুগ পার হলেও হয়তো বুদ্ধের করুণার কথা বড় হয়ে আছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর এই কোমলতা ও আধ্যাত্মিকতার অগ্নি তাঁকে কৃষ্ণের পরবর্তী স্থানটি দেয়, কৃষ্ণ ছিলেন সর্বদা শান্ত, উদার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয়। হিন্দু সমাজের উপর গীতাকে এক কর্তৃত্বপূর্ণ ঘোষণাকারী বলে আমরা গ্রহণ করব। আর গীতায় সর্বদা এটিই ধ্বনিত হয়েছে যে, 'যে ঈশ্বর লাভ করে, সে প্রকৃত মানুষ', যেখানে সমস্ত জীবন ও দায়িত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় হিসাবে। এইভাবে বলা হয়েছে 'অন্যের কর্তব্য নিপুণভাবে করার চেয়ে নিজের কর্তব্য, সুষ্ঠভাবে না পারলেও, করা ভাল। নিজের কর্তব্যপালনে মৃত্যু শ্রেয়, অন্যের কর্তব্য বিপদ আনে'। আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে বেদ ও উপনিষদগুলির সারাংশ নিয়ে গীতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশেষভাবে রচিত হয়েছে নারী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্য, যাদের উচ্চশিক্ষার অভাব ও এইসব মহৎ শাস্ত্রীয় পুঁথি পড়ার সুযোগ খুবই কম। কিন্তু এর বিষয়বস্তু প্রচারণার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতে আধ্যাত্মিকতাকে সর্বদাই মনে করা হয়েছে সর্বসাধারণের সম্পত্তি এই তথ্যের আর এক সাক্ষ্য হচ্ছে, হিন্দুর 'ধর্ম' শব্দটিই ধর্ম অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ব। এটি খুবই চমকপ্রদ। ধারণার সমস্ত গুরুত্বই বর্ণ, আরও বেশি করে জাতি বা শ্রেণী, থেকে সরিয়ে স্থাপন করা হয়েছে যা মানবসত্তার

মধ্যে সর্বজনীন ও চিরন্তন তারই উপর। আর সর্বশেষে আমরা স্মরণ রাখতে পারি যে হিন্দুধর্মের মহৎ ঐতিহাসিক গুরুরা—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং উপনিষদীয় যুগের অনেকেই —দ্বিতীয় বিভাগ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মানুষ ছিলেন।

না, ব্রাহ্মণরা কোনকালেই কোনভাবে ধর্মের বিশেষ সর্বময়কর্তা ছিল না। তারা ছিল ধর্মের সাধারণ বাহক, কারণ তাদের প্রকৃত কার্য ছিল সংস্কৃত কৃষ্টি নিয়ে এবং সংস্কৃত হচ্ছে জগতে আজ পর্যন্ত উদ্ভূত সবচেয়ে নিখুঁত ধর্মীয় চিন্তার বাহন। কিন্তু 'উপলব্ধি'কে সর্বদাই মনে করা হয়েছে এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় এবং ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ যার মধ্যেই এটি দেখা গেছে, তাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যাহোক, পুরোহিতশ্রেণী নিঃসন্দেহে যে সুবিধা ভোগ করেছে, তার কারণ নিহিত আছে এই সত্যে যে, তাদের ক্ষেত্রে শ্রেণীর আভিজাত্য তাদের সরাসরি উচ্চতম প্রেরণা দান করেছে, যেমন পণ্ডিতের জীবন, দৈনন্দিনের ধরাবাঁধা সত্ত্বেও, সাধুর জীবনের সবচেয়ে কাছাকাছি।

ভারতীয় প্রথায় ধর্মীয় জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর মধ্যে আছে উচ্চতর স্বতন্ত্রতার সকল প্রকার রূপ। তত্ত্বগতভাবে হিন্দু মনের কাছে সকল প্রতিভাই হচ্ছে প্রেরণার ফল, এক প্রত্যক্ষানুভূতি ; ইউক্লিডের গণিত বা মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য হচ্ছে ধর্মীয় চেতনার নির্ভরযোগ্য অভিব্যক্তি যেমন হচ্ছে ফ্রান্সিসের সাধুত্ব। এই প্রণালীতে ব্যাখ্যার ফলের মধ্যে শুধু সাধুত্ব সর্বাগ্রে স্থান পাবে মহত্ত্বের অন্যান্য সাধারণ প্রকাশগুলির চেয়ে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যেমন ভাস্করাচার্যের জ্যোতির্বিদ্যা ও পতঞ্জলির মনোবিদ্যা সুনির্দিষ্ট ও স্বাধীন অবকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। আর সাহিত্যকে পৌরাণিক কাহিনী জোয়ালে বাধা হয়েছিল, যেমন মধ্যযুগীয় ইতালীতে শিল্পকে করা হয়েছিল।

তাসত্ত্বেও অবিস্মরণীয় প্রতিভার সঙ্গে ভারতের যথেষ্ট পরিচয় আছে, আত্মার শ্রেনী হচ্ছে মানবিক সীমার বাইরে, সচরাচর পরিচিতিরও বাইরে। বলা হয় যে মহত্ত্বের চেতনার যে ভ্রাতৃত্ববোধ আছে, তা নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের জন্য সবচেয়ে ভাল যা করতে পারে তা হচ্ছে মুক্তি প্রদান। তাই সামাজিক বাধ্যতা হতে মানুষকে সর্বদা মুক্তি দেওয়া যেতে পারে, যদি সে ভাবের জীবন, আত্মার জীবন-যাপনে বাসনা করে। শুধু এটা দেখা হয় যে সে যদি বিধি না মানে, তাহলে সম্প্রদায়ের উপর বোঝা হয়েও সে যেন না থাকে। তাই যে দাবি করে যে সে জাতির উর্দ্ধে এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, তাকে অবশ্যই পরিবার ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে হবে, তার দৈনন্দিন আহার্যের জন্য মানুষের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে এবং সে ভাল করেই জানে যে কোন লেখাপড়ার কাজে—যেমন বারাণসী ও জয়পুরের মানমন্দিরগুলিতে—হিন্দু সরকার অন্তত তাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করবে। সামাজিক সংগঠনের সুবিধা যতক্ষণ একজন

গ্রহণ করবে, ততক্ষণ তার আচরণবিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা অযৌক্তিক বলে গণ্য করা হয় না।

এই ত্যাগই হচ্ছে সন্ন্যাস, সাধকজীবনের ভারতীয় রূপ, এবং এই সন্ন্যাস সর্ব জাতির জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত, এর বিরুদ্ধে সব যুক্তি খণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে মনে করা হয় যে যখন জীবনের সব দায়িত্বপালন শেষ হয়ে যায়, যেন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সংসার পরিত্যাগ করা এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ওই অবস্থায় কাটানো। উত্তর ভারতের কোন অঞ্চলে 'ত্যাগী মেথর' বা সাধু দেখতে পাওয়া যায়, যারা জন্মেছে সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে।

তত্ত্বগতভাবে সাধু হচ্ছে সারা জগতের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে আহারে প্রস্তুত এবং আধ্যাত্মিকতা ও আত্মসংযমের ফলে সেখানে এই বোধ জাগ্রত হয়েছে, ভারতের প্রতি হিন্দু মানবপ্রেমিকের এই ভিক্ষান্নকে প্রসাদস্বরূপ মনে করে। এটাও খুব স্বাভাবিক যে সাধুদের পূর্বাশ্রমের জাতি জিজ্ঞাসা না করেই তাদের হাত হতে আহার্য গ্রহণ করা হয়।

পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে এই সবের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহকর বিষয় হচ্ছে একদিকে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত জাতি আর অন্যদিকে সকল জাতির ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকারীর মধ্যে যে প্রভেদ মেনে নেওয়া ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার মধ্যে এর চেয়ে চমকপ্রদ আর কিছু নেই। বাংলাদেশে পারিবারিক পুরোহিত হয়তো স্বীকৃত শিক্ষক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব প্রতি পুরুষ ও নারী নীরবে সেই মুহূর্তে পরিত্যাগ করবে, যখনি তারা খুঁজে পাবে কোন মহাত্মাকে (সংসারে বা সংসারের বাইরে, স্বামী, শিশু বা আশ্রমবাসী সাধুও হতে পারে, সাধারণত কোন যোগীই হন) যিনি তাদের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে উদ্বুদ্ধ করবেন ; তারপর পুরুষ বা স্ত্রী যাই হোন, তিনিই হন গুরু বা শিক্ষক এবং এই সম্পর্ক জীবনের মূল সত্য হয়ে ওঠে।

এই নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব, যখন তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা ঘটাবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হন, সকল নতুন জাতির ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের কারণ হয়। শিখজাতি এইভাবে পর পর গুরুদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মে সকল জাতিকেই আহ্বান করেছিলেন এবং তার দ্বারাই তাদের পক্ষে উত্থান সম্ভব করেছিলেন। ধাঙররা এত নীচ জাতি যে হিন্দুধর্ম বা মুসলমান ধর্ম কোনটিকেই নিজস্ব বলে দাবি করতে সাহস করছিল না, তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগরিত করেছিলেন গুরু নানক ও লালবেগী মেথর—শেষোক্তজন তাদের নিজেদের শ্রেণীর সাধু ছিলেন।

প্রচারকের আবির্ভাব হয় এবং তিনি নতুন ভাবধারা ঘোষণা করেন। তিনি নিজের চারপাশে সমবেত করেন সকল জাতির মানুষকে। শিক্ষিতরা জয়ী হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জাতিবিভেদ বিলুপ্ত হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ই চিহ্নিত হয় তাঁর

শিষ্যদের মধ্যে জাতিবিভেদ বিলুপ্ত হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ই চিহ্নিত হয় তাঁর চরিত্র ও মর্যাদা দ্বারা। ঘটনাচক্রে যদি এর মধ্যে ব্রাহ্মণের অংশ বেশি হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠদের এই স্থান হতে পারে এবং কিছু ব্যক্তিকে এটি নিজের সাথে সাথে উচ্চে তুলে ধরে। কিন্তু যদি এটি প্রধানত সমাজের তুচ্ছ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে এটি ধর্তব্যের মধ্যে খুব কমই আসবে, তবুও এর ধর্মীয় ও চিন্তার অভিব্যক্তির শক্তিতে তার মূল বিন্দু থেকে কিছু উন্নতির দাবি নিশ্চয়ই করতে পারে। বর্তমানে খ্রীষ্টধর্মে রূপান্তরিত ব্যক্তিদের ভাগ্য অনেকটা এইরকমই। যারা নিম্নতম অস্পৃশ্যদের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরিত হয়, তারা তাদের নতুন বিশ্বাসের জন্য কিছু মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং সামাজিক মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত ভাল স্থান গ্রহণ করতে পারে, এই পরিণামে পৌঁছাতে কয়েক শতাব্দী লাগতে পারে। সেইসঙ্গে আমাদের এটাও ভোলা উচিত নয় যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে যে ধর্মান্তরণ হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে মহান ত্যাগের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এই খ্রীষ্টানদের বংশধররা পরিণামে লাভবানের বদলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাস সমগ্রভাবে ধরলে আমরা লক্ষ্য করি জাতির বিরাট সঙ্কোচন ও প্রসারণ, বৌদ্ধ ও সাম্প্রতিক খ্রীষ্টীয় কালগুলি মিলনের সুনির্দিষ্ট যুগ বলে গণ্য হতে পারে, আর অন্তর্বর্তী শতাব্দীগুলি চিহ্নিত করা হয় প্রগতিশীল সংজ্ঞা দ্বারা এবং মাঝে মাঝে সংস্কারের তরঙ্গের দ্বারা খণ্ডিত, যা নিজেকে মনে করেছিল জাতিভেদ বিলুপ্তির দিকে এক আন্দোলন, কিন্তু এক নতুন গোষ্ঠী গঠন করেই শুধু শেষ হয়েছিল। কারণ এই তত্ত্বের মধ্যে ভারতের সমস্ত ভাবী সংস্কারগুলি তাদের সুযোগ ও তাদের সীমা অবিলম্বে খুঁজে পাবে। এখন এটি প্রমাণিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে যে জাতিভেদ ব্যাপকভাবে দূর করতে হলে আন্দোলনকারীর প্রয়োজন হবে বাইরের সত্যগুলির চেয়ে আরও গভীর বিষয়ে লক্ষ্য করা, অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাগুলির প্রতি।

যদি এই জাতিতত্ত্ব কার্যকর হয়, তাহলে আমরা দেখি যে কথাটির তাৎপর্য শুধুমাত্র সমাজের একটি পদ নয় বা সেই পদের সঙ্গে জড়িত মর্যাদা নয়। আর মার্জিত আত্মসম্মানের দ্বারা নিম্নপদাধিকারীর আচরণ যেমন নিয়ন্ত্রিত হবে, তেমনি হবে তার উর্ধ্বতন পদাধিকারীরও। আমরা দেখেছি যে মর্যাদা হচ্ছে এমন বস্তু যা সমগ্র সমাজের উপর সমানভাবে প্রয়োজিত হয়। স্মরণে আসবে যে এমন কি টেনিসন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন গ্রাম্যযুবক লেডি ক্লারা ভের দ্য ভেরকে তাঁর জন্মগত গর্বের বিষয়ে গর্বভরে পরাজিত করেছে। অতএব জাতি শব্দটি কোনক্রমেই গণতন্ত্রের বিপরীতার্থক বাক্য নয়, যেমন প্রায়ই অনুমান করা হয়।

আত্ম-সংগঠন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সার্থক সহযোগিতার পক্ষে

কোন বাধা সৃষ্টিও এটি করে না। কারণ এই শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় হচ্ছে যে বিষয়ে হাত লাগানো হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন পারস্পরিক প্রভেদের সকল বিষয়কে তুচ্ছ করার এক প্রচলিত অভ্যাস। আমরা যাকে বলি 'সু-জন্ম' কিংবা ভারত যাকে জাতি বলে, তার এই বিষয়কে সহজতর করা উচিত। কারণ এক সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত যে কোন দলের লোকেরা দেখতে পায় তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এইভাবেই তাদের কাছে নিরাপদ থাকে এবং বহুকাল ধরে মেনে নেওয়ার ফলে সেগুলিতে অন্যের হস্তক্ষেপ করার বাসনা হতে সন্দেহমুক্ত। এটি শক্তিরই ভিত্তি, দুর্বলতার নয়, কারণ এটি মনে হয় যে যদি ভারতীয় নরনারীরা কোন বড় ধরনের সম্মিলিত কার্যে বর্তমানে অক্ষম হয়, তাহলে এই অভ্যাসকে তাদের নিজেদের অবহেলা করার ফলই হচ্ছে সেটি এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় পরিণাম নয়। এমন দুর্বলতা সম্বন্ধে কোন উক্তি অভ্রান্ত বলে আমাদের খুব চট করে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার নিজের পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে হিন্দুরা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক পথে যথেষ্ট জোরদার সহযোগিতায় সক্ষম, যেমন যৌথ পরিবারের ব্যক্তিরা, গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোকেরা এবং অন্যান্যেরা। এই বিষয়ে পরীক্ষা দিলে ইউরোপীয়দের অক্ষমতা আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়ে পড়ার প্রত্যাশা করা যায়।

যাহোক, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে জাতিভেদ মানার ফলে গত পঞ্চাশ বছরে সমাজকে বহু বোকামি ও বহু বিরক্তিকর ক্ষতির বোঝা বহন করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি যে উচ্চবংশজাত মানুষ কেন সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করবে না বা যে হাতকে কম পরিষ্কার মনে করা হয় সেই হাতের রান্না খাদ্য গ্রহণ করবে তার সুনির্দিষ্ট জোরাল যুক্তি আছে। যাহোক, এই নিয়ম তাদের দ্বারা রক্ষিত হতে পারে না, যাদের কোন কারণে সমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপে যেতে হয়। অন্য কোন বিশদ ব্যাপারের চেয়ে এটাই সত্য, সমুদ্রযাত্রা করলেই জাতিচ্যুতির বিষয় হয়ে উঠত এবং এর প্রতিবিধান কখনও এমন ঘটেছে যা ভাবলে কম্পিত হতে হয়। মানুষ নিজের সামাজিক মর্যাদা হারানোর বিশেষ পরোয়া নাও করতে পারে, কিন্তু যখন সে নিজেকে দেখে যে কন্যাদের উপযুক্ত বিবাহ দিতে অক্ষম, তখনই প্রকৃত বেদনা বোধ হয়। তাই সে প্রায়ই মোটা জরিমানা দিতে স্বীকৃত হয় তার হৃত মর্যাদা আচার ফিরে পাবার জন্য। এটি অজ্ঞ ও গোঁড়া ব্যক্তিদের লাভের লোভ জাগিয়ে তুলতো, যাদের দেশে বাস করা সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব ছিল এবং যে কেউ তাদের ক্ষমতায় বাধা দিত, তার ধ্বংস ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য এমন নীতিবিগর্হিত কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল। এমন ধারা ঘটনা প্রায়ই ঘটতো, তবে এ ধারণা করার প্রয়োজন নেই যে ইউরোপ প্রত্যাগত প্রতি হিন্দুই একক্ষণে শহীদ, যাকে সমাজ থেকে দূরে রাখা হতো। এই অবস্থায় ইউরোপে ভ্রমণের নীতিগত ফল হচ্ছে এক নৈতিক অবিশ্বাসের বিষয় এবং এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। এটি এচ্ছে প্রধানত রাজনৈতিক ব্যবহারিক বা শিল্পগত শিক্ষা সম্ভাবনায়

বিচারেই প্রধানত জাতিভেদপ্রথা দুঃখজনক এবং এটি স্পষ্ট যে সম্প্রদায় যতই আধুনিক অবস্থাগুলি বিচার করার শক্তিতে উন্নত হয়, ততই অবশ্য তারা বুঝতে পারে যে এই ধরনের মনোভাব আত্মহনন প্রকৃতির। তবুও এখানে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে কী ভাবে জাতির প্রথা সাম্যভাবে এক প্রকৃত উপায় হয়ে উঠতে পারে, কারণ এই উপায়ের দ্বারা ব্যক্তির উন্নতি যে সমাজে সে বাস করে, সেই সমাজের চিন্তাধারার অনুপাতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়। এই সত্য বৈশিষ্ট্যমূলক। বর্ণের, জাতির, পরিবারের মঙ্গল সর্বপ্রথমে, এবং ভারতে পুরুষ বা নারী ব্যক্তিটির মঙ্গল তারপরে দ্বিতীয় স্থানে। আর একটি স্তরের ব্যাপার দেখা যাক। কোন নীচ বর্ণের লোক ধনী হয়ে উঠল, তখন সে বাধ্য হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে তার নিজের কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ দেবার উপযুক্ত করার জন্য। এইভাবে যে সম্প্রদায় থেকে সে জন্মলাভ, শক্তিলাভ ও বিকাশলাভ করেছে, সেই সম্প্রদায়ই আবার তার কাছ থেকে লাভ করে তার জীবনের কর্মফল। এটি ইউরোপীয় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকে শোষণ করে নেয় সম্পদ, প্রতিভা ও সৌন্দর্য, আর উপর থেকে অবনতির দ্বারা সেটি বরাবর সংগৃহীত হয়।

সত্য যে প্রতি মানবিক শক্তি তার নৈতিক ক্রিয়াকর্মে একমুখী তা সামাজিক গর্বের ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখিয়ে দেবার প্রয়োজনে খুব কম।

আমরা প্রতিদিন দেখি একদিকে উচ্চ আদর্শবাদের জন্য এই কর্ম, অন্যদিকে বিদ্রোহী আত্ম-অহঙ্কারের জন্য। সামাজিক পরিত্যক্ততা ক্ষমা করা যেতে পারে, এর স্থূলের ধারও কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যখন বিশেষ করে এর সঙ্গে ব্যক্তিগত উন্নাসিকতা যুক্ত হয়, তখন অনাগ্রহী দর্শকের এটি বর্বরোচিত আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এটি ধারণা করা ঠিক নয় যে ভারতীয় জাতিপ্রথা এই দুরকম ফলাফলের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম। তাসত্ত্বেও, মনোভাবের শর্তগুলি বোঝা ভাল, যেখানে দুটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যময় জাতিকে পাশাপাশি দেখা যায়, সেখানে এই বিষয়টির অবশ্যম্ভাবী পুনরাবৃত্তি অনুমান করা চলে।

আর এটা অস্বীকার করা যায় না যে জাতিভেদ থেকেই জমে উঠেছে মহান মঙ্গল ও বিরাট মঙ্গলগুলি। এটি এক প্রতিষ্ঠান যা হিন্দু-সমাজকে করে তুলেছে পৃথিবীতে চিন্তার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি উদার। ভারতে সব ধর্মই আশ্রয় নিয়েছে—মুসলমান বিজয়বন্যার পূর্বে পার্শীরা, সিরিয়ার খ্রীষ্টানরা, ইহুদীরা। আর তারা আশ্রয়ের চেয়ে বেশি কিছু পেয়েছে—তারা এক জগতের আতিথেয়তা পেয়েছে, যার বিদেশীর থেকে ভয় করার কিছু ছিল না, যে বিদেশীরা জ্ঞানের স্বাধীনতার নামে এসেছিল। জাতি-বিচার এটি সম্ভব করেছিল, কারণ এক অর্থে এটি আত্মরক্ষার সামাজিক নীতি, যা আক্রমণাত্মক সকল বিষয় বিবর্জিত। আবার এটি নিশ্চিত এবং এমন কিছু যা সহস্র বর্ষাকাল বিজিত দেশেও রাজ্যপালের দ্বাররক্ষী সারা ভারতের শাসকের সঙ্গে

একপাত্র পানীয় ভাগ করে খাওয়ার পক্ষে তার জাতিকে উচ্চতর বলে অনুভব করবে। এখানে যে নৈতিক শক্তি জড়িত আছে তার পরিমাপ আমরা সহজে করি না, কারণ অজাত উত্তরপুরুষের জন্য তার জন্মগত সম্পদ রক্ষা করার অভ্যাস হিন্দুর হৃদয়ে ভাগ্যের প্রতি এক অবিনশ্বর গভীর বিশ্বাসের মূলে। 'আজ এখানে, কাল বিগত' সবচেয়ে অজ্ঞ জনান্তিকে বলে যখন সে বিদেশীকে দেখে এবং তার অকথিত চিন্তার ধুয়া হচ্ছে 'আমি ও আমার চিরকাল থাকবে'। শ্রেণী হচ্ছে জাতির প্রবাহমান ধারা, এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক বোধ, এটি হচ্ছে ঐতিহ্যের মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের জন্য এক উপায়। এটি তার চেয়ে বেশি, এটি হচ্ছে সর্বশ্রেণী সমেত সমগ্র লোকের অন্তরঙ্গতার একটি পরম মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে—আভিজাত্যের মর্যাদার ভাব। কারণ যদিও এটি সত্য যে সকল মানুষ এই নীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত, এটিও সম্ভবত সত্য যে কেবলমাত্র সুবিধাভোগকারীরাই এই তথ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাহলে কি জাতিভেদ শুধুই একটি বোঝা যা সহজেই পরিত্যাগ করা হবে, যেন এক ক্লান্তিকর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু?

আর তবুও যদি ভারতবর্ষ তার জাতীয় কর্মক্ষমতা কখনও ফিরে পায়, পূর্বপুরুষদের এই প্রাচীন প্রথা সংশোধিত পদ্ধতিতে থাকবে,—ঠিক কীভাবে তা ভারতবাসী নিজেরাই একমাত্র নির্ধারণ করতে পারে। কারণ আজকের ভারত জাতীয় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। গতকাল তার যা প্রয়োজন ছিল আজ তা নেই। সস্তা মুদ্রণ ও ব্যাপক সাক্ষরতার বর্তমানকালে ব্রাহ্মণরা তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর একমাত্র অর্থ যে তার জাতীয় প্রচেষ্টার শীর্ষবিন্দু ও লক্ষ্যরূপে আত্মপ্রকাশের বহুবিধ পদ্ধতি আজ দেশের প্রয়োজন। সে চায় আরও বেশি নমনীয়তা, বোধহয় আরও বেশি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার নিখুঁত ক্ষমতা, আগে তার যা ছিল তার চেয়েও বেশি। কিন্তু তা আসা উচিত সেই বিরাট আধ্যাত্মিক বন্যার বিচারবোধের সঙ্গে যার উপর ভেসে উঠতে পারে জাত ও অজাতের সকল প্রশ্ন এক নতুন ও উচ্চতর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। তার প্রয়োজনগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে তার নিজের অধিবাসীদের মধ্যে এক সুদৃঢ় একতা বন্ধন। হিন্দুস্থানের প্রতি ভারতীয় নরনারীর অন্তরে এখন শোনা দরকার গৃহের আহ্বান, দেশের আহ্বান, স্থানের আহ্বান এবং তার উপর গভীরভাবে ধ্বনিত হোক শ্রমের ও জাতির মহাসঙ্গীত।

তখন পূর্বপুরুষদের পথে চলব কি চলব না এই প্রশ্নটি হারিয়ে যাবে নতুন পথনির্মাণ জ্ঞানের প্রচুর ক্ষমতার মধ্যে, যেমনভাবে পথ নির্মাণ সেই পূর্বপুরুষেরা করেছিলেন। ভারতের নিজস্ব প্রকৃতিতে কি সেই সম্ভাবনা আজও আছে, যা তার কাছে এমন একটি যুগ নিয়ে আসতে পারে?

কিছু ব্যক্তি আছে যারা বিশ্বাস করে যে হিন্দু ব্যক্তিদের চরম ক্ষমতার পরে আর কোন কর্তব্য করার নেই। যে জাতি ন্যায়ের জন্য বহু যুগ ধরে এমন অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্যে এমন ক্ষমতার উৎস রয়েছে, যা তাকে শেষ পর্যন্ত সক্ষম করে তুলবে ভাগ্যের উপর কর্তৃত্ব করতে। তার পুরানো সংগঠনের দূরদর্শী বুদ্ধি ও শান্তভাব বর্তমান জগতের পক্ষে তাকে অনুপযুক্ত করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি হচ্ছে আর একবার পূর্ণ বিকাশের পথে তাকে পরিচালিত করার জন্য বৈষয়িক ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধি যে তার আছে তারই এক নিশ্চিত প্রমাণ।

কারণ, সব কিছু সত্ত্বেও, এই বিস্ময়কর বুদ্ধি নিয়ে প্রবীণ পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন? কী তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল এমন এক সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করতে যাতে প্রতিটি বিদ্রোহ ও আক্রমণাত্মক কার্য শেষ পর্যন্ত শুধু প্রাচীন মোধেকের নকশায় এক উপযুক্ত নতুন রঙয়ের প্রলেপ লাগিয়েই শেষ হয়ে যাবে? আহা, বাস্তবিক তাঁরা কে ছিলেন? আমরা এ কথা ভাল করেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, কারণ এতকাল কি আমরা তাদের নামের চেয়ে বড় কিছু বলে সম্বোধন করিনি, যা আমাদের শ্রদ্ধালাভের পক্ষে আরও অশেষ উপযুক্ত,—সম্প্রদায়গত সচেতনতা,—যথা, এক বিশাল ধৈর্যশীল জনসাধারণ, যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের পথে পরিশ্রম করেই চলেছে, কখনও ধ্বংস করে না, বিজ্ঞান ও সত্যের মঙ্গলগুলি সর্বদা গ্রহণ করে পরিপাক করে নেয়, শুধু নতুন উন্নয়নের সম্মুখে দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ অতীতের সমস্যাগুলি নিয়ে তারা এত জড়িত যে বুঝে উঠতে পারে না সে অবস্থা বিগত এবং আজ নতুন জগতে সূর্য উঠেছে, নতুন বিপদ ও অভাবিত অসুবিধার সম্মুখীন তারা হয়েছে?

নবম অধ্যায়

ভারতীয় চিন্তার সংশ্লেষণ

যখন অস্তিত্ব ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না,
যখন জগৎ ছিল না, তার পরে আকাশও ছিল না
কুয়াশাবৃত কী ছিল? কার দ্বারা আবৃত ছিল?
সেই ঘনান্ধকারের গভীরে কী ছিল?

যখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না,
যখন দিবারাত্রির পার্থক্য ছিল না,
তখন সেই গতিহীন স্পন্দিত হয়েছিল স্বমহিমায়,
যে সত্তা ব্যতীত আর কোন কিছু ছিল না।

যখন অন্ধকার লুকিয়ে ছিল অন্ধকারে,
বিশাল জলরাশির ন্যায় বিভেদবিহীন,
তখন অন্ধকারাবৃত সেই সত্তা
উত্তাপ দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করল।

তখন প্রথম জাগল বাসনা, মনের আদি বীজ,
(ঋষিরা স্বীয় অন্তরে এই সব দেখেছেন,
অস্তিত্ব হতে নাস্তিত্বকে প্রভেদ করেছে।)
তার জ্যোতি উচ্চে নীচে চারিপাশে পরিব্যাপ্ত হলো,
মহিমা হয়ে উঠল সৃজনশীল,
সেই আত্মা কারণরূপে নিম্নে প্রকাশ হলো
আর কার্যরূপে উপরে।

কে তখন উপলব্ধি করল? কে তখন ব্যক্ত করল.
এই প্রপঞ্চ কীভাবে উদ্ভূত হলো?
শোন, এমন কি দেবতারাও এর পরে এল,
তাহলে কে বলতে পারে এ কখন এল?
এ কখন প্রকাশিত হলো,
প্রক্ষেপিত হলো কি হলো না।
তিনি একা, হে প্রিয়, সর্বোচ্চ স্বর্গে যিনি এর নিয়ন্তা
তিনিই জানেন।
না, এমন কি তিনিও হয়তো জানেন না।

ঋক্‌বেদ : সৃষ্টিতত্ত্ব

সতী নারীদের সাধারণ সূক্ষ্ম মাধুর্যের মত, সাধু ও বীরদের বৈশিষ্ট্যময় মহত্ত্বের মত, বিদ্যাপীঠের জ্ঞানপূর্ণ আবহাওয়ার মত, প্রকৃতপক্ষে জগতের সব কিছু সুন্দরতম বিষয়ের মত, ভারতীয় চিন্তাধারা নামহীন ও সংজ্ঞাহীনরূপে ছিল ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত। কারণ 'ধর্ম' শব্দটি কোনক্রমেই এক উপাসনাপদ্ধতির নাম হিসাবে নেওয়া চলে না। এটি হচ্ছে বস্তুর প্রয়োজনীয় গুণ, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়—পুরুষের পৌরুষ, জীবনের প্রাণ। আমরা ব্যষ্টির যে রহস্য বিবেচনা করছি সেই অনুসারে এটি কিন্তু যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। শিল্পীর কাছে তার শিল্প, বিজ্ঞানীর কাছে তার বিজ্ঞান, সন্ন্যাসীর কাছে তার ব্রত, সৈনিকের কাছে তার সম্রাটের নাম, প্রতি বিশ্বাসীর কাছে তার বিশেষ বিশ্বাস,—এর যে কোন একটি বা সব কটি ধর্ম হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আর একটি

এবং সমষ্টিগত অর্থে—অনেকটা ইংরাজি 'কমনওয়েলথ'-এর কাছাকাছি কিংবা বোধহয় আরও ভাল হয় যদি অনুবাদ করা যায় 'জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা'—কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি ধর্ম-বিশ্বাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে না। এটি প্রযোজ্য হয় নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিগত, শিল্পগত, গার্হস্থ্য-সংক্রান্ত জটিল ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার সব কিছু ব্যবস্থা সম্বন্ধে—যাকে আমরা জানি ভারতবর্ষ বা জাতীয় স্বভাব বলে। এই ধর্মের জন্য ঝাঁসীর রাণী লড়াই করেছিলেন। পাঠান, মোগল ও ইংরাজদের প্রত্যেককেই পালাক্রমে এর প্রতি তাদের মনোভাব দ্বারা ভারতীয় কৃষিসমাজ বিচার করে। এই ব্যবস্থার প্রধানরূপে ভারতীয় শার্লামেন (যুধিষ্ঠির), ধর্মরাজ আখ্যা লাভ করেছিলেন, যে নামে লোকে আজও তাঁকে জানে। আর এই ধর্ম ও তার সব কিছু সম্বন্ধে বোধহয় সবচেয়ে ভালভাবে লেখা আছে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতে মুমূর্ষু ভীষ্মের ভারতের ভাবী রাজাদের উপদেশদানের মধ্যে।

এটি পরিষ্কার যে এমন একটি ধারণার ইংরাজী শব্দ 'রিলিজিয়ান' দ্বারা অনুবাদ করাটা হচ্ছে খুবই সম্পূর্ণতা। এটিও খুব পরিষ্কার যে কোন ধারণার মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় বস্তুকে, যা তার কেন্দ্রভাগে এমন সুনির্দিষ্ট ও সীমান্তে এমন ধোঁয়াটে, ব্যবচ্ছেদ করে ও সাজিয়ে তারপর যদি দাবি করা হয় ভারতীয়দের ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাহলে কাজটি খুবই শক্ত হয়ে ওঠে। এমন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েই হয়ক্ষে ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রাচীন শব্দগুলি বৃত্তাকার এবং আধুনিকগুলি চতুষ্কোণাকার।'

যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অরণ্য গড়ে ওঠে বহু ধরনের বৃক্ষের সমাবেশে, যার প্রত্যেকটি অন্য সবগুলির মতোই শুধু আলোক পিপাসার সাধারণ সত্যের ভিত্তিভূমিতে বর্ধিত এবং প্রত্যেকটি বৃক্ষেরই নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার নিজস্ব বীজের সঙ্গে, ঠিক তেমনি হিন্দুদের মধ্যেও খ্রীষ্টানদের এই বিংশ শতাব্দীতেও ধর্ম বিশ্বাস ও মত গড়ে উঠেছে। ইসলাম নিজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কারণ ইংরাজি শিক্ষার পরে যে ভাবধারা শহুরে সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজ গোষ্ঠীতে তীক্ষ্ণভাবে নিজেকে পৃথক করেছে, তার বৃদ্ধি হয়েছে আধুনিক যুগে। এটি বোধহয় সেই মিথ্যা ব্যাখ্যার ফলে, যা বলে ভারতীয় ইতিহাস হচ্ছে দুটি ভাবধারার সংঘর্ষেরই কথা। গ্রাম-জীবনে এমন তীব্র প্রভেদ নেই। বাংলা ও বিহারে হিন্দু ও মুসলমান ভদ্র সন্তানরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিজেদের নামগুলি তারা মিশিয়ে নেয়। একই জেলায় মুসলমান অন্দরমহলে গ্রামের হিন্দু শিশুরা হচ্ছে আদৃত অতিথি। প্রত্যেক হিন্দু গুরুই হিন্দুর মতোই মুসলমান শিষ্যও গ্রহণ করে। প্রতি মুসলমান ফকিরকে মুসলমান ভক্তের মতো হিন্দুরাও খুঁজে বেড়ায়। সংকীর্ণ গোঁড়া বলে যে দক্ষিণকে মনে করা হয়, সেই দক্ষিণের ত্রিবান্দ্রামে সবচেয়ে গর্বের বস্তু যে মন্দির, সেই মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছে এক মুসলমান রাজকন্যাকে, যিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজসম্মান পরিত্যাগ করেছিলেন ত্রিবান্দ্রামের স্থানীয় দেবতাকে উপাসনা করার জন্য। রাজনীতির জগতেও বার বার দিল্লীর ও নবাবদের সৈন্যদলকে হিন্দু সেনাপতিরা বিজয়ী

করে তুলেছে এবং আজও প্রতিটি নেটিভ স্টেটে ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে সেই মানুষদের যাদের ধর্ম-বিশ্বাস শাসকের সঙ্গে এক নয়। এর থেকে সুন্দর প্রশংসা নিশ্চয়ই কখনো করা হয়নি, যা এক মারাঠী রাণী সম্বন্ধে বলেছে, 'তিনি ওঁর ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যে প্রজাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভেদ ছিল, তাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়ালু ও বিবেচক ছিলেন।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ধর্মের অসহিষ্ণুতাকে কখনোই খ্রীষ্টান পর্যবেক্ষকরা ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেখেছেন, যাঁদের প্রাচ্য মনোভাবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা মনে হয় অদ্ভুতভাবে কম ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই অসহিষ্ণুতাকে রোমান চার্চের অসহিষ্ণুতার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কয়েকটি যুদ্ধমান উপজাতি থেকে এক শক্ত সামর্থ্য জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা এক সরল সংক্ষিপ্ত ধর্মমত নির্ধারণের কারণ হয়েছিল, তবু পয়গম্বর ভুল করেননি প্রকৃত এশীয় প্রথায় তাঁর অনুগামীদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে 'ঈশ্বর হচ্ছেন সকল প্রাণীরই ঈশ্বর, কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ের নন' এবং সকল বিদেশী ধর্মকে নিন্দা হতে অব্যাহতি দেওয়া, বিশেষ করে তাঁর সুনির্দিষ্টভাবে জানিত ধর্মকে, যথা খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম, 'গ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তিরা'। সত্যিকারের বিবাদটি যতই জোরাল হোক না কেন, সেটা ছিল এক আগের থেকে না জানা রাজনৈতিক ও সামরিক জরুরী অবস্থায় সুদৃঢ় ন্যায়বোধের সঙ্গে অবিশ্বাসের, অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে নয়। এই বিবাদ বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করার কারণ হয়েছে ওই অবস্থাটি। সত্য যে মুসলমানরা কোন কোন সময় বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছে, সেটি পবিত্রতা সম্বন্ধে তাদের ধর্মের শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই হতে পারে না। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে 'অবিশ্বাসী কুকুর' উক্তিটি স্পেনিয়ার্ড ক্রুজেডারদের প্রতি তেমনি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন খ্রীষ্টানরা বর্বরদের সম্বন্ধে ব্যবহার করেছে। দিল্লী ও গজনীর বিবাদ হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের দীর্ঘকালের সংঘর্ষ, ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের লড়াইয়ের চেয়ে বেশি এমন কিছু 'দীন' ও ধর্মের লড়াই নয়। এমন কি শিখ ও মারাঠা অভ্যুত্থান হচ্ছে শুধু আঞ্চলিক ক্ষমতাকেন্দ্র পরিবর্তনের মানসিকতা। হিন্দু রাষ্ট্র বরোদার বিখ্যাত রত্নখচিত শাল প্রস্তুত হয়েছিল মদিনায় মহম্মদের সমাধিতে প্রেরণের জন্য, স্বভাবতই সেই প্রাচীন রাজত্বের কালে।

মরু অঞ্চলের কিছু হাওয়া, মেষপালকদের স্বভাবের কিছু ঐতিহ্য, পারস্য ও আরবের কিছু সুদৃঢ় স্মৃতি বিজয়ী আক্রমণকারীদের সঙ্গে বস্তুত এসেছে বিজিতের অবিশ্বাসের ও প্রতিবাদের কারণ হয়ে থাকার জন্যে। গোহত্যা সম্পর্কে মতটি আন্তরিক বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে সাহসী হিন্দুদের অস্ত্র নবাগত শক্তির বিরুদ্ধে বর্তমানে উদ্যত হতো। ঐটিকে উপলব্ধি করতে হবে একদিকে শিল্প-উন্নয়নশীল কৃষি সম্প্রদায়, অন্যদিকে মরুপ্রান্তরের দুরন্ত সন্তান, যারা পশুপালন ও পশুহত্যা করে জীবনধারণে অভ্যস্ত, তাদের দু'দলের মধ্যে স্বভাবতই বর্তমান বিরুদ্ধ সম্পর্কের শুধুমাত্র এক প্রতীকরূপে। কিন্তু সেই একই প্রক্রিয়া, যা যাযাবরকে বশীভূত

করে কৃষি-সম্প্রদায়ভুক্ত করেছে এবং মুসলমানদের নদীর মাঝি ও জমির চাষীতে পরিণত করেছে, তাই কালের ব্যবধানে পুরাতন সম্পর্কজাত পার্থক্যকেও হ্রাস করে দিয়েছিল। মুসলমান ভিস্তির জলের জন্য কলের তলায় মশক ভর্তি করা এবং হিন্দু ভারীর তারপরেই মাটির কলসী ভরে জল নেওয়া বর্তমানকালেও বর্তমান দুই বৈপরীত্যের উদাহরণের খুবই স্বাভাবিক দৃশ্য। দুটি পৃথক সভ্যতা পাশাপাশি রয়েছে, কিন্তু তারা বন্ধুভাবাপন্ন সম্প্রদায়, বৈরীভাবাপন্ন জাতি নয়।

ইসলামের ধর্মচেতনায় এমন কিছু নেই, যার সঙ্গে ভারতের মৃত্তিকায় জাত বিশ্বাস-গুলির কোন সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছিল 'একটি প্রকৃত ধর্ম'—এর ধারণাকে, কারণ হিন্দুরা মনে করত ধর্ম বিকাশের প্রাথমিক পর্বে এটির প্রয়োজন আছে। আল্লা অবশ্যই ব্যষ্টি ঈশ্বর। কিন্তু তাহলেও তো বিষ্ণুর উপাসক তার ভাইয়ের শিবকে পূজা করার অধিকারকে সর্বদাই স্বীকার করত, যদিও অন্য নামটি তাকে অবিচলিত রাখে। অতএব সেই একইভাবে আল্লা নয় কেন? হিন্দুরা মূর্তি ব্যবহার করে, মুসলমানের কাছে মূর্তি ঘৃণার্হ। সত্যি, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু আশা করে একদিন মূর্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা হতে অব্যাহতি লাভ করার। কে না মুগ্ধ হয় হিন্দু রমণীদের ভক্তি প্রথা দ্বারা, দেবমূর্তি'র প্রতিবিম্বকে আয়নায় স্নান করানো ও উক্তিতে, 'যাকে আমরা স্নান করাচ্ছি, তা মূর্তি নয়। সেও মূর্তি নয় যাঁকে আমরা উপাসনা করি!' সাধুরা কি সব সময় বলেন না মূর্তি'-উপাসককে যে, অনন্ত সত্তার নামকরণ করাটা পর্যন্ত ঈশ্বর-নিন্দা? আর কোন মুসলমান সাধকও এ কথা না বলেছেন? এই সত্যের আলোকে মূর্তি নিয়ে বিবাদ হয়ে ওঠে শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে মূর্ত কোন কিছু ব্যবহার সম্পর্কে শুধুমাত্র মতদ্বৈধতা। বাস্তবিক বর্তমানকালে হিন্দুধর্ম স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছে এমন সব সম্প্রদায়কে তুলে ধরে যারা ইসলামের মতোই তীব্রভাবে মূর্তি ব্যবহারের নিন্দা করে।

অতএব এটি বোঝা যায় যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয়গুলি হচ্ছে ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক ব্যাপারের চেয়ে শুদ্ধতা ও গার্হস্থ্য আচার-বিধির পুঙ্খানুপুঙ্খতা। এই সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দুটি ধর্ম-বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায়। কারণ যতই একটিকে উপলব্ধি করা যায়, ততই অন্যটি নিখুঁতভাবে অপরটির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে যায়। সুফিধর্ম প্রেমের দ্বারা আত্মাকে পরিচালিত করে আর বেদান্ত তাকে পরিচালিত করে জ্ঞান, প্রেম বা মুক্তির প্রেরণায়,—ক্ষেত্র অনুযায়ী, কিন্তু দুটিরই মূল বিষয় হচ্ছে একই রকম লক্ষ্য, যেখানে সকল প্রকার ভিন্নতাবোধ অন্তর্হিত হবে এবং ক্ষুদ্র আমিত্ব সার্বিকে লীন হয়ে যাবে। তাহলে একথা বলা যেতে পারে যে দুটি বিশ্বাসের প্রত্যেকটিতেই অন্যটির সম্পূর্ণতর বিকাশে হারাবার কিছু নেই, আর পরিপূর্ণ প্রাপ্তির যোগ আছে। মহম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য পরস্পরের পথের নিন্দনীয় বাধাস্বরূপ নন, বরং একই শ্রেণীর বহু পৃথক উদাহরণ—ভাস্বর এশীয় ব্যক্তিসত্তা,

যাঁর জাতীয়তাবোধের ধারণা জড়িত রয়েছে জাতীয় ন্যায়বোধের সঙ্গে এবং যাঁর জনসাধারণের নেতা হবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সত্যের ভিত্তিতে যে, তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এমন মহাপুরুষরা পরস্পরকে বুঝতে ব্যর্থ হতে পারেন না। পয়গম্বর মোজেস ও খ্রীষ্টকে সম্মান জানাতে বিলম্ব করেননি, তাঁর নিজস্ব শ্রেণীভুক্ত উদাহরণস্বরূপ, যাঁদের নাম তাঁর জানা ছিল।

অতএব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে যতদিন হিন্দুধর্ম নামবিহীন ও অস্পষ্ট ছিল, ততদিন তার সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য বোধও অস্পষ্ট ছিল, সাধারণ প্রাচ্যধর্মের শান্তিদায়ক প্রভাবের অধীন হাওয়ার ফলে। অবশ্য কোন কোন স্থানে রাজনৈতিক ধারণার জন্য নিঃসন্দেহে দ্বন্দ্বটি তীব্র হয়েছিল, কিন্তু আবার বহুপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনের ফলে সেই ভাবটি প্রশমিত হয়। আর যদি সংজ্ঞা নির্ধারণের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মগুলি বেশ কিছুটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এটা কি পরিষ্কার নয় যে তা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের মিলনের বাস্তবভূমি সম্বন্ধে নতুন ও গভীরতর চেতনা নিয়ে আরবের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার জন্যেই,—যা জীবনের এশীয় সংশ্লেষণ নয় কি ?

হিন্দুধর্মের নামহীনতা দ্বারা যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত হয় তাকে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। বিশাল দেশ পূর্ণকারী বিরাট জনসাধারণ, যারা তাদের দেশের সীমান্তের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে অথবা নিজেদের সঙ্গে প্রতিবেশী জাতিগুলির প্রভেদের তীব্রতা সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা নিজেদের চিন্তাধারাকে এক নামকরণ করার জন্য গুছিয়ে নিতে স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম ছিল। সংজ্ঞা নির্ধারণের আগে সীমা ও পার্থক্যের জ্ঞান চাই এবং ভারতবর্ষ যখন বিদেশী ভাষা ও শাসনের আয়নায় নিজেকে সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হতে দেখল, তখন সে সীমার কল্পনা করতে পারল। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারে এমন কী ছিল যা হিন্দুদের এলাকাভুক্ত নয় ? হিমালয় পেরিয়ে চীন ও মঙ্গোলিয়ায় পৌঁছে মানুষেরা যখন অজানা ধর্মাচরণ ও কুসংস্কারের সংস্পর্শে আসত, তাঁরা সর্বদাই নিজেদের দেশের জীবন ও অনুষঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য ও উপমা। চীনদেশে অদ্ভুত ও শক্তিশালী দেবীর উপাসনা করা হত। কিন্তু মাতৃ-উপাসনা ভারতে এত প্রাচীন যে তার উৎপত্তি অতীতকালের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। একই ধরনের বিশ্বাসের কী যুগ গেছে, যা আমাদের নিশ্চিতভাবে দিয়ে গেছে কন্যাকুমারী অন্তরীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কন্যাকুমারী ও আজকেরও জাপানের সকল সাফল্যদাত্রী দেবী-মাতা কোয়ানিয়ন। কে বেশি প্রাচীন, চৈনিক পুরাণের স্বর্গের রাণীমা 'কারি' না বাংলার কালী তা কে বলতে পারে ? যাহোক, এই ধারণাগুলি পরিষ্কারভাবে সেই মাতৃতান্ত্রিক যুগেরই লক্ষণ, যখন জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের ভাব জন্মায়নি,—এমন কি এগুলিও ভারতে বা এশিয়ায় ধর্মীয় চিন্তার প্রাথমিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে না।

সমস্ত ওল্ড টেস্টামেণ্ট জুড়ে এবং মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থানের কাহিনীর মধ্যে আমরা শুনতে পাই উপাসনার বস্তুরূপে 'প্রস্তর খণ্ডে'র কথা। কৃষ্ণবর্ণ অতীন্দ্রিয় 'কাবা' আজও ইসলামধর্মী সকল মানবের কাছে তাদের ঐক্যের প্রতীক হয়ে আছে। আর সমস্ত ভারতব্যাপী আজও শ্রমজীবী এমন মানুষের দল আছে, যারা দেবত্বের প্রতীকরূপে রুক্ষ পাথরের চেয়ে ভাল কিছু চায় না, যেগুলি সম্ভবত কিছুটা যত্ন নিয়ে নির্বাচন করা হয়, তারপর এককভাবে বা সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়, হয়তো কোন ঘেরা জায়গায়, হয়তো বা তা নয়, তারপর থেকে শ্রদ্ধার বস্তুরূপে তাদের মনে করা হয়। যে লোকেরা এই প্রতীকগুলি ব্যবহার করে—কারণ এদের মূর্তি বলা চলে না—তারা শূদ্র বা চাষী থেকে, যেমন আমি দাক্ষিণাত্যে দেখেছি, ভুটিয়া বা বেদের মতো ভ্রমণকারী, যাদের হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়, তেমন যারা কেউ হতে পারে।

সাধারণ জীবনের সর্বত্রই অলৌকিক পদার্থ হচ্ছে আগুন ও আলো। আর বোধহয় তাই স্বাভাবিক যে প্রজ্বলিত শিখায় রূপান্তরিত হওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তৈল হয়েছে এইসব প্রস্তরখণ্ডগুলির পূজায় অর্পণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তু। ভুটিয়া মন্দিরে কখনও কখনও প্রদীপ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এগুলি হচ্ছে ক্ষুদ্র ও লৌহনির্মিত, ডেসার্ট স্পুনের মতো হাতলের সঙ্গে সমকোণ করে গোল বাটির আকার। এক ছোট মন্দিরে আমি এ রকম ষোলটি বা সতেরটি দেখেছি। ওই প্রদীপগুলি ছাড়া অন্য কোন মূর্তি বা প্রতীক সেখানে ছিল না এবং তীর্থযাত্রীরা যাত্রাকালে তাদের পরিধেয় বস্ত্রের খানিকটা ছিঁড়ে কাছের কোন গাছে বা ঝোপে বেঁধে দেবে। বিরাট যাত্রীদলের শত শত চিহ্ন একত্রিত হয়ে বোঝায় এক সাধারণ উপাসনাকর্মে তাদের আত্মার অদৃশ্য সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। যেমন এই কৃষকদের উপাসনাগার সর্বদা হয়, তেমনি সেই স্থানটিও যেখানে ছিল, সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য সবচেয়ে মনোরম এবং প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সংযোগের আহ্বান তীব্রতম। কখনও ওই পবিত্র প্রস্তরগুলিকেই তৈলসিক্ত করা হয়, কারণ যে অদ্ভুত তরল পদার্থ অগ্নিকে বৃদ্ধি করে তার স্পর্শকেই পবিত্র বলে মনে করা হয়।

ভারতের-ধনী সম্প্রদায়গুলির কাছে ঘৃতই শুধু হচ্ছে বেদীতে অর্পণ করার উপযুক্ত এবং ইউরোপে আমাদের প্রয়োজন হয় বড় মোমবাতি। কিন্তু এ সবের মধ্যে থেকে আমরা কি খুঁজে পাই না যে শ্রমজাত দ্রব্য দ্বারা শ্রমকে পবিত্রজ্ঞান করার এটি এক সাধারণ প্রক্রিয়া ? হিন্দু বলে, 'গঙ্গাকে আমরা গঙ্গাজল দিয়েই পূজা করি, কিন্তু পূজা আমাদের করতেই হবে।' সেইভাবেই কৃষক পবিত্র তেলের কল্পনা করে, নীলগিরির তোডা উপজাতি তাদের গরুর গলার ঘণ্টার পূজা করে। এটি কি সত্য নয় যে যদি মানুষের স্মৃতি থেকে এক মুহূর্তে সব মুছে যায়—খ্রীষ্টধর্ম থেকে ইউকারিস্ট (ভোগ নিবেদন) ও পবিত্র প্রদীপ, মুসলমানের কবর থেকে কম্পিত দীপশিখা ও সুগন্ধি ফুল,

প্রাচ্যের উপাসকদের কাছ থেকে তেল, ফল ও ধূপ—তাহলেও পরদিনই এগুলি আবার গজিয়ে উঠবে, কৃষকের কাছে শস্য, মদ ও তৈল, পুষ্প-প্রেমিকদের কাছে সুগন্ধিদ্রব্য, মেষপালকদের কাছে আদর্শ রাখাল, ধীবরদের কাছে মুক্তির তরণী ? পুরাণ তো আর কিছু নয়, শুধু মানবতার রত্নপেটিকা, যাতে রক্ষিত থাকে পূর্বপুরুষের স্বপ্ন প্রেম ও বেদনার অক্ষয়সম্পদ উত্তরপুরুষের জন্য চিরকাল। ধর্ম-বিশ্বাসের জন্ম-রহস্য সর্বদা আমাদের চারপাশে থাকে।

সকল মহান এশীয় ধর্ম-বিশ্বাস—তার মানে বিশ্ব-ধর্ম—মনে হয় এমন কোন প্রবাহ থেকে জন্মলাভ করেছে, যাকে মোটামুটি বলা চলে যে প্রাচীনকালের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির উপর আর্য চিন্তাশক্তির স্রোতধারা। চীনের তাওধর্ম, পারস্যের জরাথুস্ত্রধর্ম, ভারতের হিন্দুধর্ম—তিনটিই হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি ও অনুমানের এক মূল ভাণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগের ধারা। আর আর্যদের অঞ্চলে পৌঁছাবার পর ইসলাম নিজেই সুফিমতবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সবগুলি থেকেই সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে ভারত তার নিজের দায়ভাগকে উন্নত করে তুলেছে। তবু আমরা সমানভাবে সবগুলির মধ্যে সাধারণ সূত্রগুলি চিনতে পারি।

যেহেতু ভারতীয় চিন্তাধারার মূল গভীরভাবে প্রোথিত আছে মানবের ক্রমবিকাশের ভিত্তিপ্রস্তরে তাই প্রতিটি নতুন ঐতিহাসিক উন্নতিতে বিরাট কাঠামোয় কিছু না কিছু যুক্ত করতে সে ব্যর্থ হয়নি। ভারতের সমগ্র কাহিনীটিই এক দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে পড়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সাংবিধানিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উত্তরণের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি। মহাভারতের বীর চরিত্র-গুলির বাৎসরিক গ্রাম্য পূজার মধ্যে, যা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বহুল প্রচলিত, আমরা দেখতে পেতে পারি দূর দেশবাসীর জাতীয় মহাকাব্য ও ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের 'মহান ভারতের' মধ্যে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা। উৎসবের দিনে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশের মন্দিরগুলিতে যে তোপধ্বনি করা হয়, তা হচ্ছে যথেষ্ট প্রমাণ যে এককালের খাঁটি ধর্মটি ছিল আক্রমণশীল, আগ্রহী, নবভাবের অধিগ্রাহক, সব কিছুতে নির্ভীক ও প্রগতির বন্ধু। একটা জনপ্রিয় কুসংস্কার হচ্ছে যে পূর্বদিক অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুরা তারকার গতি দেখতে পায় না। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে যে প্যারিসে যেমন বারাণসীতেও তেমন এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের মতো কখনই নয়। প্রতি সাধক, প্রতি কবি বিশাল ভাণ্ডারে কিছু যোগ করেন যা পূর্বসঞ্চিত সব কিছুর মতো নয়। আর এটি মাতৃভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্বন্ধে যতটা সম্পূর্ণ সত্য, ততটাই সত্য হচ্ছে ধ্রুপদী সংস্কৃতে সংরক্ষিত সকল কর্তৃত্বশীল সংস্কৃতি সম্পর্কে।

বাংলার চৈতন্য, শিখদের দশ গুরু, মহারাষ্ট্রের রামদাস ও তুকারাম এবং দক্ষিণে রামানুজ —এঁদের প্রত্যেকেই নিজেদের কালে জাতীয় দর্শনের যেন জীবন্ত মূর্তি, আবার সাধারণ জীবনের সম্পূর্ণতার সঙ্গেও সম্পর্কজড়িত। এমন ধারা মহাসাধকের প্রত্যেকেই জনসাধারণের কাছে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, নিজেদের ব্যক্তিত্বের ও ক্ষমতার প্রকাশ করেন এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিশ্বাস এক জাতি গঠন করে তোলে। এইভাবে মারাঠা রাজত্বের উদ্ভব হয়েছিল। লাহোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এইভাবে হয়েছিল। সুদূর আরবদেশে ইসলামও এইভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কারণ যে নিয়মের বিবেচনা আমরা করছি তা শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নয়, তা হচ্ছে সমগ্র এশীয় জীবনের পক্ষেই এক।

তাহলে হিন্দু জগৎ তার সম্পূর্ণতা সমেত হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ দর্শনের সঙ্গে এক। বহু কথিত বেদান্ত হচ্ছে শুধুমাত্র সেই সংশ্লেষণের তত্ত্বগত বিষয়, যার বস্তুগুলি গড়ে তোলে সাধারণ জীবন। একবারে নিরক্ষর, বাহ্যত মূর্তিপূজক কৃষক যদি জিজ্ঞাসিত হয় তাহলে বলবে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতার কথা। সে স্বীকার করে যে খ্রীষ্টধর্ম মূলত সত্য, কারণ মিশনারীরা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট যে একজনই সর্বময় কর্তা আছেন। সংস্কৃতের জ্ঞান থেকে এক প্রজন্মকে যদি বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় তাহলে কী ঘটবে, এই প্রশ্নটি হচ্ছে আর একভাবে জিজ্ঞাসার ধরন যে হিন্দুদের মধ্যে এক নির্দিষ্টকালে প্রকৃতপক্ষে কোন গতীয় শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান? বিশিষ্ট ধারণাগুলি কী, যা বর্তমানে জন্মগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে তাকে সমর্থন করতে বা নাড়া দিয়ে ধ্বংস করতে? এই ধরনের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় শুধুমাত্র বিরাট ঘটনার মধ্যে ও প্রতিভাবানদের কল্পনার মধ্যে। অবশ্য কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়, যাতে বোঝা যায় উত্তর কী হতে পারে।

খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দীর হিন্দুধর্মের নামকরণ করা হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম, যখন সেটি বিদেশী চেতনায় অধঃক্ষেপিত হয়। কোন কর্তৃত্ব এটি দাবি করেছিল? বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে এটি কী ব্যাখ্যা দিয়েছিল? আত্মা সম্পর্কে? অশুভ সম্বন্ধে? নৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্যরূপে মানব-সমাজকে এটি কী প্রদান করেছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিশ্চয়ই দিতে হবে তত্ত্বগতভাবে, অথবা তত্ত্বগুলির থেকে পৃথকভাবে, হিন্দুধর্মের পূর্বসঞ্চিত ভাণ্ডার হতে গৃহীত যেগুলি। আর যদিও বিশেষ মতটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু আমরা যে বিষয় বিবেচনা করছি তাতে ঘোষণাটির তাৎপর্য নিয়ে তর্ক করা যায় না। এটি স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতে কোনকালে বৌদ্ধধর্ম নামে কোন ধর্ম ছিল না তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতবৃন্দসহ। এ ছিল এক ঝোঁক সেই সত্যগুলিকে জনপ্রিয় করার জন্যে, যা পূর্বে শুধু শিক্ষিতদের উপযুক্ত বলে গণ্য করা হতো এবং এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভেদ ব্যাখ্যাগুলির প্রতি নিঃসন্দেহে বেসরকারী আগ্রহ, যেমনটি বাংলাদেশে আজও চৈতন্যের জন্য আছে। দেশকে সমৃদ্ধ ও জনগণকে উন্নত

ও ঐক্যবদ্ধ করতে একান্ত আগ্রহী, অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, সকলাংশে সুসংবদ্ধ, ভৌগোলিক চেতনায় পূর্ণ, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে একই ধরনের স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে প্রকাশিত বিশাল রাজকীয় সংগঠনেরও উদ্ভব হয়েছিল। এই ভারতীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ও সজীব সংযোগ ছিল চীন, জাপান, সিরিয়া ও মিশরের। জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। বিদেশে রাষ্ট্রদূত, বণিক ও ধর্মপ্রচারক দল প্রেরিত হতো। আর নিজের রাজ্যের মধ্যে এটি করেছিল পথনির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, উদ্যান গঠন, কূপ খনন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং হিংসা অবসানের দাবি, এমন কি মূক প্রাণীদের প্রতিও।

ঠিক যেমন জনগণকে দাসত্ব হতে কর্তৃত্বে এনে তাদের মানসিক শক্তিকে মুক্তি দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশান হয়েছিল আধুনিক ইউরোপের জাগরণের অন্তর্নিহিত শক্তি, তেমনি অশোক ও তাঁর পরবর্তী সাম্রাজ্যগুলিতে সেই অধিকার ছিল—ব্যক্তিগত ন্যায় বিচারের অধিকার নয়, ভারতবর্ষে সেই ন্যায়বিচার দাবির প্রয়োজন কখনও ছিল না—যে, সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সমান অধিকার সমাজের উচ্চস্তরে বা সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করার। কারণ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, প্রাচ্যে স্বাধিকার সর্বদা মুখ্যত ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক, রাজনৈতিক নয়। নাগরিক ও জাতীয় ক্ষমতা ছিল উচ্চতর চেতনার প্রত্যক্ষ ফলগুলির মধ্যে, কখনও তার কারণস্বরূপ নয়। এ হচ্ছে মানুষের সংসার পরিত্যাগের অধিকার এবং সাবালকের ভোটাধিকার নয়, যা সর্বোচ্চের সঙ্গে তার সমানত্ব সৃষ্টি করে। সমাজের সকল অংশে আধ্যাত্মিক জীবনের আকস্মিক উপলব্ধি বৌদ্ধধর্মের অধীনে সকল মানুষকে, তার জন্ম ও অবস্থা যাই হোক না কেন, তার মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছিল, তার নৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ গুরুত্ব ব্যবহারে শক্তি দিয়েছিল। ফলে হয়েছিল জাতীয়তার বিরাট সংহতি ও বিকাশ। মানুষ অনুভব করল তারা যেন শূন্যমার্গে বিচরণ করছে। মানবীয় সৌভ্রাত্রের মহান বাণী শ্রবণ ও প্রচারের জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। সারা বিশ্বে তাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং সকল প্রাণীর কাছে মহান বাণী প্রচার করতে হবে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও উদ্দীপনা কতই না ছিল, যখন ব্যবসায়ী বণিক ও ভ্রমণকারী-দলের ভৃত্যেরাই শক্তিশালী চীন সাম্রাজ্যের ধর্মে স্থায়ী অবদানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল? সে ছিল এক মহান যুগ, সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষ, যেটুকু আজও টিঁকে আছে তা যারা দেখেছে, তারাই শুধু ধারণা করতে পারবে সে যুগের সম্পদ ও শক্তির।

তবু অশোকের ধর্মান্তরণ কোন এক নতুন ধর্মে হয়নি, শুধু তাঁর কালে প্রচলিত ধর্মীয় জীবনে হয়েছিল। 'আমি, রাজা প্রিয়দর্শী, দেবতাদের প্রিয়, আমার দীক্ষার দশ বৎসর পরে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছি।' (উড়িষ্যার ধাউলি পর্বতে ও গুজরাটের গিরনারে অশোকের শিলালিপি।) অতএব যাকে আমরা বৌদ্ধধর্ম বলি, ভারতে তার কর্মজীবনের অবসান খুব ধীরে হয়েছিল। যিনি প্রথমে ইলোরা ভ্রমণ করেছেন

তিনি এলিফ্যান্টায় প্রবেশ করে তাঁর বামে বুদ্ধের মতো মূর্তির শিব ও দক্ষিণে দুর্গার বিজয়িনী মূর্তি দেখে বিস্মিত হন। ইলোরাতেই গির্জার মতো গুহা 'তিন-তাল' ও কৈলাস গুহার মধ্যে নিশ্চয় তিন শতাব্দীর ব্যবধান হবে। এমনকি সেখানেও আমরা দেখি শিক্ষাদাতা বা ধ্যানরত বুদ্ধের নিঃসঙ্গ মূর্তি ধীরে ধীরে স্থান ছেড়ে দিয়েছে দেবতাদের বা লোকরক্ষক রাজাদের সমৃদ্ধ মন্দিরকে। কিন্তু সেই আশা ও আনন্দ, যা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এবং বৌদ্ধযুগের বিশ্বজনীন সংমিশ্রণে অমন অবাধভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, তা অলক্ষ্যে বিলীন হয়ে যায় পৌরাণিক যুগের সমৃদ্ধশালী কল্পনায় এবং শঙ্করাচার্য ও সামন্তযুগের বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায়।

ব্রাহ্মণ ও যোগীদের সাধারণ প্রবৃত্তি ছিল আত্মসংযমের মধ্যে দিয়ে সমস্ত স্বভাবের মুক্তিই হচ্ছে সাধনার লক্ষ্যটিকে তুলে ধরা। এই নীতিকে সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হতো। অন্যদিকে বৌদ্ধদের বিশ্বাস ছিল ওই একই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে আত্মার বিকাশের দ্বারা যতটা নয়, ততটা আত্মমোহকে মুছে ফেলে। মুক্তি নয়, নির্বাণই হয়ে উঠেছিল প্রধান কথা। এই দুটি ধারণাই যে টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠের মতো, এই সত্য সমসাময়িক মানুষের চিন্তার বাইরে ছিল না। কিন্তু এর নিজস্ব উত্তরাধিকারী এই পার্থক্যের উপর এত বেশি মূল্য আরোপ করেছিল যা বর্তমানকালের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের কাছে যত না প্রকট এটা তার চেয়ে বেশি। এটা তাদের কাছে বোধ হয়েছিল সকল সম্ভাব্য ধর্মীয় পার্থক্যকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, এই তথ্যই গীতায় সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত সেই বিশ্বাস গড়ে তুলতে প্রধানত সাহায্য করেছিল, এবং যা সুস্পষ্টভাবে ভারতীয়, যে সকল ধর্ম একটি সত্যকেই ব্যক্ত করে।

উপনিষদের যুগে পৌছানো গিয়েছিল ব্রহ্মের ধারণায়—প্রকৃত একই সত্তা বহুরূপে প্রকাশিত। এটি মায়াবাদ বা বস্তুর অধ্যায়ের তত্ত্ব, যা বৌদ্ধযুগে জনপ্রিয় হয়েছিল। এটি স্পষ্ট যে এই তত্ত্বে অসতের উৎপত্তির সকল প্রশ্ন একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সৎ ও অসৎ দেওয়ালের ছায়ার মতো, আমাদের ব্যক্তিগত সুবিধাবোধ যা প্রক্ষেপিত করেছে বর্ধিত ও বিকৃত আকারে। সাধকেরা ঈশ্বরানুভূতির আনন্দে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট, অপমান, স্বীয় স্বার্থ অনুভব করেন না।

জগৎ-সংসারের চক্রাকারে প্রকাশ—যা কদাচ সৃষ্ট হয়নি, কিন্তু চিরকাল স্বতঃ-অস্তিত্বশীল, স্বতঃ-ধ্বংসশীল, স্বতঃ-আবর্তিত হচ্ছে—আর একটি তত্ত্বের বীজ যা বৌদ্ধ-শিক্ষকরা রোপন করেছিলেন। এখানে আমরা এমন একটি ব্যাখ্যা পাই, যে বিশাল বিজ্ঞানশক্তি হিন্দুধর্মীয় অনুমানের হাত ধরাধরি করে চলে ভক্তি প্রবণতার মধ্যে অনুসন্ধিৎসাকে ওতপ্রোত করেছে, তারই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি ধর্মীয় গোঁড়ামি পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানকে যেমন বাধা প্রদান করেছিল, তেমন প্রাচ্যেও করত, তাহলে বিদেশীদের চোখে বর্তমানে ভারতীয় গবেষণা আরও জমকাল বলে বোধ হতো। কিন্তু ভারতীয়

ধর্মযাজকসম্প্রদায় শুধু একটি বিষয়ের কথাই ভেবেছিলেন, সেটি হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ভার নিজের উপর নেওয়া। সামাজিক বিচ্যুতি ছাড়া আর কোন কিছুতে বাধা দেওয়া হয়নি। আর এটা দেখানো কষ্টকর হবে না যে মুরীয় স্পেনের যে বড়াই করা বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক জগতের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির রসধারা সংগ্রহে বেশি বা কম কিছু নয়।

কিন্তু সম্ভবত বৌদ্ধপ্রচারের সকল বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার অনুমান যে জ্ঞানপ্রাপ্ত তাঁর বাণীই হচ্ছে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত। হিন্দুধর্ম শুধু একটি প্রমাণকে স্বীকার করে এবং সেটি হচ্ছে অপরোক্ষ উপলব্ধি। এমনকি শাস্ত্রীয় রচনাগুলিও সাধু-ঋষিদের অপরোক্ষ অনুভূতির কথা মেনে নিয়েছে এবং বেদ নিজেই ঘোষণা করেছে মানুষকে বেদের পারে যেতে হবে। তার মানে বলা যায়, শাস্ত্র নিজেই তার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বলছে যে, উপলব্ধির ফলেই সেগুলি লেখা হয়েছে। জৈনরা বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের ও হিন্দুধর্মের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাইরে যতটা পার্থক্য দেখা যায় আসলে ততটা নয়। একই ভাষা এবং ঐতিহাসিকভাবে একই জাতিত্বকে মেনে নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে এই মহান ঘোষণায় পৌঁছানো গেছে—'বেদের দ্বারা কোন গ্রন্থ বোঝায় না। বেদ হচ্ছে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডার।'

'এ হচ্ছে বেদ', ভারতে এটি আমরা বলি সেই উক্তি সম্বন্ধে, যেটিকে আমরা প্রগাঢ় সত্য বলে বুঝি। সাধারণভাবে শাস্ত্রকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—এক হচ্ছে বেদ, অন্যটি পুরাণ। বেদ সনাতন সত্য। পুরাণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাহিনী, মহাপুরুষ ও অবতারদের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, তাঁদের অলৌকিক কীর্তিকলাপের বিবরণ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সাধারণভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে, কিন্তু সহজেই পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে। যথা, যখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র বলে, 'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালবাসবে', তখন এটি বেদের উক্তি; কিন্তু যখন তারা বলে, 'রাজা হিরোডের সময় যীশু বেথেলহামে জন্মেছিলেন', তখন তা শুধু পুরাণ।

আর তাই যদি উক্তির ঠিক মত ব্যাখ্যা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে বেদ স্বীকার করে নেয় বৌদ্ধধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও কনফুসিয়াস ধর্ম, আর সেই সঙ্গে ভারতের পক্ষে দাবি করা চলে যে এই সত্য এখানেই উপলব্ধি করা গেছে, পাশ্চাত্যে নয়।

ইংরাজ ও ফরাসী মহান চিন্তাবিদদের কয়েকজন বলেন যে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল অবধি বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও জীবনে তার উন্নয়নমূলক প্রয়োগের ফলে। এই চিন্তাবিদরা মনে করেন যে গ্রীস, সাম্রাজ্যবাদী রোম ও ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে তিনটি সংহতি গঠনকারী প্রভাব, যাকে আমরা ইউরোপীয় মানস বলি। প্রাচ্য ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সমানভাবে স্পষ্ট যে এশিয়ার

ইতিহাস হচ্ছে একটি সজীব প্রাণের কথা, যার হৃদয় ও কেন্দ্রবিন্দুরূপে ভারতকে ভাবা যেতে পারে। এইভাবে গণা করলে তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্বন্ধানুসারে সেই সংস্কৃতি, যাকে আমরা ভারতীয় চিন্তা নামে অভিহিত করি, তা হয়ে ওঠে ওই ধরনের এক ঐক্য, অমনি স্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন, উন্নতিতে এমনি সঙ্গতিপূর্ণ, যেমনটি পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান-চিন্তার ক্রমবিকাশ দেখা যায়। ইউরোপের উপর নির্ভরশীল বলে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষ অর্থহীন; কিন্তু তাকে তার স্ব-ভাবে গ্রহণ করলে—আর যে স্থানটি প্রকৃতই তার—এটি আমাদের বিস্মিত করবে না যদি আমরা দেখি যে অতীত ও ভবিষ্যতের মানব প্রগতির মূলকারণস্বরূপ হচ্ছে সে-ই।

ভারত হচ্ছে এশিয়ার হৃদয়। ভারতীয় চিন্তারাশির বন্ধনরজ্জুর এক সুবিধাজনক নাম হচ্ছে হিন্দুধর্ম। দেখা যাবে যে এর বিরাট স্পন্দনের ছন্দের একটিমাত্র মাত্রা নির্ধারণ করতেই হাজার থেকে পনের শত বৎসর লাগে। কারণ কালের এই মাত্রাই মোটামুটিভাবে ভাগ করেছে মহাভারতের যুদ্ধের সময় থেকে বুদ্ধকে, বুদ্ধকে শঙ্করাচার্য থেকে এবং শঙ্করাচার্যকে রামকৃষ্ণও হতে, যাঁর মধ্যে বিরাট সম্পদস্তূপ আত্মসচেতনতার শিখরে পৌঁছেছে। সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক ক্রমবিকাশ যা মহাভারত, মহান ভারত, গড়ে তুলেছে, সেই বীরত্বের যুগ সম্বন্ধে আমরা খুব কমই বলতে পারি, কারণ রাম ও সীতার কিংবদন্তী ব্যতীত অন্ধকার কালগর্ভ হতে আমরা কিছুই পাই না। তবু আমরা জানি যে সময়ের বিভাগটি খুবই দীর্ঘ ছিল নিশ্চয়। যদি যথেষ্ট সময় দেওয়া যায়, তাহলেও তিন হাজার বছর এমন কিছু বেশি মনে হয় না। তার পিছনে আবার ভেসে ওঠে মধ্য এশিয়ার মালভূমিতে অতিবাহিত সহস্র বৎসর, বিশ্ব সভ্যতার উৎস, যেখানে আর্যরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল এবং পশুপালন শিখে, হাতিয়ারের ব্যবহার জেনে, আগুন ও শস্যকে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে এনে, ফলের গাছ রোপন করে এবং সময়কে সপ্তাহে ভাগ করে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের প্রথম সংগ্রামের পর্বটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দিনে সেই মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে সুন্দর স্বপ্ন, কাব্য ও সঙ্গীতের দ্বারা, তারই কিছু অংশ আজও ঋক্‌বেদ নামে পরিচিত হয়ে আছে। আর তার থেকে আমরা জানতে পারি প্রকৃতি সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি কত ব্যাপক ছিল, এমন কি মনের প্রসারতাও—যা ঘোষণা করেছিল, 'আর সন্ধ্যা ও সকাল ছিল প্রথম দিবস।' কত কাল এটি ছিল? সে কি দশ হাজার বছর? মহাভারতের যুদ্ধের আগে কি আরও পাঁচ হাজার বছর গেছে? যাই হোক, পরবর্তীকালের উদ্দীপনা আমাদের অত্যন্ত অসাধারণ লাগে।

এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই যে মহাযুদ্ধের পরে যে সভ্যতা গড়ে উঠছিল, তার বৈশিষ্ট্যময় ফল হচ্ছে আরণ্যক বিদ্যালয়গুলি, যার শিক্ষাকালের বিষয়বস্তু হচ্ছে সূত্র ও

উপনিষদগুলি। কিন্তু আমাদের এটাও ভোলা উচিত নয় যে সেই সময়েই বেদ হয়েছিল এবং সমাজের সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, যার পরবর্তী ফল ভক্তিময় ও সহানুভূতিময় ব্যাখ্যার সঞ্চয়, যেগুলিকে বর্তমানে আমরা মনু বলে জানি।

একমাত্র কষ্ট করেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি এই সময়ের চিন্তাবিদরা বিরাটত্বের চেতনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয় যে কেল্টরা অসীম আবেগের প্রতি ধাবিত হয়। ঠিক সেইভাবে হিন্দুরাও চিন্তার অসীমতা স্থির থাকতে পারে না। আমরা এটা দেখতে পাই খুবই প্রাচীনকালে, যেমন স্তোত্রগুলিতে। 'যখন অন্ধকার লুকানো ছিল অন্ধকারে, প্রভেদবিহীন, যেমন জলরাশি', সৃষ্টির মহাসঙ্গীতের শুরু ওইভাবে। উপনিষদের ব্যাপ্তি এর চেয়ে। 'অসত্যের মধ্যে যাঁরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, মৃত্যুর মধ্যে যাঁরা জীবনকে পান, বিশ্বপ্রপঞ্চের অনিত্যতার মধ্যে যাঁরা সেই এককে জানেন, তাঁরাই চিরন্তন শান্তি করেন, অন্য কেউ নয়, অন্য আর কেউ নয়।' বেদ হচ্ছে সেই মূলধন, যার আর্য সংস্কৃতি ভারতকে অধিকার করা শুরু করেছিল এবং উপনিষদের এই প্রচুর ও সামান্যীকরণ বর্ণনা করে নতুন স্থানে জাতীয় মনের প্রথম সাফল্যের। নিশ্চয় এই হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের বিস্ময়কর সত্যের রহস্য যে পুনরুজ্জীবনের সকল যুগকে, যেমন শঙ্করাচার্যের এবং এমন কি গুরু নানকের ও রামানুজের মত পুন ক্ষুদ্র আন্দোলনগুলিও, উপনিষদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে এবং তার নিজেদের সংগঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়েছে। এই আলোকে আমরা অ করতে শুরু করি যে মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনা করে প্রথম কালের শেষাংশে বৈদিক উদ্দীপ আপাত অবসান এবং কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের শক্তিতে পৌরোহিত্য আধিপত্যের পুনঃ প্রতি

প্রাক বৌদ্ধযুগে ভারতীয় অরণ্যের ম্লান সন্ধ্যা ইতিহাসের কানে ধ্বনি- তুলেছিল স্তব ও প্রার্থনা। কিন্তু পরবর্তী যুগ আমাদের নিয়ে যায় গ্রাম ও শহরে জীবনের মাঝে। কারণ জনসাধারণের সঙ্গীত ও গাথা তখন দানা বেঁধে ওঠে মধ্যে। তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ—সেই জীবনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দ্বারা আলোড়িত সম্পূর্ণ উপনিষদীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি, যে সংস্কৃতি হচ্ছে জাতীয় স্বপ্নের পূর্ণ নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল সাধারণের মধ্যে সহজাত ও ভারতীয় পরিবেশে বৈশিষ্ট্যজ্ঞনক, সেই সমস্ত ধর্মীয় ধারণাকে একত্রিত করা ও বুনে সম্পূর্ণরূপ কাজে। অকস্মাৎ শক্তির বৃদ্ধি হলো তীর্থযাত্রা ও মূর্তিপূজার মতো কাজগুলির ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কম-বেশি অজ্ঞাতসারে ব্যস্ত রইল মূর্তি, প্রতীক ও অনুষ্ঠানের সত্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যায়, যে সত্য ছিল জাতির প্রথম উপলব্ধি। এই বৌদ্ধযুগের পর্যায় বৃহত্তর সুযোগ খুব বেশি করে ছিল তার রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও উপধর্মীয় সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে।

কিছু মন্দ অবশ্য এসেছিল তত্ত্বের তৎকালীন বিশদ ব্যাখ্যার সঙ্গে। তত্ত্বগুলির প্রয়োজন ছিল হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণতার কাছে পরিণামে নিজেদের প্রমাণিত করার। আমরা বুঝতে পারি যে মঠবাসী হওয়ার মত জাতীয় শক্তির অনেকখানি আকর্ষণ করে নিয়েছিল গার্হস্থ্যধর্মের নিরাপদ পথ থেকে, যাতে শুধু পারিবারিক জীবনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি, নীতিও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ নেই যে এই সময়ে এবং এই ভুল সংশোধনের জন্য আদর্শের গীত সুস্পষ্টভাবে গাওয়া হয়েছিল, প্রথমে কালিদাসের কণ্ঠে তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে এবং পুনরায় রামায়ণভিত্তিক 'রঘুবংশম' কাব্যে রামের জন্য সীতার ভালবাসার মধ্যে, যা পত্নীত্বকে গৌরবময় করে তুলেছিল, যার সামনে মঠ জীবনের বৈরাগ্য ও বিশ্বাস ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

নীতির শুদ্ধতা বিচার বিষয়ে আমরা এটাও বিশ্বাস করতে পারি যে, সকল প্রকার ধর্মীয় ধারণাকে যে সাদর অহ্বান জানানো হয়েছিল, বিশেষ করে এই যুগের শেষ শতাব্দীগুলিতে, তা পরিচালিত করেছিল জনপ্রিয় ধারণাগুলির উপর অনুচিত গুরুত্ব আরোপ করায়, এমন কি প্রতীকের অপ্রয়োজনীয় বহুত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় এবং সম্ভবত পূর্ব-প্রচলিত প্রতীকগুলির অমার্জিত ও স্থূলভাবে ব্যাখ্যায়।

কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কোনকালেই হিন্দুধর্মের নিয়ম ছিল না। বরং সঙ্কটমুহূর্তগুলিতে উচ্চতম আদর্শের পতাকা বার বার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেই ধর্ম-বিশ্বাস অগ্রসর হয়েছিল। যে যুগের কথা আমরা বিবেচনা করছি, সেই যুগে ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রতিভার এই সঞ্জীবতার নিয়ম, অবতারদের আবির্ভাবের নিয়ম, ভালভাবেই জ্ঞাত ছিল। 'যখনই ধর্ম ক্ষয়িষ্ণু হয়, যখনই অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুর্জনদের বিনাশ করার জন্য, প্রকৃত ধর্ম দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য আমি বারে বারে জন্মগ্রহণ করি।' ভাগবদ্‌গীতায় এমন উক্ত হয়েছে,—আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী কখনও এর চেয়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়নি, যেমন এটি হয়েছে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব দ্বারা।

এই আশ্চর্য বালক—কারণ তিনি বত্রিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন—অষ্টম শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বহু মানুষ যখনও তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি এক মহান কর্তব্য সম্পূর্ণ করে ফেলেন। প্রাচ্য সংস্কৃতির চরিত্রগত বিশেষত্ব সর্বদাই হচ্ছে এক ভাষ্য রচনা। এই ধরনের সাহিত্য দ্বারা ভবিষ্যৎ দৃঢ়ভাবে অতীতের সঙ্গে সংবদ্ধ হয় এবং যদিও সংযোগকারী তত্ত্বের গতিশীল শক্তি বিদেশীদের কাছে অস্পষ্ট হতে পারে, তবুও এটি সুস্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে প্রাচ্য মনের কাছে পৌঁছায়। সমগ্র কনফুসিয়াসধর্ম ধরা আছে এঙ্কিং বা 'বুক অব চেঞ্জ'-এর টীকায় এবং ইউরোপীয় প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মকে প্রায় বর্ণনা করা যায় পবিত্র খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের উপর এক বিশেষ ধরনের ভাষ্যরূপে। সংস্কৃত সূত্রগুলি সমালোচনামূলক রচনা, আর এমন কি বিশেষভাবে এই সমালোচনাই দাবি করে, কারণ সূত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে সুতো

এবং সেই ধরনের রচনার উপরই এটি প্রযুক্ত হয়, যা এক নির্দিষ্ট যুক্তির মূল পথ ধ চলে এবং প্রতি বাক্যের শেষে সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়। এই সাহিত্য-প্রথা সম্ভ প্রাচ্য দেশেই পাওয়া যায় এবং যখন স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করাই রচনার প্রধান কা ছিল সেই যুগ থেকেই এর শুরু। স্পষ্টত এক নির্দিষ্ট সূত্রের উপর নতুন টীকা রচন দ্বারা প্রতিভাবান মানুষ এক নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে সমস্ত প্রচলিত মতবাদের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করতেন নিজের শক্তিতে। অতএব এটি মোটেই বিস্ময়কর নয় শঙ্করাচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের উপর টীকা রচনা।

তাঁর জীবিতকালে যে সমস্যাগুলি ভারতীয় মনের সম্মুখীন হয়েছিল, একমা ব্যতিক্রম হচ্ছে যে দেশ তখন ধনী ও সমৃদ্ধশালী ছিল, তা নিশ্চয়ই অদ্ভুতভাবে বর্তম কালের মতোই এবং এই সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর যে তাঁর চোখে ... জাতীয় আকার পরিগ্রহ করেছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি তাদের আদিম সারল্য হারি ফেলেছিল, এবং সম্ভবত তাদের বাধ্য করার শক্তিও। জাতীয় ও বিজাতীয় (কা 'গোঁড়ামি' শব্দটি ছিল এশীয় মতানুসারে 'জাতীয়' অর্থবোধক) ধারণাগুলি হয়েছি পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তকর। মানুষ বাস করছিল এবং ধর্ম-বিশ্বাসের সম্প্রতি সম্প্রদায়গত বিকশিত চিন্তার জগতেই বেশি করে এবং সর্বোচ্চ উপলব্ধির প্রতি নির্দেশ কঠোর অনুজ্ঞাগুলির, এর প্রাচীনত্বের, এর সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত ভুলে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী হয়েছিলেন উপাস্য প্রধান বস্তুগুলির অন্যত. সম্প্রদায় ও রাজ্যগুলি সমানভাবেই তাদের পারস্পরিক ঐক্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিল আর কখনও সম্ভবত এশীয়বাসীরা নিজেদের শুধুমাত্র ঐহিক উন্নতির মধ্যে আবদ্ধ ফেলার এত কাছাকাছি আসেনি।

এই রকম মুহূর্তে সমগ্র জাতীয় প্রতিভা শঙ্করাচার্যের মধ্যে আর একবার জাগ্রত উঠল। যুগের সর্বপ্রকার বিলাসিতা ও উজ্জ্বলতার মাঝে, পৌরাণিক যুগের সমৃ বর্ণোজ্জ্বল রুচি সত্ত্বেও তাঁর আত্মা বৈদিক মন্ত্রের প্রাচীন ছন্দের রহস্যময় গুঞ্জরণ শু পেয়েছিল এবং ধর্ম-বিশ্বাসের প্রাণবন্ত শক্তি আত্মাকে পরম জ্ঞানে পরিচালনা করা কাছে হয়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের প্রতিটি স্তরের রহস্য। বেদের প্রতি প্রেমের আ তিনি জ্বলে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের স্তবগুলির মধ্যে বেদের প্রাচীন সৌন্দর্য শক্তির কিছুটা আছে এবং তাঁর গ্রন্থগুলিকে প্রায় বলা চলতে পারে যেন উপনিষদে তীক্ষ্ণতম ও বোধগম্য বাক্যগুলির উধৃতির শৃঙ্খল, যার সংযোগগুলিতে আছে অবদান।

শঙ্করাচার্য তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে পরিভ্রমণ করেছেন তাঁর জন্মস্থান দাক্ষি থেকে সুদূর হিমালয় পর্যন্ত এবং তাঁর এই ভ্রমণের মধ্যে যা কিছুর সংস্পর্শে এসেছে তা তাঁর মনের একটি কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছে। প্রতিটি উপাস পদ্ধতিকে তিনি মেনে নিয়েছেন, এমন কি প্রথমে যেগুলির বিরোধী ছিলেন সেগুলি

কারণ তিনি সর্বদা দেখেছিলেন যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম'-এর ভাবটি শুধু বৈদিক নয়, পৌরাণিক লক্ষ্যেরও বটে। এই নীতিই তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বারোটি যুগান্তকারী ভাষ্যে, বিশেষ করে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনায়—বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে। আর 'অদ্বৈত-দর্শন' নামে এই তত্ত্ব ভারতের প্রকৃত ঐক্য সাধন করেছে হিন্দুধর্মের অবশিষ্ট কালের জন্য।

পাশ্চাত্যবাসীরা শঙ্করাচার্যের যেমন ব্যক্তিত্ব ছিল, তেমন ব্যক্তিত্ব মোটেই কল্পনা করতে পারবে না। এত অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে কম করে দশটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের (দশনামী সন্ন্যাসী দল) প্রতিষ্ঠা করা, যার মধ্যে চারটি আজও তাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখেছে; বিরাট সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করা, যাতে এক বিশেষ দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করা যায় এবং ভারতের পাণ্ডিত্য বোধের উপর নিজেকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, যাকে নাড়া দেওয়ার পক্ষে বারো শ' বছরও যথেষ্ট নয়; এমন সব স্তোত্র রচনা করা যাদের উচ্চভাব বিদেশী ও অশিক্ষিতের কানেও নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে, আর এই একই সময়ে নিজের শিষ্যদলের সঙ্গে বাস করা সাধুদের সর্বপ্রকার উজ্জ্বল আনন্দ ও সরল করুণাধারা নিয়ে—এই মহত্ত্বের আমরা প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু ধারণা করতে পারি না। আমরা বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারি অ্যাসিসির ফ্রান্সিসের ভক্তি, অ্যাবেলার্ডের বুদ্ধি, মার্টিন লুথারের শক্তি ও স্বাধীনতা আর ইগনেতিয়াস লয়োলার রাজনৈতিক দক্ষতা, কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে এই সমস্ত মিলিত হয়েছে এটা কে কল্পনা করতে পারে?

পরবর্তীকালের সমালোচকরা শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধদের নিগ্রহকারী রূপে অঙ্কিত করেছে। যেহেতু তিনি মুক্তির এক একচেটিয়া উপায় প্রচারের পরিবর্তে পুরাণগুলির ও তন্ত্রগুলির এক সমন্বয়ের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন; যেহেতু তাঁর কাছে লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট এবং নেতিবাচক এক উক্তি নয়, আর যতদূর সম্ভব তিনি দর্শন ছাড়া অনুষ্ঠানের, আলোকবিহীন উপাসনার অসারতার উপর জোর দিয়েছিলেন সেই কারণে কোন না কোন সম্প্রদায়ের শত্রু বলে তাঁকে মনে করা হতে পারে। এ কথা বলা প্রায় অপ্রয়োজনীয় যে এই শত্রুতার চরিত্র সম্পূর্ণ বিতর্কমূলক এবং উত্তর সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের কাছে সুস্পষ্টতর ঐতিহাসিক জ্ঞান তাঁকে প্রকাশ করবে নিগ্রহকারীর সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবে, বরং প্রত্যাদিষ্ট ধর্মীয় গুরু জাতির আর এক দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে জাতির মধ্যে পড়েন তাদের নিজেদের ধর্মসংস্কারক নেতা নাগার্জুন।

সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধধর্ম, তার পরবর্তী পুরাণগুলি সহ, জন্মলাভ করেছে সাধারণ মনের দ্বারা, জনসাধারণের সৃষ্টি। শঙ্করাচার্যের কর্ম ছিল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলিকে ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করা, পৌরাণিক কল্পনাকে উপনিষদীয় নীতির সঙ্গে কঠিনভাবে সংবদ্ধ করা। মায়া, কর্ম, পুনর্জন্ম ও অন্যান্য প্রচলিত চিত্তাকর্ষক শব্দগুলির সংজ্ঞা নির্ধারণ তিনি করেছিলেন এবং বর্তমানকালেও হিন্দুধর্মের যে পরিভাষা রয়েছে,

তা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁর জাতি কর্তৃক তাঁকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করাটা শুধু প্রদর্শন-করে যে জাতির চিন্তা ও অভিলাষের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে তাঁর মিল ছিল।

শঙ্করাচার্যের ঠিক পরবর্তী দুই বা তিন শতাব্দীকে ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকার যুগ হিসাবে সাধারণত বলা হয়। এই শব্দটির প্রয়োগ খুবই অস্পষ্ট। কোন্ অর্থে এটি অন্ধকার যুগ ছিল? এই শতাব্দীগুলিতে ছিল বীরত্বের প্রাবল্য এবং বহু রাজপুতদের বংশে চারণকবিদের গাথা এখনও সংরক্ষিত আছে, যা একদিন ভারতীয় ঐতিহাসিকদের উত্তরপুরুষকে সক্ষম করবে তাদের ইতিহাস পড়তে। এমন কি এ যুগের যুদ্ধগুলি কখনও ধ্বংসাত্মক ছিল না, কারণ তাদের বীরত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া, প্রাচ্যের সামরিক অভিযান সর্বদাই অসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখত। পানীয় জলবাহী ও রসদবাহী পরিচারকদের জীবনকে এশীয় যুদ্ধে বিশেষভাবে মান্য করা হতো। একথা প্রকৃতপক্ষে ঠিকই বলা হয় যে ইউরোপীয় জিপসীরা এর এক দৃষ্টান্ত। এই দরিদ্র লোকেরা ছিল মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, যারা সৈন্যদলের অভিযানের সঙ্গে থাকত। যেখানেই তাঁবু খাটানো হতো, তারা সেখানেই আধ ঘণ্টার মধ্যে বাজার বসিয়ে দিতে পারত এবং তাদের জাতীয় মর্যাদায় বাধতো এক পক্ষের গুপ্ত কথা অন্য-পক্ষকে বলতে। যখন চেঙ্গিস খাঁ হাঙ্গেরী অভিযান করেছিলেন, এই বিশেষ গোষ্ঠী সেখানে গিয়েছিল এবং আর কখনও প্রত্যাবর্তন করেনি।

কিন্তু শুধু এই সৈন্যদলের অনুগামীদেরই আইন মতো রক্ষা করা হতো না, যেমন এখন রক্ষা করা হয় ইউরোপের 'রেড ক্রশ সিস্টারহুড'কে। ঠিক এই ধরনের বিবেচনা করা হতো ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের ও নিজেদের নেহাইয়ে কর্মরত কারিকরদের সম্পর্কেও। প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহে নবীন শস্যের সম্মান রক্ষা করা হতো যেমন আধুনিক যুগে করা হয় কলোন ক্যাথিড্রালে বা নোতর দাম দ্য প্যারীতে। এই পারিপার্শ্বিকতায় যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় শুধু এক মারাত্মক প্রতিযোগিতা, যাতে যুদ্ধরত মানুষগুলি ছাড়া আর কেউ ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে না।

কিন্তু এই ধরনের প্রতিযোগিতাগুলি যদি ধ্বংসাত্মক না হয়ে ওঠে, তাহলে সামরিক প্রতিরক্ষার সাধারণ কর্তব্য সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষাদানে এগুলি সফল হয় না। এই ফললাভ করা যায় শুধু তখনই, যখন এক ধর্মমত সমগ্র অঞ্চলের রণধ্বনি হয়ে ওঠে জাতিনির্বিশেষে সকল মানুষকে অধিকার দান করে সংগ্রামের। জাতীয়তাবোধকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য এই প্রয়োজনীয় অধিকার মুসলমান অভিযান প্রদান করেছিল এবং কল্পনা করা কষ্টকর যে অন্য কোন উপায়ে এই শিক্ষা এত ব্যাপকভাবে প্রদান করা যেত।

শক্তির যে মহাবন্যা শঙ্করাচার্য থেকে নির্গত হয়েছিল, তা ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছিল। রামানুজ, মাধবাচার্য, রামদাস ও তুকারাম, শিখ গুরুবৃন্দ ও গৌরাঙ্গ সকলেই পর্যায়ক্রমে এর থেকে উদ্ভূত। যেখানে

যেখানে এটি মুসলমান চেতনাকে স্পর্শ করেছিল, এটি প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে এক উত্তমরূপে কেন্দ্রীভূত জাতি সৃষ্টি করেছিল। যেখানে এটি মুসলমান ধর্মের সংস্পর্শে আসেনি, যেমন দেশের দক্ষিণতম প্রান্তে, এই আধ্যাত্মিক শক্তি জাতীয়ভাবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। আর যেখানে এটি নিশ্চিত সংঘর্ষের মধ্যে যায়নি, যেমন চৈতন্যের যুগে বাংলায়, সেখানে জাতীয় অস্তিত্ববোধ কম বেশি প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। অতএব শঙ্করাচার্য উত্তর যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনকে কখনই বৈপ্লবিক আক্রমণ বলে গণ্য করা চলে না, যেহেতু নতুন শক্তির অধীনে এশীয় রীতিগুলির কোন হানি হয়নি। বিলাসিতার নতুন শিল্পকলা আমদানী করা হয়েছিল, কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় রইল। ভারতবর্ষে আরও কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা হলো, যা অশোকের সাম্রাজ্যের পরে আর সম্ভব হয়নি, কিন্তু কোন নতুন শক্তি কার্যকর হয়ে ওঠেনি তার সন্তানদের কৃষিব্যবস্থার শ্রমদাস বা প্রজার অবস্থায় পরিণত করতে। আর আমরা দেখেছি, এমন কি যখন পাশাপাশি বাসকারী হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে ওঠে, সেটি এক পক্ষের অন্যপক্ষকে পরাজিত করার চেয়ে জাতি ভাইদের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে গণ্য করা উচিত, যা স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। বিজয়ী বিজয়ের পর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য পদচ্যুত বা মত-পার্থক্যের জন্য অবিচার করত না। 'নবাবের রাজত্বকালে বাংলার বড় বণিক ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিরা হিন্দুই রয়ে গিয়েছিলেন, যেমন স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা হিন্দু রাজত্বে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস বজায় রাখত।'

স্পষ্টতা ও আত্ম-চেতনা, যার সংজ্ঞা হিন্দুধর্মে সংযুক্ত হয়েছিল, তা কোনক্রমেই এর সর্ববাদিতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দী যে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করল জাতীয় উন্নতির শীর্ষবিন্দুরূপে তা হচ্ছে রামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁর নামটি হচ্ছে সকল সম্ভাব্য আদর্শ ও সকল সম্ভাব্য চিন্তাধারার সংশ্লেষণের আর একটি প্রতিশব্দ। এই মহান জীবনের মধ্যে হিন্দুধর্ম খুঁজে পায় শঙ্করাচার্যের দর্শনকে রক্তমাংসের শরীরে এবং পরিণামে সচেতন হয়ে ওঠে যে কোন একটি বিশ্বাস বা ধারণার আত্মাকে তার লক্ষ্য ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবার ক্ষমতার যথেষ্টতা সম্পর্কে। তারপর এটি শুধু সত্য নয় যে হিন্দু মন সব ধরনের জীবন বা উপাসনাকে সহ্য করে বা বোঝে; সব ধরনই ন্যায়সঙ্গত, বরণীয়, তার আরও গভীরভাবে ভালবাসার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে যে কোন ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীদের কাছে, সে সম্প্রদায় গোঁড়া বা আধুনিক, দার্শনিক বা জনপ্রিয় যাই হোক না কেন, চরমতম অপরাধ হবে অন্য কারও নিন্দা করা, যেন সেটি 'সনাতন-বিশ্বাস'-এর বহির্ভূত কিছু। 'মানুষ সত্য থেকে সত্যে অগ্রসর হয়, ভ্রান্তি থেকে সত্যে নয়'—ভবিষ্যতে বিশ্বাস গঠনের নিয়ম এটি হয়ে উঠবে।

এই সূত্রে আমরা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতাম, যদি না সেটি ইতিমধ্যেই ঘটে

যেত, যে এই শিক্ষকের কোন বড় শিষ্য সমগ্র জাতির পক্ষে ঘোষণা করবেন যে, হিন্দুধর্মের চরম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইষ্ট-দেবতার নীতিটি গ্রহণ করা, অর্থাৎ প্রতি মানুষের অধিকার আছে নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস নির্বাচনের এবং কেউই জোর করে একই বিশ্বাস অন্য কারও উপর চাপাতে পারে না।

তাহলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তা তার সম্পূর্ণতা নিয়ে প্রকাশিত হয়—সম্প্রদায় নয়, কিন্তু সংশ্লেষণ; বিশেষ উপাসনাগার নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয়,—যেন ব্যক্তি স্বাধীনতার এক ধারণা, পৃথিবী যা জানে তার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। কিছু তত্ত্ব যেমন মায়া, কর্ম, পুনর্জন্ম,—বৌদ্ধধর্মের দ্বারা যা জনপ্রিয় হয়েছিল,—এবং মুক্তি বা আত্মদর্শন—যার বীজ ছড়িয়েছিলেন শঙ্করাচার্য ও সুফিরা একইভাবে—এ সবই হচ্ছে এক বিরাট ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এগুলি কোন স্থানে বা কোনভাবে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় না। কারণ এটা হিন্দুধর্ম প্রতিভাকে অন্য যে কোন ধর্মনীতির কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে বলা ততটা অস্বাভাবিক হবে যতটা অক্সফোর্ডের এক জনকে আরিস্টোটলের নীতির বদলে প্লেটোর নীতির প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনের কথা বলা। এইভাবে এটাও বোঝা যায় যে মুসলমান যুগের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারক সম্প্রদায়দের সম্পূর্ণ অধিকার আছে নিজেদের হিন্দু বলায়, ঠিক যেমন আছে সবচেয়ে গোঁড়া শিবের পুরোহিতের বা সব চেয়ে শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতের।

তাহলে আমরা দেখছি যে, কোন সময়ের ভারতীয় ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সংঘর্ষের কাহিনীরূপে পাঠ করা অবশ্যই ভুল, যদিও এই ভুলটিকে ইউরোপীয়দের রাজনীতির উপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা হতে সম্ভবত বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অন্যদিকে, এটিও খুব পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় না যে শঙ্করাচার্যের যুগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালটুকুর মধ্যে ভারতীয় চিন্তাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হচ্ছে মুসলমান বস্তুটিকে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে এটি হয়েছিল বহু যুগ ধরে বর্ধিত বিশাল জটিলতার মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাকে উপলব্ধি করা।

এটি কথিত আছে যে জাতিগুলি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাগুলি এক বিশেষ কার্য-সাধন করে, যেমন মানব সমাজের অঙ্গরূপে ব্যষ্টিরা সমষ্টির মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করে। যদি তাই হয়, তাহলে এটা প্রায় দেখা যাবে যে ভারতের সীমার মধ্যেই রয়েছে জাতির কেন্দ্রবিন্দু বা মেরুবিন্দু। বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের বিরাট কার্য এই সীমানার মধ্যে আবদ্ধ জনগণের উপরই বর্তেছে। এটি যথেষ্ট নয় যে মুসলমানদের গোচারণ ক্ষেত্রভূমিতে বসবাস করা, মঙ্গোলীয়দের থিয়ান শানের পিছনে নিশ্চিন্তে থাকা এবং আর্য ও দ্রাবিড়দের দক্ষিণের অন্তরীপে পাশাপাশি শান্তিতে অধিবাস করা উচিত। এটি গোড়া থেকেই বিধিনির্দিষ্ট, বস্তুগুলির প্রকৃতির মধ্যেই এটি এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না যে আগে হোক বা পরে হোক সিন্ধুনদের দেশে এগুলি মিলিত হবে এবং তাদের

পরস্পরের তাৎপর্য ও দায়িত্ব শিক্ষা করবে। বৌদ্ধধর্মকে এক বিষয়ে বলা যেতে পারে পূর্ব এশিয়ার শুধুমাত্র সংশ্লেষণ। নব-হিন্দুধর্ম (খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থেকে যে শব্দটি সৃষ্টি হয়নি, সেটি ধার করে) হচ্ছে সমানরূপে আর্যচিন্তাধারার মধ্যে সেমিটিক নিয়মাবলীর এক স্থান নির্দেশক এবং কে বলতে পারে এইসব সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে কী জন্মলাভ করবে, যার মধ্যে দিয়ে এশিয়া নিজেকে দেখবে—যা তাকে এতকাল বলা হয়েছে, 'ভৌগোলিক খণ্ডগুলির এক স্তূপবিশেষ', বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সম্মিলনও নয়, পারস্পরিক আশা ও অভিযোগের সংমিশ্রণের ফলে এক যান্ত্রিক সংযোজন, তা নয়, কিন্তু বিরাট এক প্রাণশক্তি, এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রবল প্রাণস্পন্দন বন্যায় ভরা, সাধারণ মূল ও সাধারণ আচার-ব্যবহারে মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত? এই ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় কী মূল্যদান আমরা করতে পারি, তা নির্ভর করবে মানব সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশে এশিয়ার স্থান সম্পর্কে যে ধারণা আমরা করতে ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু যাঁদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাবী নীতিবোধের দূরদৃষ্টি আছে, তাঁদের কাছে এটি ঠিকভাবে বোধ হবে যে এই প্রশ্নটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দশম অধ্যায়
প্রাচ্য অভিজ্ঞতা

আধ্যাত্মিক বুদ্ধি বিশ্বাস করতে চায় না গোঁড়া মতবাদ বা অলৌকিক ঘটনার কোন সুখবর। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস নিজেই দেখিয়েছেন যে প্রার্থনা ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিবর্তনে সক্ষম নয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, সেটি পুরণের উপায়রূপে নিযুক্ত হতে পারে। বইয়ে যা বলা হয় বা কথায় যা ব্যক্ত করা হয়, সত্য তেমন কিছু নয়। তা হচ্ছে স্বপ্রকাশ ও সনাতন। আমাদের দেখার ও বলার সব কিছু ধরনের পিছনে এটি আছে, কিন্তু এক মিথ্যা-মায়ার মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের সব কিছু শিক্ষা একত্রিত করে যেন এক ফুলদানি বা পাত্রে রাখা হয়েছে খ্রীষ্টীয় আত্মার সুন্দর কাহিনী, যার মধ্যে আমরা পাই কেন্দ্রীয় সত্তাকে।

আর এটা ঠিকই। কারণ মানুষের দুঃখের প্রকৃত বিষয় কী, রুটির ক্ষুধা, না মুক্তির বাসনা? উত্তরটি সন্দেহজনক নয়। আর এটা ঠিকও হতে পারে যে আমাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি জনের কোন ধারণা নেই যে কী আমরা সঞ্চয়ের জন্য সন্ধান করি অথবা কিসের থেকে আমরা ছুটে পলায়ন করতে উদগ্রীব? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে মানবজাতি আধ্যাত্মিক কিছু এক উন্নয়নের জন্য অবর্ণনীয় বাসনায় অধীর, যেটি সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, কিন্তু তাকে আত্মা বলে অভিহিত করে। আর কোন পরিকল্পনা, এমন

কি সবচেয়ে অবাস্তবও, এই বস্তুলাভের উপায় নির্ধারণ করলে কিছু পরিমাণে অনুমোদন ও অভ্যর্থনা পাবে, অবশ্য যিনি এটি প্রদান করতে চান, তাঁকে নিজের উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাবান হতে হবে।

আমাদের জ্ঞাত সবকিছুর মধ্যে সম্ভবত সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে ক্যাথলিক-ধর্মের চিত্রাবলী, যাতে অঙ্কিত হয়েছে তার মুক্তিদানের শপথ। জীবনের ক্ষুদ্র ভেলা, যাতে আত্মা সমুদ্রে ভাসমান হয়েছে, ঢেউয়ের দোল্যানি ও ভেসে বেড়ানোর মধ্যে পরিচালিত হবে সেই বিজ্ঞানের দ্বারা, যাকে খ্রীষ্টধর্ম নামকরণ করেছে পরিত্রাণের জ্ঞান, মৃত্যুর রহস্যপূর্ণ রূপান্তর, যার দ্বারা আত্মা শুদ্ধির তীরে পৌঁছায় এবং পরিণামে শুদ্ধিকরণের বেদনা নিঃশেষিত হয়, স্বর্গে তাকে গ্রহণ করা হয় এবং ঈশ্বরের দর্শনলাভ হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রতীকগুলি কি কিছুটা স্থূল নয়? স্বর্গ আর নরক, পুরস্কার ও শাস্তি! একটি শিশুর পক্ষেও কি এর পারে যাওয়া সম্ভব নয়? আমরা কি বর্ণনা করার চেষ্টা করতে পারি যে নীতিবোধের দ্বারা কী বোঝায়, অবশ্য এ কথা না বলে যে আমরা ভালকে বেছে নেব, যদিও তার জন্য অসংখ্য যুগ দুঃখ পেতে হয় এবং মন্দ থেকে দূরে থাকব, তা আমাদের কাছে স্বর্গ এনে দিলেও? তাছাড়া, আমাদের মধ্যে এমন পিতামাতা কি নেই, যিনি এক শিশু প্রতিবার এক টুকরো মিছরী চুরি করলে নাটকীয়ভাবে বিচার করতে অস্বীকার করবেন? অনন্তকাল দ্বারা গুণ করা এক বিরাট বিশ্ব, শুধুই কি এক বিশাল পাঠশালা? অথবা আমরা কি এটা কোথাও শিখব না যে আত্মসংযম নিজেই হচ্ছে এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ? সেই মুক্তিতে কেমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি, যা এক ঘটনারূপে ব্যক্ত করা হয়েছে? যা আমাদের বাইরে থেকে অপরিবর্তনীয় সুখ প্রদান করে? জ্ঞান ও প্রশংসার এক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে?

আমরা কি নিজেদের মধ্যে অনুভব করি না এই কৃত্রিমতাগুলির বিরুদ্ধে এক অসংযত প্রতিবাদ, যা বস্তুগুলির স্বভাব, তার জন্য এক অনমনীয় দাবি এবং কোন নাটকীয় সাজসজ্জার অপ্রয়োজনীয়তা; সমভাবে স্বর্গ ও নরক, মুক্তি ও শাস্তি এই পরিবর্তনগুলি থেকে অব্যাহতির এক বাসনা এবং এক নির্দিষ্ট উপায় খুঁজে বের করতে, কোন স্থায়ী মানসিক সাম্যের কেন্দ্র, যা আমাদের প্রদান করবে পরস্পরবিরোধী তত্ত্বগুলির সকল ধারণা থেকে মুক্তি এবং পরিণামে জ্ঞানলাভ হবে তাঁর, যিনি নিজেই বস্তুস্বরূপ? অথবা আমরা কি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমাগুলির সঙ্গে এমন প্রেমে আবদ্ধ—আমাদের মঙ্গল অপরের অমঙ্গল এই সত্য সমেত—যে বর্তমানের আনন্দ ভবিষ্যতের বেদনা, যে আমরা যদি পারি তো এই অভিজ্ঞতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখব?

অন্তত এমন কোন প্রতিবাদ প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে পাশ্চাত্যবাসীর ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নগুলির দ্বারা। প্রাচ্যবাসী বলে এ সবই দৈহিক, এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং সেই হেতু পরিবর্তন ও ধ্বংসের নিয়মের অধীন স্বাভাবিকভাবেই সকল যৌগিক পদার্থের উপর প্রযুক্ত হবে, তা সে আগে হোক বা পরে হোক।

ঈশ্বর দর্শনের উচ্চ কল্পনায় সে গভীরতর সত্যের আভাস পায়, কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করে সময় ও অনন্তের মধ্যে এই প্রভেদ কেন ? অসীম ঈশ্বরের ধারণা সময়ের শর্তে কি বদ্ধ হতে পারে ? ও, অসীম, অনাদি, কোন কারণেই কার্য নয়, কোন কার্যের কারণ নয়, তাঁর জ্ঞানের জন্য ! সেই তাঁকে পেলে, আর একমাত্র তাকেই, আমরা স্থায়ী আনন্দের, অপরিণামী অস্তিত্বের সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু যদি একান্তই পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা এই পার্থিব জীবনে বর্তমানেই, আর নাহলে কখনই নয়। ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা নিশ্চয় হবে, আর তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, যখন ইন্দ্রিয়গুলি সর্বাপেক্ষা সক্রিয়, ব্যষ্টিসত্তাকে মগ্ন ও পরিবর্তিত করবে, যখন ব্যক্তিত্ব সকল প্রকার আগ্রহকর দাবি পূরণে সক্ষম বা চির অবিশ্বাস্য অবস্থায় থাকবে, যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের এক দোলা যা একদিন বিপরীতমুখী হবে।

এই জ্ঞানকেই ভারতবর্ষ বলে একত্ববোধ, সমস্ত প্রকৃতির দ্বারা একে ধীরে ধীরে গ্রহণ, ফলে এটি আর কথার কথা থাকে না, বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে, যাকে ভারতবর্ষ অভিহিত করে উপলব্ধি নামে। এইভাবে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম হয় অসার ও মৃত অথবা ক্রম বর্ধমান জ্ঞানের আগুনে দগ্ধ, যাকে আমরা আধ্যাত্মিকতা বলে জানি। সর্বোত্তম প্রতিভা হয়ে ওঠে পরম আনন্দলাভের পথে শুধুমাত্র একটি ঘটনা। আর ফিডিয়াসের অনাসক্ত বাসনা, বিয়াট্রিসের জন্য দান্তের প্রেম, সেণ্ট টেরেসার 'গৌরবময় শূন্যতা' এবং পদার্থবিদ ফ্যারাডের মুখমণ্ডলের আলোক, সবই সেই অক্ষমালার সমান ধরনের একই রকম অক্ষ, যেখানে আত্মার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। কারণ ভারতীয় চিন্তাবিদের কাছে বিভিন্ন আঙ্গিকের এই সমগ্র কাহিনীর মূল কথা হচ্ছে বহুত্ববোধ হতে একত্ববোধে পৌছানোর সংগ্রাম এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রতিটি উন্নয়নই এরই অভিমুখে যাবার জন্য এক পদক্ষেপ বলে গণ্য হয়। ক্রীড়ামগ্ন বিড়ালছানা পশু মানসের সমগ্র বিস্ময় ও অসংলগ্নতা নিয়ে প্রথমে এক বস্তুর ও পরে অন্য বস্তুর পিছনে ধাবিত হয়, যখন ক্ষুদ্রতম শিশুও মানব ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করবে উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার অধিকতর অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতায় নিম্নশ্রেণীর মানুষ সংবেদনের প্রতিটি উদ্দীপনায় ইতস্তত পরিচালিত হয়, আর আর্কিমিডিস চিন্তায় এমনি মগ্ন হন যে তিনি তাঁর কাছে রোমান সৈন্যের উপস্থিতি টের পান না, আর তার গণনা শেষ করার চেয়ে বেশি সময় ভিক্ষা করার কল্পনাও করেন না।

এটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে প্রাচ্য চিন্তাবিদের কাছে মানুষ স্বয়ং এক বিশ্ব, কারণ সকল পার্থক্য মনের মধ্যেই অবস্থিত। কার্যকর এক প্রকল্প হিসাবে ভারত এই তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারে যে সকল বিজ্ঞানের সংশ্লেষণ হচ্ছে সমাজতত্ত্ব, কিন্তু তার নিজস্ব মূল বিশ্বাস হচ্ছে যে এই স্থান অধিকার করে আছে মনস্তত্ত্ব। অতএব তার কাছে ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শক্তি সর্বদা নিহিত রয়েছে। মন হচ্ছে শরীরের প্রভু, নিঃসন্দেহে, কিন্তু শরীরের মতোই মনও হচ্ছে বস্তুগুলির মহান সত্তার একটি উপকরণ মাত্র, যিনি ওই

দুটিরই অন্তরালে থেকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়কেই ব্যবহার করেন। যেন এক অদ্ভুত জটিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র, যার একটি অংশে বহু ধরনের বিবরণ—আলোক, ধ্বনি, ওজন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও স্পর্শের—দানের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে ; আর অন্য অংশের দ্বারা এগুলির বিরাট ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি, যা আমাদের ক্ষণিক প্রত্যক্ষের সম্ভাবনার বাইরে, যার দ্বারা আমরা যাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলি তার ধারণা করতে পারি। কিন্তু আবার ভারতীয় চিন্তা অনুযায়ী এই যন্ত্রটির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তখনই লাভ করা যায়, যখন এর প্রতিটি অংশকে ইচ্ছামাত্র কোন সাধারণ বিন্দুতে সন্নিবিষ্ট করা যায়—অনুসন্ধানের সকল শক্তিকে যে কোন এক বস্তুর উপর আরোপ করা। যখন তাই করা হয়, যখন সম্পূর্ণ সত্তার তীব্রতম স্পন্দনে পৌঁছানো যায় এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয় একাগ্রতার এক বিন্দুতে অভিসারী হয়, তখনই ভারত ঘোষণা করে—আমরা এক হয়ে একত্বকে প্রত্যক্ষ করছি, মন সত্যের মুখোমুখি হয়ে দর্শন করেছে।

এই দর্শনকে আমরা কেমনভাবে ব্যাখ্যা ও ব্যক্ত করব তা আমাদের নিজেদের অতীত ভাষা ও শৃঙ্খলার দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয়। মা এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হলেন ভালবাসতে ও রক্ষা করতে, অবিচলিত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে জোয়ান অব আর্ক সেনাবাহিনী পরিচালিত করেন, স্যার আইজাক নিউটন আমাদের মধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম প্রদান করেন, মোজার্ট তাঁর 'রিকয়েম মাস' সঙ্গীত সৃষ্টি করেন এবং পরিব্রাজক যীশু পর্বতপ্রান্ত হতে অবতরণ করে গুঞ্জন করেন, 'আমি ও আমার পিতা এক'। তার মানে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়লব্ধ আত্মসুখ সরে দাঁড়িয়েছে পরহিত অনুসরণে, সেটিই লক্ষ্যস্বরূপ হয়েছে। মানুষ এক সৌন্দর্য ও সত্য দ্বারা অভিভূত হয়েছে, যা তার সারা জগতের সঙ্গে ভাগ করে নেবার প্রয়োজন। অথবা সসীম ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে, পরম সত্তা ও বিভুর সঙ্গে মিলনে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাচ্য যে ভাবে চিন্তা করে তা হচ্ছে এই, দুই ধরনের অস্তিত্ব আছে— এক ব্যক্তি বা অহং, অন্যটি নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার, যেখানে স্বার্থ ও পরার্থ সমানভাবে ভুলে যাওয়া হয়। এই অসীমের উপলব্ধি করাটাই মুক্তি এবং জীবনে তাতেই পৌঁছাতে হবে, মৃত্যুতে নয়। ধ্যানই হচ্ছে এর একমাত্র রহস্য, আর প্রকৃত ক্ষমতা সর্বদাই হচ্ছে নিজের উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা।

তাহলে এই চিন্তা ও অনুভূতির সাধারণ বার্তাগুলি কী, যার জন্য এই স্বর্গীয় মত্ততায় আমরা সর্বদা নিমগ্ন থাকি না ? আর পথগুলিই বা কী, যার দ্বারা আমরা এই বাধাগুলি সাধারণত অতিক্রম করতে পারি ? কারণ এটি অনুমান করা হয় যে, যদি এই অভিজ্ঞতা প্রকৃতই সত্য হয়, তাহলে মানুষ এটি অকস্মাৎই প্রথমে উপলব্ধি করেছিল এবং তত্ত্ব নির্ধারণ তার পরে হয়েছিল।

মানুষের মন এক অসীম বৃত্তে আবর্তিত হয় এবং তার অপরিমেয় পরিধির প্রতি বিন্দু হতে একত্ববোধরূপ সাধারণ কেন্দ্রবিন্দুর দিকে জীবনের পথ

চলেছে। প্রতি মানুষই যেন এক নতুন বাতায়ন, যার মধ্য দিয়ে অন্যেরা সকলে অসীমের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারে, প্রতিটি জীবনই হচ্ছে আমরা যাঁকে ঈশ্বর বলি, তাঁরই এক নতুন নাম। তাই পথ হচ্ছে অসংখ্য। কোন দুটি পদ্ধতি একবারে একই রকম হতে পারে না। তবু এমন কিছু ব্যাপক বৈশিষ্ট্য আছে, যা কম-বেশি সাধারণ। যে আত্মা সেবার জন্য উন্মুখ, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র হতে স্বার্থপরতার সূক্ষ্ম ছায়াগুলিও ক্রমশ বিতাড়িত করে দেয়—যেমন বিশেষ ধরনের কার্য-কলাপের প্রতি আগ্রহ, কার্যের প্রতি আগ্রহের দাবি এবং ফলের প্রতি অনুরাগ ও সহানু-ভূতি—সেই আত্মা অন্যের চেয়ে সহজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে পরের মঙ্গলের পরম স্বস্তাতে। ম্যাজিনীর কাছে 'জনসাধারণ', জোয়ান অব আর্কের কাছে 'সুন্দর দেশ ফ্রান্স', মহান শাসক বা রাজনীতিজ্ঞের কাছে স্বদেশের প্রতি কর্তব্য পালন,—এ সবই হচ্ছে সেই পদ্ধতি, যার মধ্যে দিয়ে এই উপলব্ধি লাভ হয়। পবিত্র উদ্দেশ্যে কর্মের পথকেই বলা হয় কর্মযোগ বা কর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন।

আবার আমরা কিছু পরিমাণে বুঝতে সক্ষম হই সেই প্রকৃতির বিকাশ, যার কাছে সব কিছুই প্রেমের পরিমাপে আবির্ভূত হয়। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতি ছিল সেণ্ট ফ্র্যান্সিসের এবং তাঁর পরে সেণ্ট টেরেসার। ভারতবর্ষে একে ভক্তি বলা হয়। এমন ধরনের আত্মায় ক্রমশ—স্বার্থ পরিত্যাগের চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসীমে উপনীত হওয়া—প্রেমের শক্তি হয়ে ওঠে ব্যষ্টির বেড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার এক আগুন। সেণ্ট টেরেসা বলেন, 'কেউ বুঝতে পারে না জাগতিক সুখের অনিত্যতা কথাটির অর্থ কী। কারণ সেগুলি তাহলে তারা আরও আনন্দের সঙ্গে পরিত্যাগ করত তারা ভাবে এ সব চিরস্থায়ী।' তারপর সব বস্তুরই সংমিশ্রণ ঘটে প্রেমাস্পদের একটি ধারণার মধ্যে। সর্বশেষে পার্থক্য ঘুচে যায়, অহং বিস্মৃত হয়, অসীম প্রেম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। প্রথমে শান্তির প্রার্থনা, পরে মিলনের প্রার্থনা, সর্বশেষে অনিবার্য আনন্দ,—মহান কার্মেলাইট বলেছেন। এই হচ্ছে ভক্তিযোগ, যে পথ দিয়ে বেশি সংখ্যক সাধকেরা গেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে উচ্চতম হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা মিলন বা জ্ঞানযোগ। সেই জীবন যার সমস্ত সংগ্রামই হচ্ছে সত্যের জন্য তীব্র বাসনা; সেই আত্মা, যার কাছে মিথ্যা বা কুসংস্কার হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ; সেই মন, যা গিরি-নির্ঝরের মত স্বচ্ছ; আনন্দের এক আবহাওয়া, সকল শান্তি, সকল নিস্তব্ধতা, আবেগহীন সকল প্রভা—এগুলির কাছেই আসে উপলব্ধির ক্রম বর্ধমান তীব্রতা, প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ধিষ্ণু শক্তি এবং পরিণামে সর্বশেষ আলোকচ্ছটা, যাতে জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় কিছুই নেই, আছে শুধু একত্বের সঙ্গে একাত্মবোধ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের ইংরাজি ভাষায় জ্ঞানের কোন প্রতিশব্দ নেই, ইনসাইট শব্দে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যথেষ্ট তীব্র নয়

প্রকৃতপক্ষে, চিন্তার যে অভ্যাস এই ধারণায় পৌঁছে দেয়, তা আমাদের কাছে অজানা। অতএব খাঁটি সমার্থক শব্দ প্রশ্নের বাইরে।

মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধ, কারণ বুদ্ধির প্রশান্তি তাঁর মধ্যে প্রধান ছিল, চল্লিশ বৎসরেরও বেশি সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে ছিলেন, যদিও তাঁর প্রেম ও করুণাই (তাঁর পাঁচশতবার আত্মদানের ফলস্বরূপ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে) তাঁকে টেনে এনেছিল মানবসেবার তীব্র অনুরাগভরা অভিযানে। তাছাড়া তিনি আরও হচ্ছেন তিন ধরনের উপলব্ধির—বুদ্ধির দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও কর্ম দ্বারা—সংমিশ্রণের এক উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্ত। এই ধরনের সংমিশ্রণের কিছু মাত্রা নিশ্চয়ই থাকবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা অন্যের মঙ্গলের জন্য তাঁদের জ্ঞানকে ব্যবহার করেন, অবতাররা হচ্ছেন যাঁদের সর্বোচ্চ পরিণতির রূপ। কারণ জ্ঞানে ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে স্বপ্নবৎ দেখা হয়, শুধু এক মায়া, এবং যিনি একবার এই অভিভূতকর প্রকাশলাভ করেছেন, তাঁর কাছে এটি বিশ্বাস করা অসম্ভব যে তাঁর সত্তার বাইরে মায়ার অন্য কেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে, যার মুক্তির জন্য তিনি কর্মরত হতে পারেন।

কারণ কর্ম বা সেবার আবার ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। আবার জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত না হওয়া, করুণা দ্বারা জাগরিত না হওয়া স্বর্গীয় প্রেমের উমত্ততা প্রায় অকল্পনীয়।

এই হচ্ছে তিনটি পথ—সত্য, ভক্তি ও সৎকর্ম—যার দ্বারা আত্মা তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্যারে এ কথা বলা হয়। যিনি এই লক্ষ্যে পৌঁছান এবং জীবনধারণ করে থাকেন, তাঁকে বলা হয় পরমহংস, মানুষের মধ্যে মহামানুষ। আর তাঁদের মধ্যে শুকদেব হচ্ছেন প্রধান ও আদর্শস্থানীয়, যিনি মরদেহে সেই জ্ঞান-সমুদ্রের গণ্ডূষমাত্র জল পান করেছিলেন। কারণ বলা হয় যে বহু মানুষ সেই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে শুধু তরঙ্গ-গর্জন শুনেই দেহত্যাগ করে, অল্প লোকই সেই জ্ঞানবারি স্পর্শ করতে পারে, সামান্য লোকই তার স্বাদ পায় আর একমাত্র শুকদেবই তা সামান্য পান করতে পেরেছিলেন। বহু মুসলমান সাধকও পরমহংসত্ব লাভ করেছেন এবং তাঁদের সকল ধর্মের লোকেরাই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা জানায় একই রকমভাবে।

এই হলো একত্বের ধারণা, যখন চেতনা ও আত্মপরিচালনা তাকে প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিকতায় পরিণত করেছে। কথিত হয়েছে যে আমাদের এতে উপনীত হওয়ার একটি ধাপ সর্বদাই আছে, সেটি যে কোন রূপেই আসুক না কেন, তা হচ্ছে অহংবোধ পরিত্যাগের শক্তির অভাব। উপনিষদ বলে, 'যখন কামনা অন্তর্হিত হয় এবং হৃদয়ের সব তন্ত্রী ছিন্ন হয়, তখনই মানুষ অমরত্ব লাভ করে।' আর 'অমরত্ব' সম্বন্ধে এখানে বুঝতে হবে যে এর অর্থ হচ্ছে অবিনশ্বরতার গুণ। এই কারণে সকল ধর্মই হচ্ছে বৈরাগ্যের আহ্বান, সকল নীতিই ব্যক্তিত্বের স্বার্থপরতা নাকচ করে, সকল শৃঙ্খলাই ব্যক্তির উত্তেজনা দমনকারী। ভারতীয় তত্ত্বে বহুর মধ্যে একের সর্বব্যাপকত্ব

অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পণ্ডিতের অধ্যয়নের তপশ্চর্যা, শিল্পীর নিজেকে সাক্ষীরূপে দ্রষ্টা হওয়ার প্রচেষ্টা, প্রেমিকের আত্মদানের বাসনা,—সব কিছু অজ্ঞাতসারে ব্যক্ত করে আমাদের মধ্যে সেই অসীমত্ব, সেই বিশ্বচেতনা।

পরম প্রাপ্তি, যা বিভিন্নভাবে বিদিত, যথা স্বাধীনতা, মুক্তি বা নির্বাণ, সসীমের ধ্বংস—এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না এটা সত্য। বহুত্বের ধারণা হচ্ছে মায়া বা ভ্রান্তি, একই হচ্ছে সত্য আর বহু অসত্য—এই হচ্ছে সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত কথা। যাঁরা এই বিশ্বের সকল পরিবর্তনশীল বহুত্বের মধ্যে একককেই দর্শন করেন, তাঁরাই চিরশান্তি লাভ করেন, অন্যেরা নয়, অন্য কেউ নয়।'

স্পষ্টত তত্ত্বের চরম সত্য অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ বা অপ্রমাণ দাবি করে না। কিন্তু এর প্রতি সাধারণ ভারতীয় মনোভাব কঠোর বিজ্ঞানভিত্তিক। পরীক্ষা করা ছাড়া আমরা প্রমাণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এই তথ্যের প্রতি নির্দেশ করতে পারি যে জীবনের সঞ্চিত পর্যবেক্ষণ এই তত্ত্বের অখণ্ডনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার দিকেই যায়—ভারত কার্যত বলে। আর যদি আমাদের দেখানো হয় যে, একটি নীতি যা আবেগের বহুত্বের বিরুদ্ধে একত্বের নীতি তুলে ধরার দাবি জানায় না, একটি বিজ্ঞান যা আপাত প্রভেদের সঙ্গে ক্রমশ বিশুদ্ধ ঐক্যের পারম্পর্যে বর্ধিত হয়নি, অথবা একটি চরিত্র যা নৈর্ব্যক্তিকতার কাছে ব্যক্তিত্বকে সমর্পণ করার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পায়নি, তবে মায়ার তত্ত্ব আপাত প্রভেদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য—ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং এটি এক ভুল ধারণা বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে। এটা দাবি করা যেতে পারে যে, এ পর্যন্ত বিশ্বের সারা ইতিহাস সেই প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এইভাবে হিন্দুধর্মের ঈশ্বর-দর্শন আর দান্তের দ্যুলোক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নেই, শুধু সেটিকে কোন দূর ভবিষ্যতে ঠেলে রেখে দেওয়া নয়, এই জীবনেই তা কিন্তু সগৌরবে সমর্থিত হবে। মায়াতে অন্য সব কিছুর মতই ভগবানের নাম ও করুণা করার প্রথাও সত্য নয়, কিন্তু আমাদের বন্ধনমুক্ত হতে সক্ষম করার শক্তি তার আছে, যেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের আনন্দ সেই বন্ধনকে শুধু আরও দৃঢ় করে তোলে।

একটি কথা বাকি থাকে। যে তত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা এক জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। পাশ্চাত্যে খুব কম লোকই এটির সম্পূর্ণ রহস্যের মর্ম গ্রহণ করতে পেরেছে। খুব কমই দেখা যাবে কোন এক নির্দিষ্ট ধারণা বা বিষয় গভীরভাবে বুঝতে পারে। প্রাচ্যে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ব্যাপার। আধুনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে মানুষরা মুক্তিলাভ করেনি, তারা বৈরাগ্য ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে কিন্তু মুক্ত। যদিও ভারতবর্ষ প্রতিদিন তার নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দখল হারিয়ে ফেলছে, তবু এখনও সে শত শত সাধকের মাতৃভূমি। আর প্রাচীন আভিজাত্যের জনগণে

মধ্যে আদর্শের রাজ্যটি এমন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক যে দরিদ্রতম কৃষক, হীন শ্রমিক প্রভৃতি সকলেই বুঝতে পারে হিন্দুধর্মের দৈনিক প্রার্থনার মহান বাণীর দ্বারা কী অর্থ বোঝায় :

অসৎ থেকে আমাদের সতে নিয়ে চল।
অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে চল।
মৃত্যু থেকে অমরত্বে নিয়ে চল।
আমাদের নিজেদের মধ্যে দিয়ে পৌঁছাতে দাও।
আর সর্বদা আমাদের রক্ষা কর
অজ্ঞানতা থেকে তোমার মধুর করুণাধারা দ্বারা।

একাদশ অধ্যায়

জীবন-মৃত্যুর চক্র

চিন্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে নিয়তির চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই।…জিয়াস তার শক্তির কাছে মস্তক নত করে। দৃঢ়তায় লৌহকে সে হার মানায়।—ইউরিপিডিসের 'আলসেস্টিস'।

বংশগতি এক অবস্থা, অদৃষ্ট নয়।—রোনসন

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন পরিধান করে, তেমনি দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নরদেহ গ্রহণ করে।—গীতা

জীবন সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণার চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল ইচ্ছা ও পরিবেশ, যার সঙ্গে ইচ্ছাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, এদের মধ্যে নাটকীয় প্রভেদ। যেমন ঠিক নিশ্চিত ভাবে পৃথিবী-গ্রহটিতে আমাদের জন্ম আমাদের এক সুনির্দিষ্ট স্থান প্রদান করেছে, সৌরজগতে তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, আমাদের সে মাত্রানুযায়ী সম্পর্কিত করেছে সুদূরতম উপগ্রহের কর্মপথে যা কিছু ঘটছে তার সব কিছুর সঙ্গে, ঠিক তেমনি এটা পরিষ্কার যে এই গ্রহের উপর আমাদের অবস্থান—ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও জাতীয় ভাবে—আমাদের শুরু থেকেই কার্য-কারণ রেখাগুলির সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে রেখে দিয়েছে যা মানবরূপে আমাদের গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।… এই অপ্রত্যাখ্যানীয়, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নিয়ম, তা গ্রীকদের কাছে সোজাসুজি ছিল এক অব্যাখ্যাত ও অনাবিষ্কৃত প্রয়োজন বা ভাগ্য।

উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীনদের কাছে অভিশাপ ছিল উক্তিকারকের মননশক্তির কোন ক্রিয়া নয়। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে, ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু ও নর্সম্যানদের কাছেও

অভিশাপ ছিল সম্পূর্ণ এক ভবিষ্যদ্বাণী। এটি ঘোষিত হতো সতর্কীকরণের জন্য বা প্রকাশের জন্য যে কোন এক নির্দিষ্ট কার্যে এক নির্দিষ্ট ফল অবশ্যই ফলবে। অ্যাপোলো মনে বুঝেছিলেন যদি লাইওসের সন্তান হয়, তার ফলে ধ্বংস আসবে। তিনি সংকল্প করেননি যে এটি এমনি হবে। স্পষ্টত ইচ্ছাশক্তিকে এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীন বলে গণ্য করা হতো, কিংবা বিকল্প আমরা চিন্তা করতে পারিনি, কোন পুত্র জন্ম না দেওয়া। কিন্তু ইডিপাস ও তার সন্তানদের কাছে কোন বিকল্প ছিল না; সে ও তারা অদৃষ্টের সেই বৃত্তের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে ভাগ্যে যেটুকু আছে সেটুকুই তারা পাবে।

এই সত্যকেই আর বিশেষ অনুসন্ধান না করে গ্রীক-মন গ্রহণ করে নিয়েছিল তা দেখা যায়। কারণ সেই মন ভাগ্যের প্রকৃতি ও অবস্থা বিশ্লেষণ করার পরম আগ্রহ না দেখিয়ে মানুষের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে ভাগ্যের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের দৃশ্যের প্রতিই আগ্রহ নিবদ্ধ করেছিল। এই দৃশ্যই হচ্ছে হেলেনীক ট্র্যাজেডির সমস্ত বিষয়বস্তু। খ্রীষ্টীয় করুণার নীতি জীবনের ইউরোপীয় ধারণার মধ্যে বিভ্রান্তিকর ও অলৌকিক কিছু পরিচিত করায় এবং কয়েক শতাব্দী ধরে বস্তুগুলি যা হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্বেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বস্তুর অতি-প্রাকৃতিক অধিবিদ্যা দ্বারা, যাতে বস্তুর কী হওয়া উচিত বলা হয়েছে, কী তারা হয় সেটা নয়। যাহোক, রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাশক্তি তীব্রবেগে প্রত্যাবর্তন করল গ্রীক যুগের অবস্থায়। ম্যাকবেথ ও ওথেলো কিছু ভাবে সম্পূর্ণ হেলেনীক যেমন এস্কাইলাসের সব কিছু। প্রলোভনকে আর একবার মানুষের বহিঃস্থ করে রাখা হলো; সত্য ও মিথ্যা কারণকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত করা হলো এবং ইচ্ছাশক্তিকে দেখানো হলো তার নিজের অন্ধতার যেন শুধু এক ক্রীড়ার সামগ্রী। এই সব বিষয়ে এবং যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি লিখেছেন তার অনুভূতির বিশালতায় সেক্সপীয়ারের বর্ণনা হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্রীসীয়।

এটি সত্য যে ম্যাকবেথে নৈতিক কষ্টভোগের অনুভূতি বর্ণনাকে কিছুটা অস্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু ওথেলোর নিখুঁত সৌন্দর্য কোন কিছুই ম্লান করতে পারেনি। সংশয়ের পীড়নমুক্ত এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক চরিত্রগুলি ঘুরে বেড়ায় তাদের প্রেমের উষাকাল হতে মৃত্যুতে তার পবিত্রতা চরম সমর্থনের জোয়ারবেলা পর্যন্ত। বিশেষ সমস্যাটি সাবেক নয়। এর বর্ণচ্ছটার কোমলতা কিছুটা আধুনিক, কিন্তু সারল্য ও আড়ম্বরে প্রয়োজনের স্রোতে জীবন খড়কুটোর মত ভেসে যায়—এই বিশ্বাসে ওথেলো হচ্ছে এক প্রাচীন নাটক।

প্রাচীনত্বের গ্রীসীয় ভাবধারা ও রেনেসাঁসের মধ্যে এক বড় পার্থক্য এই সত্যের মধ্যে আছে যে সংগঠন আধুনিকের করায়ত্ত। বিচ্ছিন্ন প্রতিভা নাটক লেখে, দর্শন ব্যাখ্যা করে কিংবা মূর্তি গঠন করে; সংগঠিত প্রতিভা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান উৎপাদন করে। এক ভাবে আধুনিক বিজ্ঞান হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তাধারার আরিস্টটোলীয় ও আলেকজেন্দ্রীয় বিষয়ের কার্যকর উন্নয়ন ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিজেই হচ্ছে

একটি বস্তু, যা চিরকাল বিভ্রান্ত করছে মানুষের গবেষণাকে। এমন কোন মুচি ... যাতে এটা গলানো যেতে পারে। অতএব সমস্ত বিজ্ঞান গ্রীক নাট্যকারদের পুরা সমস্যায় দ্রবীভূত হয়—ইচ্ছাশক্তির সম্মুখীন হয় যে অবস্থা, তাকে যথার্থ পর্যবেক্ষণে সমস্যা এবং সেটি প্রাচীনদের চিন্তার কঠোর ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের দ্বারা। এক চিন্তা কদাচ কল্পনা করেনি মানুষ ও তার দেহের মধ্যে কোন প্রভেদ,—যাতে আমরা পৌঁ দেহ ও মস্তিষ্কের আধুনিক ধারণায়, অদৃষ্টের শেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে।

এর সারল্য ইউরোপীয় চিন্তাধারার একাধারে শক্তি ও দুর্বলতা। আধুনিক কল্প কাহিনীর ঝর্ণাগুলি বংশগতি সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহের নুনে এখনও লবণাক্ত। বং গতি সম্পর্কে আধুনিক কথাবার্তা পেয়ালায় পড়ে তিক্ততার চেয়ে একটু বেশি। সন্দ হলো প্রতিটি একক সত্যকে ভুল করার মতোই বংশগতিও যে কোনও ভাগ্যবাদী ব্যব মতো মানুষের চেতনায় এক বিরাট বন্ধন চাপিয়ে দেবে। কারও পূর্বপুরুষদের দুর্বল বা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কী লাভ? রক্তের মধ্যে যে কলঙ্ক রয়েছে তার উপ জয়লাভের কী আশা আছে? আর তবুও সকল নিয়ম ও সকল ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে মানুষে ইচ্ছাশক্তি চিরকাল জেগেছিল, জাগছে এবং জাগবে, তার ললাট স্বাধীনতার সূর্যালে উজ্জ্বল, পদতলে দলিত সেই শত্রু, যাকে আমাদের সূক্ষ্ম সমালোচনা অজেয় বলে ঘোষ করেছিল, বংশগতি ও বস্তুর স্বভাবকে সমভাবে অবজ্ঞা করার স্বীয় শক্তির জ্ঞানে উদ্ভাসি আর ব্যর্থতার জাল থেকে চরম বিজয়োৎসবের পোশাক প্রস্তুত করেছে নিজের জন্য।

কিন্তু প্রায়ই একে মনে হয় নিদ্রিত। ঘুমন্ত কিংবা শিশুর মতো অজ্ঞ, বোধ পথের ধারে প্রতিটি ফুলের জন্য, যে কোন চকচকে নুড়ির জন্য সে পথ ছেড়ে এক নেমে পড়ে এবং দরকারের সময় তাকে ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা এও হ পারে যে সে মিথ্যা বা বাসনার কোন হীন নেশায় মত্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করছে অমঙ্গলকে মঙ্গল করে তার পদচুম্বনের জন্য অবনত হয়েছে, কুমারীকন্যাকে আদর মতোই দাসত্ব ও পরাজয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। নিশ্চয় এখানে এবং শুধু এখানেই বিষয়টির মূল, শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অশিক্ষিত ইচ্ছাশক্তির মধ্যে প্রভেদে। প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অবস্থাগুলির যোগফল। আর সেই অবস্থাগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে কিন্তু বংশগতি যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ইচ্ছাশক্তিকে বন্ধনের দিকে অথবা মুক্তির দিকে নিয়োগ মধ্যেই হচ্ছে জীবনের ঐক্যের রহস্য।

অতএব মানব জীবনের ব্যাখ্যার উৎপাদক হচ্ছে তিনটি, আর এশীয় চিন্তার বৈশি হচ্ছে এই তিনটিকেই জানতে পারায়। শীঘ্র হোক বা দেরীতে হোক কারণকে অনুস করবে কার্য, আর কার্যের আগে নিশ্চয়ই কারণ আছে, এই গভীর বিশ্বাস ভারতীয় মন ভাবকে এক শান্ত সমাহিত মেজাজ দান করেছে, যা নিষ্ক্রিয় ভাগ্যবাদিতা থেকে বহু দূরের ব্যাপার, যেমন সাধারণত অনুশাসন করা হয়ে থাকে। কারণ নিশ্চয়ই দুই মনোভাবের মধ্যে প্রভেদ আছে— এক হচ্ছে বিষয়টিকে মর্যাদার সঙ্গে মেনে নেও

কারণ তা হচ্ছে হিসাবের বাইরে এবং তাকে বাধা দেওয়া ঠিক নয় এবং অন্যটি হচ্ছে একই ধরণের মর্যাদার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করা, কারণ সে সম্পূর্ণভাবে হিসাবের মধ্যে এমনভাবে পড়ে যে ঘটনাগুলির গতিবৃদ্ধির কোন প্রয়োজন করে না।

ভারত যে বংশগতির নীতি বোঝে তা প্রদর্শিত হয়েছে জাতিভেদ প্রথা দ্বারা। পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে শুধু সেখানেই বহু যুগ ধরে এক অমার্জনীয় সামাজিক অপমান বলে গণ্য করা হয়েছে রুগ্ন, পঙ্গু ও মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিকে বিবাহ করতে দেওয়া। এমন লোকদের জন্য জাতি-প্রথার নীরব প্রচলিত বিধান সর্বদা ছিল,—কোন বংশধর নয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশী, অন্য সব বিষয়ের চেয়ে,—সমাজ-ব্যবস্থার আসল অর্থই ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক, কারিগরদের হস্ত ও বিশেষজ্ঞদের ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি রূপকে আরও বেশি উন্নত করার প্রচেষ্টা। সত্য যে এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে রক্তের সংমিশ্রণকে উপায়-রূপে এ প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু এটি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সযত্নে নির্বাচনের সঞ্চিত প্রভাবের উপর দৃষ্টি রাখে, দৃষ্টি রাখে জীবিকার পরিবেশের উপর এবং উত্তরাধিকারের প্রাপ্ত ফলের উপর, পরিচ্ছন্ন আহারের উপর। মস্তিষ্কের ব্যবহারকারীদের কাছে শেষেরটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়; তাই অন্য সকলের চেয়ে ব্রাহ্মণেরা প্রতিনিধিত্ব করে সেই ফলের, যা এই বিষয়ে বহু পুরুষের যত্নের ফলে উৎপন্ন হয়েছে এবং সমাজের যত নিম্নস্তরে আমরা অবতরণ করি ততই এই ধরনের হস্তান্তর কম দেখতে পাই।

কিন্তু ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রদত্ত পরিকল্পনায় পরস্পরের পরিপূরক পদার্থরূপে বস্তুর প্রকৃতি ও বংশগতি সম্পর্কে ভারতীয় বোধশক্তির অর্থ শেষেরটির বিষয়ে কখনই অন্ধতা নয় এবং সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হচ্ছে—ইচ্ছাশক্তির নিজস্ব কার্যদক্ষতা। এটি যদি নির্ণয়ের মূলসূত্র না হতো, তাহলে ভারত বলতো, এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না যেমন দুই ভাইকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একই উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে, একই বাস্তব সুযোগ পেয়ে এবং একই নৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে, একই সাধারণ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে একজন গৌরবে অন্যজন অপমানে পৌঁছায়। আর যদি এটি সার্থকতা বা ব্যর্থতার চরম মাপকাঠিও না হতো, তাহলে উদাহরণস্বরূপ অ্যারিস্টাইডিসের গ্রীক গল্প তার সকল করুণ রস হারিয়ে ফেলতো। কারণ আমরা সকলে জানি, যখন এক অজ্ঞ লোক অ্যারিস্টাইডিসকে অভিযুক্ত করে ভোট দেবার সময় তাঁরই সাহায্য চেয়েছিল, তখন সেই মহাপুরুষ কী ভাবে প্রথমে তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং তারপর মৃদুভাবে এর কারণ জিজ্ঞাসা ...র জবাব পেয়েছিলেন, "তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ' বলা হয়, কথাটা শুনে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।"

এখানে কিংবা ডাইভেস ও ল্যাজারাসের কাহিনীতে আমরা অসমতার এক ঝিলিক দেখতে পাই কি? কোনটি আমাদের ন্যায়বোধকে নিষ্ঠুরতরভাবে বিচলিত করে—

যাতে একজন সম্পদ লাভ করে, আর অন্যজন দারিদ্র্য, অথবা একজন মঙ্গল করতে পারে না, অন্যজন অমঙ্গল ?

ভারতের উত্তর সন্দেহজনক নয়। সে বলে, একটি উপকরণ আছে, শুধু এক যা সবচেয়ে নিখুঁত মানব মস্তিষ্কের চেয়েও সূক্ষ্মতর, তা হচ্ছে সদ্-ইচ্ছার উপকরণ যে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের চেয়ে বড়,—সে দাবি করে,—তখনই উৎপাদন শুরু করতে যখনই আমরা তা দেখতে ইচ্ছা করি। যেভাবে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্বলতা ও বিচার হীনতা থেকে সম্পূর্ণতায় উন্নত হয়, যেভাবে প্রাণী ক্ষুদ্র ও সরল থেকে উন্নতি বৃহৎ ও জটিল হয়ে ওঠে, আমরা ধরে নেব তেমনিভাবে ইচ্ছাশক্তি অহংকারের অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছায় সেই আলোকে, যাকে আমরা বলি সম্পূর্ণ প্রতি অবস্থাতেই আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনাগুলি সীমাবদ্ধ, যদিও তারা যতই লক্ষ্যের নিকট হয় ততই এমন ভাবটি ক্রমে ক্রমে কমে যায়। সমস্ত হিন্দু-দৃষ্টিভঙ্গিটি এই সমালোচনামূলক ও বৈজ্ঞানিক। পাপ বলে এক অস্পষ্ট ভয়ঙ্কর কিছু আর সেটি স্থান ছেড়ে দিয়েছে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ইচ্ছার অজ্ঞতার বা অন্ধতার অবস্থাকে এই অজ্ঞতাকে এক অবিচল বা নির্দিষ্ট পরিমাণের বলে ধারণাও করা হয় যেমন সুনিশ্চিতভাবে গাছপালাগুলি বড় হয়ে ওঠে এবং নদীগুলি সাগরের সন্ধানে তেমনি প্রত্যেক মানব আত্মায় এটি আগে হোক বা পরে হোক জ্ঞানকে স্থান দেবে। আর তখন কোন মানুষের তার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্মৃতি অন্যের কাছে মনে হবে যেন মহত্ত্ব; তার নিজের কাছে এটি এমন প্রতীয়মানও হবে না, আরও বেশি বিশ্বজনীন জীবনের বৃহৎ বাসনায় অবলুপ্ত। অতএ এক মহৎ ও উদার চিন্তা হচ্ছে যেন ঠিক নদীর মোহানার কাছ থেকে নদীর মুখে যাবার অবস্থা, যা কোনক্রমেই পৌঁছানো যায় না নদীর গতিপথের সম্পূর্ণ অতিক্রম বিনা। পরম সৌভাগ্যের সম্ভাবনা মানুষের কাছে হচ্ছে মহৎ ইচ্ছার, সঙ্গে বিরাট মস্তিষ্কের সংযুক্তি, তার সঙ্গে যুক্ত প্রভুত্ব ও স্বাধীনতার এক বাহ্যিক অবস্থা যাকে বলা যায়, কার্য-কারণের কোন রেখার উপর এক সুবিধাজনক বিন্দু। আম ধরে নিতে পারি, তাঁর জন্মের মধ্যে এমন সুযোগ পেয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। যাহে বেশীর ভাগ জীবনই তিনটি অবস্থার যতদূর সম্ভব বিভিন্ন মাত্রার এক সংমিশ্র আমরা দেখি মূর্খতা ও হীনতার পটভূমি করা হয়েছে এক বিরাট অবস্থাকে। দেখি দয়ার চিন্তা বুদ্ধির ক্ষীণতার জন্যে অসার হয়ে গেছে। অনেক সময়েই ব্যক্তি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না, কিন্তু কখনও কখনও সিংহের হওয়ার মতো বা সাধারণ অপরাধীর সম্রাটের মুকুট ধারণের মতোই গরমিলের চরম রূপ গ্রহণ করে। কখন এই সব ব্যতিক্রমগুলি ঘটে ? কোন দৃঢ় নিয়মের মধ্যে সেগুলির মূল প্রোথিত ?

হিন্দু মনকে মনে হয় সর্বদাই অধিকার করে আছে এক প্রশান্ত বিশ্বাস, যে সকল ঘটনাই এক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার কাছে নিজেদের ধরা দেবে। যেহেতু 'যা কিছু আছে সবই এক', তাই এই ধারণা করা উদ্ভট যে মানসিক যুক্তি ও বিশ্বের মধ্যে পরিণামে পরস্পরবিরোধীতা আছে। যে মন তার সঙ্গীদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সঠিক, তা বস্তুদের সঙ্গে তার সম্পর্কেও স্বাভাবিক ও সঠিক। যদি আমরা দেখি ও শুনি ও স্বাদ অনুভব করি, তার কারণ হচ্ছে প্রধান স্পন্দনেও এমন কিছু আছে যা দৃশ্য, শব্দ ও অবশিষ্টের অনুরূপ, যার প্রয়োজনীয় পরিণাম হচ্ছে আমাদের মানবিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। যাকে বলা যায়, আমাদের ইন্দ্রিয় দুর্বল হতে পারে, কিন্তু আমরা সেটিকে সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করব। যদি ত্রিশ বৎসরের জীবন এক ভয়ঙ্কর স্থায়িত্বের বোধরূপে আমাদের মনে দাগ কাটে, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব চরম অসামঞ্জস্যকর হলেও, তার কারণ হচ্ছে পরম সত্তায় কালের কোন গতি নেই, চেতনার সকল অসীম অনন্তগুলি বর্তমানে অবস্থিত। যদি মানবীয় প্রেম অকল্পনীয় বিশালত্বে আমাদের পীড়িত করে, অকস্মাৎ আমাদের সামনে যদি তা উন্মুক্ত হয়ে যায়, তার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে আমরা মোটামুটি এমন এক অবস্থা পাই, যা সব সীমা ও সব পরিবর্তনকে অতিক্রম করে। পরম সত্তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তা নিশ্চয়ই চেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, বর্জন করবে না। বিষয়টি এমন হলে আমরা নিশ্চয় এটা ধরে নেব যে বস্তুগুলির নিয়ম, যেমন আমরা তাদের দেখছি,—স্থান, কাল ও কারণ—জীবনের উপর প্রযুক্ত হয় ঠিক তেমনি স্বাভাবিকভাবে যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ করা জীবনের সীমার মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের উপর। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে আমাদের আকৃতি ঘটনা পারস্পর্যের এক সহজ বিষয়, যা আমাদের থাকাকালীন প্রতি মুহূর্তে আমাদের গোচরে আনছে। এ হচ্ছে কোন কারণের কার্য, যা স্থান ও কালে তার পরিপূর্ণতা খুঁজে পেতে ততটুকু ব্যর্থ হয় না, যতটা ব্যর্থ হয় উড্ডীয়নের সঙ্গে সহযোগিতাকারী এক পাখির আপনা-হতে-নাড়া ডানা। আচার সাধারণ কার্যের মধ্যে প্রতিটি বিষয় হচ্ছে এক অধস্তন কার্য, তার নিজস্ব অধস্তন কারণের দ্বারা শর্তাধীন। দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক হচ্ছে শুধু বিভিন্ন মাত্রাজ্ঞাপক শব্দমাত্র, যার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ফলদানের অবস্থায় এসেছে। কার্য সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। বিষয়গুলিকে আমরা যেমন দেখি, তা কি আমাদের কারণ সম্পর্কে কোন আভাস দেয়? হাঁ, একটি শক্তি—বাসনার শক্তি যা আমরা প্রত্যহ ক্রিয়ারত দেখি, সৃষ্টিরত, লালনপালনরত, সংগ্রহরত কার্য ও ফলগুলিকে। পূর্ববর্তী ঘটনারূপে এটি ছাড়া পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এমন কিছু ঘটে না, যা আমরা জানি না। অতএব যদি জীবনকে সমগ্রভাবে একটি সদৃশ ঘটনারূপে গণ্য করা যায়, যাদের এটি ঘিরে আছে তাদের সঙ্গে, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হব যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক কার্যকর কারণ এটিও হচ্ছে। আমরা দেহীরূপে নিজেদের কল্পনা করেছিলাম। কোন অদ্ভুত ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে

আমরা ইন্দ্রিয়ের সুখ কামনা করেছিলাম। আর জাগ্রত হয়ে আমরা নিজেদের দেখলাম কারাগারে বন্দী, আর সেই বাসনার শক্তিতে না জেনে আমরা ইন্ধন জুগিয়ে চলি, যাদের মধ্যে প্রতিটিই হয়ে গেছে আমাদের দৃঢ়ভাবে বন্ধন করার এক শৃঙ্খল। আমাদের এখানে উপস্থিতির এই হচ্ছে হিন্দু ব্যাখ্যা। কী আমাদের আত্ম-প্রবঞ্চনায় পরিচালিত করেছিল তার বিবরণ দেবার সে চেষ্টা করে না, ধারণা করে নেয় যে যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব প্রয়োগের তার দাবি শুধু ঘটনার উপর, অর্থাৎ সেই বিষয়গুলিতে যেগুলিকে যুক্তির ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এইভাবে জীবন হচ্ছে জন্মকালেই তোলা এক ফসল। এটি আরও হচ্ছে নতুন ফসলের বীজ বপন করা ভবিষ্যতে বেদনাদায়ক কর্তনের জন্য। প্রতিটি কর্মই যেন এক বীজ, অতীত কারণের ফল, আগামী কার্যের কারণ—এই হচ্ছে কর্ম। জন্ম, পরিবর্তন ও মৃত্যুর অনন্ত চক্র। কারণ হিন্দুরা মনে করে না যে শুধু একটিমাত্র জন্মেরই হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। আমাদের মনের গঠনটাই আমাদের উপর এই ধারণা জোর করে চাপিয়ে দেয় যে ঘটনাগুলি হচ্ছে চক্রাকার, যে আবির্ভাব বার বার ঘটবে, তারকাখচিত এই বিশ্ব বিকশিত হয়ে আবার একটি ফুলের মতোই শুকিয়ে যাবে। তাহলে স্পষ্ট যে কারণগুলি আজ আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, সেগুলি আবার নিশ্চয় আমাদের নিয়ে আসবে, নিশ্চয়ই এই অনন্তকালের চক্রে আগেও অসংখ্য বার নিয়ে এসেছে। এই হচ্ছে পুনর্জন্মবাদ। আমাদের বর্তমান অজ্ঞতা জানিয়ে দেয় অতীতের আরও গভীরতর অজ্ঞতা। যে বাসনাগুলি আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হচ্ছে, সেগুলি আর কিছু নয়, যা এখনও ঘটেনি সে সম্বন্ধে আমাদের আত্মিক বোধশক্তি। কারণ যা কিছু আমরা কামনা করছি তা আমাদের হাতে আসবেই। প্রতি জন্মের কর্ম হচ্ছে শুধু আমাদের পূর্ব ইচ্ছার ফসল।

অবশ্য বাসনা-পীড়িত ব্যক্তি সর্বদা যা ভুলে যায়, তা হচ্ছে বস্তুর দু ধরনের প্রকৃতি এবং তাদের সদা পরিবর্তনশীল অবস্থা। ভাল মন্দকে নিয়ে আসে, সম্পদের উত্তরাধিকারী হচ্ছে দারিদ্র্য, প্রেম শুধু দুঃখের পদতলে প্রেরিত এক বার্তাবাহক। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব বস্তুর আপাত প্রতীয়মান সুবিধাগুলি বাস্তবে হচ্ছে চাবুক, শীঘ্র বা দেরীতে এগুলি তারই পিঠের উপর পড়বে যে তাকে নিজের কাছে টেনে নেবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউই এমন নির্বোধ হতে পারে না যে প্রাসাদ, রত্নরাজি ও অশ্বদের সং বলে ঘোষণা করবে, যাতে সেগুলি বরাতক্রমে পাওয়া কোন প্রকার ক্ষতিপূরণস্বরূপ হবে সেগুলির প্রয়োজনে বার বার যে কষ্টভোগ করতে হয় তার জন্যে। হিন্দু বলে, প্রেম, বুদ্ধি ও মুক্তি প্রয়োজনীয় হিসাবে দাবি করা আর একটু বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। মায়ার জগৎ গঠিত হয়েছে বিপরীতের চিরস্থায়ী পালাবদলের দ্বারা। প্রতি বাসনাই

বহন করে আনে তার পরিপূর্ণতা, তার ক্ষয় এবং তার নিজের মধ্যে লুকানো প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শাস্তি। তপশ্চর্যার প্রথম শিক্ষা হচ্ছে যা আমাদের হতে পারে তা প্রথমে অন্যরা দান করব।

অতএব এক ব্যক্তির কর্মের মধ্যে নিহিত থাকছে এক নির্দিষ্ট স্থান বা রুচির অবস্থা, এক নির্দিষ্ট দৈহিক যন্ত্র এবং পার্থিব সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের নির্দিষ্ট অংশ। রুচি কখনও প্রতিভায় উন্নীত হয় কিংবা পাশব ক্ষুধায় পর্যবসিত হয়। দৈহিক যন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে গণিতজ্ঞের মস্তিষ্ক, বেহালা বাদকের হস্ত কিংবা বিকৃত বাসনায় পীড়িত দেহ। এই তত্ত্ব অনুসারে যে কোন ক্ষেত্রে যে ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রারূপে এসেছে, তা জন্মগত সে গুণই ঠিক অর্জন করেছে এবং এই বিষয়ে জীবন ন্যায়সঙ্গতভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এটিকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হয় না যে যাদের আত্মা সঙ্গীতজ্ঞদের পরিবারে জন্মগ্রহণের সুযোগ খুঁজবে, কারণ সেখানে তার প্রয়োজন মতো সব চেয়ে ভাল অবস্থা সে খুঁজে পাবে। এই ধরনের সব বিষয় নিয়ে বিরাট জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে ডুব দেওয়া খুবই আগ্রহকর। হিন্দুদের মধ্যে একটি বিশ্বাস খুবই জনপ্রিয় যে, বিবাহ সর্বদা একই দুজনের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং একজনের পুণ্য সমানভাবে অন্যজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়। যাহোক, প্রথম দর্শনেই প্রেম,—সারা পৃথিবী জুড়ে এই অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে দেখা যায়—এটিকে ধরা যেতে পারে অতীত বন্ধুত্ব ও পরিচয়ের নিশ্চিত প্রমাণ। খুব সুদৃঢ় সম্পর্ক দ্বারা এটিও বোঝায় যে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যাদের মধ্যে গুণগত জটিলতা আছে, এটিও বিবেচিত হবে—সম্পর্কের মূল খুব গভীরে প্রোথিত। বিবেচনার সময়ে বিস্ময়কর বিষয়ের একটি হচ্ছে ধর্মীয় জীবন। অনেক সময় এটা ঘটে যে কঠোর যোগী তার তপশ্চর্যার মধ্যে কোন বৃথা বাসনার বশীভূত হন, অন্তত মনে স্থান দিয়ে বসেন; তাঁকে সংসারে আর একবার টেনে আনার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট হয়ে ওঠে; সেই সংসারে তাঁর অবস্থা ও শক্তি তাঁর অতীত বৈরাগ্যের কঠোরতার মাপের ঠিক সমান হবে। এইভাবে তিনি খুব সহজেই এক সম্রাট হতে পারেন এবং এটা বিশ্বাস করা হয় যে অতীত ধর্মাচরণের অস্পষ্ট স্মৃতি প্রায়ই সিংহাসনারূঢ়ের মনে হানা দেবে। দিল্লীর মহান আকবর এই ধরনের স্মৃতির কথা তাঁর নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন এক মঠের শিক্ষার্থী এবং প্রেমেও পড়েছিলেন। যাহোক, যখন তাঁর শাসনকাল শেষ হয়ে যাবে, তিনি তাঁর প্রার্থনায় ফিরে যাবেন এবং আর একবার পতন না হয়ে মুক্তিলাভ করবেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামের প্রভাবের প্রকৃত রহস্য হচ্ছে এই ধরনের এক মনোভাব। এটাও যোগ করা যেতে পারে যে সেই প্রভাব আরও গভীর হতো যদি তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সিংহাসন ত্যাগে সফল হতেন তাঁর বাকি জীবনটা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করার জন্য।

যাহোক, আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখব যে পুনর্জন্মের ধারণা নিয়ে জাত প্রাচ্যবাসী

খুব কমই এত মোহিত হয়ে যায় না যে জীবনের ব্যাখ্যা করাটাকেই একমাত্র নির্ভরশীল বিষয় করে তোলে। সে এই নিয়ে নিজের বুদ্ধি খোয়ায় না, যেমন খোয়াতে পারে এই সম্পর্কে যে প্রথম শুনল তার মতো। তার নিজের তত্ত্ব অনুসারে সে ভালভাবেই জানে যে আমরা বীজ বপন ও শস্য কর্তন উভয় কার্যে একই সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছি। তাই সে প্রতিটি নতুন কার্যকেই এক কাল্পনিক অতীত দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করবে না। এই জীবন তার কাছে হচ্ছে এক সুদীর্ঘ সঙ্গীতের একটি কলি। এর সুরের বেশির ভাগ অংশেই তাদের সৌন্দর্য ও অর্থ এই ঘটনা থেকে পেয়েছে যে তাদের আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছে, অবশ্য নতুন কিছুও তার মধ্যে থাকে। নিয়মানুসারে, আমরা যে নিজেদের অতীতকে মনে রাখি না, সেটা তাদের অস্তিত্বের অপ্রমাণ নয়—সে যুক্তি দেখায়—যেহেতু আমরা তো আমাদের জন্মকাল ও শৈশবকে মনে রাখি না।

যুক্তি-বিবেচনার এই স্পষ্টতা অস্তিত্বের ভারতীয় ধারণাকে ভীতিকর করে তোলে। জ্ঞানীর কাছে, সরলভাবে, জীবন হচ্ছে এক বন্ধন এবং একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে কী ভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আত্মহত্যা সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এই কার্যের যুক্তি সামান্য বা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মানুষের হাতের কাছে রাখা যন্ত্র বা আত্মরক্ষার অস্ত্রের মতোই আত্মহত্যারূপ যন্ত্রটি ব্যবহার করার শক্তি মানুষের নিজের আছে। শুধু এটি অস্তিত্বের দুঃখের হাত থেকে কোন পরিত্রাণ প্রদান করতে পারে না। স্কুলের ছাত্র কি পাটিগণিতে উন্নতি করতে পারে, যে অঙ্কটি সে করতে পারছে না সেটি তার শ্লেট থেকে মুছে ফেলবেই? সেই বিশেষ অসুবিধা কি আবার ঘটবে না, যখনই সে সামনে একপদ অগ্রসর হবে? তাকে বিভ্রান্ত করবে, ব্যঙ্গ করবে, অন্ধ করবে, যতক্ষণ না সেটি পরাজিত হচ্ছে। হিন্দু মনে করে, এমন কি আত্মহত্যার ভাগ্যও এমনি ধারা। সে কি ন্যায়ের ফাঁসিরজ্জু এড়িয়ে যাবার বাসনা করে? তাহলে ভবিষ্যতের কোন জীবনকালে তার কর্ম হবে ফাঁসিমঞ্চে দণ্ডায়মান হওয়া এবং চরম শাস্তি ভোগ করা সেই অপরাধের জন্য, যা সে আচরণ করেনি। সে কি কোন অপমানের হাত থেকে পালাতে চায়, যা সহ্য করার শক্তি তার নেই? কোন ভীরু আত্ম-নির্বাসন তাকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। শীঘ্র বা পরে তাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে নিশ্চয়ই কিংবা এটা কি জীবনের একান্ত ঘৃণা, যা মানুষটিকে হত্যা করার জন্য তার নিজের হাতকেই ব্যবহার করেছে? মূর্খ! সে কি দেখতে পায়নি যে কার্যটি হচ্ছে চরম আত্ম-প্রশ্রয়ের অংশ বিশেষ এবং অস্তিত্বকে যা কিছু সুন্দর ও ধন্য করে তুলতে পারে সেই সব থেকে নির্বাসনের চরম পরিণাম এটি নিশ্চয়ই নিয়ে আসে?

সংক্ষেপে, বাসনা হচ্ছে আত্ম-কেন্দ্রাভিগ, আত্ম-নিশ্চয়াত্মক, আত্ম-বিবেচক শক্তি। স্রোতকে স্বেচ্ছায় বাইরে দূর করে দিতে হবে, ভেতরে আকর্ষণ করে আনা নয়। স্বার্থ বাসনাকে সেবার তৃষ্ণায় নিশ্চয়ই ডুবিয়ে দিতে হবে। বৈরাগ্যের অনলে বাসনাকে

পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিতে হবে। তখন, আর শুধু তখনই, চক্রের অবিরাম আবর্তন হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। একমাত্র তখনই বিজিত বিজয়ী হতে উঠতে পারে এবং ক্রীতদাস জগতের প্রভু হতে পারে।

এই হচ্ছে শোপেনহাওয়ারের 'মহাজাগতিক আত্মহত্যা', প্রাচ্যের বহু কথিত 'দুঃখবাদ'। বাস্তবিক এ হচ্ছে সকল হিন্দুর পরিচিত ধারণা, এত পরিচিত যে ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা মোটেই 'দুঃখবাদ' নয়। বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কি বহন করে বিষণ্ণতা ? তার নিশ্চিত মুক্তির শপথ কি ক্রীতদাসকে ক্রুদ্ধ করে তোলে ? যদি হিন্দু দর্শন এই অর্থে আশাবাদী না হয়, তাহলে আশাবাদ দ্বারা জগৎ কী অর্থ বোঝায় তা জানা কষ্টকর। পুনর্জন্মবাদের তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে আমরা দেখি এটি মায়াবাদের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে, এমন কি বৌদ্ধ নীতি-নির্ধারণও এর কিছু ভাষা গ্রহণ না করলে টিঁকে থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে এর এক পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে মায়া-দর্শন-সংক্রান্ত ছিদে-ঢালা ভুল ধারণার মূল্যবান সংশোধনী। আমরা যা দেখেছি, সেই ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন অলস বুদ্ধিগত অনিশ্চয়তাকে এটি নিজের অন্তর্ভুক্ত করে না, যেহেতু সমগ্র কর্মতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে জাগতিক নিয়মের সম্পূর্ণ গণনীয়তা সম্পর্কে হিন্দুর দৃঢ়মূল বিশ্বাসের উপর। এটি খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে না যে মায়ার যুক্তি কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ, সংশক্তিপূর্ণ এবং প্রাচ্য চিন্তাবিদের কাছে শুধু সেই ব্যক্তি, যিনি আত্মসংযমের কোন প্রণালী দ্বারা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করায় সক্ষম হয়েছেন, যাঁর সঙ্গে তুলনায় আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জেনেছি তা মিথ্যা, তাঁরই অধিকার আছে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চও সম্বন্ধে বলার যে তাঁর কাছে এগুলি মূলত এক অধ্যাস। তবুও এই দর্শন লাভের প্রচেষ্টা প্রাচ্য মানবের কাছে অস্তিত্বের একটি ন্যায়সঙ্গত সামর্থনীয় দিক, জীবন-চক্র হতে পরিত্রাণ পাওয়ার দিক এবং মানবসমাজ চিরকালই দুই ভাগে বিভক্তনীয়, একদল যারা এই লক্ষ্যকে দেখে ও এতে পৌঁছাবার সংগ্রাম করে এবং অন্যদল তারা, যারা বাসনা-বীজের 'ঝড়' রোপনে ও সেই বীজজাত 'ঘূর্ণিঝড়' ফসল সংগ্রহে নিমগ্ন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থল বহু শতাব্দী নীরবতায় নিমগ্ন আছে, তবুও জ্ঞানীজনের কর্ণে আজও প্রতিধ্বনিত হয় মানব সমাজের ভবিষ্যদ্বাণী ভয়ঙ্কর ভাষণের মধ্যে দিয়ে—'যা কিছু জন্মগ্রহণ করেছে, তার মৃত্যু অবধারিত। যা কিছু মৃত, তার জন্ম নিশ্চিত।'

দ্বাদশ অধ্যায়

মহান দেবতা শিব বা মহাদেবের কাহিনী

তুমি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ,
পবিত্র, মুক্ত, দ্রষ্টা চিরন্তন,
সকল চিন্তার পারে, সকল গুণাতীত,
তোমাকে, একমাত্র প্রকৃত গুরুকে, আমার প্রণাম,
শিবগুরু। শিবগুরু। শিবগুরু।
আত্মার গুরুরূপী শিবকে প্রণাম।

ভারতের মহান মুহূর্তগুলিতে, হিমালয় চিরকাল হচ্ছে তার রাজপথ, সীমান্ত নয়। জীর্ণ চালের বস্তাবহনকারী খচ্চরের সারি, যাদের আমরা সাক্ষাৎ পাই পর্বতের মধ্যে ভ্রমণকালে প্রতিটি পাহাড়ী পথে, যা হচ্ছে একদা চীনে ধর্মবহনকারী বিরাট মহাদেশীয় যানবাহনের অবশিষ্টাংশ। কারণ রোগের মতো বিশ্বাসও একা ভ্রমণ করে না। তীর্থযাত্রীর সঙ্গে থাকে ব্যবসায়ী, বণিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভিক্ষার্থী মঠবাসী কুকুরেরা, বিশ্বাস অনুসরণ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিরেখা। এটা হতে পারে যে যদি চীনা সিল্ক ও নীলকান্তমনি বুদ্ধের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে আসার পথ না খুঁজে পেত, তাহলে মহানির্বাণের সংবাদ সুদূর প্রাচ্যে কখনই পৌঁছাত না।

আজও আমরা দেখতে পাই প্রাচীন রাজধানী ও তাদের ধ্বংসাবশেষ, পুরাতন দুর্গ, রাজকীয় মন্দির বেলুচিস্তান থেকে নেপালের উচ্চ ভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যে অঞ্চল বহুকাল হলো জনবসতিশূন্য। আর হিমালয়ের মন্দির ও সহরগুলির এক নিজস্ব শিল্প ও স্থাপত্য রীতি আছে, যা আরও দক্ষিণে দেখতে পাওয়া পরবর্তীকালের রীতির চেয়ে আরও বেশি সুন্দর ও স্বতন্ত্র, কারণ সেগুলি আরও বেশি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল সাধারণ প্রাচীন এশিয় রীতির সঙ্গে। কারণ প্রথম মানবিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বেড়া ছিল যেন এই পর্বতগুলি। এই পূর্ব অধিকৃত স্থানের ভূমধ্যীয় নামকরণের বহু আগে নাম ছিল এশিয়া। আর সেই এশিয়ার বহিঃস্থ প্রদেশগুলি ছিল ইজিপ্ট, গ্রীস, ইট্রউরিয়া। সারাসিন ও মুরেরা, শিল্প ও বীরত্বের যা কিছু সঙ্গে করে এনেছিল, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত যত উজ্জ্বলতা ইউরোপকে প্রদান করেছিল, সেই সমস্ত নিয়েও তারা অতীতের স্মারক-কারবারী ছাড়া আর কিছু নয়। এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্যে আমরা এক জাতিকে তখনই সভ্য বলে স্বীকার করি, যখন আমরা তার বুদ্ধি-সংক্রান্ত উৎপত্তি এই প্রাচীন এশিয়া থেকে হয়েছে এটা খুঁজে পেতে সক্ষম হই।

সবার উপরে, তার আদিম চেতনার ভগ্ন স্বরগুলি প্রতিটি সভ্য দেশে বর্তমানকালেও দৈব সত্যের প্রকাশ বলে স্বাগত জানানো হয়। ভারতও এই নিয়মের ব্যতিক্রমকারী

নয়। কারণ অশোকের ও অন্যান্য যুগের সব দেশান্তর-গমন আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগের পাশে ম্লান হয়ে যায়, যখন উত্তরের সমভূমিতে সর্বপ্রথম বসবাসের জন্য এসেছিল সেই জাতির ছোট একটি সম্প্রদায়, যাদের ইতিমধ্যেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্মের, যারা বহন করে এনেছিল মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি। এ এক সুসংবদ্ধ অভিবাসন ছিল না। লাল কাফির বা পাংশু জাতি, হিন্দুকুশে আজও বসবাসকারীরা, যাত্রাপথ থেকে এক পাশে সরে আসা পলাতকদল ছিল না। আমরা বরং অনুমান করব বহু শতাব্দী ধরে হিমালয় অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে অভিবাসনের প্রাচুর্য। তবুও কোন সময় বা স্থানে এটি যথেষ্ট সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়েছিল তার চিন্তাধারার মহান উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে, তার জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে রাখতে এবং আর্য সভ্যতার স্বপ্ন ও রূপ নির্ধারণ করতে।

যেখানে আর যখনই এটা ঘটে থাকুক, এই ছিল সেই সময়, যখন দীর্ঘকালের সঞ্চিত চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ জমাট হয়ে বেদের রূপ ধারণ করল। সকল শাস্ত্র এইভাবে জন্মগ্রহণ করল। তাতার পশুপালক কৃষকরূপে অজানা ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়ে তার আদর্শ ও স্মৃতি লিপিবদ্ধ করল এবং আমরা পেলাম চীনা জাতির 'এিক' বা পরিবর্তনের পুস্তক। সিরীয় মেষপালকদের কয়েকটি উপজাতির কঠোর আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ব্যাবিলনীয় শহরগুলির ধ্বংসভীতির সম্মুখীন হলো এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারা তাদের সূক্ষ্ম দুর্দশার কথা বিবৃত করল। ল্যাতিন চার্চ নর্স-কৃষকদের কাছে একহাতে নিয়ে গেল দীক্ষাদানের পবিত্র বারি এবং অন্য হাতে অক্ষর-লিপি, যার দ্বারা সে তার চমৎকার গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবে। পুরাতন সভ্যতা সম্পূর্ণ আত্ম-চেতনায় সেই মুহূর্তে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, যখন তার প্রতিটি পাপড়ি বসন্তে শিহরিত হয়ে ওঠে।

এইভাবে কেটে গেল বৈদিক যুগ, কারণ আর্যেরা ভারতে বাস স্থাপন করেছে এবং হিন্দু হয়ে উঠেছে। যে প্রণালীতে এটি ঘটেছে, সেটি নিশ্চয়ই খুব জটিল ও ধীর ভাবাপন্ন ছিল। কোন কোন দিকে এটি বেশি বিলাসবাহুল্যকর হলেও মূলত ছিল জীবনের সরলীকরণ। হিমালয়ে নির্মাণকারীদল ব্যবহার করেছিল কাঠ ও পাথর। সমতলভূমিতে নির্মাণকারীদল ব্যবহার করেছিল বাঁশ, মাটি ও ইঁট এবং তাদের স্থাপত্যের নকশাগুলি মোটামুটি মৃৎশিল্পের রীতি অনুযায়ী হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার তন্তুবায়রা 'পশম নিয়ে কাজ করেছিল, চমৎকার রঙয়ে নিঃসন্দেহে। দক্ষিণের কারুশিল্পীরা তুলা ও রেশম নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। শুদ্ধি অনুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা সমস্ত এশীয় সংস্কৃতিতে একই ধরনের এবং যা আজও ইউরোপে প্রচলিত 'স্যাক্রামেন্ট ও রুব্রিক'-রূপে তা নিশ্চয়ই নতুন জল-হাওয়া অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য গভীরতর ও ব্যাপকতর করা হয়েছিল। স্বাভাবিক উপমার রূপান্তর ঘটল। বন্ধুত্বের গুণরূপে শৈত্যকে বদলে নেওয়া হলো উষ্ণতার সঙ্গে। হিমালয়ের দৃশ্যাবলী আর উপস্থিত নেই চমৎকার পৌরাণিকী কথা ও বিরাট কল্পনার সদা সর্বদা জন্মদান করার জন্য। ক্রমশ স্থানীয়

চিন্তা ও উপাসনাকে পরিশোষণ করা শুরু হলো, যা উৎপাদন করেছিল সেটি, যেটির আধুনিক অবস্থাকে হিন্দুধর্ম বলে জানা যায়। কিন্তু এটি সবসময়েই ছিল পরিশোষণ। এটিকে সব সময় হতে হয়েছিল দেশীয় প্রতীকের উপর আর্যবুদ্ধির ক্রীড়া, যে কুসংস্কারকে যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় না তাকে কখনই গ্রহণ নয়। চিন্তার এই বিস্ময়কর নিরবচ্ছিন্নতা হিন্দু ধর্মের ঐক্যকে লক্ষ্যণীয় করে তোলে, যা আর অন্য কিছু তেমন পারে না। প্রতিটি মতবাদই তার সীমান্তের মধ্যে—আর সেই সীমান্ত ধর্মীয় চিন্তার বিভিন্ন ধরনকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট বিস্তৃত—প্রমাণ করতে পারে বেদই হচ্ছে তার প্রামাণিক গ্রন্থ। এমন কি কালিকা দেবীর মূর্তির ছায়াও ঋক্‌বেদের সৃষ্টি সম্পর্কীয় মহান স্তোত্রের মধ্যে পাওয়া যায়—

আত্মা কারণরূপে নি ম্ন বিধৃত
কার্যরূপে ঊর্ধ্বে অভিক্ষেপিত।

তাহলে ভারতবর্ষে আমরা পাই মিশর বা গ্রীসের মতোই এক প্রাচীন জাতি, যাকে মানসিক স্তরে স্বাধীনভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং যে আজ পর্যন্ত তার চিন্তার সূত্র অবিচ্ছিন্নরূপে ধারণ করে আছে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে মহান সংস্কৃতি ও আত্মসুখ দর্শনগুলি প্রায় সর্বদাই মহাদেশীয় হয় তাদের উৎপত্তিতে, আর জাতীয়তার বোধ ও সৌন্দর্যের প্রতি নির্বন্ধ হচ্ছে সংকীর্ণ। এটি যদি সত্য হয়, তাহলে এটিই ব্যাখ্যা করবে গ্রীস ও ভারতীয়ের মধ্যে কার চেয়ে হেলেনীয় ও জাপানীয় উন্নয়নের মধ্যে বেশি সহানুভূতিকে।

কারণ হিন্দু কল্পনা বহু পূর্বেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গিয়েছিল দৈহিক সৌন্দর্যের চক্র হতে আরও উচ্চতর ভূমিতে নিজের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সন্ধানে। এই সত্য অসাধারণভাবে প্রকট হয়েছে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে, যেখানে তিনি হিমালয়-দুহিতা উমার মহাদেবের প্রতি অনুরাগ বর্ণন করেছেন। এখানে কবি তাঁর নায়িকাকে কুমারীসুলভ মাধুর্যের চরমে স্থাপন করেছেন, মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে উপাসনা করার জন্য নতজানু হয়েছেন এবং তার পটভূমিরূপে রয়েছে কিসমিস, চেরী ও বাদাম বৃক্ষের অরণ্য, যা অকস্মাৎ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, কারণ তাদের কাছে প্রেমের সহচর বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। আর তারপর কলমের একটি খোঁচায় ছবিটি মুছে ফেলা হয়েছে, মহাদেব তাঁর বৃক্ষতলের আসন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; মদন ভস্মীভূত হয়েছেন, রাজকুমারী একা বসে আছেন, আর মদনের সুন্দরী পত্নী রতি করুণ বিলাপে সমস্ত বনভূমি ভরে গেছে। উমার জয় হলো, দেবতা স্বামী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন শুধু তখনই, যখন অশ্রুতপূর্ব তপশ্চর্যার মধ্যে তিনি সন্ন্যাসিনী ও পূজারিণীরূপে, নারী ও প্রেমিকার পরিবর্তে, তাঁর সাহস ও ভক্তির চরম প্রমাণ প্রদান করলেন। এই মনের আবেগ প্রকাশ গ্রীকদের মানসিক শক্তি সীমার বহু দূরে অবস্থিত।

আধ্যাত্মিক ধারণার প্রত্যক্ষ ও যথেষ্ট অভিব্যক্তি সন্ধানের পরিবর্তে, যেমন ইউরোপের প্রাচীন মনীষীরা করেছিলেন, শিব বা মহাদেবের সর্বাঙ্গীণ ধারণার আদ্যন্তের

মধ্যে শুধুমাত্র প্রতীক ব্যবস্থার বিষয়বস্তুরূপে দৈহিক চিহ্ন ব্যবহার করার এক অনুরূপ প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত তিনি এবং এই দেবতার কয়েকটি নাম টডকে তাঁর 'অ্যানালস অফ রাজস্থান' গ্রন্থে অনুপ্রাণিত করেছিল শিবকে গ্রীক ব্যাকাসের এক নতুন সহজ সংস্করণরূপে গণ্য করতে। এটা আরও বেশি সম্ভব যে এই দুজনের পিছনে, অস্পষ্ট উত্তরভাগে ও সুদূর অতীতে—মানস-সরোবরের কোন চিন্তাধারায়, ম্যাক্স মুলারের উদ্ধৃতি অনুযায়ী—এক সাধারণ পূর্বপুরুষ অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা দুটি ধারণার মধ্যে দূর অপসারণকে শুধু আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

উত্তর ভারতে যে কেউ ভ্রমণ করলে প্রতিটি দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বৃক্ষতলে ছোট কালো পাথরটির অর্থ কী তা জানতে ইচ্ছুক হবেন, যাকে এমন স্পষ্টভাবে স্থাপন করা হয়েছে পূজার জন্য। ইউরোপীয়রা বলেন এগুলির উৎপত্তি হচ্ছে লৈঙ্গিক। যদি তাই হয়, তাহলে 'মে-পোলের' ওই ধরনের উৎপত্তির সত্য সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন হিন্দুরা তার চেয়ে বেশি সচেতন নয়। যেখানেই কেউ যায়, গ্রামে ও সহরে রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে বা কোন উদ্যানের প্রবেশ-পথে যদি কোন বৃক্ষ একাকী দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সেখানেই এগুলি দেখতে পায়। কারণ এই ধরনের স্থানে চিন্তা করে আনন্দিত হওয়া যায় যে মহাদেব দ্বারে দ্বারে তাঁর এক মুষ্ঠি অন্ন ভিক্ষা করে, হয়তো তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য।

লিঙ্গম বলে অভিহিত ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তম্ভ—লিঙ্গম শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রতীক—হয়তো কোন নদীগর্ভ হতে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘ ডিম্বাকৃতির মতো হয়। কিন্তু যদি এটি মানুষের হস্ত দ্বারা কর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে এটি ক্ষুদ্র ও একটু ছুঁচালো এবং উপরটা অঙ্গুস্তানার মতো হয়। কখনও কখনও সরল বিশ্বাসে মানব-মুখাকৃতি সাদা রঙ দিয়ে কম-বেশি স্থূলভাবে এর উপর অঙ্কিত হয়। যে কোন ক্ষেত্রেই, এটা শুধু সময়ের প্রশ্ন, যে পর্যন্ত না কোন রমণী তার স্নানান্তে পথ দিয়ে যেতে যেতে একটু জল ঢালার জন্য থামে কিংবা কয়েক দানা চাল প্রস্তরের মস্তকে সন্তর্পণে বর্ষণ করে, হয়তো তার সঙ্গে যুক্ত থাকে কিছু বেলপাতা, আমাদের ক্লোভার গাছের মতো ত্রিপত্র, কিংবা সাদা ফুলের মালা অথবা সাধারণের চেয়ে আরও বেশি ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় একে চন্দনচর্চিত করে, যা এই উষ্ণ ঋতুর দেশে শীতল ও সজীবকারী; তারপরই এই স্থানের মৃত্তিকায় মস্তক স্পর্শ করা হয় এবং পূজারী চলে যায়।

এই সরল কার্যটি কিন্তু তার সংশ্লিষ্ট জটিলতাবিহীন নয় এবং আমরা তার ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াই। প্রথমে বৃথাই। কিংবা যে ব্যাখ্যা করা হয় তা সাহায্য করার চেয়ে আরও বেশি বিভ্রান্ত করে। হিন্দুরা প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রতীক-স্বভাব সম্পর্কে এত সচেতন এবং বেশীর ভাগ বিদেশী জিজ্ঞাসুর নিন্দাপূর্ণ অশ্রদ্ধা সম্বন্ধে এত বেশী অনুভূতিশীল যে, কোন সাধারণ বিদেশীর সঙ্গে তাদের অন্তরের অন্তরতম কথা বলতে

বা তর্ক করতে চাইবে না। বরং তারা এক অদ্ভুত করুণার সঙ্গে কথা বলবে। তারা বলবে, 'তুমি বুঝতে পারছ না এই হচ্ছে মহাদেব, যাকে এখানে প্রতীকরূপে রাখা হয়েছে ? তার কোন দর্শনার্থী নেই, ইতিহাস নেই, পূজারী নেই। সে সব হচ্ছে মানুষের মিথ্যা স্বপ্ন। শুধু আমাদের নিজেদের হৃদয়ের শান্তির জন্য এবং নিজেদের আন্তর দর্শনের নিকটতর করার জন্য আমরা এক প্রস্তর স্থাপন করি, যার উপর আমরা চাল ও জল আর একটা দুটো পাতা অর্পণ করতে পারি।' সারা ভারতবর্ষে এমন এক সরল নারী বা অজ্ঞ কৃষক খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর হবে, যার কাছে পূজা হয় না, যেমন একজন বলেছেন, 'আদিম নরত্বারোপের এক অংশ বিশেষের বদলে এক সচেতন প্রতীকতা।' তথাপি ধীরে ধীরে মহান পৌরাণিক কাহিনী প্রকাশিত হয়। আস্তে আস্তে আমরা নামের অনুষঙ্গগুলি শিক্ষা করি।

যাহোক, লিঙ্গম হচ্ছে শুধু এক প্রস্তরের খণ্ড। মহাদেবের আরও ভাল প্রতিমূর্তি হচ্ছে তারা, যারা ভ্রাম্যমান জনতার মধ্যে আসে ও অদূরে চলে যায়—সন্ন্যাসীরা ও ভিখারীরা, কারও কেশে জটা ও অঙ্গ শুধু ভস্মে ভূষিত, অন্যদের মুণ্ডিত মস্তক ও কণ্ঠ হতে পদ পর্যন্ত পবিত্র হরিদ্রাবস্ত্র, আর তাদের বেশির ভাগই কোন না কোন রকম দণ্ডধারী কিংবা ত্রিশূলধারী এবং ভিক্ষাপাত্র বহন করছে। এঁরা আরও সুন্দর হয়ে ওঠেন, যখন বনবাসী হন কিংবা অনন্ত তুষাররাশির সীমায় আরোহণ করে, কোন বৃক্ষ বা শিলার তলায় আশ্রয় নিয়ে ওই প্রস্তর লিঙ্গের মতো সোজা উপবিষ্ট থাকেন, বাইরের জগৎ সংসার ভুলে একাকী ধ্যানে নিমগ্ন।

সমস্ত ধারণাটির মধ্যে রয়েছে হিমালয়ের এক বিস্ময়কর স্মৃতিজড়িত। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন আমরা শুনি, সেই মহান বৈদিক যুগে, যখন পর্যন্ত চলছিল আর্য অভিবাসন। সে ছিল যজ্ঞের দিন এবং জঙ্গল পরিষ্কারক মানুষেরা ও পুরোহিতেরা মিলিত হতো শক্তিশালী অগ্নিতে আহুতিরাশি প্রদান করতে উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও দিনের পর দিন, পবিত্র অগ্নিশিখারাশি জেগে থাকত, এবং তা নিভে যাওয়ার অনেক পরেও উত্তপ্ত সাদা ভস্মরাশি পড়ে থাকত বিরাট অগ্নিকুণ্ডগুলিতে, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট স্ফুলিঙ্গের শিহরণ জাগাত, মৃত্যুর শীতলতায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের নিঃশেষ করত। কে প্রথমে এগিয়ে এসেছিল এবং নিজেকে ভূষিত করেছিল ওই কোমল শ্বেত ভস্মে ঈশ্বর উপাসনার জন্য এবং সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ? কে প্রথমে চলে গিয়েছিল গুহা বা জঙ্গলের মধ্যে এবং ধ্যানস্থ হয়েছিল যতক্ষণ না তার কেশরাশি জটাজুটে পরিণত হয়েছিল, তার নখগুলি দীর্ঘ হয়েছিল এবং তার দেহ শীর্ণ হয়েছিল আর সে তবুও আত্মার পরম আনন্দকে অনুসরণ করে চলেছিল ? যাহোক, এই ধরনের এক বাহ্য আকারের ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভারতের সকল প্রতিভা বহু শতাব্দী ধরে ঠিক এই

ধরনের এক ছবির কথা বলেছেন—ভস্মবিভূষিত সন্ন্যাসী, অবহেলিত কেশরাশি মস্তকের উপরে জটাবদ্ধ, সমগ্র জগৎ সম্পর্কে উদাসীন, শুধু চিন্তায় মগ্ন।

তুষারমণ্ডিত পর্বতমালার দৃষ্টিপথে আর্যেরা যখন ভ্রমণ করে বেড়াত, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদান ছিল তাদের প্রধান অনুষ্ঠান, তখন তাদের মনে দুটি ভাবের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আহুতির অগ্নিশিখা কি হিমালয়ের মতো শুভ্র নয়, যা উচ্চাভিলাষী ওই শৃঙ্গগুলির মতোই সর্বদা ঊর্ধ্বে উত্থায়মান এবং তাঁদের পশ্চাতে ভস্মরাশি রেখে দেয় জমাট হিমকণার মতো? আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করব ওই তুষারমণ্ডিত উচ্চতা তাদের ভালবাসার কেন্দ্রীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। নিস্তব্ধভাবে জগতের উপর মাথা তুলে, তাদের শীতলতা ও দূরত্বে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, তবুও বর্ণাতীতভাবে সুন্দর, তারা কিসের মত দেখতে? কেন, তারা যেন যোগী—মহাযোগী, ভস্মবিভূষিত, ধ্যানমগ্ন, নীরব নিঃসঙ্গ। তারা যেন—ঠিক যেন স্বয়ং মহাদেব, শিব।

এই ধারণায় উপনীত হয়ে হিন্দু মানসিকতা শুরু করল সৃষ্টি করতে নানা ধরনের আনুষঙ্গিক উপকরণ ও প্রতীক, যার মধ্যে কখনও অগ্নিশিখার, কখনও পর্বতের, কখনও যোগীর ভাব প্রধান হয়ে ওঠে—সবগুলিরই অবদান রয়েছে শিব বা মহাদেবের সম্পূর্ণচিত্র সৃষ্টিতে।

যজ্ঞের জন্য কাঠ বহন করে আনা হয় ষাঁড়ের পিঠে। শিবের এক বৃদ্ধ ষাঁড় আছে, যার পিঠে তিনি চড়েন।

চাঁদ পর্বতের উপরে শোভা পায়, তাই তিনি কপালে বহন করেন বাঁকা চাঁদ।

প্রকৃত যোগীর মতোই গৃহস্থের দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করেন, খুব সামান্য দানেই তিনি সন্তুষ্ট হন। স্নানের জন্য শীতল জল, কয়েক দানা চাল আর দু-তিনটি সবুজ বেলপাতা তাঁর দৈনিক পূজার সমগ্র উপকরণ। কিন্তু তণ্ডুল ও জল সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া চাই, কারণ সেগুলি প্রদান করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত অতিথিকে। স্পষ্টত বিল্বপত্র আমাদের 'শ্যামরক' এর মতো, ত্রিমূর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ আমরা সকলে জানি এই ত্রিমূর্তির তত্ত্ব হচ্ছে যেমন হিন্দুর, তেমনি খ্রীশ্চান ও মিশরীয়দের।

শিব কত সহজেই খুশি হতে পারেন সেটা বোঝাবার জন্য লোকেরা এক চমৎকার গল্প বলে। এক দরিদ্র ব্যাধ—যাকে বলা হয়, নীচের থেকেও নীচতম একজন—একদা সারাদিন শিকার অন্বেষণে ঘুরে একটিও প্রাণী ধরতে বা বধ করতে পারল না। রাত্রি ঘনিয়ে এল, সে গৃহ থেকে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একা। কাছাকাছি এক বেলগাছ ছিল, যার শাখাগুলি মাটি থেকে খুব উঁচু ছিল না, তাতে চড়ে সে খুব আনন্দিত হয়েছিল, বুনো জন্তু থেকে রক্ষা পেয়ে রাতটা কাটাতে পারবে। কিন্তু গাছের ডালে যখন সে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে তখন গৃহে তার অভুক্ত স্ত্রীপুত্রদের চিন্তা মনে আসে, তাদের জন্য দুঃখে তার চোখ দিয়ে হু হু করে জল বেরিয়ে গাল গড়িয়ে পড়ল আর সেই জল বেলপাতার উপর পড়তে তাদের ভারে বেলপাতা খসে গেছের

জলের সঙ্গে মাটিতে পড়ল। সেই পবিত্র বৃক্ষতলে ছিল এক শিবলিঙ্গ, শিবের প্রতিমূর্তি, আর বিল্বপত্রসহ অশ্রু পড়ে সেই শিবের মস্তকে। সেই রাত্রে এক কালসর্প গাছে উঠেছিল এবং লোকটিকে দংশন করেছিল। তারপর দেবদূতরা এসে তার আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে গেল এবং শিবের পদতলে স্থাপন করল।

তখন সেই স্বর্গে বহু কণ্ঠের কোলাহলের মধ্যে প্রশ্ন উত্থিত হলো—'এই বর্বর এখানে কেন? সে কি অপবিত্র বস্তু আহার করেনি? উপযুক্ত যজ্ঞ সে কি করেছে? শাস্ত্রীয় আচরণ কি সে জানে?'

তখন মহাদেব শান্ত বিস্ময়ে তাদের দিকে ফিরে বলেন, 'সে কি বেলপাতা ও চোখের জলে আমার পূজা করেনি?'

যাহোক, অগ্নিশিখাকে যদি ভাল করে লক্ষ্য করা যায়, একটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে শুভ্রবর্ণ কিন্তু তার কণ্ঠ নীল—এমন কি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেও আমরা এটা দেখতে পাই। আর মহাদেবের উপর নীলকণ্ঠ আরোপ করার জন্য নিম্নলিখিত কাহিনীটি গড়ে উঠেছে:

কোন এক সময়ে দেবতাদের সকল গৌরব ও আড়ম্বর নষ্ট হতে যেতে বসেছিল। (আমরা সবিস্ময়ে ভাবি এই ধরনের গল্প কি সেই যুগের স্মৃতি, যখন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি পৃথিবীর কর্তারা নিজেদের জনপ্রিয়তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিলেন, কারণ ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—বরণীয় হয়ে উঠছিলেন?) কী করতে হবে দেবতারা জানেন না, কিন্তু তারা স্থির করলেন বিশ্বের পালন কর্তা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করবেন উপদেশ। তিনি তাঁদের বললেন, বোধ হয় অবজ্ঞাভরেই—'যাও, সমুদ্র মন্থন কর গে।' তাঁর আদেশ পালন করার জন্য হতভাগ্য দেবতারা সাগ্রহে দল বেঁধে অগ্রসর হলেন।

তাঁরা সমুদ্র মন্থন করেই চলেন। অনেক বিরাট আশ্চর্যজনক জিনিস উঠে এল এবং তাঁরা সেগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করলেন, কেউ পেলেন এক আশ্চর্য হস্তী, কেউ পেলেন রাজকীয় অশ্ব, আবার কেউ পেলেন সুন্দরী স্ত্রী। প্রত্যেকেই শুধু লোভাতুর হয়ে পরবর্তী আনন্দদায়ক বস্তুটি প্রথমে নেবার জন্য ব্যগ্র হলেন, তখন হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ কিছু একটা উঠতে শুরু করল। ধীরে ধীরে উঠে সেটি সমস্ত সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই সভয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল 'এটা কী?' সেটা ছিল বিষ—তাদের মৃত্যুস্বরূপ, পৃথিবীর মৃত্যুস্বরূপ, জগতের মৃত্যুস্বরূপ। সেটি একবারে তাদের পদতলের কাছে গড়িয়ে আসে এবং ভয়ে তাদের তাড়াতাড়ি পলায়ন করতে হয়, কিন্তু যাবার জায়গা কোথাও নেই, কারণ সেই ঘন অন্ধকার সমস্ত জগৎ প্রায় ছেয়ে ফেলে। প্রাণভয়ে সেই মুহূর্তে সকল দেবতা সমস্বরে শিবকে আহ্বান জানালেন। তিনি সমুদ্রের দান গ্রহণে কোন অংশ নেননি, হয়তো তিনি এখন তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। তৎক্ষণাৎ শ্বেতকায় শিব তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। তাঁদের ভয় ও সঙ্কটে তিনি মৃদু হাসলেন এবং নত হয়ে তরঙ্গে হাত ডুবিয়ে বিষকে আদেশ করলেন তাঁর অঞ্জলির

মধ্যে প্রবাহিত হতে। তারপর জগৎকে রক্ষার জন্য মরণ বরণে ইচ্ছুক হয়ে তিনি সেই বিষ পান করলেন। কিন্তু যা ছিল সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট, তা শুধু তাঁর কণ্ঠে কলঙ্ক ফেলার পক্ষে পর্যাপ্ত। সেই থেকে চিরকাল তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে গেলেন।

সম্ভবত সব চেয়ে বৈশিষ্ট্যজনক কাহিনীগুলির অন্যতম যা মহাদেবের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তা হচ্ছে বরাহ শিকারের কিংবদন্তী। যখন আমরা সেটি পড়ি তখন যেন আমরা দণ্ডায়মান হই হিমালয় পর্বতমালার তৃতীয় শ্রেণীটির তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে এবং মনে হয় যেন লক্ষ্য করছি আমাদের সামনের সংকীর্ণ গিরি-সংকটে ভীষণ তুষার-ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীরদের অন্যতম এবং গীতার কথোপকথনের দ্বিতীয় জন, অর্জুন পর্বতমালায় আরোহণ করেছিলেন তিন মাসব্যাপী শিব পূজা করে তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য। অকস্মাৎ একদিন যখন তিনি শিবলিঙ্গের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন সচকিত হয়ে উঠলেন এক বন্য বরাহ দ্বারা, যে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে। মুহূর্তমাত্রের মধ্যেই সুদক্ষ ধানুকী অর্জুন তাঁর ধনুক গ্রহণ করে পশুটিকে তীরবিদ্ধ করলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এক সতর্কবাণী শোনা গেল এবং অর্জুনের তীরের প্রায় সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি তীর পশুটির দেহকে বিদ্ধ করল। বীরবর চোখ তুলে দেখলেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে এক বিশাল-দর্শন কিরাত ও কিরাতিনী, শিকারের পোশাক পরা অগণিত নারী অনুগামীসহ এবং কিছু দূরে অপেক্ষমান রয়েছে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির দল—ভূত-প্রেতের বাহিনী। মুহূর্ত পরে শিকারীর দল তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়।

'এটা আমার শিকার!' শিকারী চিৎকার করল—আর তার কণ্ঠস্বর যেন পর্বতমালার মধ্যে তুষার-ঝঞ্ঝার গর্জন—'তাড়া করা এ শিকার আমার। এই জঙ্গলের রাজত্ব আমার। তুমি একে ছুঁতে সাহস কর কী করে?'

এই ধরনের কথায় অর্জুন রাগে জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর ধনুক আবার তুলে নিলেন, যা তিনি আবার পূজায় বসার জন্য এক ধারে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি শিকারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন।

'ঠিক আছে' এই জবাব পাওয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বীরবর সবিস্ময়ে দেখলেন তিনি যেন ভয়ঙ্কর কোন অশরীরীকে আক্রমণ করেছেন, কারণ তাঁর সুতীক্ষ্ণ তীরগুলি একটির পর একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার কোন ক্ষতি না করে।

ধনুক একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অর্জুন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমরা মল্লযুদ্ধ করব!'

তিনি তাঁর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর বুকের উপর এক হাতের মৃদু স্পর্শ পেলেন এবং বিস্ময়াহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি যখন সামলে উঠলেন, কিরাত বলল, 'কি হে, চলে এস।'

কিন্তু অর্জুন রণে ক্ষান্ত হলেন। তাঁর মনে হলো তিনি যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছেন। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, আমি প্রথমে আমার পূজা সেরে নেব।'

তিনি এক ফুলের মালা তুলে নিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করলেন। পর মুহূর্তে অর্জুনের চোখ খুলে গেল, কারণ সেই কিরাত তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে আশীর্বাদ করল এবং ফুলের মালাটি তাঁর গলায় দুলছে।

'মহাদেব! মহাদেব!'—ভক্ত চিৎকার করে উঠল এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দেবতার চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে শিকারীর দল পার্বত্য পথ দিয়ে দূরে চলে গেছে, কিরাত ও কিরাতিনী তাদের দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিব সম্বন্ধে এই ধরনের কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে, যা তাঁর সব ভক্তেরা গভীর ভাবে ভালবাসে। তাদের কাছে মহাদেবের মত এমন শক্তিশালী, পবিত্র ও পরম দয়ালু জগতে আর কেউ নেই এবং হিন্দুদের খুব কম গ্রন্থ ও কাব্য আছে, যাতে তাঁকে গভীর ভক্তির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়নি।

কখনও তিনি হচ্ছেন হিমালয়ের উপর সম্পূর্ণ নরস্বারোপিত, তখন যেন ছায়াপথ তাঁর মস্তকের উপর নেমে আসে, জটাজালের মধ্যে পথ খুঁজে বেড়ায় এবং শেষে গঙ্গারূপে নির্গত হয়। বাস্তবিকই বলা যেতে পারে, লোকের কল্পনা তাদের উত্তরের পর্বতমালাকে তাঁর এক বিশাল মন্দিররূপে সৃষ্টি করেছে, কারণ তারা বলে, বহু দূরে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলির পারে, যেখানে হিমালয় সব চেয়ে বিরাট এবং ভারত শেষ হয়ে তিব্বতের শুরু, সেখানে আছে মানস-সরোবর, বরফ-ঢাকা কৈলাস শিখরের পদতলে। সে স্থান হচ্ছে নিস্তব্ধতা ও চির তুষারের রাজ্য এবং উত্তর অঞ্চল রক্ষাকারী এই স্থানই হচ্ছে সেই পবিত্রভূমি, যা শিব ভালবাসেন।

তিনি হচ্ছেন শান্তস্বরূপ, কাবুকেই বিমুখ করেন না। এখানের উচ্চভূমিতে তাঁর চারধারে তারাই এসে ভিড় করে, যারা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে এবং সৌভাগ্যবানদের মধ্যে কোন স্থান পায়নি। যাকে পৃথিবীর সবাই ঘৃণা করে ও তাড়িয়ে দেয়, সেই সাপরা কৈলাসে আসে এবং মহাদেবের উদার হৃদয়ে তাদের জন্যও স্থান আছে, তিনি তাদের অঙ্গে ধারণ করেন। আর ক্লান্ত পশুরাও তাঁর কাছে আসে,—কারণ তিনি জন্তুদেরও আশ্রয়দাতা—তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এক কুৎসিত বুড়ো ষাঁড়, যাকে তিনি বিশেষ করে ভালবাসেন এবং তারই পিঠে আরোহণ করেন।

এখানে আরও আসে সেই সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আত্মা, যারা দুরন্ত, হাঙ্গামাকারী ও অদ্ভুত, যেন বয়স্কদের জগতের দুষ্টু ছেলেমেয়ে। সেই সব লোক, যারা এত কুৎসিত যে কেউ তাদের দেখতে চায় না; যারা বিশ্রীভাবে কাজ করে, জোরে কথা বলে ও সব কিছু ভণ্ডুল করে দেয়, যদিও তারা কোন ক্ষতি করতে চায় না এবং সেই সব হতভাগারা, যারা একগুঁয়ে, যার জন্য তারা কখনও সোজাসুজি কিছু দেখতে পায় না, একটু পাগল

বলে যাদের বোধ হয়—এই ধরনের সব আত্মার উপর একমাত্র তাঁরই করুণা বর্ষিত হয়। তিনি তাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত আর তারাও তাঁকে ভালবাসে ও পূজা করে। তাঁর কাজ তিনি তাদের দিয়েই করান, আর তারা শিবের ভূত-প্রেতের দল বলে পরিচিত।

কিন্তু শিব এর থেকেও বেশি। তিনি হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ; স্বাধীনতা, পবিত্রতা ও আলোকের চিরন্তন স্বতঃসিদ্ধতা। তিনি হচ্ছেন বস্তুর শিক্ষাদাতা মহান আত্মা। অজ্ঞতা ধ্বংস করা তাঁর কার্য এবং যেখানে জ্ঞান লাভ করা যায় সেখানেই তিনি। তাঁর 'হর হর' নাম ছিল মারাঠাদের রণধ্বনি। আরও হচ্ছে, তিনিই রুদ্র, ঝঞ্ঝা, ভয়ঙ্কর এবং এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দুধর্ম তার প্রাত্যহিক প্রার্থনায় তাঁকে বলে :

'চিরদিন আমাদের রক্ষা কর—হে রুদ্র।
তোমার মধুর করুণাভরা মুখের দ্বারা অজ্ঞতা থেকে।

কারণ সবার উপরে, মানবিক গুণ সর্বদা দু'টির একটিতে সীমাবদ্ধ, দেবতার স্থান দুইয়ের ঊর্ধ্বে, যেমন ভাল তেমনি-মন্দের ঊর্ধ্বে, যেমন আনন্দ তেমনি দুঃখের পারে। এখানে আমরা পাই সমদৃষ্টির ভারতীয় ধারণা এবং সম্ভবত এর ভক্তিমূলক তাৎপর্য আর কোথাও এমন ব্যাখ্যাত হয়নি, যেমন সুরদাসের হিন্দি গানে হয়েছে, যেটি এক রাজপুত দরবারে এক নর্তকীকে গাইতে শোনা গিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হচ্ছে :

প্রভু মেরা অবগুণে চিত না ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘর পর,
পরশকে মন দ্বিধা নহী হৈ
দুগু এক কাঞ্চন করো॥
ইক নদিয়া ইক নাম্ন কহাবত মৈলী নীর ভরো
যব মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পরো।
ইক মায়া ইক ব্রহ্মা কহাবত সুরদাস ঝগেরো,
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পবিত্রজনের ধর্মমত

এক বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাঁর সাধনার শেষে এবং বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তিনি প্রায় নির্বাণ লাভ করছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর চরণ সেই পরম আনন্দের দ্বার স্পর্শ করেছে, তখন তাঁর কানে এল মানব সমাজের করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি। সেই মহাত্মা নির্বাণের দ্বার থেকে প্রত্যাবর্তন করে আবার সাংসারিক জীবনে প্রবেশ

করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন যে যতক্ষণ না বিশ্বের শেষ ধূলিকণাটি পর্যন্ত তাঁর পূর্বে মুক্তিলাভ না করছে, তিনি কোনক্রমেই নিজে মুক্তি নেবেন না। আর এই বোধিসত্ত্বই তিনি, যিনি তিব্বতের দালাই-লামার সিংহাসনে বসে জগতের মানুষকে স্বর্গীয় করুণাপূর্ণ নেত্রে দূর থেকে লক্ষ্য করছেন।

বিভিন্ন নামে অভিহিত, বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত, যেমন এখানে দালাই-লামার কাহিনীতে হিন্দুধর্মের মধ্যে আমরা সর্বদা এক প্রচেষ্টা দেখতে পাই সেই ভাবটিকে ব্যক্ত করার যে পরম সত্তার হৃদয়ে মানুষের প্রতি অটল করুণার অস্তিত্ব আছে। এটি মনে হতে পারে যে মানব সমাজের ধর্মীয় সহজ প্রবৃত্তির কাছে 'ঈশ্বর দ্বারা আত্মার অনুসরণ-এর স্বপ্ন এক প্রয়োজনীয়তা এবং এটিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ করার অসম্ভবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হিন্দুরা তাদের প্রচেষ্টাকে পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে রাখে। তাই সৃষ্টি হয়েছে অবতারদের কাহিনী। কারণ পুনর্জন্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তখনই শুধু পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে, যখন আমরা বুঝি যে অনন্ত প্রেম, ব্যক্ত জগতে নিজেকে অভিক্ষেপকারী রূপে, বার বার মানুষের আকার গ্রহণ করে প্রকাশিত হয়, বিভ্রান্তির অন্ধকারের মধ্যে এক প্রদীপের মতো কার্য করার উদ্দেশ্যে, বাসনার আকর্ষণের বিপরীতচুম্বকত্ব।

হিন্দুরা বলেন,—যাদের কল্পনাকে কখনও প্রাদেশিকতার দোষে অভিযুক্ত করা যায় না,—এ চিন্তা অবাস্তব যে এই ধরনের অবতার, ধরে নেওয়া যাক তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে, মাত্র একবারের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মানুষের শ্রদ্ধা কি এক স্বর্গীয় গুণ? কিংবা মানবসমাজের প্রয়োজন কি কোন সময়ে পরিপূর্ণতার চেয়ে কম? আবার আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি যে সৃজনশীল শক্তির সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তির রূপ ধারণ করা ও পরিত্যাগ করার একটি মাত্র প্রচেষ্টাতেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে? বরং, সেই পরম সত্তার নিজের উপর নশ্বর রূপ ও সীমা আরোপ করা সেই বিভুর কাছে ঠিক যেন 'বসন্ত বায়ুর ফুলের সুবাস বহন' করার মতো এক খেলার বিষয় কিংবা বাতায়ন পথে রাখা প্রদীপের আলোক বিতরণের মতো,—তার বেশি কিছু নয়।

এইভাবে গোঁড়া হিন্দুও স্বভাবত এমন অবস্থায় নেই যে বেথেলহেমের শিশুর অলৌকিক চরিত্রকে অস্বীকার করে। সে শুধু স্বীকার করতে অক্ষম যে খ্রীষ্টের প্রকৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র অনন্য, তার নিজের দেশই এই ধরনের তিনটির বেশি দেখেছে,—রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—যাঁরা ছিলেন খ্রীষ্টের সমগোত্রীয়। সে আরও অকাট্যভাবে কখনও কখনও দাবি করে যে এই সবই এবং সম্ভবত আরও কেউ, যাদের সম্বন্ধে সে শোনেনি, তারা সবাই একই আত্মা, দেবত্বের এক অভিব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ঘুরে ঘুরে এসেছে মানব হৃদয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য। আর এই বিষয়ের সমর্থনে কৃষ্ণের অতি পরিচিত উক্তি সে উধৃত করে, 'যখনই ধর্মের ক্ষয় হয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখনই আমি আবির্ভূত হই; সাধুদের রক্ষার জন্য

পাপীদের বিনাসের জন্য, ধর্মকে দৃঢ় ভাবে সংস্থাপনার জন্য আমি বারে বারে জন্মগ্রহণ করি।'

হিন্দু চিন্তাবিদদের কাছে এটা খুবই স্বাভাবিক যে দেবত্বের এমনি আবির্ভাবকে ঘিরে এক নতুন ধর্মব্যবস্থা বা সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি হচ্ছে শুধু মায়ার এক মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করার জন্য এক বিশেষ প্রণালীমাত্র, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের স্নেহের এক নতুন প্রকাশ রীতি। সেই সঙ্গে এটাও ভাবা হয় যে পরস্পরের বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিকে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিজনেরই জানা উচিত এদের মধ্যে থেকে তার নিজের জন্য কী ভাবে একটিকে বেছে নেওয়া যায় এবং ধৈর্য সহকারে তাতে লেগে থাকা যায় যতক্ষণ না তার দ্বারা সে এমন এক স্থানে পৌঁছাচ্ছে, যেখানে সম্প্রদায়গুলির নিয়ম-কানুন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। লোকে বলে, 'কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা ভাল, যদিও তার মধ্যে মরা মূর্খতা।'

এই অর্থে—উইরোপের ধর্মীয় দলগুলির থেকে কিছুটা পৃথক—হিন্দু জনগণের জনপ্রিয় ও বর্ধিষ্ণু বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল কৃষ্ণের উপাসনার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। যাদের প্রয়োজন আছে তাদের কাছে এই মতবাদ বহন করে আনে এক ধর্মীয় আবেগ-প্রবণতা ঠিক যেমনটি আছে স্যালভেশান আর্মি বা মেথডিস্টদের মধ্যে। গ্রীষ্মের রাতে 'পুনরুজ্জীবন' করলে শহরের রাজপথ জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে লণ্ঠন ও পতাকাধারী মানুষের দ্বারা, যারা উন্মত্তের মতো নৃত্য করে এই ধরনের গান গেয়ে :

প্রভুকে ডাক, প্রভুকে ডাক,
প্রভুকে ডাক, ভাই গো।
প্রভুর এই নাম বিনা
নশ্বর জীবের পারের উপায় নাই গো।

রাম ও বুদ্ধের মতো কৃষ্ণকেও সৃষ্টির পালনকর্তা দেবতা বিষ্ণুর এক বিশেষ অবতার বলে বিবেচনা করা হয়। অতএব তাঁর কাছে জীবনের সকল সামগ্রীর জন্য, দুঃখে সান্ত্বনার জন্য, ভয় হতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা। তিনি জ্ঞাত হচ্ছেন পবিত্র শিশুরূপে, যমুনার তীরে গোয়ালাদের মধ্যে দীনহীন ভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লোকদের কাছে শান্তশিষ্ট রাখাল, বিজ্ঞ উপদেষ্টা, পবিত্র ভগবান, মধুর প্রেমিক ও মানবাত্মার পরিত্রাতা এবং আরও বহু নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়, যা আমাদের কাছে কম পরিচিত নয়। ভারতীয় জননীরা শিশু কৃষ্ণের প্রতিমূর্তিকে শ্রদ্ধা করে, 'গোপাল' নামে ডাকে, তাদের রাখাল তিনি। তাঁর নামে পরিপূর্ণ যত কাব্য ও শাস্ত্র, হিন্দুর জাতির লোক-গীতি তাঁর বর্ণনায় ভরা, রাখালরূপে সঙ্গীদের সঙ্গে নানা ক্রীড়ায় মত্ত। শিশু-সাহিত্যও তাঁর বহু কাহিনীতে পূর্ণ। খ্রীষ্টের শৈশবের ইউরোপীয় গল্পগুলির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। মধুরভাবের সাধকদের কাছে তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় স্বামী।

তাঁর ইতিহাসে যদি আমরা নিমগ্ন হই, তাহলে আমরা ভাবব সেটি এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। একটি ব্যক্তির উপর এতগুলি ঘটনা আর কখনও আরোপিত হয়নি। কিন্তু এ সবেরই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের আধিপত্য—ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু সূক্ষ্ম ও কৌতুককর অন্তর্দৃষ্টি।

ভারতের পক্ষে তাঁর প্রধান আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত পাওয়া যায় না তাঁর জীবনের যে অংশ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে তাতে—অবশ্য একটি ব্যতীত—বরং পুরাণগুলিতে যা বলা হয়েছে, তাতে আছে যে, গ্রন্থগুলি আমাদের প্রাচীন বাইবেলীয় শাস্ত্রের মত। কিন্তু ওই একটি ব্যতিক্রমই গুরুত্বপূর্ণ। এটি জড়িত রয়েছে সেনাপতি অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনের ঘটনায়, যা নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাগবদ্‌-গীতা,—ঈশ্বরীয় গীতি। এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ—'সারমন অন দি মাউন্ট' থেকে দৈর্ঘ্যে মাত্র তিন চার গুণ বড়, এমন কি 'গোসপেল অফ সেন্ট মার্ক'-এর চেয়ে ছোট—এর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে মানবসমাজের ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সম্ভবত একাধারে এমন মহান, এমন পূর্ণাঙ্গ ও এমন সংক্ষিপ্ত আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার এবং স্বভাবতই সমজাতীয় সকল পদ্ধতির সঙ্গে দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় পরম দার্শনিকতার, যা ছাড়া ভারতবর্ষে কোন ধর্মমত এক সপ্তাহও স্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু এটি কোনক্রমেই একমাত্র বৈষ্ণবদেরই সম্পত্তি নয়। কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ধর্মীয় চিন্তার সকল রূপেরই এটি হচ্ছে অস্থি-মজ্জা।

এর তত্ত্বগুলি অভ্রান্তভাবে ভারতীয় বর্ণের, এর ভাব ঠিক তেমনি সার্বজনীন। যে কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শোনা যায়, সেই একই স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে গ্যালিলিওর সমুদ্র তীর হতে এক ইংরাজি শৈশবের মধ্যে। 'সকল তত্ত্ব একধারে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার কাছে এস আশ্রয়ের জন্য—আমি তোমায় পাপ থেকে পরিত্রাণ করব, তুমি দুঃখ করো না।' 'আমার উপর নির্ভর করলে আমার করুণায় তুমি সকল বাধা বিমুক্ত হবে।' আমাদের হাত থেকে পুস্তক খসে পড়ে আর আমরা হারিয়ে যাই তাঁর স্বপ্নে, যিনি শ্রান্ত ও ভারাক্রান্তদের আহ্বান করে বলেছেন, 'আমার নিকট এস।' আমরা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারি, আর কখনও ভুলতে পারি না, যে ভারতীয় পাঠকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা করুণাপূর্ণ, তাঁর স্পর্শ অসীম শান্ত এবং তাঁর হৃদয় সীমাহীন করুণায় ভরা, যেমন আমাদের হচ্ছে তাঁর চক্ষু, হস্ত ও হৃদয়, যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন তিনি এক উত্তম মেষপালক।

আমাদের নিজেদের ধর্মশাস্ত্রের মত গীতাও অদ্ভুত ও সরল উপমায় পূর্ণ। 'সুরক্ষিত স্থানে প্রদীপ শিখা যেমন অকম্পিত থাকে,' মনও তেমনি হবে। সকল কর্মভারই অমঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন 'ধূমের দ্বারা অগ্নি'। উপাসনার পালা 'যেন ঘূর্ণায়মান চক্র'। জ্ঞান এত মহৎ যে 'যদিও তুমি পাপীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাপী হও, তবু তুমি সকল পাপের পরে নিরাপদে উত্তীর্ণ হবে শুধু জ্ঞানের ভেলার দ্বারা।' সবচেয়ে সুন্দর

হচ্ছে ইন্দ্রিয়লব্ধ সেই ধারণাগুলি সম্পর্কে যেগুলি গড়ে তুলছে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে,—'মণিহারের সুতায় মণিগুলি যেমন গাঁথা থাকে, এই সমস্ত তেমনি আমাতে গাঁথা রয়েছে।' এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যা দরিদ্রতম কৃষকের কাছে পর্যন্ত অপরিচিত মনে হবে, যে উর্বর সমতল ভূমিতে বাস করে, যেটি নদী ও মাঝে মাঝে প্রাচীর বেষ্টিত শহর দ্বারা পৃথক করা।

আর বাস্তবিক সেই নিরক্ষর দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের জন্যেই এত সুন্দর সরলভাবে গীতা লিখিত হয়েছে। যারা ভেবেছিল মুক্তি ও দিব্য-দর্শন তাদের কাছে সুদূরপরাহত প্রাচীন ভাষায় জ্ঞানের অভাবের জন্য, সেই নগন্য মানুষগুলির কাছে দিব্যকণ্ঠ ঘোষণা করছেন যে, ঈশ্বরোপাসনা এবং সেই সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন করলে প্রতি মানুষই মুক্তি পেতে পারে। 'পরধর্ম' সহজসাধ্য হলেও তার চেয়ে স্বধর্ম, যত খারাপভাবেই হোক, পালন করা মানুষের পক্ষে শ্রেয়তর।' আমরা বারম্বার গীতা পাঠ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, এক অসীম করুণাময় সেই লোকদের নিজের কথা বলছেন, যারা ধারণা করেছিল ঈশ্বরের জ্ঞান শুধু পুরোহিত ও ধর্মসম্প্রদায়গুলির একচেটিয়া সম্পত্তি এবং তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছেন সৎসাহসের কারণ প্রকৃত সাধু হচ্ছেন তিনি, 'যিনি ঘৃণাও করেন না, কামনাও করেন না, প্রকৃত পূজারী হচ্ছে সে, যে 'ভক্তির সঙ্গে আমাকে একটি পুষ্পপত্র বা একপাত্র জলদান করে।' বিস্ময়ের কিছু নেই যে ভারতীয়রা অবতারকে বন্দনা করার সময় তাঁকে বলেন 'ভবব্যাধির চিকিৎসক'। এর চেয়ে গভীর কিছু ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। যারা সকল কর্ম পরিত্যাগ করে আমায় ভজনা করে পরম সত্তা জ্ঞানে, হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি সহকারে আমার ধ্যান করে, যাদের চিন্তা আমাতে নিবদ্ধ থাকে, হে পার্থ, এই নশ্বর ভব-সমুদ্রে আমিই তাদের পারকর্তা।' ...'কারণ আমিই ব্রহ্ম, অবিনশ্বর ও অখণ্ড, সনাতন সত্তা ও পরম আনন্দ।' বিরাট স্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে আমরা নতজানু হই, এবং শুনতে পাই কথাগুলি জলবিন্দুর মত ঝরে পড়ছে।

অশান্ত হৃদয় যা চায়, তার কিছুই গীতাতে বাদ পড়েনি। এমন কি উদ্বিগ্নজনের কাছে যা প্রয়োজনীয় সেই দৈনিক আহার্যের কোমল আশ্বাসও তাতে আছে। 'সকল চিন্তা পরিত্যাগ করে যারা আমার উপর নির্ভর করে, তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা আমি নিজে তাদের কাছে বহন করে আনি'—একটি শ্লোকে আছে। গ্রামে এই সম্বন্ধে এক সুন্দর গল্প বলা হয়ে থাকে। এক ব্রাহ্মণ বসে গীতা নকল করছিলেন, যখন 'বহন' করা শব্দটি লেখা হলো, তখন তাঁর সন্দেহ জাগে। তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তিনি তার দিকে ফিরে বলেন, 'প্রিয়তমে, তোমার কি মনে হয় না এখানে 'বহন' করা শব্দটি এক অশ্রদ্ধেয় উক্তি। ঈশ্বর কি বোঝাতে চান নি 'প্রেরণ করা'?'

স্ত্রী উত্তর দিয়েছিল, 'নিঃসন্দেহে, প্রিয়তম। তুমি যা বলছ তাই ঠিক। কথাটি প্রেরণ করা হবে।'

তখন লোকটি কলম কাটা ছুরি নিয়ে যে শব্দটা সবে লিখেছিলেন, সেটা চেঁছে তুলে ফেললেন এবং তার বদলে নিজের মনোনীত শব্দটা বসালেন। একটু পরে উঠে পড়ে স্নান করতে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী চিন্তিত মুখে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'আমি তোমায় বলিনি যে গৃহে কোন খাদ্য নেই এবং তোমার জন্য রান্না করতে আমি পারিনি।'

ব্রাহ্মণ মৃদু হাসল। শান্ত স্বরে উত্তর দিলে, 'আমরা ভগবানকে ডাকি তাঁর কথা রাখার জন্য। ইতিমধ্যে আমি স্নানটা সেরে আসি।

এই বলে তিনি কক্ষান্তরে গমন করলেন। তাঁর স্থান ত্যাগের কয়েক মিনিট পরে তাঁর স্ত্রীকে এক সুন্দর তরুণ দরজার কাছে ডাক দিল, যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল এক ঝুড়ি সুখাদ্য নিয়ে, যা তখুনি খাওয়া চলতে পারে। স্ত্রীলোকটি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে আমায় এগুলি পাঠাল ?'

খাবারের পাত্রটি তার হাতে দিয়ে যুবকটি লঘু ভাবে বলে, 'আপনার স্বামী আমায় ডেকে এটা বয়ে আনতে বললেন।'

কিন্তু যেই সে হাত তুলল স্ত্রীলোকটি সভয়ে দেখল বুকে এক সদ্য ক্ষতের চিহ্ন। সে বলল, 'বাছা আমার, কে তোমায় এমন আঘাত দিল ?'

ধীরভাবে উত্তর দেওয়া হলো 'মা, আপনার স্বামী আমায় ডাকার আগে এক ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে বিক্ষত করেছেন।'

সে যে ভোজ্যদ্রব্যগুলি এনেছে তা রেখে আসার জন্য ব্রাহ্মণপত্নী ভেতরে গেলেন, যখন দ্বারে ফিরে এলেন তখন তরুণটি চলে গেছে। এই সময় তার স্বামী গৃহে পুনঃপ্রবেশ করলেন, স্ত্রী ভাবলেন তিনি স্নান সেরে এলেন। খাদ্য প্রাপ্তির বিস্ময় তখন ভুলে গেছেন রোষযুক্ত সমবেদনায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বাহকটিকে অমন আঘাত দিলে কেন ?'

স্বামী কথাটা বুঝতে না পেরে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন। স্ত্রী বুঝিয়ে বলে 'যখন তুমি স্নান করতে গেলে, তখন যাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছ।'

স্বামীর মুখ দিয়ে কথা বের হল না। 'স্নান করতে তো আমি যাইনি।'

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকেন এবং তাঁরা বুঝতে পারেন কে এসেছিলেন তাদের কাছে এবং তারা কী ভাবে প্রভুর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রগ্রন্থের কাছে আবার গিয়ে বসল এবং আর একবার লিখিত শব্দটি তুলে ফেলে মূল শব্দটি বসিয়ে দিল, কারণ এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে প্রকৃত পাঠ হবে—'যারা সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে আমার উপর নির্ভর করে, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সে সবই আমি স্বয়ং তাদের কাছে বহন করে আনি।'

কলকাতার ছেলেরা কয়েকটিমাত্র পয়সার বিনিময়ে কৃষ্ণমূর্তির ছোট পুতুল কিনতে পারে। এগুলি মাটির তৈরি এবং নীল রঙ করা—কারণ উত্তরাঞ্চলের বরফের মধ্যে

বসবাসকারীদের কাছে শুভ্র বর্ণ যেমন পবিত্রতার প্রতীক, তেমনি দক্ষিণাঞ্চলের সন্তানদের কাছে আকাশ বা সমুদ্রের নীল বর্ণটি। পুতুলটির বাঁ হাতে এক বাঁশী মুখের কাছে ধরা, আর ডান হাতে এক ছোট সোনালী রঙয়ের বই, গীতাকে বোঝাচ্ছে। পা দুটি আড়াআড়িভাবে স্থাপিত গ্রাম্য চাষীদের মতো এবং মাথায় মুকুট পরানো। সামান্য পুতুল হলেও ভক্তি জাগানো ভাবের সূক্ষ্মতা এই মূর্তিটির মধ্যে থাকে।

'বৃন্দাবনের যমুনা তটে তুমি বংশী বাজাও', কৃষক ভক্তেরা গেয়ে থাকে এবং গানের সঙ্গে তাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়, যেমন স্বর্গীয় প্রেমে বিদ্ধ সেণ্ট টেরেসার ক্ষত। যাহোক, এর সমস্ত বস্তুগুলির মধ্যে তাঁর ডান হাতে যেটি ধরা আছে, তার সমান গুরুত্ব পুস্তকের জগতে আর কোনটির নেই, চিন্তার ভারতীয় প্রকৃতির উপর আলোকপাত ও ধর্ম-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা উভয় কার্যই সেই গ্রন্থ করেছে। অতএব প্রশ্ন জাগে গীতা কোন্ মূল অভিজ্ঞতার উপর নিজের ভিত্তি করেছে? কিসের কাছে এর আবেদন? জীবনের মধ্যে একমাত্র কোনটিকে এ বেছে নিয়েছে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে? এর প্রধান নির্দেশ কী? খ্রীষ্টান জগতে চারটি শাস্ত্রগ্রন্থ যে স্থান অধিকার করে আছে, হিন্দুধর্মে গীতারও সেই স্থান এবং প্রকৃত অর্থে গীতা হৃদয়ঙ্গম করা মানেই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে বুঝতে পারা।

হিন্দুদের এটি বিশ্বাস যে যখন বিরাট শক্তিরা কার্যকর হয়ে ওঠে, যেমন যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের মতো ঘটনায় তখন সূক্ষ্ম স্পন্দনের কিছু অবস্থা ঘটে, যা চরম জ্ঞানের সীমানায় কম্পিত মনের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বাধাগুলি অতিক্রম করা ও জ্ঞান লাভ করা সহজ করে তোলে। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিরাট তীব্রতাকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তার পারেও যাওয়া হয়। হয়তো অবস্থাটা আপাতদৃষ্টিতে সরল হলেও প্রকৃত-পক্ষে এর চেয়ে আরও জটিল। যাহোক, ভগবৎ-গীতার কাহিনী হচ্ছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে অর্জুন নামে এক যুবক সৈনিকের এমনি দিব্যজ্ঞান লাভ।

ঘটনাক্রমে কাব্যের সূচনাটি আমাদের সামনে উপস্থিত করে এক প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রের মনে দাগ কেটে রাখার মতো একটি চিত্র। যেটি শত শত বৎসর ধরে সাধু ও পুণ্যার্থী-দের প্রার্থনা ও তপশ্চর্যার স্থান, সেই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দুই সেনাবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। দু দলের সেনাপতিরা শ্বেত অশ্বারোহিত রথে অধিষ্ঠিত, প্রত্যেকের রথের উপর উড্ডীয়মান তাঁদের ব্যক্তিগত চিহ্নজ্ঞাপক পতাকা, প্রত্যেকের কাছে রয়েছে নিজস্ব শঙ্খ, তাঁর বাহিনীর মনোযোগ আকর্ষণ ও সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্য। দুই বাহিনীকেই বিরাটরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে, কিন্তু এই আভাসও বাদ পড়েনি যে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে স্বৈরাচারী দুর্যোধনের বাহিনী হচ্ছে অধিকতর বিরাট ও বলশালী। আর এটাই ঠিক, কারণ দুর্যোধন, অন্যায়ভাবে বা ন্যায়ভাবে হোক, তখনো সারা দেশের রাজা, আর তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডব তাঁর কাছ থেকে নিজেদের শুধু অধিকারটুকু আদায় করতে বদ্ধ-

পরিকল্প। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যুদ্ধটা হচ্ছে প্রাচীনকালের, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে চলে মূল যুদ্ধ ; বর্ণনায় শান্তভাবে মনোযোগ দেবার আগে আমাদের বলা হয় যে রণক্ষেত্রের সর্বদিক থেকে ও দুই বাহিনীর মধ্যে থেকে শঙ্খধ্বনি করে আক্রমণের সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে, তখন অর্জুন তাঁর রথের সারথীরূপী কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুই পক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর রথ স্থাপন করতে, যাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করবেন তা নির্বাচন করতে পারেন।

কিন্তু শত্রুদের দর্শন সেনাপতির মনে এক অদ্ভুত ভাব এনে দিল। তাঁর নিজের দাবির ন্যায্য অধিকার ও তার সমর্থনের জন্য শেষ পর্যন্ত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পরিবর্তে যুদ্ধের পরিণাম তিনি এই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন শত্রু সেনাবাহিনী দর্শনের ফলে। শত্রুদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন যাঁদের তিনি চিরকাল ভালবেসেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন— তাঁদের পরিবারের প্রধান, তার শৈশবকালের প্রিয় পিতামহ ভীষ্ম, তাঁর শিক্ষাগুরু দ্রোণ, যাঁর প্রতি তিনি এক গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিভ্রাতারা, শৈশবের খেলার সাথী বা ক্রীড়াকালে নকল যুদ্ধের বীর প্রতিদ্বন্দ্বীরা। বিজয়ের পথ রয়েছে শবদেহে পরিপূর্ণ শ্মশানের মধ্যে দিয়ে। যে সব লোককে তিনি ভালবাসেন তাদের ভস্ম সেই পথের ধূলি। যখন তিনি এটা উপলব্ধি করলেন তখন তাঁর বিরাট গাণ্ডীব-ধনু তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে এবং তিনি রথের মধ্যে হতাশায় লুটিয়ে পড়েন। আমরা নিশ্চয় স্মরণ করি এটি শুধুমাত্র সাহসের অভাব নয়। সৈনিকরূপে বহু পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সর্বদাই প্রমাণ করেছেন ভীরুরূপে তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও নিন্দা করা চলে না। তাছাড়া তাঁকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরিণামে বিজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তিনি মনে পোষণ করেন না। যুদ্ধের ভাগ্য সম্বন্ধে সকল সাহসী মানুষের মতোই তিনি চিন্তিত নন, যা সত্য তা ঘটবেই। তিনি শুধু উপলব্ধি করলেন যে এই পৃথিবীতে মাত্র কয়েক বৎসর রাজত্বের জন্য তিনি যা কিছু ভালবাসেন, তা স্বহস্তে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে এই ব্যাপক প্রাণহানি এক বিরাট সামাজিক ধ্বংস সৃষ্টি করবে।

অর্জুনের এই মনোভাব ধর্মীয় ভাষা লাভ করে। 'হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাই না, রাজত্ব চাই না, সুখও চাই না।···আমার পক্ষে শ্রেয় হবে যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা যুদ্ধে নিরস্ত্র ও অপ্রতিরোধী আমাকে নিহত করে।' নৈতিক অবস্থাটি নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে অনুমান করা হয়েছে। পৃথিবীর এক গৌরবময় বংশের রাজপুত্র সাম্রাজ্যের প্রাপ্য মূল্য প্রদান করে তা গ্রহণ করার বদলে নিজেকে বলি প্রদান করতে আগ্রহী। জীবনের রণক্ষেত্রে আর কোন বিষয় এর চেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করার দরকার আছে ? তথাপি এই আত্মদানের তৃষ্ণা, যাকে বৈরাগ্যের

হচ্ছে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু। 'তুমি তাদেরই জন্য শোকান্বিত, যাদের জন্য শোকের কোন প্রয়োজন নেই ; তবুও তুমি জ্ঞানের কথা বলছ,' কৃষ্ণ বলেন। কারণ জগৎ সম্বন্ধে সাংখ্যকারের উদাসীনতা এবং নিজের সম্মুখে সব কিছু মিথ্যা বলে প্রত্যক্ষ যিনি করেন, তাঁর মত জগতে অংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে অর্জুন বস্তুগুলি যেমন রয়েছে সেইভাবেই সেগুলিকে বজায় রাখার মনোভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন, অন্তত সেগুলিকে সত্য বস্তু ভেবে ভালবাসার ভাবটি তো বটেই। মনোভাবের এই পার্থক্যের উপরই গীতার সমস্ত আলোচনার ভিত্তি।

প্রথমে বাস্তবিকই সারথী সেনাপতির মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করেন ভীতি সম্পর্কে বীরদের সমস্ত ঘৃণা দিয়ে। তিনি বলেন, 'হে পার্থ, ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিও না। সে তোমার উপযুক্ত নয়। হে শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী, এই হীন দুর্বলতা পরিহার করে উঠে দাঁড়াও।' যতক্ষণ না অর্জুন তাঁর শোক ও বিভ্রান্তির কথা স্বীকার করে পরম জ্ঞানের জন্য একান্ত আবেদন করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দিব্যজ্ঞানের শিক্ষকরূপে কৃষ্ণ প্রকৃত ও অপ্রকৃত সম্পর্কে চিরন্তন ঘোষণায় প্রবৃত্ত হন না, যার পরিশেষে বীরবর আবার তাঁর জন্মগত কর্তব্যে প্রবৃত্ত হলেন দৃঢ়ভাবে এই কথাগুলি ঘোষণা করে, 'অসন্দিগ্ধ মনে, দৃঢ়তা সহকারে আমি তোমার বাক্য অনুসরণ করছি।'

কথোপকথন যতই অগ্রসর হয়, নাটকীয় ভাব ততই অন্তর্হিত হবে। যুদ্ধের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায়। আমরা নিঃসঙ্গভাবে আত্মার কোন নিভৃত কক্ষে দণ্ডায়মান হই, মানব ও দেবতার মধ্যে, সসীম ও অসীমের মধ্যে কথোপকথন শুনতে পাই, যা আমাদের কারও জীবনে আর কখনও নীরব হয় না, জাগতিক কোলাহল থেকে আমরা নিজেদের যত কমই বিমুক্ত করতে পারি না কেন। এই কথোপকথনের শেষ মুহূর্তে, যখন ভক্তের কাছে অকস্মাৎ ব্যক্ত হয় কৃষ্ণের দ্বারা যে সকল অস্তিত্বসম্পন্ন পদার্থই হচ্ছে একমাত্র তাঁরই শক্তির বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি মাত্র, সেই মুহূর্তে ও তার পরবর্তী গভীর ও বিচ্ছিন্ন প্রশংসা কালে আমরা এমন কিছু পাই না যা পরিবেশের পক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ। একমাত্র হিন্দুর লেখনী দ্বারা যা সৃষ্টি সম্ভব, সেই যুদ্ধের রথ হয়ে ওঠে যে কোন ধ্যান-কক্ষের মতো স্তব্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ জীবনের ঘূর্ণাবর্ত হতে যেন বহু দূরে সরে গিয়ে হয়ে উঠল প্রার্থনারত হৃদয়ের এক নিভৃত কন্দর।

যেমন আমরা প্রত্যাশা করতে পারি তেমনভাবে প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে সকল রূপই বিভ্রান্তিকর, জ্ঞানীর কাছে কর্ম হচ্ছে ফলাফলবর্জিত এবং সেটিকে তিনি তাঁর কর্তব্যরূপে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলে, পরিণামের ভয় না করে সম্পন্ন করবেন। 'জ্ঞানীরা তাঁকেই ... বলেন, যাঁর সকল কর্মই উদ্দেশ্যহীন ও বাসনাবিহীন, যাঁর কার্য জ্ঞানের আগুনে দগ্ধ ... ভস্মীভূত হয়েছে।' 'আমি কখনও অস্তিত্বহীন নই, তুমিও নও, মানুষের এই শাসনকর্তারাও নয় এবং আমাদের কেউই এর পরে অস্তিত্ববিহীন হব না।' অতএব, বাসনাবিমুক্ত হয়ে, স্বার্থশূন্য হয়ে, উৎকণ্ঠাবিহীন মনে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'

এই কথাগুলি যাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তিনি প্রধানত একজন কর্মী, এক সৈনিক—তাঁর সামরিক মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে অনুমান করা যায়, ন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ এবং তা সমর্থনের উত্তেজনায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এই বস্তুগুলি হচ্ছে পণ, এদের বাজি ধর এবং সাহসের সঙ্গে ধর, কৃষ্ণ বলেন, আর ফলস্বরূপ বরাতে যা জোটে তাকেই গ্রহণ কর। মানুষের সব সময় কর্তব্য হচ্ছে কাজ করে যাওয়া, কর্মের ফলে তার কোন অধিকার নেই,' এটি হচ্ছে গীতার সার-সত্য ঠিক যেমন, 'তোমার সাফল্যে কোন অধিকার নেই, যদি ব্যর্থতাকেও তুমি বরণ করে না নিতে পার'—সুখ-দুঃখে উদাসীন স্টোয়িক-দার্শনিক মতবাদ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি মতবাদকেই একাত্ম বলে মনে হয়, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাবিদদের মায়ার ধারণা যে সুবিধাদান করে তা জানার জন্য আমাদের গীতা পাঠ করতেই হবে। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, যেন ছেনি দিয়ে চাঁছা-ছোলা এমনি হচ্ছে এপিকটেটাসের উক্তিগুলি আর কৃষ্ণের কথাগুলি হচ্ছে যেন বর্ষা রাতের বজ্রগর্জন।

কিন্তু গীতা কেবলমাত্র যুক্তির একটি মালা নিয়ে গঠিত নয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির পথে গেছে। বরং এতে একই বিষয় বার বার বলা হয়েছে, যত বিভিন্নভাবে তা বলা সম্ভব। এমন কি মাঝে মাঝে বাক্যের একই রূপের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেন অর্থ পরিষ্কার করে তোলা ছাড়া আর কিছু মূল্য নেই। এখানে বিভিন্নকালের অপ্রাসঙ্গিক শক্তির প্রচুর সুযোগ আছে নানা ধরনের রীতির বুনানির, আর আশ্চর্যকরভাবে কথিত প্রাচ্যের রত্নরাজি তার সঙ্গে নানা স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সেটি সর্বকালের জন্য ধর্মের নথিভুক্ত মহান বাণীগুলির মধ্যে থাকে।

কিন্তু গীতার মর্মবাণী সেই পাঠকেরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে না, যারা নিজেদের এর প্রথম আলোড়নকারী কথাগুলি ভোলার সুযোগ দেবে—'হে পার্থ, ক্লৈব্য প্রদর্শন করো না। তোমার পক্ষে তা শোভা পায় না। হীন দুর্বলতা পরিত্যাগ কর, উঠে দাঁড়াও, হে শত্রু সন্ত্রস্তকারী!' গ্রন্থে কোথাও সংসার পরিত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়নি, কিন্তু সর্বত্রই সাধারণ জীবনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুদূরে পৌঁছাবার পথ রূপে। 'পরধর্ম সহজ হলেও তার চেয়ে স্বধর্ম, যত খারাপ ভাবেই হোক, পালন করা মানবের পক্ষে শ্রেয়।' 'লাভ ও ক্ষতিকে সমজ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' যে মানুষ তার অস্ত্র ত্যাগ করে বিনা প্রতিরোধে যুদ্ধে নিজেকে নিহত করতে চায়, সে ধর্মবীর নয়, বরং ভীরু ও অলস; প্রকৃত দ্রষ্টা হচ্ছেন তিনি, যিনি নিজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে কর্মে প্রবৃত্ত হন,—এই হচ্ছে গীতার নীতি, বার বার উক্ত। গ্রন্থটি প্রকৃতই যুদ্ধের আহ্বান। আধ্যাত্মিকতা মানুষ ও বস্তুর কাছ থেকে পলায়ন নয়, বরং তা হচ্ছে জ্ঞানের এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা বন্ধনকে ধ্বংস করে, অহং ও অলসতাকে দগ্ধ করে সর্বব্যাপী হয়। জীবন থেকে পলায়ন নয়, উজ্জ্বল শক্তি ও উৎসাহে জীবনের নব রূপায়ণ, নিঃস্বার্থপরতায় বিজয়ী হওয়া, এই হচ্ছে ধর্ম।

বর্তমানে ভারতের পুনরুজ্জীবনের শাস্ত্র হচ্ছে গীতা। আর এই কার্যের উপযুক্ত কোন গ্রন্থ আর কখনও ছিল না। কারণ এর আঠারোটি অধ্যায় হচ্ছে জাতীর প্রাণশক্তির এক প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। এটি ব্যষ্টির পক্ষে যেমন সত্য, তেমন সত্য সমষ্টির পক্ষেও; যখন যুগটি সমৃদ্ধশালী ও পূর্ণ হয়, তখন বেঁচে থাকার জানাকে ছড়িয়ে যাবার ঝোঁক দেখা যায়। আর তখনই বড় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য চাপ দেয়। অভিজ্ঞতার বড় ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন হয় তাদের সাধারণ কেন্দ্র ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের। আর গীতা প্রধানত এটাই করে, যাতে মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের সঙ্গে অপৃথকভাবে বসে এর ব্যাখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে পারে।

সকল ধর্ম বিশ্বাসের প্রকৃতি, সকল উপাসনায় উপাসিত ও উপাসকের সম্পর্ক অনাসক্তির সকল প্রকার রূপের উপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা,—এই ধরনের সব সমস্যা ও বিশেষ কোন ধর্মনীতি গীতার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তাই এটি একাধারে পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সর্বাপেক্ষা বোধগম্য।

কর্মদক্ষতার শর্ত হচ্ছে ফল সম্বন্ধে অনাসক্তি,—গীতার দর্শনের এই হচ্ছে প্রথম বিষয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে কর্ম পরিশ্রমসাপেক্ষ। প্রতিটি মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠুক, প্রতিটি অঙ্গ দৃঢ় গঠিত হোক, মন সমস্ত বাস্তব ঘটনার উপর ঝড়ের মত ধাবিত হোক,'—অশ্ব-বল্গা হাতে নিয়ে, দুরন্ত ঘোড়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, সমস্ত রণক্ষেত্রের উপর চোখ রেখে এবং বীরের মনোবল উচ্চে তুলে ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর বজ্রগর্জনে বলে, 'ওঠ! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও!'

এই হচ্ছে চরম নির্দেশ। মহাকালের নাটকে তোমার সম্পূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করে যাও সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে, সকল শক্তিকে একত্রিত করে। 'যেমন অজ্ঞেরা স্বার্থবুদ্ধিতে কর্ম করে বিজ্ঞেরা তেমনি নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করবে।'

যেমন শিশু দেখে তার মাথার উপর সূর্য ও পায়ের তলায় পৃথিবী, নিজেকে উভয়ের থেকেই পৃথক জ্ঞান করে; কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সূর্য গ্রহ ও শিশু সবাই হচ্ছে শক্তি—পদার্থের বিরাট মহাসিন্ধুতে একই ধরনের বিন্দু, তার কেন্দ্র থেকে সুদূরতম সীমা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন, ঠিক তেমনি আমাদের কাছে চিন্তার অনুভূতি-স্তরে ঈশ্বর, আত্মা ও সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, সেই সত্যে পৌঁছালে, যা হচ্ছে দিব্যজ্ঞান, যে কোন একটিকেই পূর্ণ বলে মনে হবে, কারণ সসীমের সব ধারণাই তখন মুছে যাবে। তখন তোমাদের নিজেদেরই মনে হবে যেন আলোকে রূপান্তরিত হয়েছি; যেন চিন্তা ও প্রত্যক্ষ, জীবন ও গতি, সূর্য ও গ্রহ, সব কিছুই হচ্ছে একটি বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ, যাকে আমরা বলি সৌর-শক্তি, ঠিক তেমনি ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎকে তখন বোঝা যাবে শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই একেরই শুধু পৃথকীকরণ, যাকে বলা হয় ব্রহ্ম, 'অবিনশ্বর, অখণ্ড বস্তু, এবং পরম আনন্দ।'

এই রকম এক দর্শনের বিবরণ আমরা পাই গীতার শেষ অধ্যায়ে। কৃষ্ণ ঃ বিমুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টিপথে অকস্মাৎ প্রকাশিত হল বিশ্বরূপে, যার মধ্যে যা কিছু সবই এক হয়ে গেছে। বিশিষ্টতায় ভারতীয় ভাবে অভিব্যক্ত, বিশ্বের পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য ভীতিসহ, এই মহান দৃশ্য পাশ্চাত্য মন সম্ভবত শুধু তখনই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, যদি সে প্রথমে বুঝতে পারে সেই বাসনাকে, যা এটি পরিপূর্ণ করে, যে ঔজ্জ্বল্যের বর্ণনা এটি করছে তার কিছু চমককে গ্রহণ করতে পারলে। যদি গীতার অবশিষ্টাংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও এই একটি অধ্যায় অন্যগুলির স্থান পূর্ণ করতে পারে, কারণ এর সমস্ত যুক্তিকে এটি সত্য করে তুলেছে। অর্জুনের একটি মাত্র দর্শনই হয়েছে সমগ্র জগতের আশার ধর্মীয়-অনুষ্ঠান।

যখন আমি থানেশ্বর পৌঁছালাম তখন মধ্যরাত্রি। ট্রপিক্যাল অঞ্চলের তীব্র শুভ্র আলোক সম্মুখের বিশাল প্রান্তরকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল, যেখানে শুধু গাছপালা ও ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল তাদের কয়লার মত কালো ছায়াসহ এবং দৃষ্টিপথে একটিও জনবসতির চিহ্ন ছিল না। পিছনে অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত ছিল ডাক বাংলো এবং যে ট্রেনে আমি এসেছিলাম, সেটি বহুক্ষণ আগে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তিন হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ একাকী।

কিন্তু স্তব্ধতা অটুট রইল না। স্থির বাতাসে পরিষ্কার সুস্পষ্টভাবে জেগে উঠল অমর বাণীর প্রতিধ্বনি। 'মানুষের কর্মেই অধিকার, কর্মের ফলে মানুষের অধিকার নেই,' সেই দেব-সারথী আর একবার বলছেন। তবুও বহু স্মরণীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সহস্র উক্তি ভারতবর্ষ শুনেছে গীতার সত্যগুলিকে প্রচারিত করে। আমার হৃদয় প্রশ্ন করল, এই স্থানে কেন লোকে আসে? সবার উপরে কিসের জন্য লোকে কুরুক্ষেত্রকে স্মরণ করে রেখেছে?

তারপর আমি বুঝতে পারলাম কেন, যা অবিস্মরণীয়। কুরুক্ষেত্র ছিল দিব্যদর্শনের ক্ষেত্র, অর্জুনের আত্মজ্ঞান লাভের স্থান।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে ইসলাম

আফ্রিকার অরণ্যের বাইরে প্রাচীন জগতের একমাত্র মহাদেশকে মোটামুটি ভাবে ভাগ করা চলে প্রাচ্যের কৃষি উপত্যকা, চারণভূমি অঞ্চলের মরু ও প্রান্তর এবং ইউরোপীয় উপকূলের ধারের দেশগুলি—আর এই ভৌগোলিক বিভাগ আশ্চর্যভাবে তার নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসেরই অনুরূপ। সভ্যতা ও ধর্ম জন্মলাভ করেছিল কৃষকদের মধ্যে, আক্রমণশীল হয়ে

উঠেছিল নাবিকদের মধ্যে এবং এক থেকে অন্যের কাছে বাহিত হয়েছিল মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতির দ্বারা।

ভেনিস, জেনোয়া ও ব্রুজেডের যথেষ্ট পরিমাণ সাংস্কৃতিক-ইতিহাসের জন্য জগৎ এখনও অপেক্ষা করে আছে। যখন সেগুলি লিখিত হবে, তখন মানুষ এ দুটি জেনে অবাক হবে যে, ইউরোপ কেমন সম্পূর্ণরূপে এশিয়ার কাছে ঋণী আর বর্তমানকালে সেমেটিক জাতিগুলি কত দূর সেই ঋণের উত্তমর্ণ।

এটি প্রদত্ত হয়েছিল ইহুদী ও মুসলমানদের মাধ্যমে। কিন্তু ইহুদিরা ছিল মিশরের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী আর তাই মরু অঞ্চলকে শুদ্ধ ও সরল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করে উঠতে পারেনি। তার ধর্মীয় ধারণাগুলি ছিল খুবই জটিল, তার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সংরক্ষিত, জাতীয়তাবোধ ছিল খুবই অনির্দিষ্ট। যখন সে সিরিয়ায় কৃষকরূপে আর রইল না, তার সামনে জগৎ হয়ে উঠল তখন বিদ্বানের ও ব্যবসায়ীর।

অপর দিকে আরবদের কাছে রইল মরু-বালুকার পরিবর্তনশীল আনুগত্য। শহর-গুলির কোন বিলাসিতাই তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালাতে পারল না গৃহ ও আত্মীয়স্বজন, বিরল খাদ্য-পানীয়, যৌবনের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে পরিহার করতে যাতে সে বিদেশীদের মধ্যে ভাল খেতে ও আরামে শুতে পারে। আজও লোহিত সাগর বা ভারত মহাসাগরে সমুদ্রগামী মানুষেরা দেখতে পাবে সেই অদ্ভুত চৌকোণা পাল-তোলা নৌকা, সেগুলি 'আরব ঢেউ' নামে অভিহিত এবং ভিতর থেকে নৌচালকদের প্রশ্নের জবাবে অবহেলাভরে চেঁচিয়ে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান জানায়, তারা সূর্যের অবস্থান দ্বারা মহ সমুদ্রের মধ্যে তাদের পথ কেটে চলেছে, যেমন তারা মরুভূমি পার হবার সময় করে। কিন্তু এই নৌকাগুলি হচ্ছে শুধু গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের, বিদেশগামী পোত নয়। তারা বাইরে যাচ্ছে যাতে ফিরে এসে শুধু তাদের নিজেদের লোকদের ধনী করে তুলতে পারে ব্যবসার লাভ দ্বারা। প্রাচীন কালের আরব যখন পৃথিবীর রাজধানীগুলির দিকে নজর দিল, তখন সেগুলি দখল করার জন্যই দিয়েছিল। সে তার সৈন্যবাহিনী ও স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল এবং অন্যদের প্রাসাদে তাদের সিংহাসনের উপর নিজে গিয়ে বসল। অথচ যে শহরে তার নিজের ঐক্যবোধ জন্ম নিয়েছিল, যা মুসলমানকে সমর্থ করেছিল এক মহান ঐক্য ভাবের জন্য ছোটখাট বিবাদকে উপেক্ষা করতে, সেই শহরটি সেকালে ছিল এক উন্মুক্ত বন্দর এবং পয়গম্বর নিজে তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশি ভ্রমণ করেছিলেন। সর্বদাই এমন হয়। জগতে সাড়া জাগানো ভাবগুলির ওঠার পিছনে সর্বদা সত্যের অগ্রগতির বোধটি থাকে, বিদেশী প্রভাবের সব চেয়ে ভাল যা কিছু তাকে পরিপাকের আবেগ, আরও থাকে সাধারণ মাপের চেয়ে বেশি এক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতা। তাঁর সিরীয় বাণিজ্যস্থানগুলি ও বাইজানটাইন শহুরে লোক-দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের দ্বারা মহম্মদ তাঁর নিজের দেশবাসীর জন্য তাঁর জ্বলন্ত প্রেমে ও জাতীয় উদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতায় পৌঁছেছিলেন। বিভিন্ন জাতির পর্যটকদলের

আগুনের ধারে বসে রাত্রে আলোচনা ওঁকে শিক্ষাদান করেছিল, অস্পষ্ট চিন্তাধারা ও বিরাট বাসনা যা ওঁর মধ্যে ভাসা ভাসা ভাবে ছিল, তাকে আলোড়িত করে তুলেছিল। প্রাচীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব আধুনিক জগতের পক্ষে উপলব্ধি করা কষ্টকর। আমরা ভাবি যে স্টিম ইঞ্জিন ও রেলগাড়ি আবিষ্কার করে আমরা এক বিরাট কীর্তি করেছি, এটা এক বিষয়ে ঠিক যে আমরা কিছু করেছি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে তারপর থেকে আমাদের পর্যটনের নেতা হয়েছে এক সামান্য মিস্ত্রী, যে কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও চাকার তদ্বির করে আর জল ও কয়লার দেখাশোনা করে। একদা ঠিক এই পদে সে ছিল যেন এক গোষ্ঠী-নেতা, উদ্ধারকর্তা, কবি ও জাহাজের কাপ্তেন—একাধারে সব।

ঠিক তেমনি যুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সাহস এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃতি-বর্ণনার ভাব। সময় ও চিন্তার অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে এই গুণগুলির অবনতি। কোন আধুনিক কবি একজন রেড-ইণ্ডিয়ানের মতো সূর্যাস্তের বর্ণনা করতে পারবে না। ম্যাক্সিম বন্দুকের ব্যবহারকারী কারও সেকালের জলদস্যুদের মতো দৈহিক শক্তি নেই। অনুন্নত অসংগঠিত অবস্থা দাবি করে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তীকালের সভ্যতা হচ্ছে শুধু এক বিশেষজ্ঞ হওয়া, মাত্রানুযায়ী সূক্ষ্ম ও বিশদভাবে, যাতে সংগঠন যত লাভান্বিত হয়েছে মানুষ সেই অনুপাতে তত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণের গভীরতা, আশার মহত্ত্ব ও বিশালত্ব এবং পরিপাক করা অভিজ্ঞতার সম্পদ—সংক্ষেপে, যা কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে গঠন করে—কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিদ্যার ব্যস্ত-অনুপাত হচ্ছে সেগুলি। অতএব, বিংশ শতাব্দীর লাইব্রেরী-মিউজিয়ামে পণ্ডিতরা সপ্তম শতাব্দীর উষ্ট্র চালককে কিছুতেই অজ্ঞ বলে ভাবতে পারেন না। মহাপুরুষ মহম্মদ ওই ধরনের মোটেই ছিলেন না। স্বভাবের বিরল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাকে বিরাট পৌরুষ এবং অসাধারণ বুদ্ধিজাত সংস্কৃতিকে সংমিশ্রিত করেছিলেন। নব বিশ্বাসের প্রবর্তকদের পক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই যেমন ঘটে থাকে, তেমনি এক বিশেষ অর্থে তিনি ছিলেন প্রাচীনতার পূর্ণ বিকাশ, তাঁর পরিবারের লোকরা শুধু কাবার অভিভাবক ছিলেন না, তাঁর পিতা শৈশবে সমর্পণ করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গের, আর মহম্মদ ছিলেন একমাত্র পুত্র, অল্প বয়সেই অনাথ। বাস্তবিকই আরব উপদ্বীপের তীর্থকেন্দ্র মক্কা ছাড়া তিনি অন্য কোন শহরের অধিবাসী হলে হয়তো তাঁর জীবদ্দশার মধ্যে সমস্ত আরব জাতির ইসলামধর্ম গ্রহণ দেখে যেতে পারতেন না।

মহাপুরুষকে আমরা ধর্মপ্রচারক রূপেই বেশি ভাবি, জাতিস্রষ্টারূপে খুব কমই। ঈশ্বরের নাম আমরা এত ঘন ঘন শুনি যে, আমরা তাঁর শিক্ষা মানুষকে ভালবাসার কথা বিস্মৃত হই। সংক্ষেপে, আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হই বার্তাবহনকারী ও বার্তা, দুটিই এশীয় চরিত্র।

'করুণাময়, দয়ালু ঈশ্বরের নামে'…

কিন্তু যে কথা একে অনুসরণ করে তা ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করে না, অন্তত প্রাচীনকালে। কিন্তু সেই সত্যকে আমরা স্বভাবজাত বুদ্ধিতে বুঝতে পারি। কোন মানুষ, অন্তত মরুভূমির সকল অধিবাসীরা, অন্তরে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দুটি আছে। মহাপুরুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই পরম সহজাত জ্ঞানকে জীবন ও শক্তি দান করা, বিবেকের কাছে অনুসন্ধিৎসার আবেদন জানাবার যাত্রারম্ভের স্থানরূপে একে শুধু প্রস্তুত করে তোলা, কপটতা ও কুপ্রথা ও বিচারের ভয়ঙ্কর চিত্রগুলি আর নরকাগ্নির কর্তৃত্বব্যঞ্জক নিন্দা করা। এই সব বিষয়ে ইতিমধ্যে যার আভাস পাওয়া গেছে তাকে তিনি শুধু ব্যক্ত করেন। আরবের সমাজ-জীবন নিশ্চয় পরিবর্তনের জন্য পরিপক্ক হয়েছিল। সম্পত্তির পবিত্রতা, শিশুদের রক্ষা, নারীদের মর্যাদা স্থির করা,—এগুলি ইতিমধ্যেই সকল গোষ্ঠীর ও সকল শহরের সৎ ব্যক্তিদের কাছে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের বিরাট ক্ষমতা, যা এই সংস্কার-গুলি ব্যবহার করতে পারে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত স্বজনদের এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের উপায়স্বরূপ, ন্যায়পরায়ণতার যৌথ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এবং স্বর্গীয় দৌত্যের শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত, —এ ছিল একমাত্র তাঁরই অধিকার, যাঁর বাল্যকাল কেটেছে মেষ পালকদের মধ্যে এবং যাঁর সাবালককাল জেনেছে পর্বত গুহায় নিঃসঙ্গ চিন্তায় ঈশ্বরের বাণী শোনার আশ্চর্য সমাধিমগ্ন অবস্থাকে।

এক দৃষ্টকোণ থেকে ইসলাম প্রতিনিধিত্ব করে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে এক আদান-প্রদানের। এশীয় জাতি গ্রহণ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দৃঢ়বন্ধন, গতিশীলতা ও সৈনিকসুলভ মনোভাব। অনুমান করা যায় এই করতে ইউরোপের কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। পারসীয় ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস করার কঠোর কাজ সম্পন্ন করে তার স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, কিন্তু সেটি করা হয়েছিল যতটা এক রক্তের শক্তিতে, ঠিক ততটাই ঘটেছিল একজনের দৈবাদেশের প্রেরণায়, যা মূলত সম্পূর্ণরূপে এশীয়।

গুরু ও তাঁর শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এশীয় জীবনে সর্বদা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি। এই ক্ষেত্রে সমস্ত জাতি হচ্ছে একটিমাত্র ব্যক্তির শিষ্য। সকলকে তাঁর স্বজনের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর পরিবার গঠন করেছে তারা। তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী তারা অনুসরণ করার চেষ্টা করে—পোশাকে, খাদ্যে, আচরণে, এমন কি কিছুটা ভাষাতেও। যখনই তারা প্রার্থনা করে, নিজেদের মনে মনে স্থাপন করে আরবদেশে। এমন ঘটনা প্রাচ্যে ধর্মকে এক বিরাট সামাজিক পরিণামের বস্তু করে তোলে। ভারতবর্ষে ধর্মান্তরিতরা তাদের রন্ধনের ধারা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করে ফেলে। সেই দেশে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, জৈন ইহুদি, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ, যে কেউ দলবদ্ধভাবে আহার করতে পারে, কিন্তু খাদ্যবস্তু না পরিবর্তন করলে কেউ আন্তরিক-

ভাবে ধর্ম পরিবর্তন করেছে বলে গণ্য হবে না। অতএব, এটি অবশ্যম্ভাবী যে, যে সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের যত রকমে সম্ভব আরবীয় হয়ে ওঠা উচিত।

যাহাকে, তার অর্থ এই নয় যে তারা মরুভূমি আবার তৈয়ারি করবে। মহম্মদের সমাজ-গঠনের সমস্ত পদ্ধতিটাই ছিল স্থায়ী ও শিল্প নির্মাণ অবস্থা সৃষ্টি। তাঁর মহান শেষ ভাষণে, যাতে তিনি তাঁর সকল জনকে একত্রিত করছেন, জানেন না যে তিনি আবার তাদের কাছে বক্তৃতা দিতে পারবেন কিনা, তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা, নারী, শিশু ও ক্রীতদাসের অধিকারের কথা। পরবর্তী ছয় বা সাত শতাব্দীর মুসলমান সাম্রাজ্যে কোন বর্বরতা ছিল না। পশ্চিম এশিয়া রোমান সাম্রাজ্যের শিল্পকলার উপর নিজস্ব সৃষ্টিকার্যে ব্যর্থ হয়নি, হেলেনীয় সংস্কৃতিকে আত্তীকরণে ব্যর্থ হয়নি এবং গ্রীক ও প্রাচ্যের পদার্থ সংমিশ্রিত করে বিজ্ঞানে মৌলিক উদ্দীপনা প্রদর্শনেও ব্যর্থ হয়নি। মহান স্পেনীয় রীতির ইতিহাস এত জানা যে তার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। বাগদাদের আবাসাইড খলিফাদের জাঁকজমক ভালভাবেই বহন করেছে কর্দোভের ওমাইদস এবং যে স্থাপত্য সারা বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু হবার উপযুক্ত তারা সারাসেনীয় সভ্যতার ফল। পারস্য, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের বিস্ফোরণ মনে হয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙয়ের মোগল আক্রমণের ফল। ইতিহাসের পাতায় এই আক্রমণের বর্ণনায় মনে হয় যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। তাদের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অতুলনীয় ভাবে বিরাট, তার, যা আলারিক ও জেনসেরিক দ্বারা রোমের পতন ঘটিয়েছিল এবং যা ক্যামপানা শহরকে মঠবাসীদের অভিভাবকত্বে স্থাপন করেছিল বহু শতাব্দী ধরে গোপনে ক্ষয়ের জন্য। চিরন্তন শহর রোমের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা যাহোক তাকে কিছুটা রক্ষা করেছিল, যেখানে পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি প্রতিটি বিরুদ্ধ শক্তির আগমন ও পুনরাগমনের জন্য ছিল উন্মুক্ত। চেঙ্গিস খাঁ সম্বন্ধে গিবন বলেন যে তিনি চারদিনে যা ধ্বংস করেছিলেন, তা পুনরুদ্ধার করার পক্ষে পাঁচশো বৎসরও যথেষ্ট নয়। এশিয়া মাইনরকে ধ্বংস করাটি হচ্ছে মুসলমান ধর্মের কীর্তি এই সাধারণ উক্তিটি তাহলে ধরা যেতে পারে ঐতিহাসিক জ্ঞানের অজ্ঞতা ও ধর্মীয় বিরূপ মনোভাব।

সারাসেনীয় শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে যতদূর কলঙ্ক আরোপ করা যায় তা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে তাদের শক্তি ও ধৈর্য ছিল না নিজেদের নিযুক্ত করার সভ্যতা ও শাসন ব্যবস্থার কার্য পুনরায় গোড়া থেকে গড়ে তোলার দুরূহ কর্তব্য। কিন্তু এটা কি তাদেরই বৈশিষ্ট্য? যদি ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড বা ইতালীর অতীত মুছে দেওয়া হয় এবং সব রাজা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একটি আঘাতে নিশ্চিহ্ন করা যায়, তারা কি আরব বা তুর্কদের চেয়ে বেশি সাহস প্রদর্শন করবে? শহরগুলির যে সব আড়ম্বর অদৃশ্য হয়ে গেছে তা উত্তরপুরুষের আশাহীন কর্মকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং তারা নিজেদের অনাথ ও হৃতসর্বস্ব বলে বোধ করবে। আরও এক অতিরিক্ত কারণ হবে সব বিজয়েরই স্বভাবটি—

যেটা শুধু ইসলামেরই প্রতিভা নয়, যার সম্পূর্ণ ধ্বংসকারী ও রিক্তকারী প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবে অন্তত তারা, যারা তার কর্ম ভারতে প্রত্যক্ষ করেছে। বিজয়ীর সকল সুযোগ আছে বিজিতের অতীতের কাছে নিজেকে অনুগতভাবে সমর্পণ করার। এতে ব্যর্থ হলে যে কাঠামো সে গড়ে তোলে তা ধ্বংসকারী না হলেও, অন্তত ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হবে। কোন শক্তিই তার ক্ষমতার শিখরে চিরকাল থাকে না এবং তার পতনের যুগে যা সে সৃষ্টি করেছে তা সুরুচি ও দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করার সামর্থ্য—পুনরুজ্জীবনের আশা ও সম্ভাবনা রেখে,—নির্ভর করে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির উপর যা এর সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এটি এক অদ্ভুত ঘটনা যে পার্থেনন থেকে তাজমহল পর্যন্ত, এক অবিস্মরণীয় স্থাপত্য শিল্পের আবির্ভাব সর্বদাই ঘটেছে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীকরণ চেতনার অস্তিত্বের মধ্যেই। গ্রীক রাজ্যগুলির পুরস্কার সামগ্রীতে পেরিক্লিস এথেন্সকে সজ্জিত করেছিলেন। প্রাচীন রোম সারা পৃথিবী বিজয়ের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় ক্যাথিড্রাল ও টাউনহলগুলি গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী শিল্পকর্ম ও পুরসভার ঐক্যে। ফ্লোরেন্স ও ভ্যাটিকান ছিল গীর্জার প্রস্ফুটিত অবস্থা। ভেনিসের বাবসায়িক সম্পর্ক পৃথিবী বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মতই ছিল। ভারতে বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলির খননকারীরা এবং ইন্দোসেরাসেনীয় প্রাসাদ ও সমাধির নির্মাতারা একই রকম ভাবে রাজছত্র-ছায়াতলে কাজ করেছিল, যা তাদের জন্য বস্তুটির সমগ্রতার উৎসাহকে রূপদান করেছিল।

কিন্তু পাতা, ডাঁটা ও শেকড়বিহীন ফুলের কী হয়? প্রস্ফুটিত হওয়ার কাল খুব কমই আসে, অন্তত ঠিক তেমনি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাধারণ জীবনকে বিকশিত করা ও রক্ষা করার কর্তব্যটি। জাতির বিকাশের ব্যাপারটিও ঠিক এমনি। শোষণের দ্বারা ক্ষণিক গৌরবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে কেঁচোর কাজের মত দীন-হীনভাবে দৈনিক জীবন ও সরল গৃহকর্মের মধ্যে দিয়ে সভ্যতাকে বিকশিত করে তোলা এবং ... জাতীয়তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতভাবে নির্ভর করে আনুপাতিক সেই মাত্রার উপর, যা ... এর সদস্যদের মধ্যে অদৃশ্য, দৃঢ় ও আনন্দপূর্ণ সহযোগিতা।

মরুর আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হয়তো যথার্থ আনা যেতে পারে বাগদাদের নির্মাণ কার্যে ও দামাস্কাসের শাসনকার্যে তারা এমনি ধীর-সঞ্চিত শ্রম এত অল্পই নিয়ে এসেছিল। এটি দাবি করা হতে পারে যে, চৈনিক, হিন্দু, পারসীয় হেলেনীয় বিষয়ের উৎসাহকর মিলনে, যার উপর আরবদের সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃত্ব ... সংস্কৃতি ও গবেষণার খুব কম তীব্রতাই দেখা গিয়েছিল; রাজজাতি সন্তুষ্ট ছিল ... বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শুধু বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদে সজ্জিত করায়, যার উপর ...দের শিক্ষার ভিত্তি অনেকখানিই ছিল; তার প্রজাদের অনুষঙ্গগুলিকে ঘৃণা করার এত লক্ষণীয় প্রবৃত্তি ছিল, তাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজেদের মর্যাদা ...ের অত্যন্ত বেশি ব্যগ্রতা এবং সবশেষে, যে সংগ্রাম এত সহজ ছিল, তার অবসানও

অবশ্যম্ভাবী, তার বিজয় যতটা উজ্জ্বল ও স্বল্পস্থায়ী, তার ক্ষয় তত দীর্ঘ ও অগৌরবময়। এ ধরনের যুক্তি সত্য হতে পারে, কিন্তু তাদের এই সত্য সকল বিজয়ের বিরুদ্ধেই এক নিন্দার সঙ্গে জড়িত, শুধু আরব ধর্ম-বিশ্বাসের কলঙ্ক নয়।

দিল্লীর কুতুবমিনারের পিছনের ধ্বংসস্তূপের সম্মুখীন কেউই হতে পারে না, কেউই, এমন কি অস্পষ্টভাবেও, উপলব্ধি করতে পারে না। পারসীয় কাব্যের সৌন্দর্য এ কথা হৃদয়ঙ্গম না করে যে, আরব স্লাভ আফগান ও মোগল ভারতে এসেছিল এক সংস্কৃতির দূতরূপে যা দেশের সন্তানদের সংস্কৃতির থেকে আকারে পৃথক হলেও প্রভাবে কিছু কম ছিল না। আলতামিশের ভগ্ন পর্দার তোরণগুলি—যে নামে তাদের অভিহিত করা হয়—দ্বাদশ শতাব্দীর এক মসজিদের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা যে কোন গথিক বস্তুর মতোই রুচিসম্পন্ন ও ভক্তিভাবমূলক। সম্পূর্ণ অট্টালিকাটি নিশ্চয় গুরুভারে ও দৃঢ়তায় কিছুটা কম ছিল, কিন্তু সেটি গুণ্ডা ও বর্বরদের কীর্তি ছিল না, আর এমন মানুষদেরও ছিল না, যারা সেখানে প্রার্থনার জন্য সমবেত কিন্তু নিছক ধ্বংসের ভক্ত ছিল।

হিন্দু ঐতিহাসিকদের সর্বপ্রথম অধিকার আছে মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাসের গুণগান করার; কারণ এই ধর্মের সম্রাট আকবরের মনে এই প্রেরণা জেগেছিল যে আধুনিক ভারতের লোকদের মধ্যে গড়তে হবে জাতীয়তাবোধ ও তাদের নিয়ে এক জাতি।

ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী মহান রাজাদের যুগ বলে বিদিত। পোপ দশম লিও, সাম্রাজ্যের পঞ্চম চার্লস, ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী, ইংল্যাণ্ডের এলিজাবেথ হচ্ছেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে যাঁরা সিংহাসন পেয়েছিলেন। আর যদি আমরা শুধু ইংরাজ টিউডরদের নিই, তাহলে দেখব বংশের পাঁচজনের মধ্যে চারজন হচ্ছেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, যাঁদের নিজস্ব শক্তিশালী নীতি ছিল। যাহোক, শেষের দুজনের আবার এক বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন কি যাঁদের ক্যাথলিক রাণীর প্রতি জোরাল সহানুভূতি ছিল, তাঁরা সম্ভবত স্বীকার করবেন এটা দেশের পক্ষে ভাল হয়েছিল যে এলিজাবেথ তাঁর পরে রাজত্ব করেছিলেন, আগে নয়। দুই সাম্রাজ্ঞীর মধ্যে পরবর্তীজনের বিরাট রাজনৈতিক বুদ্ধি ও নীতির অধিকতর সংশ্লেষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে খুব অল্পজনই বিতর্ক করবেন। বাস্তবিক এই সত্য যথেষ্ট ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে তাঁর ক্যাথলিক প্রজাদের আনুগত্য ও উদ্দীপনার দ্বারা, যাঁরা প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন স্পেনীয় আর্মাডাকে বিতাড়িত করার জন্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস ইংল্যাণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে এক অদ্ভুত সমান্তরাল ও বৈষম্য প্রদর্শন করে। আকবরের রাজত্ব ছিল এলিজাবেথের রাজত্বের সমসাময়িক এবং আরও বেশি রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং মন ও হৃদয়ের ঔদার্যসহ তিনি এক বিশাল জাতি প্রতিষ্ঠার ভার

নিয়েছিলেন, যা ছিল সাম্প্রদায়িক নীতির থেকে পৃথক। বাস্তবিক জগতের খুব কম সম্রাটই এমন বুদ্ধি ও উদারতার সঙ্গে এমন এক বিস্ময়কর সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন যেমনটি দিল্লীর এই সম্রাট করেছিলেন। সকল ধর্মের বিশ্বাসীদের প্রতি প্রায় সমান সহানুভূতি, প্রাচীন ভারতীয় ব্যবস্থার প্রশংসা ও গভীর জ্ঞান, তাকে বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গ করার বাসনা, বিনষ্ট করার নয় ; জাতীয় সব কিছুর প্রতি ভালবাসা, দ্রুত আঘাত করা ও উদারভাবে ক্ষমা করার স্বভাব—এই সব গুণ আকবরকে তার প্রজাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। তিনি এক রাজপুত গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সব চেয়ে মহৎ কার্য হচ্ছে শাসন ব্যবস্থাকে প্রাচীন 'ধর্ম' অনুযায়ী গঠন করার পরে এক হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ এবং তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মাতা করা। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আউরঙ্গজেবই প্রথম যিনি ভারতীয় ছিলেন না সম্পূর্ণ এই অর্থে, তাঁর পিতা ছিলেন মুসলমান আর মাতা ছিলেন হিন্দু।

আকবরের পরবর্তী তিন বংশধর হচ্ছেন—তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর, তাঁর পৌত্র সাহজাহান এবং তার প্রপৌত্র আউরঙ্গজেব—সকলেই দক্ষতার জন্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিভা যে সাম্রাজ্যকে সংগঠিত করেছিল তাঁরা তা যথাযথই রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের মধ্যে আউরঙ্গজেব ছিলেন সাম্প্রদায়িক এবং ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিক রাণীর মতোই কিছুটা গোঁড়া ভক্তিভাবাপন্ন, ভারতীয় জাতীয়তার নির্মাণকারী হওয়ার চেয়ে যা তাকে ইসলামের এক সাধু করার উপযুক্ত ছিল। একমাত্র শাহজাহানের মধ্যে তাঁর পিতামহের সঙ্গে তুলনীয় শাসন দক্ষতা ছিল। অন্যভাবে বলা চলে, ভারতের দুর্ভাগ্য যে তার ক্ষেত্রে যেন এলিজাবেথ আগে এসেছিলেন, মেরীর পরে নয়।

এই হচ্ছেন চারজন মহান মোগল সম্রাট, যাঁদের যুক্ত রাজত্বকাল প্রায় দুশো বছর আগে পর্যন্ত ছিল, যা শুরু হয়েছিল এলিজাবেথের সিংহাসন-আরোহণের দু বৎসর পূর্বে এবং সমাপ্ত হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেন্টিয় সংযুক্তির তারিখে। তাঁদের তাতার রক্ত, কারণ তাঁরা তৈমুলঙের জাতি থেকে এসেছিলেন, তাঁদের দিয়েছিল অক্লান্ত শক্তি ও ধৈর্য। তাঁদের মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাস দিয়েছিল মতবাদের সারল্য ও শক্তি, তাঁদের উপজাতির তিনশো বৎসরের সংলগ্নতাতেও যা ছিল অশেষ। তাঁদের সৈনিক-সুলভ উৎপত্তি তাঁদের শক্তি দিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে সৈনিকজীবনের রুক্ষ দিকটি গ্রহণ করার, আবার সেই সঙ্গে তাঁদের সমস্ত অভ্যাস ও অনুষঙ্গ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছিল অতুলনীয় জাঁকজমকের। তাঁরা সবাই ছিলেন এই ধরনের ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে আকবর ছিলেন উদার রাজনীতিজ্ঞরূপে অতুলনীয় এবং শাহজাহান ছিলেন ব্যক্তিগত প্রতিভায়।

শেষোক্ত সম্রাটের হাতে ভারতের ঐক্য হয়ে উঠেছিল এক বাস্তব ঘটনা, তাঁর প্রাসাদগুলির উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দ্বারা প্রতীকায়িত আর এমন কি দশম লিও পর্যন্ত তাঁর কাছে বুঁচতে পরাস্ত হবেন। তাঁর তাজ রত্নখচিত প্রাচীর ও শ্বেত প্রস্তরের জাফরি কাটা

জানালার উপর মহিমামণ্ডিত মস্তক উঁচু করে আজও আছে, সান্ত্বনাহীন দুঃখ ও প্রেমের প্রতীক। আবার আগ্রার মোতি-মসজিদ, অনুপাতে বিরাট ও ভূষণহীন, ক্ষীণ... প্রস্তরের গাম্ভীর্যমাখা। আবার আরও কোন সুন্দর প্রাসাদ, বেগমের স্নানাগার বা বাদশাহী দরবারকক্ষ—এই সত্যকে প্রমাণিত করে যে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এক শিল্পী রাজা। কিন্তু শাহজাহান শুধু এই শ্বেতপাথরেই ভারতের মাটিতে ও তার অধিবাসীদের কাছে তাঁর অহঙ্কার প্রকাশ করেননি। তিনি আধুনিক দিল্লীতে নির্মাণ করেছিলেন লাল পাথরের দেওয়াল, প্রশস্ত রাজপথ ও বিস্ময়কর দুর্গ সমেত অনেক কিছু। তিনি স্বর্ণ ও রত্নখচিত ময়ূর-সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন, যা নাদির শা একশো বছর পরে পারস্যে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দরবারগৃহ ও বাসকক্ষ ছিল বাছা বাছা গ্রন্থ ও চিত্রের সংগ্রহশালা। আর সকল মোগলের মতোই পুঁথি-অলঙ্করণ শিল্পে তিনি নিজে ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ।

তাঁর প্রাসাদের সৌন্দর্যই শুধু শেষ কথা নয়, তাদের গম্বুজগুলি শ্রবণশক্তির ... সমন্বিত, যা ঘণ্টাধ্বনির মত কার্য করে, নিচে ধ্বনিত প্রতিটি গুঞ্জন ও মৃদু শব্দকে গ্রহণ করে নিয়ে উপরে তাদের সঙ্গীতে রূপান্তরিত করে দেয়। এমন কোন রূক্ষ বা ... কণ্ঠস্বর নেই, যা তাদের কাছে সঙ্গীতমধুর হয়ে ওঠে না। আর যদি কোন বৃদ্ধ মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা যায় প্রতিটি মসজিদে কোন গম্বুজ থাকে, সে বিভ্রান্ত... জবাব দেবে যে তার একমাত্র ধারণা যে আল্লার নাম বারবার প্রতিধ্বনিত করার জন্য এমন করা হয়েছে।

এই সবে শাহজাহান নিজেকে প্রমাণিত করেছিলেন তিনি কোন এক সম্প্রদায়ের নয়, সকল প্রজাগণেরই সম্রাট এবং ভারতবর্ষে আজও তাঁকে সেই ভাবেই গণ্য করা হয়। তিনি হয়তো জনপ্রিয় বিশ্বাসগুলির প্রতিটি দশায় সক্রিয় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু একথা ঠিক তাঁর সহানুভূতি হতে বঞ্চিত কেউ ছিল না। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে ... উৎসাহ প্রকাশিত হয়েছিল তা গভীরভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দেশের স্থাপত্য মহিমায় তাঁর সংযুক্ত তৃতীয় রীতিটি কখনই ভোলা যায় না। আর এটি এখনও লোকের স্মরণে আছে যে ইতিহাসের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা অনুসারে ভারত তাঁর রাজত্বে যেমন সুশাসিত হয়েছিল, তেমন আর কখনও হয়নি।

মুসলমানরা ভারতে গোলাপফুল এনেছিল। দক্ষিণের এক প্রদেশে আমাকে ... ভিখারী এই ফুল যখন এনে দেয়, তখন আমার বারান্দায় এক হিন্দু বসেছিলেন, তিনি বললেন, 'এরা রাজার জাত। এমন কি এদের ভিক্ষার ধরনটাও রাজকীয়।'

যেখানেই মোগল সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল, সেখানেই সামাজিক আচরণ-বিধির উপর তার উদার প্রভাব পড়ে, উপরোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে তাই। কারণ ... হিন্দুয়ানী বোধহয় সকল বিলাসিতা বর্জিত, একটু বেশি রূক্ষ; নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরম উদ্দেশ্যগুলির বিবেচনার দ্বারা একটু বেশি সীমাবদ্ধ। এটা বলা হয় যে, 'পবিত্র

জীবনের পথ ও পদ্ধতিগুলির জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, পূর্ব তার কাছ থেকে সেটি ভাল করে গ্রহণ করতে পারে।' মুসলমানধর্ম এই জ্ঞান যাতে সম্ভব সেই বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কখনও কখনও হিন্দুদের দ্বারা এমনও বলা হয় যে আধুনিক জীবনের প্রয়োজন কোন ভদ্রলোকই পরিপূর্ণ করতে পারে না, যদি তাঁর এক মুসলমান পরিচায়ক না থাকে।

মুসলমানদের সৌজন্যবোধই প্রকাশ করে প্রাসাদ-জীবন ও সৈনিক-জীবনের কথা। ভারত যদি স্বাধীন দেশ হতো, তাহলে তার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক দূতাবাসগুলি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ হতো। ইসলামের পুত্রকন্যার কাছে অভিবাদন জানানোর কার্যটি যেন ভক্তি জ্ঞাপন করা। শ্রদ্ধাভরে নীরবে দাঁড়িয়ে ওঠা, বয়সে বড়জনের হাতটি নিয়ে বয়সে ছোটর গভীর আবেগের সঙ্গে কপালে স্পর্শ করা এবং 'সেলাম আলায়কুম' (মঙ্গল হোক আপনার) রূপ সুন্দর শব্দগুলি উচ্চারণ করা, করচুম্বন ও আলিঙ্গন, তার সঙ্গে মস্তক নত করা—এ সবই মানব-সংস্কৃতির প্রতীক, যা প্রকাশ করে সেই ঈশ্বরদ্রষ্টার উপযুক্ত গভীর সহানুভূতি ও করুণা, যাঁর ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত প্রেম, মানুষের সেবা ও ভালবাসার মধ্যে দিয়েও উপযুক্তভাবে ব্যক্ত হতে পারেনি, এত গভীর ছিল সেটি। এ এক মানবিকতা, যা এখনও মরুভূমি ও প্রান্তরের গ্রাম্য শান্তির সৌরভে সুরভিত, যা হচ্ছে সমস্ত মুসলমান জগতের প্রাণশক্তি ও একতা, যা কোন স্থানে বা কোন কালে দৈবক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। গোষ্ঠীনেতা তাঁর তাঁবুর দ্বারে বসে অপরিচিতদের অভ্যর্থনা করছেন, স্ত্রী ও স্বজনদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ভালবাসার ও ন্যায়সঙ্গত, তাঁর গোষ্ঠীর সকল লোকে তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে এবং ইসলামধর্মী মানুষদের প্রথানুযায়ী ছোট শিশুদের কাছে তাঁর হৃদয় বিলিয়ে দিচ্ছেন—জাতির সম্পর্কে এই হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ কল্পনা। জগতের আর কিছুই এমন আবেগময় কোমলতা নেই, যেমন হচ্ছে এক হিন্দু মাতা, আর একমাত্র হচ্ছে মুসলমান পিতা।

আরব ধর্ম-বিশ্বাসের এই মানবিক দিক আমাদের প্রস্তুত করে ভারতে এর ধর্মান্তকরণ ক্ষমতা দেখার জন্য। ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুর কাছে এটি তারই প্রতিনিধিত্ব করে, একদা বৌদ্ধধর্ম যা করেছিল,—সম্পূর্ণ গণতন্ত্র যেখানে জন্ম, রক্ত ও জীবিকার সব কলঙ্ক মুছে যায় ভ্রাতৃত্বের সেই শর্ত উচ্চারণে, 'আল্লা ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ তারই প্রেরিত দূত।' একজন মানুষের অতীত যত অবনত ও হীন হোক না কেন, এখন সে হতে পারে এবং করতে পারে, যা কিছু চায় সে। তার নামের আগে শেখ শব্দটি বোঝায় যে সে এমন পরিবার থেকে এসেছে, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ভারতের চাষী, মাঝি ও মিস্ত্রীর বৃহদাংশ এইভাবে রক্ত ও সহজাত প্রবৃত্তির দিক দিয়ে হিন্দু এবং ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলমান। পুরানো বিশ্বাসের দেবতারা হয়ে উঠেছেন নতুনের সন্ত বা পীর। তারা তাদের সমাধিতে মৃতের কাছে প্রার্থনা করে

এবং তার ফলে তাদের নতুন ধর্ম-বিশ্বাসের শিক্ষিত ও গোঁড়া ব্যক্তিদের দ্বারা অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গণ্য হয়। যে ভ্রাতৃত্বের কথা খ্রীষ্টানধর্মে বলা হয়ে থাকে সেটি ইসলামে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। মহাপুরুষ মহম্মদের বাণী হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির কাছে মানবিকতা ও মুক্তির বাণী।

বেশীর ভাগ ধর্মের দুটি করে বিভাগ থাকে—একটি কঠোর, অন্যটি জাঁকজমকপূর্ণ। ইসলাম ধর্মের কঠোর দিকটা সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এবং জাঁকজমকের দিকটি শিয়াদের মধ্যে। শিয়ারাই পালন করে খলিফা আলির স্মৃতি এবং হাসান-হোসেনের মৃত্যুর শোক। মহরমের শোভাযাত্রায় তারা শহীদদের তাজিয়া বহন করে এবং যখন তারা মৃত্যুতে কারুকে হারায়, তখন নিজের পরিবারের জন্য শোক প্রকাশের পরিবর্তে আলির পরিবারের জন্য করে। ভৌগোলিকভাবে শিয়ারা হচ্ছে পারসীয় এবং এই সম্প্রদায় বেশি সংখ্যায় আছে বাংলায় ও লক্ষ্ণৌর চারধারে। সুন্নি সম্প্রদায়ের কঠোর ও সঙ্কীর্ণ শিক্ষাগুলি দিল্লী হায়দ্রাবাদের রাজকীয় বিশ্বাস গঠন করেছিল। এছাড়াও, ভারতবর্ষে মুসলমানদের আর একটি তৃতীয় সম্প্রদায় আছে ওহাবী নামে। এদের সম্বন্ধে কিছুটা ব্যঙ্গ করে বলা হয় যে এই ধর্ম তাদের, যাদের পিতামাতার একজন শিয়া, অন্যজন সুন্নি। প্রকৃতপক্ষে এটি এক আধুনিক সংস্কার। যাহোক হিন্দুদের মধ্যে একজনের বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত নির্বাচনের ব্যাপার, আর পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায় ব্যক্তিগত ধর্ম-বিশ্বাস নির্বাচন করার ব্যাপারটি।

ঐসলামিক সম্প্রদায়ের বহু সামাজিক উন্নয়নে আরও বেশি ভারতীয় পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। এটা খুব স্বাভাবিক যে জাতিবিভাগ গঠনের প্রবণতা খুব দেখা যাবে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে আহারের দৃঢ় প্রত্যাখানও, যারা নির্বাচিত গোষ্ঠীর নয়। অন্যান্য দিকেও এই ধরনের কিছু প্রথাগত বিষয় আছে। বাংলার বহু মুসলমান পরিবার গোমাংস ভক্ষণ থেকে সভয়ে বিরত হবে। স্ত্রী জেদ ধরে তার স্বামীর আহার্য সে তার নিজের হাতে ছাড়া অন্য কেউ রান্না করবে না। বিধবাদের পুনর্বিবাহ উচ্চরুচির পরিচায়ক নয় এবং দিল্লীর রাজপরিবারে বিধবা রাজকন্যার জীবন ঠিক স্বামীহারা হিন্দু রমণীর মতই অতিবাহিত হতো—কৃচ্ছতায়, প্রার্থনায় ও পড়াশুনায়। সবশেষে, গঙ্গার সেই স্তোত্র, যা হিন্দু শিশুর প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি, তা তিন-চার শতাব্দী আগে এক মুসলমান দ্বারা লিখিত হয়েছিল।

এর দিব্যভাবের দিকে, সুফিধর্মের অস্পষ্ট গন্তব্যস্থল যা একমাত্র সাধকদের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব, তা বাদ দিলে এবং সেখানে সব ধর্মমতের সাধকরা এক হয়ে আরও বাদ দিচ্ছেন শিয়া ও সুন্নির সম্প্রদায়গত সকল পার্থক্য, সেখানে ভারতবর্ষে ইসলাম হচ্ছে ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়প্লাবী ভালবাসার আর একটি নাম। লোকসঙ্গীতের

মধ্যে হিন্দুদের হরি ও মুসলমানদের আল্লার নাম অপার্থক্যনীয়ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে এবং যখন মাঝিরা তাদের জাল সারায় তখন তাদের গান শুনলে কেউ প্রভেদ করতে পারবে না প্রেমসঙ্গীত থেকে দেবতার মহিমাসঙ্গীতকে।

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা সম্পর্কে মহম্মদের উপলব্ধি, তিনি তা ভাষায় যত কমই ব্যক্ত করুন না কেন, আরব-জগতে আলোড়ন জাগিয়েছিল এবং সমস্ত উপজাতিগুলিকে এক হয়ে তাঁর পতাকা তলে সংগ্রামে আকর্ষণ করেছিল। প্রতিদিনে পাঁচবার ওজু করার পর মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধার্মিক মুসলমানরা বলেন :

ঈশ্বরের নাম ধন্য হোক, জগতের প্রভু তিনি,
করুণাময়, পরম দয়ালু,
শেষ-বিচার দিনের রাজা।
তোমার আমরা উপাসনা করি
আর তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।
আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর,
যে পথ তুমি যাদের প্রতি সদয় তাদের জন্য ;
তোমার ক্রোধ যাদের উপর তাদের জন্য নয়,
ভ্রান্ত যারা তাদের জন্যও নয়।

পুনরায় :

বল, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর,
ঈশ্বর চিরকালের,
তিনি জন্মরহিত,
তাঁর মত আর কেউ নেই।

এই প্রার্থনা ও বিশ্বাস, গর্ব ও ভয়ের সুর থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রহৃত ক্রীতদাসের উক্তি নয়, এ হচ্ছে ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসতে চাওয়া সন্তানের, যেখানে তারা আবেদন জানাচ্ছে, সেখানে করুণার গভীরতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী। কিছু একটা অবশ্যই আছে মহম্মদের জ্বলন্ত নৈতিক আবেগের মধ্যে, জনগণের চেতনায় তাঁর তীক্ষ্ণ আবেদনের ভিত্তি, যাকে সন্ত্রাসবাদের মতো মনে হতে পারে। যার কথা তিনি বলেছেন সেই নরক ও বিচারের কথা যদি সব মানুষ জানত, তাহলে তারা যা করেছে, তার জন্য সামান্য হাসির বদলে প্রচুর ক্রন্দন জাগত। কিন্তু এ সবই জ্ঞানের ও ন্যায়ের বাণীর পক্ষে। নারী, দরিদ্র, ক্রীতদাস ও মূক পশুদের জন্য করুণায় এমন উজ্জ্বল প্রকৃতি স্বর্গীয় ভীতির চিন্তায় কখনও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটি নিয়ম তিনি দেখেছেন বড় করে লিখিত—'আমার করুণা আমার ক্রোধকে নিশ্চিত জয় করে' এবং মহম্মদ, যিনি কৃচ্ছ্রতায় বিশ্বাস করেন কিন্তু আত্মনিগ্রহে নয়, অনুভব করেন প্রায়শ্চিত্তকারীর সকল আবেগ যখন

তিনি 'ইসলাম' শব্দটি উচ্চারণ করেন কিংবা সেই সত্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন যিনি হচ্ছেন ঈশ্বর।

পঞ্চদশ অধ্যায়
ভারতীয় তীর্থ-ভ্রমণ

জগতের ভাবধারাগুলির চলার পথ হচ্ছে এশিয়ার প্রাচীন পথগুলি। উট চলার এক পথ মিশর থেকে মরু পার হয়ে সিরিয়ায় গেছে, সুয়েজ ক্যানালের কাছে সেই পথ ভেঙেছে খেয়াপারের জন্য। এই বালুকাময় পথের সঙ্গে সৌন্দর্য ও বেদনায় ইউরোপের, রোমের বা বর্বরদের কোন পথের তুলনা হতে পারে? এই পথে আমরা এখনও দেখতে পেতে পারি গাধার পিঠে ছেলেকে নিয়ে চলেছে এক স্ত্রীলোক, আর এক বৃদ্ধ তাদের আগে আগে চলেছে, ঠিক যেন পবিত্র পরিবারের পলায়নের সেই কিংবদন্তীর চিত্র। বহুকাল আগে এই পথ বেয়ে গিয়েছিল মিশরের সেনাবাহিনী ইস্রাইলের সীমান্তে আসিরিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে। এই পথ দিয়েই খ্রীষ্টধর্মের জন্মের বহু পূর্বে জুডিয়া তার জ্বলন্ত ও প্রচণ্ড নৈতিক আবেগের স্রোতধারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরণ করেছিল।

সেই রকম সারাভারতে, তার প্রাচীন রাজপথগুলি থেকে দূরে এবং তার মহিমামণ্ডিত হিমালয়ের উপর জালের মত বিস্তৃত, এই ধরনের ছোট সুতোর মত পথ আছে—যদিও মানুষের পায়ের দ্বারা এই পথ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু শ্রমভারাক্রান্ত জনতার পদচিহ্নের চেয়ে শক্তিশালী চিন্তাধারার ভারে আরও বেশি গভীরভাবে পথটি হয়েছে।

এমন ধরনের পথগুলিই একদা কাশ্মীরের সঙ্গে চীনকে যুক্ত করেছিল। আফগানিস্তান সর্বদাই ভারতের একটি প্রদেশ, নিশ্চয়ই এই ধরনের পথ দিয়ে তার ভ্রাম্যমান বণিকদের বাদাম ও কিসমিস নিয়ে দক্ষিণে প্রেরণ করত সলোমনের রাজত্বকালের মতোই সুদূর অতীত যুগে। এখনও পর্যন্ত এই সব কাঁচা পদভরে গভীর পথ বেয়ে বড় বড় লোমওয়ালা ছাগল তাদের বোঝা নিয়ে বোখারা ও তিব্বতের বরফ ঢাকা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ থেকে ঝিলামের উষ্ণ উপত্যকায় নেমে আসে গায়ের লোম ছাঁটাইয়ের জন্য এবং বিখ্যাত শালের পশম সরবরাহের জন্য। আমরা অবাক হয়ে ভাবি কোনটি আগে, ব্যবসা না তীর্থযাত্রা, বাণিজ্যের পথ না তীর্থযাত্রীর পথ? এটা কি বোধ হবে না যে, আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে তার গৃহ থেকে টেনে বের করেছিল এবং এটা বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত নয় যে, সৌন্দর্যের অনুষঙ্গগুলি যাত্রাপথের স্থানের পর স্থানে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে এক ধর্মীয় অনুভূতি ও বাধ্যবাধকতার জন্ম দিত সেই বিশেষ স্থানগুলিতে পুনরায় ফিরে আসার ?

যে ভাবেই হোক এটি নিশ্চিত যে তীর্থভ্রমণের পিছনে থাকে স্থানের, সৌন্দর্যের, এমন কি ভৌগোলিক তাৎপর্যের প্রসংসা। উত্তরে বারাণসী ও দক্ষিণে কাঞ্জীভরম ভারতের এদুটি স্থানেতে ভালবাসা ও পরিদর্শন করা হয় একই কারণে যেমন আমাদের মধ্যে করা হয় ডারহাম বা কলোনকে। এগুলি মন্দির-নগরী ; স্থাপত্যে সম্পদে এবং সাধু ও পণ্ডিতদের সংস্পর্শে সমৃদ্ধশালী। জগন্নাথকে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে আছে সমুদ্রের সৌন্দর্য এবং হয়তো কিছুটা প্রাচীন বন্দরের জাঁকজমক, যেখান দিয়ে পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যধারা প্রবাহিত হতো। এলাহাবাদ হচ্ছে পবিত্র, কারণ সেখানে দুটি বড় নদীর জলধারা মিলিত হয়ে তাদের দুটি বিশাল অববাহিকার মধ্যে তাকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেছে, যেখানে বাস করে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্য, আশা ও লোকগীতি নিয়ে। হিমালয়ের গম্ভীর সৌন্দর্য তাকে সাধকদের আশ্রয়স্থান করে তুলেছে। হিন্দুদের সবচেয়ে পুন্যতীর্থ 'চার ধাম' ভারতের চার প্রান্তে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে—যেগুলিকে জানলে সারা দেশকে জানা হয়ে যায়। গঙ্গা-উপাসনা এবং সেই শ্রদ্ধা, যা একজন দাক্ষিণাত্যের গ্রামবাসীকে পুণ্যকর্মরূপে ভ্রমণ করায় তাঁকে দেখার জন্য যিনি সপ্ত পবিত্র নদীর একটিকে দেখেছেন, কম কাব্যভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে থাকে বলা যেতে স্থানের প্রতি ভালবাসা। দেশের লোক-গাঁথা হিন্দুধর্মের মধ্যে কী বিরাট এক বিষয়। যে গবেষকরা এর সন্ধান করেন, তাদের কাছে বোধ হবে এটি সব গণনার অতীত।* মহাভারত, রামায়ণ ও পুরানগুলি বেশ কিছুটাই স্থানীয় মনোভাবের আবেগপূর্ণ কল্পনার প্রকাশ। সাধ্বী স্ত্রী সতীর কাহিনীতে বাহান্নটি স্থানে তাঁর খণ্ডিত দেহের অংশ পতনের তাৎপর্য কার বোধগম্য হয় না ? 'পদাঙ্গুলি পড়েছিল কলিকাতায় এবং তা আজ হয়েছে কালিঘাট···এবং জিহ্বা পড়েছিল উত্তর পাঞ্জাবের কাংড়া (জ্বালামুখী) এবং আগুনের লেলিহান শিখারূপে আজও তা দেখা যায় মাটির ভিতর থেকে প্রকাশিত হতে···এবং কানের দুল পড়েছিল বারাণসীতে, যেখানে দেবীকে বলা হয় বিশালক্ষী।' কোন বিদেশী এই কটি কথার মধ্যে যে অনুষঙ্গুলি ভিড় করে আছে তা বুঝতে পারবে না।

এমন কি ধ্রুবতারারও এক ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী আছে, শিশু ধ্রুবের কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িয়ে, যারা হৃদয় সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থির।

দেশের এই অচেতন উপাসনায় ঐতিহাসিক পদার্থেরও অভাব নেই। বার্নাডেটের মতোই এক ভারতীয় রাখালের কাহিনী দক্ষিণ ভারতের এক সুন্দর মন্দিরে বলা হয়েছিল, যার একটি গোরু কোন দুধ দিত না। সে একদিন গোরুটিকে অনুসরণ করে এক অরণ্যে প্রবেশ করল এবং দেখল এক প্রস্তরের শিবলিঙ্গের উপর সে ভক্তিভরে তার নিজের দুধ

ঢেলে দিচ্ছে। আর এই ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ মন্দিরের বেদী বর্তমানে সেই শিবলিঙ্গকে ঘিরে স্বাভাবিক অমসৃণ প্রস্তর নির্মিত নয় ? এই ধরনের নানা কাহিনীতে গ্রামগুলি সব পূর্ণ। নিশ্চিতভাবে স্থানগুলির প্রতি এক গভীর সচেতন ভালবাসা সমস্ত ভারতীয় পরিকল্পনায় পরিব্যাপ্ত। একে দেশপ্রেম বলে কখনও অভিহিত করা হয়নি, কারণ এটি কখনও প্রভেদমূলক কোন সীমান্ত দ্বারা সংজ্ঞাবদ্ধ হয়নি, কিন্তু গৃহ, গ্রাম, মৃত্তিকা এবং ব্যাপক অর্থে নদী, পর্বত ও সারা দেশটি প্রায় এক আবেগময় ভালবাসার বস্তুনিচয়। এগুলির চেয়ে বেশি প্রাচ্য আদর্শের সম্পূর্ণতার দ্বারা আর কোথাও আমরা অভিভূত হই না ; এদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করা। নীল সমুদ্র ভাঙ্গাচোরা খাঁড়ি, দীর্ঘকায় পাইনবৃক্ষ, হিমবাহের মুকুটশোভিত পর্বতশ্রেণী আর দ্বীপমণ্ডিত ফিজোর্ডস নিয়ে নরওয়ে নিশ্চয় সুন্দর। কিন্তু নরওয়ের অতীত স্মৃতি সর্বদা বীরদের সঙ্গে জড়িত, ভারতের প্রতি অংশে প্রতি পক্ষের বাঁকে সাধকদের যে কণ্ঠস্বর আমাদের অভিনন্দিত করে আমরা পাই না। ঝড়ো হাওয়াময় ও ধূসর বর্ণের, ক্ষুদ্রাক্ষুপ ও প্রস্তরখণ্ড আকীর্ণ ব্রিটানি হচ্ছে সুন্দর। এখানে মাইলগুলি বৃক্ষ 'ক্যালভারি' দ্বারা চিহ্নিত এবং সমস্ত ব্রিটন দেশের জলাভূমির উপর যেমন কুয়াশা ছড়িয়ে থাকে, তেমনি সাধকদের কাহিনীও ছড়ানো আছে। কিন্তু এই ক্যাথলিক সাধুত্ব হিন্দুধর্মের কঠোর জ্ঞানের শৃঙ্খলায় কখনও পৌঁছায়নি। এবং আমরা বৃথাই আশা করি সেই আধ্যাত্মিক আবেগ ও দার্শনিক স্বাধীনতার সংমিশ্রণ, যেখানে পবিত্রতা মিশে গেছে পাণ্ডিত্যে, যা নিমেষের মধ্যে প্রাচ্যকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে এবং তার সমস্ত জাতি ও তাদের স্বপ্নগুলির মিলন ঘটায় তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রেই। নিম্নলিখিতটি প্রায় সেন্ট ফ্রান্সিসের হতে পারত, কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই একটি বাংলা কবিতা, যাতে তারা বলে :

ও, মাতা পৃথিবী, পিতা আকাশ,
ভ্রাতা বায়ু, মিত্র আলোক,
প্রিয় বারি
যুক্ত করে আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করো।
কারণ আজ আমি পরম সত্তায় বিলীন হচ্ছি,
কারণ আমার হৃদয় পবিত্র হয়েছে,
সব মায়া ঘুচে গেছে
তোমাদের সৎ সঙ্গের শক্তিতে।

ভারতীয় চেতনায় স্থানের সৌন্দর্য আত্মার প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানরূপে অনূদিত হয়। নায়েগ্রা প্রপাত যদি গঙ্গানদীতে হতো, তাহলে মানবসমাজে তার মূল্যায়ন কী ভাবে হতো তা ভাবা যায় না। বিলাসবহুল বনভোজন ও রেলের প্রমোদ ভ্রমণের বদলে ভক্ত জনসাধারণের বার্ষিক বা মাসিক আগমনের ব্যাপার হতো। হোটেলগুলির

বদলে মন্দির। জাঁকজমকের বদলে কৃতজ্ঞতা। এর বিরাট শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনের রথে বন্ধাবদ্ধ করার বদলে দেহকে এর জলে ভাসিয়ে দেবার এবং পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার স্বর্গীয় আনন্দ-উন্মাদনা জাগত। প্রভেদ কি এর চেয়ে বড় হতে পারে ?

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে হিন্দুরা তীর্থভ্রমণের ধারণাটি লাভ করেছে বৌদ্ধদের প্রতীকের উপাসনা থেকে। কিন্তু আচরণ-প্রথার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তা অন্যরকমই বোধ হয়। বৌদ্ধযুগের বিরাট বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিঃসন্দেহে যাতায়াতকে সহজ করে তুলেছিল এবং এইভাবে ভ্রমণ-প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী ও উদ্দীপিত করেছিল, যেমন আধুনিককালে রেলপথ সারা দেশকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞানের এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যে শ্রেণীর মানুষগুলি প্রাচীন কালে দূরে ভ্রমণ বা ঘন ঘন ভ্রমণের আশা করতে পারত না। কিন্তু এর মূল ভাবে, মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার এত সম্পূর্ণ প্রকাশ ছিল যে এই আচরণ বৌদ্ধধর্মের নিশ্চয় বহু পূর্ববর্তী, অন্তত যখন ভারতে আর্যদের আগমন হয়েছে, তখন থেকেই প্রচলিত। বোম্বের উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে যাওয়া ক্যানারা গুহায় কেউ এলে তার কাছে এই সত্য বোধগম্য হবে। শক্ত পাহাড়ের পাথর কেটে এখানে একশো আটটি গুহা করা হয়েছে। সেগুলি জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত এবং প্রতি জোড়ার নিজস্ব জলের ব্যবস্থা আছে ; আর যেখানেই প্রাকৃতিক সুন্দরতম অরণ্য ও সমুদ্রের মিলন রেখা যেখান থেকেই চোখে আসবে, সেখানেই পাথর কেটে বিশেষভাবে এক সিঁড়ি ও বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ধ্যান করার জন্য এটি দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ প্রকৃতি হচ্ছে চিরন্তন সত্য, আর এই স্থান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমন আছে।

ইলোরা নিমেষে জানিয়ে দেয় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি একটি পবিত্র স্থান ছিল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধেরা তাকে খুঁজে পেয়েছিল এবং উপযুক্ত কালে মুসলমানরাও প্রাচীনকালের পছন্দকে সমর্থন জানাল তাদের বিখ্যাতদের মৃতদেহ এই পর্বতশিখরের মন্দিরে শয়ানের জন্য আনয়ন করে। কিন্তু প্রথমে এটিকে কেন নির্বাচিত করা হয়েছিল ? যে কেউ এখানে উষাকালে শিশিরভেজা স্নিগ্ধতায় জাগ্রত হয়েছে, যে কেউ তারপর সমুদ্রের মত প্রান্তরে দৃষ্টি মেলেছে, সে এই প্রশ্ন করতে পারবে না। যতকাল ধরে পৃথিবী থাকবে, ততকাল ইলোরাও সেই স্থানগুলির অন্যতম হয়ে থাকবে, যে স্থানে ঈশ্বরের রহস্য মানুষের আত্মার উপর বিরাট প্রভাব ফেলে অভিভূত করে, তার ধর্ম-বিশ্বাস ও তাদের অনুষঙ্গগুলি যাই হোক না কেন।

কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির চেয়ে আমাদের পিছনে কোন অস্ত্রের দ্বারা আমরা বেশি নিয়ন্ত্রিত হই। তপ্ত বালুকা ঝড় ও অবিশ্রাম তাঁবু উত্তোলনে অভ্যস্ত মরুভূমির যাযাবরদের কাছে মৃত্যুর চিন্তা কত শীতল ও আরামদায়করূপে জাগরিত

হবে। মুসলমান পবিত্রতার তিনটি মনোভাব আছে—পুরুষের গৌরব, নারীর মাধুর্য এবং কবরের পবিত্রতা। খুব প্রাচীনকালে আমরা দেখি শ্রদ্ধেয় আব্রাহাম একটি গুহার অন্বেষণ করেছেন, যেখানে তাঁর স্ত্রীর দেহরক্ষা করতে পারেন। স্থির, স্তব্ধ, শীতল মৃত্যুকে দৃঢ় অবিনশ্বর এক মন্দিরে স্থাপন করতে হবে। 'দীর্ঘকালের গৃহ,' ক্লান্তিকর দেশে এক বিরাট পর্বত, অনন্ত বিশ্রাম, চিরন্তন শীতলতা ও বিশ্রাম, এই সমস্তই খুঁজে পাওয়া যাবে সমাধির মধ্যে। এটা বোঝা কি খুব সহজ নয় যে, গঙ্গার তীর থেকে টাইবারের তীর পর্যন্ত কৃষকরা যখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতের অগ্নি-সংকার করে, তখন অরণ্যবাসীরা মৃতকে ধরিত্রী মাতার কোলে গভীরভাবে কবরস্থ করে কিংবা তার চারপাশে কঠিন প্রস্তরের বাসগৃহ নির্মাণ করে এবং তারপর থেকে সেই প্রিয়জনের সমাধি হয় তাদের ভ্রমণের এক কেন্দ্র ?

অতএব হিন্দুদের কাছে তীর্থভ্রমণের পবিত্র স্থানটি যেমন, ধার্মিক মুসলমানের কাছে হচ্ছে তেমনি তাজমহল বা আওরঙ্গজেবের সমাধি, কিংবা মদিনার চিরস্মরণীয় সমাধি। ভারতের প্রতি মুসলমান গ্রামেও রয়েছে তাদের কোন পীর বা সাধকের চিরনিদ্রার স্থান এবং আমি দেখেছি সেই দারিদ্র্য-পীড়িত দেবোত্তর স্থানে, জনতার একমাত্র সম্পত্তি হচ্ছে এক গ্রন্থিল ও শুষ্ক কাণ্ড, যা চিহ্নিত করছে বহুকাল স্বর্গীয় কোন সাধু ব্যক্তির শেষ আবাস স্থল। কারণ এটিই হচ্ছে মরুভূমির আদর্শ—তাদের ঘুরে বেড়ানো থেকে বিরাম এবং মরুর দহনকারী সূর্য থেকে ছায়া—এই আদর্শ এবং তাদের নিজস্ব জন্মস্থানের প্রাকৃতিক নির্দেশ নয়, যা হয়ে উঠেছে এইসব মুসলমানধর্মী ভারতীয় লেখকদের জীবন ও নির্বাচনের পিছনের নির্দেশক শক্তি। আর তবুও মৃত্তিকা সম্বন্ধে তাদের সকল পুরাতন কাব্য প্রকাশিত হয় তারা যে স্থান নির্বাচন করে তার মধ্যে। গ্রাম্য-কুঞ্জে কবর, নদীর বাঁকে তাজ, কাশ্মীরের পাহাড়ে ও নদীর ধারে বৃক্ষশাখা আচ্ছাদিত সমাধিস্থান, কী সুন্দর ছবি তারা সৃষ্টি করে ঊষায় ও সন্ধ্যায় কিংবা দীর্ঘ ভারতীয় রাত্রিতে, যখন রহস্যময় কণ্ঠস্বরে মৃতের কাছে দীর্ঘশ্বাস ও অস্ফুট উক্তি শোনা যায়। এইভাবে নিশ্চিতরূপে ভারত নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে যাজকীয় ঐতিহ্য যুক্ত করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, দরিদ্র নয়, সেই বস্তুতে যা মানুষের প্রকৃত সম্পদকে গড়ে তোলে।

তীর্থযাত্রীদের তাঁবু হচ্ছে ঠিক যেন মধ্যযুগের কোন চিত্র। কিংবা তা ঠিক তেমনি ধরনের হয়ে উঠবে, যদি তার সামরিক পদার্থগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নাগারা বা অস্ত্রধারী সন্ন্যাসীরা বর্তমান ব্যবস্থায় কোন কিছুর ভীতিদায়ক নয় যা প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং যে কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করে ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে, তাকে বরং খোঁজা হবে নগ্নদৃষ্টিতে যাকে শক্তিশালী বলে বোঝা যায় তার চেয়ে বরং এক নিরস্ত্র জেলা অফিসার বা তহশীলদারের মধ্যে। দক্ষিণ দেশে, যা হচ্ছে সংকীর্ণতার ঘাঁটি, রেলপথের প্রসারের সঙ্গে দলবেঁধে

তীর্থযাত্রা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কম লোকই, বিশেষ করে খুব কম বিধবারাই, বারাণসী পরিদর্শন করে, যখন থেকে তা করা সহজ হয়ে গেছে। আর বাষ্পীয় শকটপথ থেকে দূর দূর কোন স্থানে মন্দির দর্শনার্থীর ভিড় যারা দেখেছে, তারা বিস্মিত না হয়ে পারবে না যন্ত্রযান দর্শনে তাদের পবিত্র ভাব কী ভীষণ ধাক্কা খায় তা দেখে। পুণ্যকামী ভ্রমণকারীদের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যা আশা করবার অধিকার আছে, তা হচ্ছে প্রকৃত পরিবেশরূপে নতুন ভারত থেকে প্রাচীন ভারতে গমনের সুযোগ। অনেকগুলি পথ যেখানে মিলিত হয় এবং তীর্থযাত্রীদের নানা ধরনের স্রোত যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তার যে কোন বিন্দু থেকে তীর্থস্থানের পথটি একদিনের গমন পথের নিয়মিত পরিমাপে বিভক্ত হবে এবং প্রতিটি বিরতিস্থানে রাত্রির জন্য তাঁবু খাটানো হবে। এমন কি এই বিশ্রামের তাঁবুগুলিও যতদূর সম্ভব সেই স্থানগুলিতে খাটানো হবে, যেগুলি তাদের সৌন্দর্য বা গুরুত্বের জন্য বিশিষ্ট। সেখানে কি ঝর্ণার জল আছে? স্থানটিকে পবিত্র বলা হয়, আমরা পূজার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে থামব। আসলে এগুলি ছিল শুধু সৌন্দর্য ও সুবিধার জন্য, কিন্তু কালক্রমে নিঃসন্দেহে কিছু অন্তর্দৃষ্টি ও ভক্তির আবহাওয়া তার জ্যোতি প্রকৃতপক্ষে ছড়িয়ে দিয়েছে স্থানটির আবহাওয়ায় এবং যেখানে এতখানি সরল বিশ্বাস তার উল্লাসকে প্রকট করেছে, সেস্থানে আজ প্রেম ও প্রার্থনা সকল আগন্তুকের কাছে সহজতর হয়েছে।

তারপর সব মন্দির পরিভ্রমণ শেষ, স্নানকার্য অনুষ্ঠিত, সান্ধ্যপূজা পরিসমাপ্ত, তখন নিস্তব্ধতা ও নিদ্রা নেমে আসে তীর্থযাত্রীর তাঁবুতে। চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করে, ... আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হবে পঞ্চদশ দিবসে। আবার এই নিয়ম নির্ধারণ করেছে পৃথিবীর সহজ সৌন্দর্য, যে নতুন চাঁদের সঙ্গে পথ চলা শুরু হবে এবং ক্ষয়প্রাপ্তির সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্তন। চাঁদ পূর্ণতার কাছাকাছি আসে এবং ক্লান্তি তীর নিদ্রামগ্ন। কটার সময় প্রথম তাঁবু গুটানো হয়? কখন প্রথম নিদ্রিত নিজেকে জাগরিত করে এবং আবার পথে নামে? কে বলতে পারে? নিশ্চয় সে নয়, যে কখনও এত ভোরে উঠতে পারেনি, যাতে অন্যেরা তার আগে উঠে যাত্রা শুরু না করতে পারে, তাদের তাঁবুগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং রান্নার আগুনের সাদা ছাইয়ের স্তূপ শুধু তাদের বারোঘণ্টা গাছের ছায়া বা নদীর ধারের প্রজাস্বত্ব গ্রহণের একমাত্র চিহ্ন।

গমনকালে যাত্রীরা একা বা দলবদ্ধভাবে হাঁটে। বয়সের ভরে নত বৃদ্ধারা লাঠির ভরে গুটি গুটি চলে। সব ধরনের সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। তাদের মধ্যে কেউ ভস্মাবৃত, মাথায় লম্বা লালচে চুল, পরণে শুধু গেরুয়া কৌপীন, হাতে নানা ধরনের চিমটা ও ভিক্ষাপাত্র। এঁরা যোগী হতে পারেন সেই সম্প্রদায়ের, যাঁরা দৈহিক কৃচ্ছ্রে বিশ্বাস করেন ... সংগ্রামী সন্ন্যাসী নাগারা, যাঁরা নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য একদা প্রতি মুহূর্তে মরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন এবং যাঁরা আজও শক্তিশালীভাবে সংগঠিত জগতের অন্ধকতার সম্মুখীন হতে, কিন্তু হায়, সেই জগৎ বহুদিন হলো স্বপ্নের মতো মিলিয়ে

গেছে। আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষিত সন্ন্যাসীরা, পবিত্র গেরুয়া বসনে ভদ্রভাবে সজ্জিত, খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছু ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, ধাতু মুদ্রার স্পর্শ প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরাও সানন্দে পদব্রজে এখানে দূরত্ব অতিক্রম করছেন। তারপরেই হয়তো এক যোগীকে দেখা গেল, বহু বৎসর-অব্যবহারে শীর্ণ হস্ত ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে আছে। আবার কোন বিত্তশালী মঠের গর্বিত মোহন্ত, বহু হাতির ও অগণিত সম্পদের মালিক, অন্যদের দ্বারা বাহিত হয়ে চলেছেন। কিংবা আরোহণ কালে যদি কেউ খোলা ডাণ্ডী পরিত্যাগ করে, যা এই পার্বত্য পথে বাহকদের অসহনীয় পরিশ্রমের কারণ হয়, তাহলে সে দু-একজন 'নগ্ন সন্ন্যাসী'র সঙ্গে সহৃদয় আলাপে মগ্ন হতে পারে—এই নগ্ন সন্ন্যাসীরা অঙ্গে প্রয়োজনীয় সামান্য এক টুকরা কাপড়ের বেশী কিছু বা ভস্মও ধারণ করেন না, যাঁরা রৌদ্রকরোজ্জ্বল মরুভূমি ও তুষারমণ্ডিত পর্বতমালার মধ্যে উষ্ণতা ও শৈত্যে সমান উদাসীন ভাবে ভ্রমন করেন এবং যাঁদের সঙ্গে কথা বললে কারও অন্য কিছু আর মনে আসবে না, শুধু এই ছাড়া যে এখানে রয়েছে পণ্ডিতদের ও ভদ্রবংশজাত ব্যক্তিদের বন্ধুবর্গ।

কিন্তু তীর্থযাত্রী জনতা আরও বেশি বৈচিত্র্যময়। আশ্রয়স্থানে নানা আকারের ও অবস্থার তাঁবু পাশাপাশি দেখা যাবে। কোথাও আবার পর্দানসীন মহিলারা লাল ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কীতে চলেছে, আবার অন্য স্ত্রীলোকরা অশ্বপৃষ্ঠে, নারী ও পুরুষেরা সমানভাবে পদব্রজে বা খোলা ডাণ্ডীতে, গৃহস্থরা, বিধবারা অক্ষমালা ও গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা, আবার এমন কেউ আছে যারা পায়ে হাঁটা বা পাহাড়ে চড়ার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল, তারা বেতের চেয়ারে বাহিত হয়, চেয়ারটি শক্ত ডাণ্ডাধারী এক মানুষের পিঠে বাঁধা থাকে। এই অদ্ভুত দল ক্রমশই এগিয়ে চলে, এদের সঙ্গে মিশে থাকে মুসলমান মালপত্র-বাহকরা ও ভৃত্যেরা, রাঁধুনীরা আর নানা ধরনের খাদ্য বিক্রেতারা।

কোথাও পথ হিমবাহে ভগ্ন হয়েছে। সেখানে ভয়ঙ্কর এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের মধ্যে শুধু ছাগল-চলার মতো পথ বেয়ে যেতে হয়। কোথাও এক হ্রদ, যার মধ্যে তুষার নদী তার জয়গানের সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছে একদা গুহাভিমুখী সহস্র তীর্থযাত্রীর অবশিষ্টাংশকে। এবার আমরা সেই উচ্চতায় পৌঁছালাম যেখানে পদতলের জমি ঘাসের বদলে শ্যাওলায় মোড়া। আবার আমরা ভ্রমণ করি ফুলের অরণ্যের মধ্যে, কয়েক গজ অন্তর অলক্ষ্যণীয়ভাবে বর্ণবিন্যাসের প্রধান রঙটির পরিবর্তন ঘটছে, প্রথমে হরিদ্রাবর্ণের ওয়াল-ফ্লাওয়ার, পরে অগ্নিবর্ণের আইসল্যাণ্ড পপিরা, তারপর হিমালয়ের দীর্ঘবৃন্তের এক মাথাওয়ালা মাইকেলমাস ডেজি। যখন যাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল তখন শুধু মেডন-হেয়ার ফার্ন অঞ্চলের বৃক্ষকাণ্ডে আর্কিডগুলি প্রস্ফুটিত ছিল। এখন আমরা শেষ পাইনের জঙ্গল পেরিয়ে এলাম। এমন কি পর্বতগাত্রের গলিত রূপা-বর্ণের শিরাযুক্ত সাদা বার্চ গাছগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং আজ রাত্রে যখন সাদা ও লাল অ্যানিমোনের জঙ্গলভরা ভূমিতে তাঁবু ফেলা হবে তখন পাহাড়ের গায়ে আশ্রিত কুলুঙ্গিতে আটকে থাকা জুনিপারের ক্ষুদ্র ঝোপগুলি ছাড়া কোন জ্বালানী কাঠ পাওয়া

যাবে না। শেষ তুষার নদীর তীরে জেনসিয়ানের পাশে জমানো এক চিরহরিৎ 'ফরগেট-মি-নট' ফুল আমরা দেখতে পেলাম, যা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা ছিল, তৃতীয় বা চতুর্থ নতুন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত—বড় ক্রিমশন থেকে পার্পল মিয়োসটিস পর্যন্ত—যা আমাদের যাত্রাপথে পড়ল।

আমাদের চারপাশের তাঁবুর মধ্যের প্রতিবেশীরা সম্ভবত উদ্ভিদবিদ্যায় নিজেদের নিমগ্ন রাখেনি, তারা কিন্তু আমাদের চেয়েও প্রকৃতভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধন করছিল। মন্দিরের কাছাকাছি এসে শেষ দিনটিতে আমরা তাদের দেখি নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বড় নতমুখী কলম্বাইন ও ছোট আলপাইন গোলাপ পর্বত থেকে সংগ্রহ করতে। তাদের কথাবার্তা সবই ছিল শিবকে নিয়ে। তারা যত এগিয়ে এসেছে, নিঃসন্দেহে তারা ততই চেষ্টা করে চলেছে তাঁর নামোচ্চারণে কিংবা তাঁর রূপ-চিন্তায় নিজেদের মনকে নিবদ্ধ করতে। আর তাদের চারপাশের উচ্চতার ভয়াবহ গুরুত্ব ও সৌন্দর্য তাদের চিরকাল স্মরণ থাকবে মহাদেবের উপযুক্ত বাসস্থানরূপে। তারা যেন এক চার্চের মধ্যে। প্রস্তরস্তূপ ও হিমবাহ গঠন করেছে 'স্যাংচুয়ারী', বরফ ঢাকা গিরিপথ হচ্ছে চার্চের থামওয়ালা 'আইল'। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পাইন গাছের সারি পতাকাধারী গায়কদলের শোভাযাত্রার মত এবং মাথার উপরের আকাশটি যেন ক্যাথিড্রালের ছাদ। প্রাচ্যের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপাসনাস্থানের সঙ্গেই শুধু আমরা যে মনোভাবকে যুক্ত করি, তাকে সমস্ত প্রকৃতির উপর আরোপ করা। কিন্তু এই কারণে কি তাদের ভালবাসা কম বা বেশি সত্যি ?

পূর্ণিমার দিনটি আসে, শেষ ও সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক স্থানগুলি অতিক্রম করা গেছে এবং মন্দিরেও পৌঁছানো গেল। সেই পুরুষ বা নারী সুখী, যে ঈশ্বরের কাছে এই তীর্থযাত্রায় জীবন বিসর্জন দেয়। একটি ভুল পদক্ষেপ, আর তাহলেই দেবদর্শনের জন্য যে আত্মা ব্যাকুল হয়েছিল সে তৎক্ষণাৎ নিশ্চিতভাবে ঊর্ধ্বে গমন করবে। কিংবা মৃত্যু অন্যভাবেও আসতে পারে। 'কি সুন্দর! আমি এর সঙ্গে এক হয়ে যাব!' গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি নীচে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। আর কেউ তাকে নিবৃত্ত করার আগেই সে চলে গেল। এ রকম ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত নয়। আত্মা প্রকৃতই এক স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ লাভ করে, যখন সে শুনতে পায় তার প্রতি অনন্তের আহ্বান এবং অকস্মাৎ দেহ-কারাগার তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। এটা কি হিন্দুসমাজের কলঙ্ক যে মনের এই অপ্রকৃতস্থানে সে কখনও 'আত্মহত্যা' বলেনি ?

কিন্তু মন্দিরটি—কোথায় সেটি ? কী সেটি ? হয়তো কোন গিরিখাতের উপর, কোন প্রশস্ত শিলার উপর অবস্থিত, সহোদরাসমা তুষারকণার কাছাকাছি। হয়তো কোন পবিত্র নদীর উৎসমুখে। হয়তো এক গুহা, যেখানে অবিশ্রাম জলবিন্দু ঝরে পড়ে সৃষ্টি করে বরফের এক 'স্ট্যালাগমাইট', এক বিরাট কৈলাসিত শিবলিঙ্গ, যা কখনও

গলে না। যে কেউ কল্পনা করতে পারে এমন ধরনের স্থান প্রথমে কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কোন এক গ্রীষ্মের দিনে একদল মেষপালক তাদের মেষপালসমেত গিরি-কন্দরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল আর ঘটনাচক্রে তারা এই গুহায় ঢুকে পড়ে দেখতে পেল স্বয়ং মহাদেবের উপস্থিতি। মানুষের দল ও পশুর দল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থনারত এই চিত্রটি খ্রীষ্টান-হৃদয়ের কত প্রিয়।

উপাসনা। উপাসনা। বাতাস প্রার্থনা ও স্তব-স্তোত্রে ভরা; মিথ্যা মায়া থেকে সত্যে। বহুত্ব থেকে একত্বে। প্রাণীদের ঈশ্বর। ক্লান্তদের আশ্রয়। শিব। শিব। মুক্ত। মুক্ত।

ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। পরদিন প্রভাতের আগেই উপত্যকায় অবতরণ শুরু হয়ে গেল। উচ্চ গিরিপথের তুষার-শুভ্রতা বিস্ময়কর। যখন আমরা গৃহাভিমুখী হই, চন্দ্র আমাদের পিছনে বিলীন হয়ে যায় এবং সম্মুখে সূর্যোদয় হয়। যাত্রীদল এখন আগের মত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলে না। সকলেই ফেরার জন্য ব্যগ্র, কেউ কেউ এগিয়ে যায়, আবার কেউ যাত্রা-পথরেখা থেকে বিচ্যুত হয়। আমরা আমাদের গ্রামে পৌঁছাই এবং তীর্থযাত্রায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের বিদায় জানাই, তাদের আরও দূর যাত্রাপথে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারি তা দিই। রাত্রিগুলি এখন অন্ধকার হয়ে ওঠে এবং বিরাট অভিজ্ঞতাটি হয়ে ওঠে এক স্মৃতি, হিন্দুর জীবনে সর্বদা যাহোক চিহ্নিত হয়ে থাকে কোন এক বিশেষ ত্যাগের দ্বারা, যা এরপর থেকে পালন করা হয় যাত্রীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনস্বরূপ।

এটি বিশ্বাস করা সহজ যে আমরা যে দৃশ্যাবলীর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলাম বর্তমান-কালে তার প্রকৃত পদার্থের অর্ধেক অন্তর্হিত হয়েছে, যা এককালে ছিল যখন যাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় যেমন ছিল তেমনি ছিল তাতার বা চীনা। মন্দিরটি ছিল তারই প্রতিভূ যে স্থানটিতে বিরাট অভিযাত্রীদলের গ্রীষ্মকালীন মিলন ঘটত; এই ধরনের কোন তীর্থ-ভ্রমণে হয়তো প্রথম তীর্থযাত্রী হয়েছিলেন নাগার্জুন ও বোধিধর্ম তাঁদের ভারতীয় চিন্তার রত্নসামগ্রী নিয়ে। এমন কি এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কার্যই এই ধরনের বিরাট সম্মেলনে দেখা যায়। শত শত, এমন কি সহস্র সহস্র ধার্মিকব্যক্তিরা মিলিত হন, তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ভুলে যান এমন আচরণের মধ্যে এবং তাঁদের জীবনের আদর্শ ও জ্ঞানের দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তাদের প্রাণবন্ত করে তোলেন।

সাধুদের বিরাট সমাবেশ, যা প্রতি বারো বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় হরিদ্বারে, নাসিকে, উজ্জয়িনী ও এলাহাবাদে। শিক্ষিত সমাজের নির্দিষ্ট মিলনস্থান আছে, যেখানে শত শত বছর ধরে হিন্দু দর্শন আলোচিত, নির্ধারিত ও পরিবর্ধিত হয়ে আসছে, অনেকটা ওয়েলস ইস্টেড্‌ফাডের প্রথা মত। ভারতের প্রতি অংশ থেকে ভ্রাম্যমান সাধুরা এখানে আসেন। এখানে গৃহী খুঁজে পায় তার ধর্মের সঙ্গে শক্তিশালী ও পুনর্নবীকৃত সম্পর্ক। এখানে বিদ্যা ও ভক্তির নবীন কণ্ঠস্বর সক্ষম হয় তাদের জন্য আধ্যাত্মিক অধিকার অর্জন করতে।

এই রকম সব সুযোগের মধ্যে দিয়েই শঙ্করাচার্য হিন্দু জ্ঞানের জগতে তাঁর অবিসংবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি এ রকম চিন্তা কি আলেকজাণ্ডারের জেগেছিল যে শিক্ষিত গ্রীকদের এই সব ভ্রাম্যমান কলেজগুলিতে প্রেরণ করা যেতে পারে নতুন কিছু শোনার ও বলার জন্য ?

সংস্কৃত হচ্ছে এই প্রাচীন বিদ্যার প্রধান ভাষা। আজও কোন পরিদর্শক কলকাতার টোলে গেলে শুনতে পাবে ছাত্রেরা বহু পুরাতন কোন বিষয় নিয়ে প্রাচীন ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করছে এবং সে মনে মনে নিজেকে ভাবতে পারবে যেন বহু কাল আগের এথেন্স বা থিবেসের কোন বিদ্যালয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু এই বিরাট সম্মেলনগুলিই হচ্ছে সেই গৌরবজনক সাফল্য যার প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে ওই ব্রাহ্মণ বালকগুলির দৃঢ় বাসনাগুলি। আর এই ধরনের কৃতিত্বের প্রতি তাদের উৎসাহ দেখে আমাদের বিস্মিত হবার কিছু নেই। সহস্র বৎসরের শিক্ষার মর্যাদা নিয়ে বিরাট উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, ঠিক যেন ইউরোপের কোন শহরের সকল বিদ্যাসমিতিগুলিকে একত্রিত করে ফেলা হয়েছে। নাসিক বা এলাহাবাদের কয়েক সপ্তাহের তাঁবু-নগর লণ্ডনের বার্লিংটন হাউসের সকল উদ্দেশ্যই সাধন করে। কিন্তু বলা হতে পারে যে, নাসিকের ওই সংস্কৃতি-ব্যবস্থা আর বিকশিত হয়ে উঠবে না। বাস্তবিক সেটি এর দোষ। উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ এখনও পর্যন্ত হিন্দুজগতে চরম জাতীয় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা হচ্ছে তাদের দর্শনের ভাণ্ডারে তাঁর সংযোজনের ক্ষমতা। কিন্তু এটি এই পর্যন্ত সত্য যে সমষ্টিগত চিন্তার পক্ষে আবিষ্কার করার মত আর কিছু বাকি নেই। ভারতের সাধারণ মনকে এখন মেরুপ্রদেশের তুষারাঞ্চলের মতো অনাবিষ্কৃত জগতে বুদ্ধির অভিযানে বৃহৎ চক্রে পরিভ্রমণ করতে হবে নতুবা ভারতবর্ষের মৃত্যু হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

পণ্ডিত সন্ন্যাসীদলের হট্টগোল থেকে বহু দূরে, কিংবা তাঁদের মধ্যে সাদা সুতির পোশাকে আগন্তুকরূপে নগণ্য স্থান গ্রহণ করে থাকেন সেই সব মানুষেরা, যাঁদের জীবন অতিবাহিত রাজা-মহারাজাদের গ্রন্থাগারে। ভারতীয় বিদ্বৎ-জীবনের অঙ্গই হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা, আর যেমন জাপানী দাইমিও বা ইতালীয় প্রিন্সরা তাঁদের শিল্পী ও কারিগরদের ভরণপোষণ করতেন, ঠিক তেমনি প্রাচীন রাজত্বকালে প্রতিটি ভারতীয় রাজপ্রাসাদে থাকতেন রাজপণ্ডিতের দল—সেই মানুষেরা, যাঁদের জীবনকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা হয়েছিল, যাতে তাঁরা জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেন এবং প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চা করতে পারেন।

মহৎদের পরম অধিকার হচ্ছে পবিত্রতা ও জ্ঞানকে পালন করা। কিন্তু অন্য দিকে মনু এটাও নির্দেশ দিতে ভোলেননি যে আইনসম্মত নৃপতি ব্যতিরেকে অন্য কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করার চেয়ে বড় অপরাধ আর ব্রাহ্মণের নেই। আর শুধু রাজাদেরই পণ্ডিতদের ভরণপোষণের কর্তব্যভার দেওয়া হয়নি। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কোন বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে না টোলে ও পণ্ডিতদের

মধ্যে দান বিতরণ বিধা। কারণ নীতিশাস্ত্রের স্বীকৃতিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম—অতএব প্রাচ্য অর্থনীতিরও,—যে সকল বৃহৎ সঞ্চয়ই হচ্ছে পরবর্তী বৃহৎ বিতরণের জন্য।

তীর্থ ভ্রমণের এই তাঁবু-নগরে এক আশ্চর্য জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। খুব কম সময়েই দেখা যাবে যে কোন দুটি তাঁবুর বাসিন্দারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারছে এবং আমাদের আহার্য চাইতে হলে ইংরাজির চেয়ে সংস্কৃতে চাওয়া ভাল। আপাতত মালাবারী ও বাঙালী, শিখ ও মাদ্রাজী, মারাঠী আর এমন কি মুসলমানরাও পাশাপাশি বাস করছে। প্রভেদ ও অসঙ্গতি কি এর চেয়ে বেশি বর্ণনা করা যায়?

কিন্তু যতই আমরা দেখলাম, ততই অনৈক্য নয়, ঐক্যই আমাদের মনে দাগ কাটল। আস্তানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই ধরনের সরল জীবন-যাত্রা, স্নান ও আহার সম্বন্ধে একই রকম শুদ্ধাচার, একই শিষ্টাচার ও ভদ্রতা, একই ধরনের চেহারা ও চরিত্র এবং সবার উপরে চিন্তা ও উদ্দেশ্যের একই পরিকল্পনা।

আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় হতে পারে, কিন্তু যে কোন তাঁবুর দ্বারে আমরা যদি কান পেতে দাঁড়াই, তাহলে দেখব বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধরন একই রকমের—প্রায়ই সাধুদের জীবন, প্রায়ই আত্মার মহিমা, সর্বদাই গুরু ও ধর্মের প্রতি অচল ভক্তি। দুটি নিয়ম দ্বারা, শুধু দুটি,—ত্যাগ ও স্বার্থ থেকে মুক্তি—জীবনের সমস্ত অর্থ এ দিয়েই বোঝানো হয়ে থাকে।

অন্যান্য দেশ জন্ম দিয়েছে শিল্পের, বীরত্বের, বীরগাথার, আবিষ্কার—প্রথার। এর কোনটিতেই ভারতবর্ষ একবারে পিছিয়ে নেই, তবুও কোনটিই ভারতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। তাহলে জগৎকে সে কী দিয়েছে, যা সকল প্রতিযোগিতার অতীত? বর্তমানে তার অবদানকে সবাই তাচ্ছিল্য করে, কারণ আজ শক্তিময়ী মাতা অনাথিনী ও দীনহীন হয়েছেন। যে তার বন্দরগুলি সকল আশ্রয়প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত রেখেছিল, বর্তমানে সে তার নিজের সন্তানদেরই আহার জোগাতে অক্ষম। যার কাছে পার্শী, ইহুদী ও খৃষ্টানরা আশ্রয় পেয়ে কৃতজ্ঞ, সে আজ ওই তিনজনের দ্বারাই নিন্দিত ও নির্বাসিত। যে তার সব সম্পদের উপরে জ্ঞানের স্থান দিয়েছে, এখন সে দেখছে যে তার বিদ্যার জগতে বাজারে কোন দাম নেই। এটা বলা হচ্ছে যে জাগতিক বস্তুর প্রকৃত কদর বোঝা যায় প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষায় এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পের মধ্যেই মুক্তিলাভ করাই হচ্ছে প্রাচীনকালের জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান, আদর্শের জন্যই আদর্শ এই কাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক মূল্যবান লক্ষ্য, যাতে পৌঁছানোর জন্য তার সন্তানদের প্রচেষ্টা করা দরকার।

আর আধুনিক জগৎ হয়তো ঠিকই।

কিন্তু তাহলেও প্রাচীনকালে ভারত কি কিছুই দেয়নি, যা নাহলে আমাদের সমস্ত বর্তমানই আজ দরিদ্রতর হতো?

ভারতবর্ষের নামের অর্থ কী, তার মৃদু গুঞ্জনও যে শুনেছে, সে কি এমন কথা বলতে পারে ? প্রথাগুলিকে সর্বদা উন্মুক্ত দ্বারের মত রাখা হয়েছে, যার দ্বারা সাধকেরা আমাদের সম্প্রদান করতে পারেন, চিন্তাকে এমন স্তরে তোলা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম এক হয়ে গেছে, সূক্ষ্ম সম্বোধন ও জগৎ-আলোড়নকারী প্রার্থনার ধাঁধা, সবার উপরে বিরল স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা—এ সবগুলি কি কিছু নয় ? তা সত্ত্বেও যদি মানবিক প্রচেষ্টার শেষ লক্ষ্য হয় মানুষের উচ্চতর রূপান্তর, তাহলে কোনটি তার অস্তিত্বের অধিকারকে গভীরতর-ভাবে মর্যাদা দান করেছে—ব্যবসা ও অর্থের আধুনিক সম্পর্কগুলি, না সেই প্রাচীন জগৎ, যা আমাদের তীর্থযাত্রীদের আস্তানায় নজরে পড়েছে ?

ষোড়ষ অধ্যায়

সময়ের বয়নযন্ত্রে

এশীয় ও ইউরোপীয় ধরনের দেশগুলির মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি এখনও পর্যন্ত খুব কমই বোঝা যায় এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে ইংরাজি ভাষায় এমন বস্তুর অভাব যাতে সামাজিক পরিমাপের বিস্তৃত শক্তি রূপ ধারণ করেছে। অগাস্ত কোঁতের শিষ্যেরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও ধারণাকে জনপ্রিয় করার জন্য যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু এই কর্তব্যের সকল প্রয়োজনকে মেটানোর জন্য দেবদূতের হৃদয় আর কবির মুখর রসনাও অপ্রতুল।

উদাহরণস্বরূপ, 'থিয়োক্র্যাসি' শব্দটি, যেটি এশিয়াকে ঐতিহাসিকভাবে বা রাজ্যগতভাবে বোঝার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার ইংরাজি অর্থ কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক। শিক্ষিত অস্তিবাদীদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে 'ধর্মের উপর গঠিত সমাজ-ব্যবস্থা' ; অশিক্ষিতের কাছে এটি বোঝায় স্বর্গীয় রাজত্বের কোন উদ্ভট পরিকল্পনা, যেমন সলের আমলের আগে ইস্রাইল সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা কিংবা ওলিভার ক্রমওয়েলের স্বপ্নে ইংল্যাণ্ড ছিল।

দ্বিতীয় ভাবধারায় যে ব্যক্তিরা চিন্তা করেন তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ হচ্ছে থিয়োক্র্যাসি এবং বর্তমানে এটি ব্রিটিশরাজের দ্বারা অধিকৃত, এই দুটি বিবৃতি মনে হবে অসঙ্গতি-পূর্ণ। এটি স্পষ্ট যে বাস্তব দৃষ্টান্তগুলির বিশদ ও গভীর জ্ঞানই শুধু আমাদের মনে থিয়োক্র্যাটিক ব্যবস্থার এমন ধারণা গড়ে তুলতে পারে, যা আমাদের শক্তি দেবে শব্দটি বিশুদ্ধভাবে ও বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করার, যেমন আমরা বর্তমানে আরও বেশি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক শব্দগুলিকে ব্যবহার করার উপযুক্ত বলে নিজেদের বোধ করি। আর এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে কাছে আছে সেটিকেই প্রথমে নেওয়া ভাল।

জগতের ইতিহাসে রোম-নগরী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, প্রতীচ্যের সূতিকাগার এবং দুটি বিরুদ্ধ শক্তির—রাজশক্তির ও ধর্মশক্তির—রণক্ষেত্র অথবা যা তাদের অভিহিত করতে অনেকে ইচ্ছা করেন, ইউরোপীয় ও এশীয় ভাবধারা। কারণ রোমই পাশ্চাত্যের উপর প্রথমে আরোপ করেছিল সেই সংগঠিত শক্তির ভাবটি, যাকে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সব কিছুই। আর মধ্যযুগের সব কিছু দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বর্বর জাতির শক্তির মাধ্যমে রোমীয় উদ্দীপনাই কাজ করে যাচ্ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার পূর্ণ বিজয়লাভের দিকে। সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার চিন্তা সিজার করেছিলেন, নেপোলিয়ন সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁরা যা দেখেছিলেন ব্যষ্টিরূপে আলেকজাণ্ডার হয়তো তা দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু গ্রীস এশিয়ার অত্যন্ত কাছে এবং তার সামরিক পরিকল্পনাগুলি তাদের কালেই মিলিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু পণ্ডিতসুলভ গবেষণায় ও আগ্রহকর ভাবধারা বিনিময়ে।

রোমের উপরই ভারটা পড়েছিল সূক্ষ্মভাবে সুনির্দিষ্ট করে সেই ভাগ্যকে ব্যাখ্যা করার, যা উপকূলরেখার অধিবাসীরা বোধহয় এড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতিকে প্রতিদিন জয় করার ফলে তারা সংগ্রামীভাবাপন্ন, তাদের জীবনযাত্রার ধরনই তাদের অভিযান-উন্মুখ করে তোলে। কারণ ইউরোপীয় ধারণায় সাম্রাজ্য হচ্ছে একবারে পৃথক বস্তু, এক অদ্ভুত শক্তিশালী সেনানায়কের অধীনে প্রাচ্যের একদল লুণ্ঠনকারীর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। রোম স্থাপন করেছিল এবং আধুনিক ইউরোপ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল সেই ভাব, যাতে একজাতি অন্যজাতিকে শোষণ করে আইনের সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ অধিকার দ্বারা বাহ্যিক শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে, যা শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচিতদেরও প্রতারণা করে।

সিজাররা ব্যর্থ হয়েছিলেন সেই বস্তুগুলিকে আত্তীকরণের শক্তির অভাবে, তাঁদের সাম্রাজ্যকে যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নেপোলিয়ন ব্যর্থ হয়েছিলেন কারণ যাদের তিনি সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন, তারা আত্তীকরণের পক্ষে যেমন অনুকরণের প্রতিক্রিয়াতেও তেমন শক্তিশালী ছিল। বর্তমানে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আট-দশটি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি বা রাজকুমার, যারা আপাদমস্তক অস্ত্রে সজ্জিত, সকলেই দুনিয়াটিকে দখল করার জন্য ব্যগ্র। এখনও রোমীয় সাম্রাজ্য কিন্তু এটিই হচ্ছে।

অথচ রোম নিজেই হচ্ছে সেই চরিত্র নাটকে যার ভূমিকাটি একবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কারণ কেউ আর এখন তাকে মনে করে না ইতালীর শিশুরাজ্যের রাজধানীরূপে। মানবের কল্পনায় সে আজও ধর্মীয় শহর। সেণ্ট পিটার ও ভ্যাটিকান আজও তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। পোপ এখনও শাসন করেন। তার এই প্রথম ও দ্বিতীয় রূপের বৈপরীত্য সেই রূপান্তরের চেয়ে বেশী বিস্ময়কর, যাতে এক দস্যুসর্দার হয়ে ওঠে সাধুভাবাপন্ন পূর্বপুরুষ। এটি ঘটবার আগে, এটিকে

হার চেয়ে বেশী অদ্ভুত মনে হতে পারত, যেমন অদ্ভুত আজকের দিনে যদি প্রস্তাব করা যায় যে অক্সফোর্ড বা বারাণসীর নামটির সমার্থক হোক ব্যবসা-বাণিজ্যের নোংরা প্রতিযোগিতা। কারণ গৌরবমণ্ডিত অজেয় রোম প্রকৃতপক্ষে বিজিত হয়েছিল প্রাচ্যের ভাবধারাগুলির দ্বারা। দরিদ্র ও নীচবর্ণ তাকে অকস্মাৎ অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর থেকে ইউরোপে তার কণ্ঠস্বর আর কর্তৃত্বের ছিল না, ছিল বৈরাগ্যের; আক্রমণের গুরু নয়, আত্মত্যাগের; তার পদমর্যাদায় ও অধিকারে রাজকীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু রাজাদের চেয়ে প্রজাদের আরও গভীরভাবে প্রকৃত বন্ধু। তারপর থেকে বিশেষ অর্থে যারা তার সন্তান, তারা সংসার থেকে নির্জনে বাস করবে, সম্পদের পরিবর্তে দারিদ্র্যকে বরণ করে নেবে, অসংযমের বদলে আত্ম-নিগ্রহকে মেনে নেবে, নারী ও পুরুষ পৃথক থাকবে, যেমন প্রাচ্যের পরিবারে থাকে। প্রতিটি সহজ কার্য যা সে উপভোগ করে, তার অন্তর্নিহিত মূল্যের অনুপাতের বাইরে এক পবিত্রতাও থাকবে। তার আচরণগুলি হয়ে উঠবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তার ভ্রমণগুলি হবে তীর্থযাত্রা। তার নির্দেশিত জীবনের তুচ্ছতম বিধিগুলি এখন হবে শাস্ত্রীয় কার্যাবলী। তার ক্ষমার অভিব্যক্তি হবে মুক্তি, তার স্নেহ এক আশীর্বাদ। তার শাসকেরা নিজেদের উচ্চপদের জন্য কোন ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করবে না, কিন্তু নিজেদের ঘোষণা করবে স্বর্গীয় ইচ্ছাপূরণের নিমিত্তমাত্ররূপে। জগতের কাছে তাদের সবচেয়ে গর্বজনক উপাধি হবে 'ঈশ্বরের সেবকদের দাস'।

তারপর থেকে চার্চের চোখে সব মানুষই সমান, যতক্ষণ না একজন নিজেকে সেন্ট ও অন্যজনে নিজেকে জুডাসে রূপান্তর করছে। জগতের প্রতিষ্ঠিত পদমর্যাদার প্রভেদ তার কাছে কিছুই নয়, এমন কি চার্চের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন বিভাগগুলিও তার কাছে শুধুমাত্র অবস্থার নামান্তর, যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের করুণা কার্যকর হতে পারে। বহু সন্ত অশিক্ষিত ও তুচ্ছ হতে পারেন। বহু বিশপ জঘন্যতম নরকে পৌঁছাতে পারেন। রোমে পদমর্যাদা অন্তত তত্ত্বগতভাবে কিছুই নয়। তার সন্তানরা সকলেই এক সাধারণ অলৌকিক জীবনের অংশীদার হতে পারে, যার চিহ্ন হচ্ছে একটি ধর্মীয় ভোজ। এক মহান দায়িত্ব তাঁদের উপর পড়ে, যাঁদের সেই নামের উপযুক্তভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যে নামে তাঁদের অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁদের জীবন পরস্পরের ও চার্চের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কিত, তাকে একমাত্র প্রকাশ করা যায় কিছু আদর্শের অভিব্যক্তি ও আবিষ্কারের উপযোগী পরিভাষায়, যা 'শাস্ত্র' নামে পরিচিত কর্তৃত্বময় রচনায় বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে এবং তার চেয়ে কম শক্তিশালী ও কম স্পষ্ট-ভাবে আছে গৌণ রচনা ও উপদেশাবলীতে, যাকে বলা হয় 'ঐতিহ্য'।

অন্যভাবে বলা যায়, সাম্রাজ্য-শহর নিজেকে রূপান্তরিত করেছে বিশুদ্ধ থিয়োক্র্যাসিতে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি আমরা জন্মের ভাবটি মুছে দিই এবং তার বদলে অন্য কোন নির্বাচিত স্থানের ও জাতির জন্মগত ভাবটি এনে বসাই,

অন্য সব কিছু প্রায় একই রকম রেখে দিয়ে, তাহলে চার্চ আবার পুনর্গঠিত প্রাচ্যের এই আধ ডজন দেশগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে—প্রাচীন মিশর, জুডিয়া, আরব, বর্তমান ভারত—ধর্মভাবাপন্ন সরকারের অধীনে। এখানেও পুরোহিততন্ত্রে সর্বশ্রেণীর উপর সমানভাবে আধিপত্য করে এবং জীবনের পুরোহিতসুলভ ব্যাখ্যাই চলে—ভ্রমণস্থান থেকে যে উপহার লোকে গৃহে আনয়ন করে, তাকে মন্দিরের প্রসাদী বলেই ব্যাখ্যা করা হয়। এখানেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে বাহ্যিক। প্রথাগুলি পবিত্র, যাতে অভ্যাসজনিত নিয়ম আইনের স্থান গ্রহণ করে, পুরুষ ও নারী পৃথক বাস করে, যেখানে সামাজিক মর্যাদার একমাত্র প্রকৃত শর্ত এবং এই ধরনের সব কিছু।

এর কারণ হচ্ছে বড় জটিলতাগুলির শুদ্ধ স্বাভাবিক চরিত্র, যা ভারতবর্ষে আমরা পাই—আমাদের কাছে এত অসাধারণ—পুরোহিততন্ত্রের শক্তির কাছে সমর্পিত এক সমাজের চিত্র, যা কোনক্রমেই শিক্ষার সার্বজনীন পবিত্রতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বোধটি হারায় না। রোমের ক্ষেত্রে, যেখানে বৈদেশিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক কৃত্রিম ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল, পুরানো সাম্রাজ্যবাদের রুক্ষ মেজাজ ধরা পড়ে গিয়েছিল মন ও চিন্তার বিরুদ্ধে, যেগুলিকে সে ধারণা করত তার কর্তৃত্বের আইনসঙ্গত ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। ক্যাথলিক ইউরোপে একজন খুব কমই বিশ্বাস করতে সাহস করত যে পৃথিবী ঘুরছে, না প্রাচ্যের বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণাগুলি উপভোগ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার হতো, গভীর সন্দেহ ছাড়া প্লেটো পড়া যেত না। ভারতবর্ষে একবারে মন্দির-সোপান থেকেই নাস্তিকতা প্রচার করা চলত। লোকে প্রচারকের কাছ থেকে একমাত্র যেটি দাবি করত, তা হচ্ছে আন্তরিকতা। খ্রীষ্টান জগতে জ্ঞানকে এত ভয় করা হতো যে, মানুষ আর কোন অপরাধ ছাড়াই এর জন্য বার বার নির্যাতন ভোগ ও মৃত্যু বরণ করেছে। ভারতবর্ষে জ্ঞানকে সর্বদাই স্বর্গীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রতি ভারতীয় ভাষায় শব্দের প্রাচুর্য প্রমাণিত করে বিদ্বানদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান। পার্শী ও ইংরাজি পুস্তকগুলিকে সংস্কৃতের মতই পবিত্র জ্ঞান করা হয়। আর আমরা সারা ইতিহাস ও ভাষার মধ্যে বৃথাই অন্বেষণ করব মানুষের মনের উপর কোন বাধা আরোপের বা আরোপ করা হবে তার আভাসের কোন চিহ্ন।

এমন কি কথোপকথনে যেটুকু অনুমতিপ্রাপ্ত তার চেয়ে বেশী ভাষায় প্রকাশের বিরক্তিকর প্রশ্নটি বহুকাল পূর্বেই দৃষ্ট হয়েছিল এবং নিয়মকানুন প্রণেতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলকে মীমাংসিতও হয়েছিল, তিনি মুখের দ্বারা অপবিত্র করার বিষয়ে তিনটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন—'পক্ষীর চঞ্চু দ্বারা, নারীর ওষ্ঠাধর দ্বারা এবং কবির কথার দ্বারা'।

প্রকৃতপক্ষে মতামত এত মুক্ত যে হিন্দুত্ব ধর্মপ্রচারে সত্যিই নিরুৎসাহিত করত, পাছে উৎসাহ বিবেচনাশক্তিকে পরাস্ত করে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। 'মানুষের নিজের বিশ্বাসে সুদৃঢ় থাকার অধিকার আছে, কিন্তু কখনও অন্যের উপর সেটি চাপিয়ে

দেবার অধিকার নেই' ; এই নির্দেশ ভারতবর্ষকে তৈয়ারি করেছে ধর্মীয় সংস্কৃতির এক নিখুঁত বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে চিন্তা ও আচরণের প্রতিটি স্তর ও বিভাগ আছে, একবারে কিণ্ডারগার্টেন থেকে, যেখানে সব কিছুই বাস্তব, উচ্চতর গবেষণার ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত, যাদের সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি আছে, যা আমাদের অনেকেই বুঝতে পর্যন্ত পারি না।

কিন্তু প্রাচ্যে চিন্তার স্বাধীনতা শুধুমাত্র ধর্মের নির্দেশ নয়। হিন্দুধর্মের যত গভীরে আমরা যাই, ততই আমরা বিভ্রান্ত হই যে এর সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক চরিত্র নিয়েও এটি কখনও সৃষ্টি করতে পারেনি পাশ্চাত্যের মত মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীনভাবের এক বৈজ্ঞানিক আন্দোলন। পতঞ্জলি, যিনি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁর মহান মনোবিদ্যা-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, স্পষ্টতই এক মনোবিজ্ঞানী ছিলেন, স্নায়ু ব্যবস্থার,—যাকে সমগ্রভাবে মন বলে তিনি অভিহিত করেছেন, সঙ্গে জীবিত দেহের সম্পর্ক নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। জীবন্ত নিউরো-সাইকোসিসের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন নিয়ে অধুনিক বিজ্ঞান, যা সন্তুষ্ট রয়েছে মনুষ্যদেহের স্থিতীয় ভাব নিয়েই বেশিটা, এখনও পর্যন্ত সাহস করেনি নাড়াচাড়া করতে এবং পতঞ্জলির শিষ্যদের বিরোধী বলা চলবে না, যদি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে যখন এই প্রশ্নে পৌঁছানে যাবে তখন তা হবে শুধু সেই প্রাচীন অনুসন্ধানকেই প্রতি পদে সমর্থন। কিন্তু পতঞ্জলির রচনার আরও বেশি আগ্রহকর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সত্য যে এক দীর্ঘ গবেষণার চরম ফল এটি, যে গবেষণা কোন একটি মাত্র ব্যক্তির দ্বারা করা হয়নি, করা হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের দ্বারা, বহু পুরুষ ধরে সমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি মানুষের পরীক্ষা এই সত্যের শর্তাধীন ছিল যে তার নিজের দেহের বাইরে কোন গবেষণাগার বা কোন যন্ত্রাদি নেই এবং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে জ্ঞান তৃষ্ণার জন্য প্রায়ই অনেক জীবন বলিপ্রদত্ত হয়েছিল। অতএব সমস্তটাই হচ্ছে কোন ইংলিশ রয়েল সোসাইটি বা কোন ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের দু-তিন শতাব্দীর সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্তসারের মতো, যার সূত্রপাত হয়েছিল দুই বা তিন হাজার বছর আগে। আর আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিভাষা যদি আমাদের কানে খানিকটা অদ্ভুত শোনায়, তাহলে সেটি সম্ভবত আমাদের শক্তি ও পরমাণু, কেমিক্যাল অ্যাফিনিটিস ও স্ফাইগমোগ্রাফিক রেকর্ডের চেয়ে বেশি অদ্ভুত নয়, যদি সেগুলিকে হঠাৎ পাওয়া যায়, ধরা যাক, দু হাজার বছর পরে মেক্সিকোর এক নতুন সভ্যতার দ্বারা।

মনোবিদ্যা সম্পর্কে যা সত্য, তা ঠিক সমান সত্য ভারতীয় গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে। প্রাচ্যের ধ্যানীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ গণিতের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয়, বিশেষ করে যেখানে অবরোহ অনুমানের প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এর মূলগত দৃঢ়তা ও মৌলিকতা এই সত্যে প্রকাশ পেল যে অত্যন্ত দুর্বোধ্য সমস্যাগুলিও হিন্দু চিন্তাবিদরা বিবৃত করলেন বাস্তবসম্মতভাবে, এমন কি

ক্যাবিক ভাষাতেও। আর এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে শত বৎসরেরও কম পূর্বে দ্য মর্গান এ পর্যন্ত অসমাপ্ত 'ম্যাক্সিমা অ্যাণ্ড মিনিমা'র কিছু সমস্যা রামচন্দ্র নামে এক তরুণ হিন্দুর দেখামাত্রই সমাধানের উৎসব অনুষ্ঠান করলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্যের দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম নির্ধারিত ও আলোচিত হয়েছিল। সংস্কৃত শব্দ 'শূন্যে'র প্রাচীনত্ব এবং সারা দেশে সেই ব্যবস্থা স্মরণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে আমাদের দশমিক সংখ্যার ব্যবহার আসলে ভারতীয় এবং আরবীয় নয়।

তাহলে কি করে আমরা বলি যে এমন অনস্বীকার্য শক্তির ফল একদৃষ্টি আকর্ষণকারী বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ নয়? ব্যাখ্যার জন্য বহু বিবেচনাকেই উধৃত করা যায়। আজকাল ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার জন্য বিরাট আন্তর্জাতিক সংস্থা হয়েছে, যা অতুলনীয় ফল-সমষ্টির জন্য কাজ করে চলেছে। প্রাচীন ভারত জানত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার অর্থ কী, অবশ্য সংস্থার দ্বারা খুব কমই। আর কোন জাতি একা কাজ করে আমরা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বলে যা জানি তা সৃষ্টি করতে পারত না, এমন কি তার একটি অংশ মাত্রও নয়। প্রাচীন গ্রীস বিদ্যুৎ সম্পর্কে প্রথম কথাটি আমাদের জানিয়েছে। তার থেকে ভোল্টা ও গ্যালভানি পর্যন্ত কী বিরাট এক উল্লম্ফন। আবার এগুলি কোথা থাকতো জার্মান হার্টজ, ফ্রেঞ্চ অ্যামপীয়ার ও হিন্দু বোস ছাড়া? আর তারপর ইতালী সেই অনুসন্ধানের সূত্র দ্বিতীয়বার গ্রহণ করে সৃষ্টি করল ওয়ারলেস টেলিগ্রাফির যন্ত্রপাতি।

আবার আমরা এটিও অবশ্য মনে রাখব যে বর্তমান ইউরোপে বিজ্ঞানের জন্য আমরা প্রায় সব কিছু ত্যাগ করেছি। শিল্প ও সাহিত্য প্রায় অনড় হয়ে আছে। এই বিভাগগুলিতে—অন্তত ফ্রান্স ও রাশিয়ার বাইরে প্রতিটি দেশে—আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অতীতের সম্পদগুলি নিয়েই বেঁচে আছি। ধর্মেও আমরা দেখতে পাই একই বাহ্যিক ধর্মীয় সংগঠন, প্রকৃত সমসাময়িক উদ্দীপনার একই অভাব। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও এই অবস্থায় ছিল না। পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রকৃতির রহস্য নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার পাশাপাশিই বাস্তুকারেরা গ্রাম্য-মন্দির নির্মাণ করে চলেছে, তাঁতে মাকুর টানা-পোড়েন চালু থেকেছে, কাঁসারীর যন্ত্রের ঠুং-ঠাং শোনা গেছে, সভাপণ্ডিতরা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে নিজেদের নিমগ্ন রেখেছেন, সাধুরা তাঁদের আত্মার আনন্দ বিতরণ করে বেড়িয়েছেন, চাষীরা প্রকৃতি, ধানক্ষেত ও নারিকেল বৃক্ষ, গোরু-ছাগল ও ক্ষেত-খামারের সুন্দর সাহচর্যে নিদ্রিত ও জাগরিত হয়েছে। ধর্ম-বিশ্বাস, চারুশিল্প ও কারুশিল্প নির্বিঘ্নে বাস করেছে।

তাহলে এটা কি সম্ভব নয় যে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছি? বিজ্ঞানের অনুকূলে আমাদের চিন্তার অন্য সব ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগের প্রকৃত রহস্য কি সত্যিই জ্ঞানের জন্য আমাদের আগ্রহের গভীরতা, না বরং তার যান্ত্রিক প্রয়োগের জন্য আমাদের আধুনিক

ব্যাধি ? বিশুদ্ধ সত্যের জন্য আকর্ষণ ব্যবসায়িক স্বার্থের দ্বারা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ? সংশ্লেষণের স্থানে আমাদের বিশেষজ্ঞতাকে স্থাপন করার কার্যটি শুধু অর্থের শর্তাধীন কত দূর ? যখন আমাদের প্রয়োজনভিত্তিক দক্ষতা নিঃশেষিত হওয়ার কাছে পৌঁছাবে, যখন আবিষ্কারক কর্মক্ষমতার বর্তমান উচ্ছ্বাস নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবে, তখন, আর শুধু তখনই, সময় আসবে আমাদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত উষ্ণ আবেগের প্রকৃত গভীরতা ও অনাসক্ত পরিমাপ করার। আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা কি আমাদের পরিচালিত করতে থাকবে গভীরতর তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে, না আমাদের অনুসন্ধানগুলি আমাদের হাতে দুর্বল হতে থাকবে, শিক্ষার শুধু এক প্রথারূপেই টিঁকে থাকবে, যেমন মধ্যযুগের মধ্যে আরিস্তোতল টিঁকে ছিলেন ? এই ধরনের প্রশ্নগুলি যতক্ষণ না তাদের উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের অনুমান করার মতো কোন অবস্থাই নেই যে এই বর্তমান শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের, না বিজ্ঞানের নয় ?

ইতিমধ্যে, ভারতে অর্থকরী বিজ্ঞানের এই বিপদ সর্বদাই পূর্বদৃষ্ট এবং হয়তো অতিমাত্রায় ভীতির সঙ্গেই দৃষ্ট হয়েছে, যার ফলে শুরু থেকেই অনুগামীদের প্রয়োজন হয়েছে জ্ঞানকে জ্ঞানের জন্যই অনুসন্ধান করার, সব কিছু বাহ্যিক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে। এক উন্নয়নশীল সভ্যতায় এক প্রগতিমূলক বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নত অবস্থায় যে মূল্য লাভ করা যায় তা এইভাবেই হারিয়ে যায় ; যদিও আমরা স্মরণ রাখব যে প্রকৃতপক্ষে *এমন ধারা রূপান্তর, তার নিম্নতর বিষয়গুলি হতে বিযুক্ত, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে* প্রাচ্যে ঘটেছে যখনই কোন নতুন বৃক্ষ বা পশুকে গার্হস্থ্যজীবনের অঙ্গীভূত করা হয়েছে বা কোন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যদিকে, আধুনিক জগতের প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ভারতের কাছে এখনও উন্মুক্ত রয়েছে প্রমাণ করার যে বৈজ্ঞানিক কার্য ও অনুসন্ধানে তার অধিবাসীদের স্বভাবজাত দক্ষতা কোন অংশে হ্রাস পায়নি এর ঘৃণিত লাভগুলির থেকে এতকাল দূরে যাওয়ার ফলেও।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি বিজ্ঞানের আপাত উন্নয়ন না হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের তত্ত্বগুলি উচ্চতম বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যার দ্বারা বর্তমান শতাব্দীতেই দেশটি হয়ে উঠবে ধর্মের নতুন সংশ্লেষণের প্রধান উৎস, যার জন্য পাশ্চাত্যে আমরা অবশ্য অপেক্ষা করে আছি। কয়েকটি জাতি অকস্মাৎ এক সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে না তাদের স্থানীয় পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি যে দুর্বলতা আছে তাকে প্রচণ্ড এক নাড়া না দিয়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরাজি-ভাষী দেশগুলিতে এমনি ঘটা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই ঘটনা ত্বরান্বিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ হতে জাত অজ্ঞানবাদ দ্বারা। তাছাড়া খ্রীষ্টানধর্ম আরও বেশি নিন্দার্হ হয় এই আবিষ্কার দ্বারা যে, তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাবকে যথেষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে তার অনুগামীদের কোন নীতিবোধ নেই এবং সর্ব শেষে সেই আনন্দের উপাসনা করতে যাকে শোষণের যুগ স্বভাবতই বিপজ্জনক করে তোলে। এইভাবে

শৈশবের ভাবপ্রবণতা, ধর্মের যুক্তি, বিবেকের কৃচ্ছ্রতা বা আদর্শবাদের শক্তি কোনটিই যথেষ্ট সবল নয় যুগের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বিশ্বাসকে বজায় রাখার পক্ষে। সব কিছুই মনে হয় যেন এক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নীতিবোধ, জ্ঞানের নিয়মগুলি, আইনগত ও আর্থিক সম্পর্ক সব কিছুই তাদের পুরনো বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে এবং নতুনভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বাস হারানোর প্রথম বেদনা বর্তমানে দূর হয়ে গেছে, কিন্তু সে শুধু স্থান ছেড়ে দিয়েছে এক বিষন্ন হতাশাকে, এক মানসিক ও আধ্যাত্মিক গৃহহীনভাব, যা কয়েকজনকে চালিত করছে, যাদের হৃদয় রোমের চার্চের অধীনে, আর অন্যেরা যাদের শক্তিগুলি আরও বেশি সমানভাবে অবস্থিত, তারা তাদের প্রয়োজন সমাজসেবার মধ্যে ভুলতে চেষ্টা করে কিংবা বিমূর্ত যুগের বুদ্ধিগত ও শিল্পগত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম অবশেষে নিজেকে প্রদান করেছে এক উচ্চতম স্তরের প্রকৃত ধর্মীয় বস্তু, নগ্ন সত্যের প্রতি প্রেম, যা আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ও চরিত্রকে খুঁজে পায়। কারণ অ-ক্যাথলিক ধর্মের অন্য সকল রূপেই কম-বেশি আপোষধর্মী, এই পক্ষের উপর শুধু অর্ধ-নির্মিত গৃহ। এমন কি এতেও আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ ও সাধুদের সঙ্গ মধ্যযুগীয় চার্চে ফেলে আসার উপযুক্ত। এইগুলিকে একত্রিত করার কি কোন উপায় নেই? ভক্তির মনোভাব কি পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ মনের কাছ থেকে ন্যায্য অধিকার পেতে পরে না? ধর্ম, যে বিশ্বাসকে নিয়ে এত কিছু করেছে, সে কি তার ভিত্তি হিসাবে চরম দৃঢ়তা ছাড়া কম কিছু চায় না? যে ভাবপ্রবণতা, যা সব কিছু মহত্তম শিল্প সৃষ্টি করেছে এবং প্রায় সব কিছু মহত্তম আচরণ, তাকে শুধু এক কুসংস্কার বলে মানসিক গুদামঘরে অযত্নে ফেলে রাখা হবে? যদি এমন হয়, তাহলে নিশ্চয় মানুষের সৃজনশক্তি ও অনুসন্ধান শক্তির মধ্যে এক চিরন্তন অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য থেকে যাবে।

কিন্তু আমাদের মনের গঠনই আমাদের নিষেধ করে এই আপাতবিরোধী সত্যকে মেনে নিতে। এটা হতে পারে যে আমরা আর বিশ্বাস করতে সক্ষম নই যে কোন একটি ধর্ম-ব্যবস্থার একচেটিয়া প্রামাণিকতা। কিন্তু আমরা দ্রুত এই মতের দিকে ঝুঁকছি যে এমন কি এখানেও কিছু দর্শনীয় দৃশ্য আছে, যে ধর্মমত ও পুরাণকাহিনী নিশ্চয় হবে বস্তুর একত্বের এক প্রকৃত সৃষ্টি, যেমন জীব ও উদ্ভিদ, যে একটির বেলায় যেমন, ঠিক অন্যটির বেলাতেও তেমন শৃঙ্খলা ও অর্থ নিশ্চয়ই হবে। অতএব সকল ধর্মকে সমান মিথ্যা ভেবে ঘৃণাভরে অবজ্ঞার বদলে আমরা গ্রহণ করতে শুরু করেছি সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান তাৎপর্যপূর্ণ এক মনোভাব।

একমাত্র ভারতে ধর্মীয় তত্ত্বগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার নিয়মে তার সম্পূর্ণতাসহ বরাবর চলে এসেছে ধর্মেরই এক অঙ্গ হিসাবে। একমাত্র ভারতেই অনুপ্রাণিত গুরুরা ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছেন যে ঈশ্বরের নামও হচ্ছে এক মায়া, জাগতিক বস্তুর সঙ্গে

তার এইটুকুই প্রভেদ যে তার শক্তি আছে আমাদের মায়ার বন্ধন চূর্ণ করতে সাহায্য করায়, যখন অন্যগুলি আমাদের সেই বন্ধনকে বর্ধিত করে তোলে। একমাত্র ভারতেই দৃঢ় ধর্মমতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে মনের মধ্যেই সব কিছু, যে দেবতাদের রূপগুলি হচ্ছে যা আমাদের লাভ করা কর্তব্য সেই বোধেরই বাস্তব প্রতিমূর্তি, যে প্রার্থনা হচ্ছে শুধু সঙ্কল্পের উচ্চতর বিকাশ। অতএব ভারত থেকেই আমরা সংগ্রহ করব বিশ্বাসের সেই বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কার্য, যা আমাদের নিজেদের অতীতের প্রতি আমাদের আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে নতুন ও বৃহত্তর সংশ্লেষণের নামে। এই নতুন সংশ্লেষণে আমাদের নিজস্ব চিন্তার প্রতিটি বস্তু স্থান লাভ করবে—মানবতার ধারণা ও সত্যের উপাসনা, যেহেতু এগুলি ব্যতীত এর অস্তিত্বের কোন কারণ নিশ্চয়ই নেই। এমন কি নিগ্রোর আবেগপ্রবণতা ও স্থানবিহীন ও অব্যাখ্যাত থেকে যাবে না, যেমন যাবে না জ্ঞানান্বেষীর বিস্ময়কর মনোভাব, যা তিনি একত্বের দর্শনে লাভ করেন, যার নামকরণে তিনি সাহস করেন না। ক্যাথলিকদের মঠ-সংগঠন এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের (মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করা) সাধারণ প্রার্থনার অনুপ্রেরণাও বাদ দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় চেতনা হবে অস্তিত্ব অস্বীকারের বেদনাকে মেনে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী, যেন সেটি তার নিজেরই সবচেয়ে বীরত্বের অভিজ্ঞতা, আর তা এত বিরাট হবে যে শিশুর অজ্ঞতার প্রতিও স্নেহশীল ও সাহায্যকর।

অন্য সংশ্লেষণ যা রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে গড়ে উঠেছিল, যাতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলস্থ সকল জাতি ও তাদের সঙ্গে মূলত সংশ্লিষ্ট সকলেই অংশলাভ করেছিল। মরুভূমি থেকে এসেছিল অবিনশ্বরতার তত্ত্ব, প্রাচীন মিশর থেকে পুনরুত্থান, মধ্যস্থতার ব্যবস্থা ও পাপের ব্যক্তিগত চেতনা, পারস্য ও সিরিয়া থেকে বহু বিষয়, অশোকীয় এসেনস থেকে পবিত্রতা ও তপশ্চর্যা, জুডিয়া থেকে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি অবতরণ করেছিল, গ্রীস থেকে জ্ঞানের অসারত্বের প্রয়োজনীয় অনুভূতি, কিংবা ভূমধ্যসাগরীয় সমাজের অন্তত গ্রীসীয় বিষয়গুলি থেকে, রোম থেকে সংগঠনের সহজপ্রবৃত্তি এবং এক মধুর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব থেকে জগতের জন্য করুণা ও সর্বস্ব ত্যাগ, যা নতুন ধর্মের একমাত্র বীজ হতে পারে, যাতে এই বিভিন্ন ধরনের ক্ষুধার্তরা খুঁজে পায় তাদের নিজস্ব বেথেলহেম, সেই ক্ষুধার্তদের অন্নগ্রাস।

এইভাবে আমাদের কালের নতুন উন্নয়নে বর্তমানে সক্রিয় বহু গঠনকারী প্রভাব তাদের পরিপূর্ণতা খুঁজে পাবে। তাঁরা সকলেই, যাঁরা সকলেই অনাথ ও অত্যাচারিতের প্রতি ভালবাসা অনুভব করেছেন; তাঁরা সকলেই, যাঁরা সত্যকে সত্যের জন্যই অনুসরণ করেছেন; তাঁরা সকলেই, যাঁরা ভক্তির স্বর্গে নিজেদের হারিয়ে ফেলার বাসনা করেছেন এবং দ্বারে দণ্ডায়মান শস্ত্রধারী যুক্তির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন; তাঁরা সকলেই, যাঁরা বৃহত্তর সামান্যীকরণের জন্য বোধ করেছেন, তখন তাঁরা দেখেছেন তাদের বাল্যকালের বিশ্বাস তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—এঁরা সকলেই সাহায্য

করেছেন এবং সাহায্য করছেন এক নতুন চেতনা গড়ে তোলার জন্য, সেই শক্তি সৃষ্টি করার জন্য যা ভবিষ্যতের ধর্মীয় মতবাদকে স্বীকৃতি দেবে ও আত্তীকরণ করবে। কিন্তু সেই শাস্ত্রগ্রন্থ প্রধানত ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করা হবে।

তারপর এইভাবে জগতের প্রেরণার উৎসগুলিকে নবীকরণের পর, আমাদের ক্ষমা করা হতে পারে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতের নিজের কী হবে? মিশরীয়রা তাদের সমস্ত সম্পদ প্রদান করেছিল এবং এখন সে কোথায়? বিদেশী আক্রমণের বহু স্তরের তলায় কবরস্থ; সহিষ্ণু ও নিরাশভাবে ভূমি কর্ষণ করে চলেছে তার নিজের বলদগুলির মতোই, যারা তার দেশের মঙ্গলের জন্য তথাকথিত পরিকল্পনা করে, তাদের দ্বারা খুব কমই স্মরণ করা হয়, এমন কি শুধু নামেও এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু তখনই জেগে ওঠে, যে ধর্মগ্রন্থ হতে পরিচিত কোন শব্দ শুনছে; যখন শোনে যে আজকাল কায়রোর বাজারে কোন বিড়াল হত্যা কেউ করলে তাকে তার জীবন হারাতে হতে পারে। ইহুদিরা সৃষ্টি করেছিল যীশুকে, কিন্তু তারা কী হয়েছে? মানুষ জাতির মধ্যে অচ্ছুত ও গৃহচ্যুত। কে তারে স্মরণ রাখে কোন কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে যা তারা দিয়েছে তার জন্য? 'ইহুদিরা তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করেছে' এই দুঃখজনক সূত্র স্থান পেয়েছে ঘটনার কোন স্মারক অনুষ্ঠানের ভক্তদের মধ্যে যে তারা ভাষা, চিন্তাধারা, জীবনের আচরণগুলি এবং ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে তিনি মানুষের বেশ ধারণ করেছিলেন।

এই ধরনের কিছু কি ভারতের ভাগ্যে ঘটবে? জগৎ এক ধর্ম প্রদান করা হয়তো অতীতটা যে বৃথা যায়নি তার যথেষ্ট প্রমাণ হতে পারে, কিন্তু সেটি ভবিষ্যতের পক্ষে কোন প্রকার ভরসার ব্যাপার নয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এক বিশাল মহাদেশের লোকেরা মাঠের চাষী ও জলের জেলে হতে পারে তা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং বেশ ভাল ভাবেই এগোচ্ছে। তাদের দেশীয় সব সংস্থাই ক্ষয়প্রাপ্ত। তাদের সমৃদ্ধি ঘুচে গেছে। বিরাট কৃষিক্ষেত্রের কিছু না কিছু অংশ সব সময়েই দুর্ভিক্ষের কবলে। তাদের শিল্পকলা ও শিল্প-উৎপাদন মৃত বা মুমূর্ষু। তারা অন্যলোকের করা সস্তা দ্রব্যের শুধু খরিদ্দার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি তাদের চিন্তাও মনে হবে প্রধানত অনুকরণমূলক। গোঁড়ারা চিরকাল তাদের অতীতেই চক্র কাটছে। আর যারা গোঁড়া নয় তারা বর্তমানকালের বিদেশীদের জোয়াল সমান অন্ধভাবেই কাঁধে নিতে ঝুঁকছে। আত্মহননকারী হতাশায় ভাবী দেশপ্রেমিকরা বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের রণধ্বনির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে কিংবা নতুন ধর্মের আবির্ভাবের জন্য বিলাপ করছে, যেন অনৈক্যের পঞ্চম একটি পদার্থ আনয়ন করতে পারলেই ভারতীয়রা ঐক্যে উপনীত হতে পারবে। বর্তমানের শিক্ষা ও সমস্যার কোন সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয় না। দক্ষ কেরানীর কাছে নিয়তমটাই সম্ভব, আবার সেই নিম্নতমটি বৃদ্ধির বদলে বরং ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

ইতিহাসের কোন তত্ত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, যে তত্ত্ব পরবর্তী দুই শতাব্দী কালের জন্য প্রাচ্যের ঘটনাগুলির গতি ব্যাখ্যা করতে পারে, একটি সত্য সম্পূর্ণ সরলভাবে

নিজেকে প্রকাশিত করছে। জাতি নিজেকে যা ভাবে তাই সে হয়ে ওঠে। সে মহান হয়ে ওঠে, তার আপাত শ্রেষ্ঠতা দ্বারা নয়, কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে চিন্তার দ্বারা। অতএব এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—তার নিজের প্রকৃতি ও শক্তির কোন ধারণা ভারতের কী উত্তরাধিকার সৃষ্টি করবে ?

যেমন রোম্যান ক্যাথলিকধর্ম হচ্ছে খ্রীষ্টানধর্ম নামে এক বিরাট সম্পূর্ণতার মধ্যে একটি বিষয় এবং যেমন কেউ ক্যাথলিক না হয়েও ভাল খ্রীষ্টান বলে দাবি করতে পারে, তেমনি হিন্দুত্বের ধর্ম-ব্যবস্থা হচ্ছে ধর্ম নামে এক বিরাট সামাজিক-শৈল্পিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে শুধু একটি খণ্ডমাত্র এবং একজন ন্যায়ত ও ভালভাবে ধর্মের সেবক হতে নিজেকে একজন হিন্দু বলে অভিহিত না করেও। এটি হচ্ছে এই ধর্ম, তার বৃহৎ ও অ-সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে, যা ভারতের মাটির প্রতিটি সন্তানের মঙ্গল নির্ধারণ করে। শব্দটি হচ্ছে জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা বা জাতীয় মঙ্গলের এক প্রাচীন নাম। এটা সত্য যে, ন্যায়ত যিনি রাজা নন, তাঁর কাছে যে ব্রাহ্মণ নত হয় তাকে মনু বহুবার অভিশাপ দিয়েছেন। এটি সত্য যে পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র ভাগবদ্‌গীতাই বলেছে স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত রাজার কর্তব্য হচ্ছে সংগ্রাম করা। আর এটিও একটি সত্য যে শাসক ব্যক্তিটি ধর্ম চেতনার কাছে সর্বদাই এক সম্পূর্ণ উদাসীনতার বস্তু। এ পর্যন্ত বাস্তবিকই লড়াই করাটা ছিল সামরিক ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যেকার ব্যাপার। এই ধরনের এক অদ্ভুত মনোভাবের রহস্য বোঝা যায় যখন আমরা আবিষ্কার করি যে ভারতীয় কৃষকের চোখে শাসক ব্যক্তিটি নিজেই হচ্ছেন ধর্মের ভৃত্য। 'যদি তিনি এটি বজায় রাখেন, তাহলে থাকবেন ; যদি না রাখেন, তাহলে তাঁকে যেতে হবে,' জিজ্ঞাসা করলে তারা সকলে এই কথা বলে। হায়! তারা মোটেই কল্পনা করেনি যে তারা, তাদের সন্তানরা এবং সন্তানের সন্তানরাও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে ওই বজায় রাখতে না পারার একই ব্যর্থতায়।

এইভাবে, যে কোন প্রভুর সেবা ভারতীয় রাজনীতিবিদ করছেন, হিন্দু, মুসলমান বা ব্রিটিশ যে কেউ সিংহাসনে বসেছে, এক এশীয় জাতির বিশ্বস্ত ও বাধ্য সন্তান-রূপে মন্ত্রীর কর্তব্য ছিল তার জাতির ও দেশের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলের জন্য নিজের সকল প্রভাবকে ব্যবহার করা। জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে এই বস্তুই কৃষি-ব্যবস্থার প্রতি তার বিরাট শ্রদ্ধার জন্য প্রচলিত করেছে সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মানুষ ও গোরুকে প্রায় একই স্তরে আনতে, রাজাকে দিয়ে নিষেধ করিয়েছে তাঁর রাজ্যে গোমাংস ভক্ষণ। এটিই করিয়েছিল কোন এক যুবরাজকে ব্রিটিশ-সরকারের হুকুম মেনে তাঁর প্রজাদের লবণের উপর কর দিতে বাধ্য করার চেয়ে বরং তাঁর লবণের খনিগুলি হতাশ হয়ে ব্রিটিশ-সরকারের হাতে তুলে দিতে। এইভাবে প্রজাদের কষ্টের বদলে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা নিতে তিনি চাননি। এটিই করেছিল প্রাচীনকালে বহু শাসকের অবশ্য করণীয়রূপে শুধু তাঁদের প্রজাদের কাছে লবণই নয়, জল ও ফল বিনামূল্যে দেওয়ার

ব্যবস্থা করতে, এক ধরনের 'মর্যাদার বাধ্যবাধকতা', যা কাশ্মীরের প্রতি গ্রামের বাইরে পথিপার্শ্বে উদ্যান সৃষ্টি করিয়েছিল, যতক্ষণ না সেই সুন্দর দেশটি অ্যাভিলিয়নের সুখী দ্বীপের মতো প্রায় হয়ে উঠেছিল, 'সুন্দর উদ্যান ও কুঞ্জমণ্ডিত, গ্রীষ্মকালীন সরোবর শোভিত'। ধর্মের এই শক্তি তার লোকদের মঙ্গল সংরক্ষণ করার এক নিয়মের মাধ্যমে যা রাজা ও প্রজার উপর সমান বাধ্যতামূলক ছিল, যা সৃষ্টি করেছিল আচরণ-বিধির এক বিরাট জাল এবং সেই জাল নিয়ন্ত্রিত করত ভিক্ষুকদের ত্রাণ, জলের ব্যবহার, তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির, স্বাস্থ্যবিধির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, গোচারণ ভূমির বণ্টন, জঙ্গলে কৃষকদের অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য হাজার রকম ব্যাপার। রাজার ব্যক্তিগত প্রার্থনা মসজিদে করা হতো এই ঘটনাটিই শুধু তাঁর এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। জন্ম ও মানুষ করে তোলার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে শাসনের ভাষা সব শাসকের উপর সমান কর্তৃত্ব করত এবং তার কোন বিচ্যুতির কল্পনা করাটাও একবারে অসম্ভব ছিল। অতএব এটি কেবল সময়ের প্রশ্নের বেশি কিছু হতে পারে না যে পর্যন্ত না কোন নতুন রাজা সমস্তটি পরিপাক করছেন এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক করার মহান কর্তব্যে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। আমরা আক্ষেপ করতে পারি, কিন্তু আমরা ক্ষমা করতে পারি না সেই অদ্ভুত আলস্যকে, যার দ্বারা ভারতের অধিবাসীরা তাদের প্রাচীন সভ্যতার এই জাতীয় ও নাগরিক দায়িত্বের বিষয়গুলি হারিয়ে ফেলার অনুমতি নিজেদের দান করেছে এবং নিমগ্ন হয়েছে ব্যক্তিগত গৃহসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করতে পারি না যে অরণ্যের বদলে এই বৃক্ষকে আনা নিষ্ঠা নামের উপযুক্ত,—যে নিষ্ঠা হচ্ছে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস।

যাহোক, ধর্মীয় শাসনের এক মূল দুর্বলতা হচ্ছে যে যদিও এটি যে কোন প্রতিবেশীকে সহ্য করতে পারে, কিন্তু নিজের চারপাশের বিভিন্নমুখী বিষয়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করার কোন ধারণা এর ছিল না। এর বিরাট সংখ্যক অনুগামীরাও জীবনকে অতি-প্রাকৃতের মেঘের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে দেখত। জাতীয় ব্যাপারে পুরোহিততন্ত্রকে জাতির স্বীকৃত নেতাদের অধীনে আনার পরিবর্তে একে শুধু উচ্চস্থলাভিষিক্ত করা হতো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিবেকের উপরে প্রভাব বিস্তারের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়ে, ধর্মীয় শাসনে এই প্রয়োজনের প্রবণতা দেখা যায় যে তার নেতারা পুরোহিতদের উপদেশের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে চলুক।

এই তথ্যগুলির সুস্পষ্ট ধারণা পয়গম্বরের ছিল, যা ইসলামকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। তিনি এক শক্তিশালী সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর সদস্য-পদের একমাত্র শর্ত হচ্ছে এক সংক্ষিপ্ত নিয়মকে গ্রহণ করা। কিন্তু আরব রক্ত ছিল তুলনামূলকভাবে অমিশ্রিত এবং মহম্মদের কাজের বেশির ভাগই তাঁর হয়ে করে

দিয়েছিল সগোত্রতার নিবিড় বন্ধন, যা তাঁর কেন্দ্রীয় দলকে সংঘবদ্ধ করেছিল। থিয়োক্র্যাটিক প্রকৃতির প্রথম দাবি যা, সেই ব্যক্তিত্বের শক্তি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নয়, মহম্মদ একটি বন্ধনে দুটি কর্তব্য সমাধা করেছিলেন—জাতীয়তার সর্বাত্মক চেতনা সৃষ্টি এবং চিন্তার প্রয়োজনীয় মুক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যাওয়া। আজও বিরাট সেমিটিক বেষ্টনী যা প্রাচ্যজাতীয় আর্য ও মঙ্গোলদের ইউরোপ থেকে বিভক্ত করেছে, যখনই আমরা মানচিত্রের দিকে দেখি, তখনই তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর কৃতকার্যতার বাস্তবতাকে। আর ইউরোপীয় শিক্ষার উৎপত্তির ইতিহাস প্রমাণিত করে মুক্তির আগ্রহকে, যা তিনি সারাসেনীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রদান করেছিলেন।

ভৌগোলিক অবস্থা ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সব কিছু মূল্যে ঐক্যের এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য সব সত্যের সঙ্গে এটিও জড়িত যে তার নিজেকে সর্বজাতির মিলন-ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করতে হবে। বর্তমানকালে বিশেষ করে এই ব্যাপারটি হয়ে উঠেছে, যখন মহাসাগর সীমানার বদলে সড়ক হয়ে গেছে। ভারত যেন এক জাতির, ধর্মের ও সমাজ-সংস্কারের যাদুঘর, যার মধ্যে রয়েছে কিছু বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত, কিছু অত্যধিক যৌবনশক্তিতে রূঢ়। অতএব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে আরবের যে সমস্যা ছিল ভারতের সমস্যা তার চেয়ে আরও বিরাট অসুবিধাজনক। তবুও তার মধ্যে নিজে থেকে নিরাময়ের বহু বস্তুই রয়েছে।

যদিও এই সত্যে আগে কিছু সন্দেহের অবকাশ ছিল, কিন্তু ইংরাজ শাসন তার রেলপথগুলি, সস্তা ডাক ব্যবস্থা ও তার কাজকর্মের জন্য সাধারণ ভাষা দিয়ে প্রদর্শন করেছে দেশের রাজ্যসংক্রান্ত ঐক্যকে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে ভারতের ঐক্য হচ্ছে জৈব, শুধু যান্ত্রিক ঐক্য নয়। কথিত হয় যে, 'উত্তর ধর্মপ্রচারক সৃষ্টি করে, দক্ষিণ সৃষ্টি করে পুরোহিত'। আর এটি সত্য যে, তার জ্ঞানের ও বিচারশক্তির, তার উপলব্ধির ও সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষমতা দক্ষিণের আছে; এটি সত্য যে, তার মারাঠা, মুসলমান ও শিখেরা তার কার্য-পরিচালকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে, আর বাংলার উপর দায়িত্ব পড়েছে হৃদয়সংক্রান্ত কার্যের, সে দেশ তার নিজের সীমান্ত বর্ধিত করার জন্য কোন সংগ্রাম করেনি, তবুও যে বাকি সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে 'ভারতবর্ষ' নামক মহান শব্দটির অর্থের বিরাট সর্বগ্রাহিতাকে উপলব্ধি করতে। ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় ঐক্য সুস্পষ্ট। আর সামাজিকভাবে যদি এটি সন্দেহজনক বোধ হয়, তাহলে দেশটি নিজেই সেই সন্দেহ-মুহূর্তে নিরসন করতে পারে জাতীয়তার সেই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করে, যা ঐক্যগঠন কার্যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা প্রদানে একমাত্র প্রয়োজন।

কিন্তু বর্তমান সংকটে ভারতের একমাত্র সমস্যা নয় যে প্রকৃত সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ঐক্যের নগ্ন সত্যটি জাতীয় চেতনারূপে দানা বেঁধে ওঠার অপেক্ষা করা। এক মহান অতীতে ও সুস্পষ্ট নির্দেশিত অর্থনৈতিক আদর্শে তার প্রত্যাবর্তন করার আছে। তার ঐতিহ্য অকলঙ্কিত। জাতীয়জীবনের কোন বিষয়ই ছিল না—শিল্প,

কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—যাতে সে কোন না কোন সময়ে অসাধারণ শক্তিশালী ছিল। সে আধিপত্যশালী চরিত্রের দুটি সাম্রাজ্য অন্তত সংগঠিত করেছিল। স্থাপত্যে, পৃথিবীর সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ রীতির তিনটি হচ্ছে তার—দক্ষিণে দ্রাবিড়ীয়, মধ্যভারতের উড়িষ্যা থেকে বোম্বে পর্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধযুগীয় এবং উত্তরে ইণ্ডো-সারাসেনিক।

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতকে সম্মুখীন হতে হবে পুরোহিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রিয়াকর্মের কোন যৌথকর্তৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তায়। আর এটি নতুন গঠনরীতির প্রয়োজন সৃষ্টি করবে, যৌথকর্তৃত্ব চেতনার নতুন স্থাপত্য, যা জাতীয় কল্পনায় প্রয়োজনীয় আবেদন জানাবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের আবেগকে প্রয়োজনীয় সুযোগ দেবে।

কারণ ভারতীয় সমস্যার সমাধানরূপে জাতীয়তার মনোভাবের বৃদ্ধিকে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই রাজা ও পুরোহিতদের কাছ থেকে সরে নারী ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাব। এই ধরনের আবেদন বৌদ্ধধর্ম করেছিল, যা সে যুগের অবিমিশ্র থিয়োক্র্যাসির পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য রূপ ছিল। আর ভারতের সমগ্র ইতিহাস, খ্রীষ্টীয় যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে, জনসাধারণের চেতনাকে শিক্ষিত করে তোলার কাহিনী, হিন্দুধর্মের ঐক্যমূলক ও উন্নতিমূলক প্রভাব দ্বারা, তখন যেভাবে এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে যদি আমরা নীতি ও বুদ্ধির পরীক্ষাকে সভ্যতার মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারব না যে সেই সব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্য বেশি সফল হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনের শক্তিতে; পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্যে; সামগ্রিকভাবে ধর্মের পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উন্নতির স্থানটির ব্যাপক উপলব্ধিতে; স্থূল দৈহিক বস্তু বিনা অবসর উপভোগের শক্তিতে; মর্যাদায়, মিতব্যয়িতায়, আক্রমণজনক কার্য-ব্যতিরেকে অবিরাম পরিশ্রম, কৃত ও ক্রিয়মান কার্যের শৈল্পিক প্রশংসায় এবং সর্বোপরি ইচ্ছামাত্র সমগ্র শক্তিকে একাগ্র করার সামর্থ্যে, ভারতের দরিদ্রতম শ্রেণী পর্যন্ত, তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, পাশ্চাত্যে তাদের চেয়ে বহু উপরে অবস্থিত শ্রেণীর অনেকের সঙ্গেই তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে। এমনি ছিল বৌদ্ধযুগের কিছু ফল।

মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতন হলো কারণ সে শুধু বুঝতে পারেনি যে, ভারতীয় ঐক্যের বিরাট জনপ্রিয় ধারণার উপর কী করে নিজের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। সে ভারতের ধর্মীয় উদ্দীপনার সবটুকু আত্তীকরণ করতে পারেনি, কিংবা নিজেকে এর থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখতে পারেনি। তাই সরকার হিসাবে এটি সফল হয়নি স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়তে কিংবা জাতীয় শক্তির সেই চক্র সৃষ্টি করতে, একমাত্র যা তাকে স্থায়িত্ব প্রদান করতে পারত। যাহোক, ভবিষ্যতের জাতীয়জীবনে এর কিছু অমূল্য অবদান ছিল এবং এটা দেখতে পাওয়া খুবই দুষ্কর যে জীবন কীভাবে নিজেকে সংগঠিত করার আশা করবে তার স্মরণীয় প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি ছাড়া।

ইংরেজ পর্বের বৈদেশিক চরিত্র তার প্রথম প্রভাবরূপে উৎপন্ন করেছিল বিভ্রান্তি ও বিক্ষোভের এক ব্যাপক অনুভূতি, যা জন্ম দিয়েছিল শতাধিক পরিকল্পিত প্রতিষেধকের। সমাজ-সংস্কারক কিছু ছিলেন, যাঁরা ভেবেছিলেন, তখন তাঁরা যা উপলব্ধি করেছিলেন তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ ধ্বংসকারক কোন কার্যক্রম দ্বারা তাঁদের মাতৃভূমির ভাল সেবা করা চলবে। তাঁদের উৎসাহ যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা আমরা অনুমোদন না করতে পারলেও, এটি আমরা স্বীকার না করে পারি না যে জাতির প্রাণশক্তি সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ এত দৃঢ়ভাবে পাওয়া যায় না। যদি ভারতীয় সভ্যতা প্রকৃতই এমন অচল হতো, যেমন পাশ্চাত্যের লোকেরা জ্ঞানীসুলভ অনুমান করেন, তাহলে নতুন ভাবধারাগুলি সংস্পর্শমাত্রই অঙ্গার এমনভাবে অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারত না। অন্যদিকে যদি দেশটি বাহ্যিক তত্ত্বকে গ্রহণ করত এবং নিজের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা করত, তাহলে তারপরে ভারত সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারতাম না যে আশাকে সম্ভব করে তোলার পক্ষে তার যথেষ্ট গভীরতা ও স্থায়িত্ব আছে। ইতিমধ্যে সংস্কারকরা ফল আনয়নে ব্যর্থ হননি। তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন একদল লোক, যাঁরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও আচরণে যা কিছু মূল্যবান তার প্রতিনিধিত্ব করেন নিজেদের জাতীয়তা না ঘুচিয়ে এবং তাঁরা চিরকালের জন্য এই সত্যটি দেখিয়ে দিয়েছেন যে বিদেশী উপদেশ ও সমালোচনার উপর সম্পূর্ণ অনির্ভরশীল থেকেই ভারতের নিজের মধ্যেই শক্তি রয়েছে পুনরুত্থানের।

তারপর আসেন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা, যাঁরা বোধহয় মনে করেন যে বিদেশী ভাবধারার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারাই তাঁদের দেশ বাঁচতে পারে। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রেও কিছু মূল্যবান অবদান আছে। বিদেশী ভাবধারা কখনও ভারতকে বাঁচাতে পারে না—বাস্তবিকই দেশের বর্তমান অবস্থায় 'রাজনীতি' শব্দটির ব্যবহারই আমাদের কয়েকজনের কাছে মনে হতে পারে এক বেদনাদায়ক কপটতা,—কিন্তু সেই সঙ্গে বিদেশী-দের কার্যপদ্ধতি আয়ত্ত করা ও সাত্তীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। জাতির শিক্ষা, তাদের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং সারা দেশ জুড়ে বন্ধুত্বের ও পারস্পারিক আদান-প্রদানের জাল ক্ষেপণ করা হচ্ছে বিরাট কার্য।

আবার সাম্যাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বাইরে শত রকমের বন্ধনছিন্নকারী মুক্তি ও ধর্মকেন্দ্রগুলির পুনরুজ্জীবন, সব কিছুই হচ্ছে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। আর এ ছাড়া চতুর্থ এক সম্প্রদায় ঘোষণা করেন যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে ভারতের একমাত্র সমস্যা এবং সেটিকে একবার দূরীভূত করতে পারলেই সব কিছুর সুরাহা হবে।

যাহোক, এই মুহূর্তে এক নতুন সন্দেহ নিজেকে তুলে ধরেছে, সেই সন্দেহটি রয়েছে এই সব ব্যাখ্যার পিছনে—সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন ও অর্থনৈতিক অভিযোগ—এ সব ছাড়া আছে এক বড় বাস্তব সত্য, সমস্তগুলির উপর আধি-

প্রত্যেকারী ও তাদের মধ্যে সংযোগ সাধনকারী, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, যার অংশ হচ্ছে ওই প্রত্যেকটি। এটি ভাবা শুরু হয়েছে যে, এক ধর্মীয় ভাব আছে যাকে ভারতীয় বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটি কোন একটি সম্প্রদায়ের নয়; এক সামাজিক ভাব আছে, যেটি কোন বর্ণের বা শ্রেণীর সম্পত্তি নয়; এক ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আছে, যাতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে; আর এই সমস্তের মধ্যে সেই বস্তুটি আছে, একমাত্র যাকে বলা যেতে পারে 'ভারতবর্ষ'। যদি এই ধারণা প্রচলিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মীরা সকলে সমানভাবে সাহায্য করেছে একে প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু এটা কখনও মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে সমস্ত সমস্যাটাই অর্থনৈতিক, যদিও অবস্থার শেষোক্ত বিষয়টি হচ্ছে নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র এক মর্যাদাকর স্থানের ব্যাপার নয়, এটি হচ্ছে কিন্তু সমগ্র জাতির, যে জাতি পৃথিবীর বৃহত্তম ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি অধিকার করে আছে, তার সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও চরিত্র, যা পুনরায় আয়ত্ত করতে হবে। সেই যুগে যখন প্রাচীন মিশর মানব সভ্যতার উপর এক চিরন্তন ছাপ রেখে দিচ্ছিল, তখন তার সম্রান্ত বড়লোকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আজকের এক ভারতীয় রাখালের চেয়ে বেশি ছিল না। ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি, সংশ্লেষণের সহজাত প্রবৃত্তি, সংঘয়ের মানসিকতা, এইগুলি ছিল তার শক্তির রহস্য।

আধুনিক জগতের বৈশিষ্ট্যমূলক আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করছে সর্ববস্তুকে সমগ্রভাবে চিন্তা করায় তার দক্ষতার উপর, তথ্যের বিরাট উপকরণগুলিকে এককরূপে ব্যবহার করার উপর, বহু প্রকারের কার্যাবলীকে একত্রিত করার উপর এবং এদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করা। এই হচ্ছে বাস্তব, যার বাহ্যিক প্রতীকগুলি হচ্ছে মানচিত্র, আদমশুমার, সংবাদপত্র, এমন কি তালিকাপঞ্জী, মিউজিয়াম ও এনসাইক্লোপিডিয়া। অন্তর্নিহিত বস্তুটি যতই আয়ত্ত করবে, সেই অনুপাতে ভারত ততই তার নিজস্ব সম্ভাবনাগুলির শিখরে আরোহণ করবে।

জাতীয়তা বৃদ্ধির পবিত্র কর্মগুলি হবে তার প্রাচীন শিল্পকলার নবীন উন্নয়ন, তার পুরাতন বিদ্যাশক্তির নতুন প্রয়োগ, নতুন ও গতিশীল ধর্মীয় ব্যাখ্যা—সংক্ষেপে এক নতুন আদর্শবাদ, জাতির নিজ অতীতের প্রকৃত সন্তান, যাকে নিয়ে নবীনরা মাতামাতি করবে এবং প্রবীণরা শ্রদ্ধাশীল হবে। এর সাফল্যের পরীক্ষা হবে নবীকৃত স্থানীয় ও ব্যষ্টিগত শক্তির সঙ্গে এ পর্যন্ত অজানা আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও আত্ম-অভিব্যক্তির শক্তির সংমিশ্রণে।

কিন্তু এমন ধরনের কোন ফলপ্রাপ্তির আগে আমাদের নিশ্চয় আশা করতে হবে সকল প্রদেশের সন্তানরা ও সকল সম্প্রদায়কে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসায় জ্বলে উঠতে হবে। আমরা নিশ্চয় কল্পনা করব যে, শিখ, মারাঠা ও মুসলমান প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন হবে, তার নিজের গোষ্ঠীর চিন্তায় নয়। এইভাবে কোন অংশের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যলাভ করা প্রতিটি নাম সমগ্র দেশেরই হয়ে উঠবে। হিন্দু মসজিদের সোপানে

নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করবে, মুসলমান মন্দিরের সামনে প্রণাম জানাবে, আর্যেরা ইসলামের ইতিহাস লিখবে এমন এক উৎসাহ নিয়ে যা ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ কারও দ্বারা সম্ভব নয়, সেমাইট হবে ভারতের অতীতকালের বীরত্বের ব্যাখ্যাকারী, সেই ব্যক্তির মতো কর্তৃত্বসহকারে, যে পৌরুষের দৃষ্টিকোন হতে প্রথম এইটিকে দেখছে। কারণ আমরা মনে করি না একজন অন্যজনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে শুধু সহ্য করলেই ভারতে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার পক্ষে সেটা যথেষ্ট হবে। ডেভিড ও জোনাথানের ভালবাসা যেমন, জন্মের দূরত্বের জন্য যে ভালবাসা আরও বেশি শক্তিশালী, নিজের মাতার অসহায় সন্তানদের দুঃখের আর্তনাদ শুনে মনের মধ্যে জেগে ওঠা আবেগের মতো যেটি। নিজের কাছে অজানা অন্যের প্রতিটি প্রয়োজন আত্মদানের বাসনাকে জাগরিত করে তোলে। অন্যদের পাপের নিন্দা সে করে না, সে তাদের শপথবদ্ধ সেবক ও সমর্থক।

কিন্তু এমন ধরনের উন্নতির জন্য ভারতের বর্তমানে কি কোন গোপন শক্তি আছে? থিয়োক্র্যাটিক চেতনার কী হবে? যুধ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির কী হবে?

নিজের পুনরুজ্জীবনের জন্য তার নিজের যথেষ্ট শক্তি আছে কিনা সে বিচার কার্যের উপযুক্ত হচ্ছে শুধু ভারতের সন্তানরাই। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে এক বিরাট জাতির জাতীয়তায় মানবতার দিক দিয়ে দুটি ধর্মতন্ত্রের এক সাধারণ মিলনস্থানে উপনীত হতে হবে। ঈশ্বরের সকল রাজত্বেই কি ঘোষিত হয়নি এমন এক দিনের আশা যখন খঞ্জ হাঁটতে পারবে, অন্ধ দেখতে পাবে, কুষ্ঠরোগী আরোগ্যলাভ করবে এবং দরিদ্রদের কাছে ধর্মশাস্ত্র প্রচারিত হবে? ধর্মতন্ত্রের চেতনা সামাজিক মঙ্গলের প্রতি কখনও ঈর্ষান্বিত নয়, বরং তার দ্বারা গভীরভাবে সংক্রামিত হয়। নিজের প্রকৃত লক্ষ্যরূপে বাস্তবিক তারই সন্ধান সে করে। কি ধর্মতন্ত্রীয় চেতনায়, কি ধর্মে এমন দিন কি কখনও আসবে, যখন মানুষ আবিষ্কার করবে যে স্বর্গীয় প্রকাশগুলি মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই, তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়? নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরবের প্রাচীন গোঁড়ামি এখনও হবে মুসলমানের কৃচ্ছ্রতা। হিন্দুর প্রাচীন পবিত্রতা এখনও এবং ভবিষ্যতেও হবে ভক্তিপূর্ণ জীবনের মন্দির। তা সত্ত্বেও জন্মভূমিকে নতুন করে নির্মাণে উভয়েই নতুন উদ্দেশ্য এবং এক সম্মিলিত সুযোগ খুঁজে পাবে।

তাহলেও প্রশ্নটি থেকে যায়। পথ পরিষ্কার, কিন্তু সেই পথ অনুসরণ করার শক্তি কি ভারতের আছে?

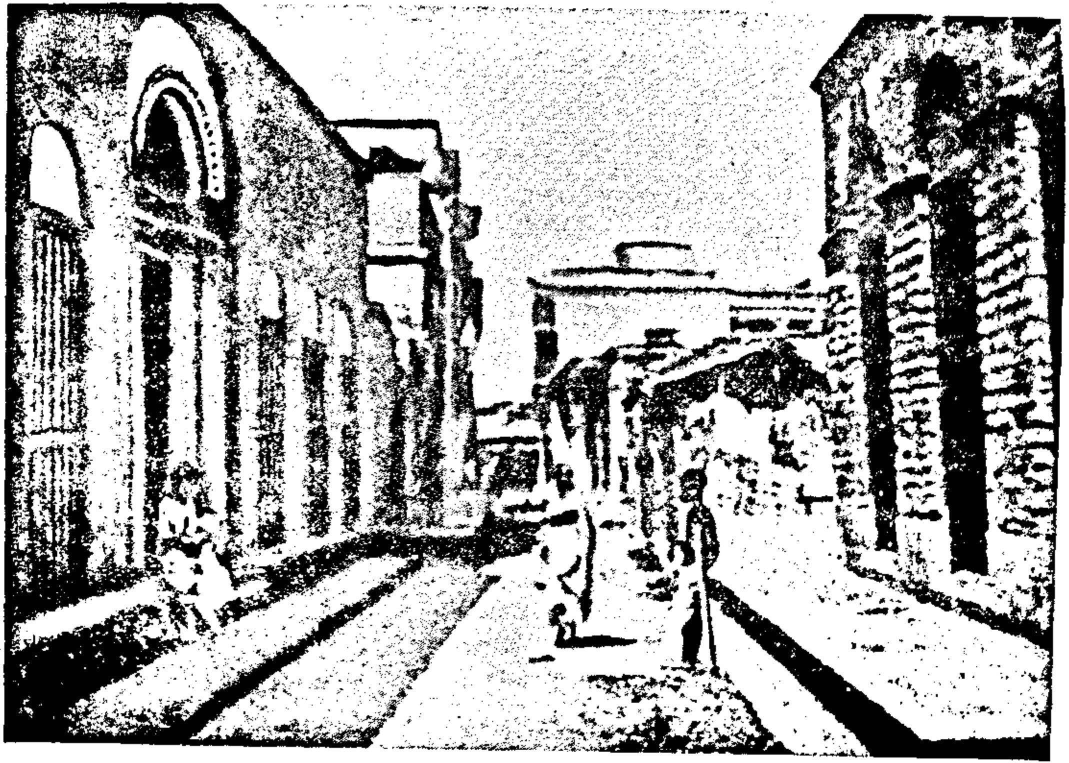
অশোকের যুগের লুপ্ত নগরী ও পরিত্যক্ত মন্দিরে শৃগালরা ঘুরে বেড়ায়। মোগলদের মর্মর প্রাসাদে শুধু স্মৃতিটুকুই বাস করে। শক্তিময়ী মাতা কি এখন নিঃশেষ হয়ে যাননি? জগৎকে সব দেওয়া, এটা কি যথেষ্ট নয়? তিনি কি আবার জেগে উঠে নিজের সংসারের জন্য সচেতন হবেন? কে বলতে পারে? তবুও বর্তমানের সমস্ত নিঃসঙ্গতা ও শক্তিহীনতার মধ্যে, দেশের ধ্বংস স্তূপ ও গৌরবের ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে

এক অদম্য আশা এখনও জেগে আছে কৃষি-ভারতের হৃদয়ের মধ্যে। সে অস্ফুটস্বরে বলে, 'যা আছে, তা চলে যাবে। যা ছিল, তা আবার হবে ; সময়ের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত।' আর তার এই কথার মধ্যে আমরা শুনতে পাই, আরও বড় ভবিষ্যদ্বাণীর ধ্বনি, যার প্রতিধ্বনিই হচ্ছে তার কথাগুলি :

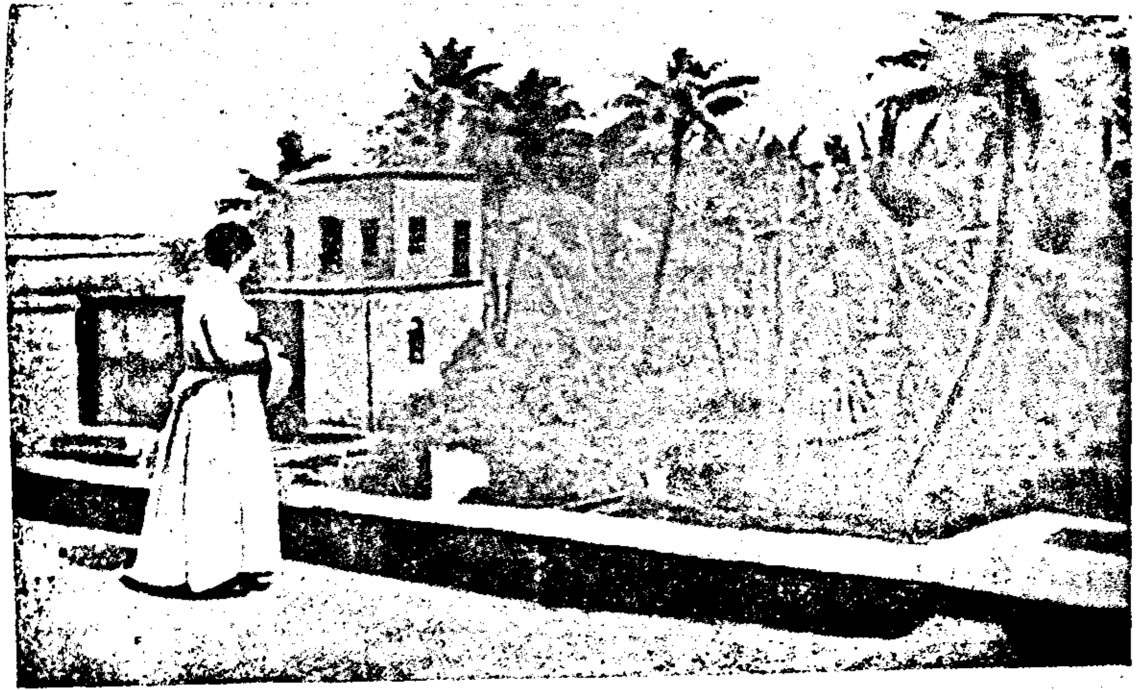
'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'



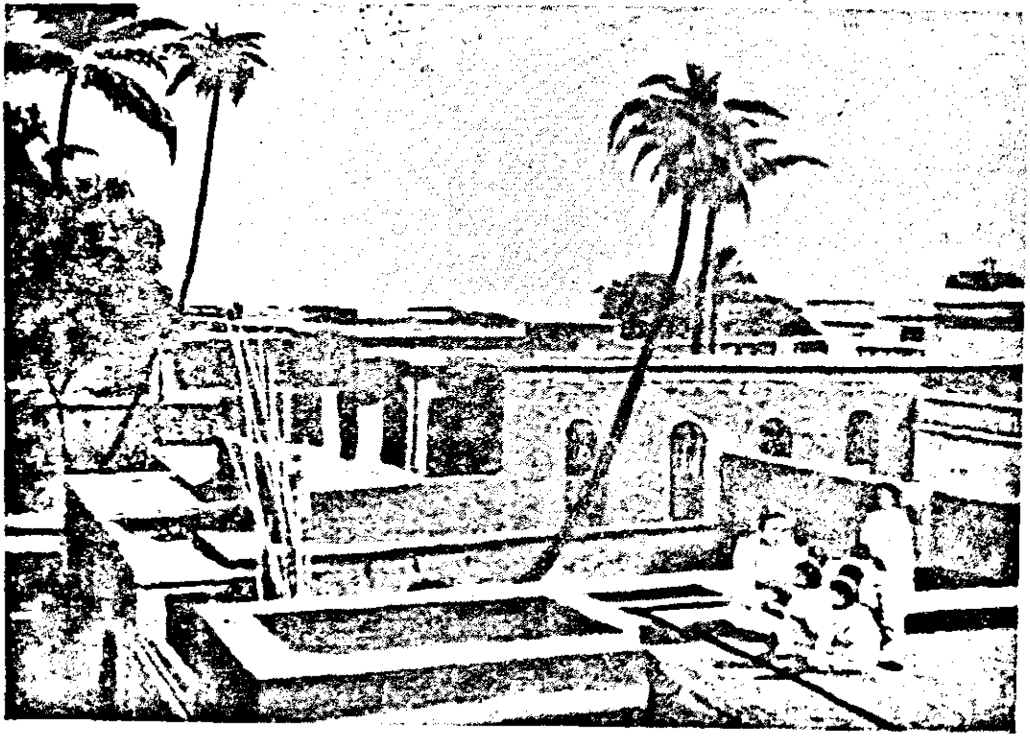
১৮৯৯—ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুল বাড়ি



বামদিকের গৃহে ১৮৯৯ সালে ভগিনী নিবেদিতা বাস করতেন



ছাদে—একাকিনী



এক মধ্যাহ্নে শিশুদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

জাতীয়তাবাদের রূপায়ণে চারুকলার ভূমিকা

নিজস্ব আধ্যাত্মিক অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টায় এবং সামনে যে কর্তব্য রয়েছে তা পালনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ভারতে আপনা থেকে রূপ নিচ্ছে জাতীয়তাবোধ। সব দিক থেকে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, আর এমনও হতে পারে ঐসব পুনর্বিন্যাসই করতে গিয়ে আমরা এক জাতিতে পরিণত হব, সত্যি সত্যি আমরা তা হচ্ছিও। কারণ এই পরিবর্তন স্ববিনাশী নয়, তবে লক্ষ্যহীন অথবা ভুল উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং ঠিক এর থেকে জাতীয়তাবাদের আদর্শ, বিবেকের নির্দেশ ও নৈতিক দৃঢ়তার প্রচণ্ড প্রেরণা নিয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। সংগ্রামের সমুদ্রের যেদিকেই তাকাই না কেন আমরা দেখতে পাই, "আমরা এক জাতিবদ্ধ হব" এই চিন্তাই দোদুল্যমান সমুদ্রযাত্রীদের মাথার উপর ধ্রুবতারার মত দীপ্যমান।

উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় নারীত্বের শিক্ষা ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যেতে পারে। এখানে কি নববিকাশের কোন সম্ভাবনা আছে? থাকলে তা কোন পথে? ক্রমাগত যে দ্রুত পদ্ধতিতে হতাশা ও নাশের দিকে আমরা চলেছি সব কিছুর মূল্য তার থেকে নিজেদের রক্ষা করাই আশু প্রয়োজন, এবং আরো প্রয়োজন নিজেদের দৃঢ় ও সুসংহতভাবে আত্ম-সচেতন, বিবেকবান ও আত্ম-সংযমী হিসাবে একসূত্রে গ্রথিত করা। এও বলা চলে জাতীয়তাবাদের অভিপ্রায় আমাদের এক প্রশ্নের অবিলম্বে উত্তর দেয় এবং পথ দেখায়। পরিবর্তন একটা আসবেই। জগতে নিয়তি যে ঘটনাপ্রবাহের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে তাতে এক প্রথা থেকে আর এক প্রথায় ভেসে যেতে ভারত কি একাই অস্বীকার করবে? স্বাধীনভাবে ধীরস্থিরভাবে, আপন ইচ্ছা ও বিচার অনুযায়ী জগতের কোন্ পরিবর্তন আমরা সাধিত করতে পারব। কোন্ পরিবর্তনের পরিণতি আমাদের পছন্দ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘটবে। বহু শতাব্দী ধরে সীতা, সাবিত্রী, রাণী অহল্যাবাঈ বা ত্রিপুরার জাহ্নবীর আদর্শে রচিত ভারতীয় নারীত্বের কি অধোগতি হবে ছলনাময়ী আর বিবাহবিচ্ছেদকারিণী সৃষ্টি করে? ভারতের পদ্মিনীর স্থলাভিষিক্তা হবে কি গ্রীসের হেলেন? পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে, না হলে ভারতের অতীতের গৌরবময় কার্যাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরিবর্তন হবেই হবে। তবে প্রাচীন পবিত্রতার থেকে গ্রহণ না করেই নূতন শিক্ষার সাথে যুক্ত হবে প্রাচীন মর্যাদা ও জ্ঞান। সুবিশাল দায়িত্ব আরো খাঁটি আরো পবিত্র করবে, নূতন ও মহৎ প্রেমের উৎসই হবে সুগভীর জ্ঞান। বর্তমান প্রজন্ম এই আশাকেই সযত্নে লালন করবে যে তারা সর্বমঙ্গলা মায়ের হাতখানি দেখতে পাবে যা ভাবী নারীত্বের আদলে গঠিত। নব চেতনার প্রত্যূষে সুদূর অতীতের স্বপ্নের প্রদীপ শিখাখানি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। তা কতই না সুন্দর ও মহৎ।

স্ত্রীশিক্ষা হচ্ছে বহু প্রশ্নের মধ্যে একটি মাত্র। সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও আমরা যে এখন নতুনতর উন্নয়নের পথে রয়েছি একথা বহুল প্রচারিত। সামাজিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ যেমন, আমরা বিশেষ বিশেষ কতকগুলো অব্যবহিত রূপান্তরের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে উত্তেজিত হয়ে রয়েছি অনেকদিন ধরে। কিন্তু সম্ভবত প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে আমরা এখনো যথোপযুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি। সম্ভবত আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানও নেই (নজর রাখা উচিত, যে সমগ্র বিশ্বে কিংবা জীবনে এই ধরনের জ্ঞান সংগ্রহ করাই সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার) নেই প্রয়োজনীয় দায়িত্ববোধ, সর্বোপরি নেই বিদেশী সমালোচনা ও উপদেশ থেকে সরে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবকাশটুকু, কেন না, এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদৌ যদি আমরা কখনো কোন মতে উপনীত হই যা কিনা বাস্তবিকই আমাদের নিজস্ব, সেসব ক্ষেত্রে ঐসব উপদেশ ও সমালোচনা আমাদের আবার না পেলেই নয়। বস্তুতঃ অন্যান্য আরো অনেক কিছুর মধ্যে আমাদের ভিতর জাতীয়তাবোধ যে ক্রমশঃ গড়ে উঠছে সেটা যেন একটা সার্বভৌম মানসিক শক্তির একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। একটি প্রাণীর দেহে বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিজস্ব ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের মতো এই ব্যাপারটা। এই ভাবাদর্শের গ্রন্থিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সমাজ ও নিজস্ব ভবিষ্যতের বিভিন্ন সমস্যারাশি নিয়ে জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হতে পারি।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রসঙ্গে এটা যতটা প্রয়োজনীয়, তত আর কিছুতেই নয়। ধরে নেওয়া যাক যে ভারতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই অতীত ও বর্তমানের প্রশ্নটি বিবেচনা ও প্রাক নির্দিষ্ট করার মনোভাব দেখা দিল জাতীয় মেধার মধ্যে। তাহলে কিসের খোঁজই বা করতে হবে? আর কিই বা স্থিরীকৃত করতে হবে?

হিন্দুধর্মের একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি একটি অল্পবিস্তর রূপকধর্মী মহান চিন্তাধারা। প্রতিটি কৃষক, দীনতম ব্যবসায়ীও কোন চিত্র, কোন পাত্র, অথবা মূর্তি এমন কি যে কোন ধরনের কারুকার্যখচিত প্রতীককেই বুঝতেও পারে, ভালোও বাসে। ইতালীর ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়ে থাকে, এদেশেও তেমনই কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিখুঁত। অধিকন্তু মূর্তিপূজার সুপ্রাচীন অভ্যাস দৃষ্টি থেকে হৃদয়াভিমুখী পথটিকে সরল, সংক্ষিপ্ত ও বহু পরিক্রান্ত করে তুলেছে। আবার এই প্রতীকধর্মিতার আবেদনটি বিশ্বজনীন। কি ভাষায় বলা হল, কিংবা পাঠক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কিনা তাতে কিছুই আসে যায় না। চিত্রকলা তার কাহিনী নিজেই বলতে পারে, এবং, তা পারে অভ্রান্তভাবেই। সন্ধ্যার আগে নদী থেকে প্রত্যাবৃত্তা গৃহিনীর নিজের গৃহের দরজাটি চেনে নেবার জন্য চৌকাঠের উপর রাখা প্রজ্বলিত দীপশিখাটি, দেউড়ি অবধি কোন রকমে জড়ো করা কর্দমাক্ত শস্যস্তূপ, তুলসীমূলে প্রদীপ, সূর্যাস্তের প্রাক্কালে গ্রামের দিকে ফিরে আসা গরুর পাল প্রভৃতি দৃশ্য

প্রতিটি ভারতীয় চিত্তে একই বাণী বয়ে আনবে। এইভাবে চিত্রশিল্প আমাদের কাছে মহান এক সাধারণ বাণীর সুযোগ তুলে ধরছে ; সেজন্য আমাদের মাতৃভূমির উন্নয়নের জন্য এক পুনর্জন্ম তথা পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য। কেন না চিত্রশিল্পের অনেকগুলো মহান নবযুগের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় রয়েছে যার প্রভাব এখনো মুছে যায়নি। এ্যালিফান্টার ভাস্কর্য যে যুগের সেই যুগ ছিল হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। যে ক্ষমতা দ্বারা অংকিত হয়েছিল অজন্তার চিত্রাবলী তা ছিল আধুনিক বস্তুবাদী যে কোন গোষ্ঠীরই অনুরূপ স্বাধীনচেতা ও উপভোগ ও প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে সমান রকম সজীব। সাঁচী, অমরাবতী ও গান্ধারের স্থপতি ও খোদাইকরেরা শিল্পের একটা অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনকে উপভোগ করেছেন, পর পর অনেকগুলো শতাব্দীর মধ্য দিয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিরাট বিরাট পর্যাবৃত্ত ঢেউ দিয়ে সেই বিবর্তন চিহ্নিত হয়ে আছে। নিজস্ব স্থাপত্য উদ্যোগগুলিকে বাদ দিলে এমন কি মুসলমান সাম্রাজ্যও শুধু রূপের পরিবর্তনই ঘটিয়েছে—তারা কখনও ভারতে সৃজনশীল শিল্পকলার প্রক্রিয়াকে চেপে রাখবার চেষ্টা করেনি। বাঁকীপুরের লাইব্রেরীতে ব্যাখ্যাকর পাণ্ডুলিপিগুলো যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই এর সাক্ষ্য দেবেন।

সুতরাং, জাতীয়তাবাদের যুগকে এই সব নবযুগের প্রতিটির শক্তিকেই নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। অতীতের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ রয়েছে তাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারার মধ্যেই সর্বদা থাকে নতুন নতুন বিজয়ের চাবিকাঠিটি। উত্তরাধিকার-হীন মানুষের কোন ভবিষ্যৎও নেই। আধুনিক যুগের ছাত্রকে একথা জানতেও হবে, বুঝতেও হবে। কেন না তাকে হঠাৎ করে পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে জরীপ করার অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তার পিতৃপুরুষের মতো করে তার নিজের গোষ্ঠীর লোকেরা যা করেছেন সে সব জিনিসের কল্পনাতেই সীমায়িত থাকতে হচ্ছে না। গ্রীসের সঙ্গে ঈজিপ্টের শিল্পকলা কিংবা আধুনিক ফ্রান্সের শিল্পকলার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইতালী বা হল্যান্ডের শিল্পকলাকে তুলনা করে দেখার সুযোগ তার রয়েছে। এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের অবস্থান বিন্দুটি যদি তার জানা থাকে, তা হলে এটা এক ধরনের বন্ধনমুক্তি। কিন্তু যদি তার সেটা জানা না থাকে, তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা একা বেড়ে ওঠার পক্ষে এখনও অনুপযুক্ত কোন চারাগাছের চারপাশ থেকে রক্ষাকারী বেড়াটা সরিয়ে নেবার মতো।

কেন না, শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে উচিত নয় নতুন যা কিছু তাকে গ্রহণ করতে অথবা বিবেচনা করে দেখতে অরাজী হয়ে শুধু পুরোন দিনের পথকেই আঁকড়ে ধরে থাকা। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ভারতীয় জনসাধারণের ভারতীয় প্রথাসিদ্ধ শিল্প-কলায় দীক্ষিত, ভারতীয় অনুষঙ্গে তাঁরা সংস্কৃতিবান, এবং তাঁদের কাছে ইতালী অথবা গ্রীসের প্রথা অথবা অনুষঙ্গের মাধ্যমে কথা বলার ইচ্ছে যেমন অর্থহীন তেমনি খারাপ। কোন ভারতীয় চিত্রকে যদি বাস্তবিকই মহান ও যথার্থই ভারতীয় হয়ে উঠতে হয়, তা হলে তাকে ভারতীয়

হৃদয়ের কাছে ভারতীয় পন্থাতেই আবেদন জানাতে হবে—এমন কোন বাণী তাকে বহন করতে হবে যা হয় সুপরিচিত অথবা তাৎক্ষণিক অবধারণযোগ্য। উপরন্তু সেটিকে যদি খুব উঁচুদরের কিছু হয়ে উঠতে হয়, তা হলে তাকে দর্শকের হৃদয়ে মহত্তম কোন অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু একাজ সম্পন্ন করতে হলে, একথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, সেই শিল্পকীর্তিটিকে এমন সব উপাদান দিয়ে গঠিত হতে হবে যা কিনা নিজেই সাম্প্রদায়িক রুচির অনুমোদনপ্রাপ্ত। এ ভাবেই ওড়িশার প্রস্তরখোদাই দ্বারপথসমূহ অথবা দক্ষিণী মন্দিরগুলির পেটা রুপোর কারুকার্য যে ভারতীয় মানুষটি নিরীক্ষণ করেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি সুন্দরের মহান ভাষাটির দখলদারী পেয়েছেন নিজের মধ্যে এবং সেই ভাষায় তিনি যখন বলবেন কিছু, ভারতের মধ্যে সবাই তাঁর কথা বুঝতে পারবে, ভারতের বাইরে পারবে শুধু তারাই যারা যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত কিংবা যথেষ্ট সহজাত উপলব্ধি ক্ষমতার অধিকারী। এই ভাষা তিনি বলবেন নিখুঁতভাবে—কেন না তিনি নিজেই এর প্রতিটি পংক্তি ও বাঁক উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু একটা ওড়িশী বহিরঙ্গ চিত্রণে তিনি যতটা দক্ষ, ঠিক ততটাই দক্ষতা তিনি দেখাতে পারবেন *অন্য কোন ক্ষেত্রে ধরা যাক কোন গথিক গবাক্ষের ক্ষেত্রে ?* নিশ্চয়ই না। বিদেশী ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব ভূমির শিক্ষিত ছাত্র ও নিপুণ শিল্পী হিসাবে তিনি ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারেন, এমন কি তাঁর শৈলীতে এমন সব গ্রাম্যতা দোষ ঘটতে পারে যা, গথিক স্থাপত্যের জগতে বড়ো হয়ে উঠেছেন এমন সব মানুষের চোখে তাঁর শিল্পকর্মকে একেবারেই নষ্ট করে দিতে পারে। বড়োজোর যা ঘটতে পারে, তা হল এই, বিদেশী অনুকরণকারী একটি হবু-গথিক কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, ঠিক যেমন কোন ইংরেজ বা জার্মান উৎপাদক তার কাপড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কোন হবু-ভারতীয় নক্শা। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এমন কি যে সব উপাদান দিয়ে কোন ছবি তৈরী হয় সেগুলো পর্যন্ত একটি ভাষার মতো। ঠিক যেমন কোন প্রকৃত কবিই স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী ভাষায় তার সব কটি কবিতাই রচনা করতে চাইতে পারেন না, তেমনি কোন চিত্রশিল্পীই গুণগতভাবে চিরায়ত কোন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে পারেন না যদি না তাঁর চিত্রাবলী জনচিত্তের উপলব্ধির পরিভাষায় আশ্রিত না হয়। যে কোন মহৎ অভিব্যক্তিই—তা লেখা, আঁকা, ভাস্কর্য অথবা আর যা কিছুই হোক না কেন, সেটি কোন না কোন মাত্রায় মানবিক সহানুভূতির জন্য কোন মানবচিত্তের উচ্চ-উচ্চারণ ; আর, কোন অপরিচিত ভাষায় মানুষ এভাবে উচ্চারণ করে না।

কিন্তু আমাদের নিজের দেশেরই বৈশিষ্ট্যব্যাঞ্জক হচ্ছে আমাদের শৈলীর উপাদান-গুলি, এ দ্বারা কিন্তু এমন বোঝায় না যে তা বিশ্বজনীন আবেদনের মহত্বলাভের পরিপন্থী। কোন বিদেশী যদিও ওড়িশী দ্বারপথ সৃষ্টি করতে পারবে না, কিন্তু সেটি সে উপভোগ করতে পারবে। চরম সৌন্দর্য সমগ্র মানবজাতিই উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের কেউই পারবেন না কোন মিশরীয় প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করতে,

কিন্তু যখনই আমরা এরকম কোন মন্দির দেখতে পাই—আমরা সকলেই তারিফ না করে পারি না। এটি এর নিজস্ব বিন্যাস থেকে উদ্ভূত। এটি সেই বিন্যাসকেই ব্যক্ত করছে, এবং এর মহত্তর ও সাধারণ গুণগুলি সকলের সঙ্গেই কথা বলছে। সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, এর মতো আরেকটি তৈরী করতে হলে, যে সব মানুষ এটি নির্মাণ করেছিল তাদের মতো সর্বতোভাবে আমাদের বাঁচতে হবে, অনুভব করতে হবে, আশা ও প্রার্থনাও করতে হবে সেই মতো। এবং, এর জন্যই নিঃসন্দেহে আমরা এটিকে ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না কিংবা উপভোগ করতে পারছি না, যেমন পারতো সে কালের লোকে। কেননা ভাববিলাসীদের সমস্ত প্রাপ্ত তত্ত্ব সত্ত্বেও এটাই সত্যি যে ব্যবহাররত কোন প্রাসাদের তুলনায় কোন ধ্বংসাবশেষ কখনোই অত সুন্দর হতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বিষয়গুলির মতো প্রিয় আর কোন কিছুই নয়।

সে যাই হোক, কিভাবে কোন চিত্রে স্থানীয় ও সীমিত উপাদানের উপরে কোন বিশ্বজনীন উপাদান বিজয়ী হয়ে ওঠে তার উদাহরণ হিসাবে মাতা মেরী ও শিশুর চিত্রাবলী, হিন্দু সংস্কারে ক্রমশঃ স্থান করে নিচ্ছে তার কথা ধরা যেতে পারে। এ রকম কোন ছবির দিকে দৃকপাত মাত্র না করে চিৎপুর রোড দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্ট যে সাধারণ মালিকের কাছে এর আবেদন হচ্ছে এর পরিকল্পনার অন্তরঙ্গ মানবিকতার দিকটি, সঙ্গে রয়েছে উজ্জ্বল সরল রঙের আকর্ষণ। এই বিষয়বস্তুটির বিদেশিয়ানা তার সহানুভূতির পথে প্রতিবন্ধক রচনা করেছে। এ কথা সত্যি যে মালিকটির জানা আছে এই চরিত্রদুটির মান, কিন্তু ব্যস্ ঐ পর্যন্তই, তার বেশি আর কিছু সে জানে না। সে তাদের একত্র *দৈনন্দিন জীবন মানসচক্ষে দেখতে পায় না।* সেই স্বর্গীয় শৈশবের সম্বন্ধে কোন কাহিনীই জানা নেই তার। তথাপি, এটি হচ্ছে সর্বোপরি এক জননী ও তার সন্তানের চিত্র—যা কিনা সমগ্র পৃথিবীর কাছেই অবধারণযোগ্য। *দৈনন্দিন জীবনের এটা ওটা হাজারো ঘটনা সর্বত্রই ঘটে থাকে,* যেমনটি ঘটেছিল এদের ক্ষেত্রে। সুতরাং এই মহৎ শিল্পের মানবিক দিকটি স্থানীয় দিককে ত্রাণ করল। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক তো অনুরূপ মহৎ কোন শিল্পকর্ম, যাতে রয়েছে এমনটি সরল, প্রত্যক্ষতা এবং যা রাজসিক ও সুকোমল অন্তরঙ্গতায় অনুরূপভাবেই পরিপূর্ণ; তার বিষয়বস্তু যদি হয় কোন ভারতীয়া জননী ও তাঁর শিশু? ভক্তগণ কি তাকে অধিকতর ভালোবাসবেন না?

জয়পুর যাদুঘরের দেয়ালে যে সব চিত্র আঁকা রয়েছে সেগুলো যিনিই নির্বাচন করে থাকুন, তিনি ভারতীয় চিত্রকলার অতীতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে এগুতে হলে কোনটি হবে তার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই সব ছবির মধ্যে একটি নেওয়া হয়েছিল কোন জ্যোতিষ্মান পাণ্ডুলিপি থেকে, তবে মূল আকার থেকে পঞ্চাশ অথবা একশ গুণ বড়ো করেছেন অনুকৃতিকারীরা—ছবিটিতে

আছে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার সেই মহান দৃশ্যটি। চিত্রটি সোনালী ও রক্তবর্ণের আগ্নিচ্ছটায় দীপ্ত, তাতে রয়েছে প্রচুর প্রতিকৃতি, প্রচুর গতি—সৌন্দর্যের এক অসামান্য নিদর্শন। এ কথা সত্যি, আমরা যাকে বলি চিত্রানুপাত সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে এমন-ভাবে কোন আধুনিক চিত্রকরই আঁকতে পারতেন না; কিন্তু, একথাও তেমনই সত্যি, যে, আজ অবধি যত যত আধুনিক চিত্রকর এসেছেন, গীর্জার চিত্রকরদের যুগ থেকে আজও পর্যন্ত যত চিত্রকর—তাঁদের কেউই পারতেন না এই একই জায়গাকে জীবনের ও নকশার এমন মহিমা দিয়ে ভরে তুলতে। এবং একথাও নিশ্চিত যে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যা হীনতর এমন সব গুণ অর্জন করার জন্য ভারত এই সব মহান বৈশিষ্ট্য হারাতে চায় না।

সব মহান শিল্পীরই অবশ্য একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্ম অবনমন না ঘটিয়েও নবলব্ধ জ্ঞানকে স্বীকরণের ক্ষমতা। এই দ্যূতক্রীড়া দৃশ্যটির স্রষ্টাও নিশ্চয়ই ভালোই বুঝতে পারতেন যে অদৃশ্যমান বিন্দুসমূহ ও দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল সম্পর্কে অতিরিক্ত একটু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কি ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারত। তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মেই হয়তো এই জ্ঞানের একটা ছাপ থেকে যেত, কিন্তু তার জন্য তাঁকে তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ও রঙের শুদ্ধতাকে বিসর্জন দিতে হ'ত না, কিংবা তাঁর মহিমা ও প্রশান্তি, বিশেষ কোন ভাবাভিব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরবার বিশেষ ক্ষমতা অথবা কোন একটা চিত্রকে, মণ্ডনশিল্পের নিদর্শন করে তোলার শক্তি—কোন কিছুকেই বলি দেবার প্রয়োজন হত না। শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রকরণ বলে একটা জিনিস আছে, ভারতের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব প্রকরণের সঙ্গে ইউরোপীয় প্রযুক্তি-জ্ঞানকে শুধু যোগ করে নেবার প্রয়োজন। একথা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, সঠিক দৃষ্টিকোণ শুধু ইউরোপেরই একান্ত বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি কোলকাতার আর্ট গ্যালারীর জন্য কেনা হয়েছে রাম-সীতার অভিষেক নামধেয় ছোট্ট একটা ছবি। এই সুন্দর ছোট্ট ছবিটিতে রয়েছে সিংহাসনের পিছনে অযোধ্যার প্রাসাদ, প্রাসাদের পিছনে নদী তাতে রয়েছে জাহাজ, রয়েছে মাঠ, দৃষ্টিগোচর সৈন্যদল আরো কত কি! এবং এই প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে অঙ্কিত এই শিল্পকর্ম—সুবিধের খাতিরে যাকে আমরা লক্ষ্ণৌশৈলী বলে পরিচয় দিতে পারি তাতে এই দৃষ্টিবোধ অর্থাৎ পার্সপেকটিভ্ যথেষ্ট নিখুঁত, সেইসঙ্গে এতে রয়েছে পরিকল্পনা বা নকশার পারিপাট্য, টুকিটাকি তুলির ছোঁয়ার সুসামঞ্জস্য—যার জন্য এর পূর্বসূরীদের সেরা শিল্পকর্মের সমান যোগ্যতা রয়েছে এই চিত্রের। কোন অনামী মহৎ স্রষ্টার রচনা এই অযোধ্যার প্রাসাদের চাইতে মধ্যযুগীয় কোন ডাচ চিত্র অধিকতর পঙ্খানুপুঙ্খ নয়। প্রাসাদটি শ্বেতমর্মরে তৈরী—বেশির ভাগটাই আকাশের দিকে উন্মুক্ত; ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখলে দেখা যাবে গরু চরছে মাঠে, জিন লাগানো ঘোড়াগুলো আস্তাবলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি উট ও হাতী ও নিশান যথাস্থানে স্থাপিত, দিগন্ত অভিমুখে প্রশংসনীয়ভাবে সমকেন্দ্রাভিমুখী অট্টালিকা ও হর্ম্য শ্রেণীর সুদীর্ঘ সারি—যেন স্বপ্নে দেখা কোন স্বর্গীয় নগরী।

কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্প যদি ইতিমধ্যেই এত অসংখ্য ও মহান বৈশিষ্ট্যনিচয় আয়ত্ত করে থাকে, প্রশ্ন করা যেতে পারে যে তা হলে ইউরোপীয় চিত্রকলায় এমন কি গুণ রয়েছে যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষার্থী নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এসে এমন সব প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন, এ যাবৎকাল যেগুলোর অধিকাংশই কু-পরিকল্পিত বলে গণ্য হয়েছে—সম্পাদনায় অকিঞ্চিৎকরতা ও তুচ্ছতার দরুন ? শতকরা নব্বইভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী জবাব দেবেন যে ইউরোপীয় চিত্রকলার বিরাট লাবণ্য ও আকর্ষণই তাদের প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা, পাশ্চাত্যের শিল্পের পক্ষে এটা নিতান্তই স্তুতি, কিন্তু এই চিত্রকলার সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান গভীর তিনি তলিয়ে দেখে নেতিসূচকভাবে মাথা নাড়েন। এই "প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা"—যার সম্বন্ধে তরুণ শিক্ষার্থীরা এত উচ্ছ্বসিত অ আসলে কাঠিন্য ও রুক্ষতা। আত্মার ক্ষেত্রে যেমন, প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তেমনিই সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য হচ্ছে আত্মিক ও ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি যত গ্রীক শিল্প নিদর্শন দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যা লেগেছে, তা কিন্তু হাইনে যাকে বলেছেন, "আমাদের প্রিয় মাইলোর মহিলা" সেটি নয়, বরং একটা ফুলদানীর গায়ে আঁকা চিত্র থেকে নিয়ে মিস জেন হ্যারিসন যে রাজহংসের পৃষ্ঠোপরি আসীনা কুমারীর চিত্র এঁকেছেন সেটিই সর্বাপেক্ষা রমণীয়। কুমারীর কেশরাজি চূড়ার মতো আঁট করে বাঁধা, তার সূক্ষ্ম লঘুপক্ষ চেহারাটির প্রতিটি জিনিসই ক্ল্যাসিকের বদলে বরং পিউরিট্যানেরই ব্যঞ্জনাময় কোন মিষ্টি 'এলেন' 'গ্রেশেন' অথবা 'ঊষাবালার' মতো। হয়তো এমন মানুষরা এর স্রষ্টা যাঁরা প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে স্থূল ঠেলে ওঠা মাংসপেশীর মধ্যেই মাত্র সৌন্দর্য সীমায়িত নয়, এর প্রতিটি স্তরেই এই সৌন্দর্যকে খুঁজে নেওয়া যায়। অনুরূপভাবে বর্তমানের প্রজন্মের ছাত্রদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে সম্পদ, স্বাস্থ্য ও যৌবনের প্রগল্ভ লাবণ্যের চেয়ে কোন হিন্দু বিধবার বিলীয়মান হাসি ও গভীর স্থায়ী বিষাদমাখা ক্লান্ত মুখখানির ছবি আঁকার তাৎপর্যও যেমন বড়ো, তা আঁকাও দুরূহতর। ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের অভিজ্ঞ সমালোচক ভালোভাবেই জানেন এর সত্যতা এবং তিনি সিস্টাইন ম্যাডোনার চিত্রেও যা দেখেন তা কিন্তু একজন সুন্দরী রোমান রমণীর চিত্রই নয়, বরং মানুষ রাফায়েলের মনটি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই তাতে প্রতিফলিত। চিত্রকলা কিন্তু আলোকচিত্র নয়। কলা নয় বিজ্ঞান। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নয় অনুকরণ মাত্র। লক্ষ্ণৌ ও কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তি মনোহর হলেও তারা উচ্চস্তরের কোন ভাস্কর্যের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না। কিন্তু, প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য যদি চিত্রকলার সর্বোচ্চ মাপকাঠিও হয়, সেক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌর গ্যালারীতে ঝুলন্ত অযোধ্যার নবাবগণের প্রতিকৃতিগুলির ক্ষেত্রে কি বলা হবে ? একথা ঠিক, যে এই সব বিরাট বিরাট ক্যানভাস ছোট্ট ছোট্ট ছবি থেকে অনুকৃত। কিন্তু এগুলোর চাইতেও অধিকতর মনোগ্রাহী কোন প্রতিকৃতি কি কেউ দেখেছে কখনও ? দিল্লী থেকে প্রেরিত দেশকালের ঊর্ধ্বে নয়ন মেলে থাকা সেই প্রথম রাজপ্রতিনিধিটি থেকে শুরু করে আশার অসীমত্ব সম্পর্কে ধারণা

সম্পন্ন শেষটি পর্যন্ত—এই তালিকার প্রতিটি মানুষ আমাদের সামনে যেন সজীবভাবে দাঁড়িয়ে। এই রাজাদের মধ্যে মহত্তম আসফউদ্দৌল্লা বা 'সুপ্রিয়'র প্রতিকৃতিটিই সম্ভবত এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম আগ্রহোদ্দীপক। কিন্তু তাঁরা সকলেই আছেন সেখানে। এমন কি সর্বশেষ সার্বভৌম নৃপতিটির সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতিটিকে তাঁদের বহুমূল্য সম্পত্তিরূপে লালন করে থাকেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য চিত্রকলারই একক-ভাবে বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু কোন না কোন মাত্রায় সর্বত্রই এর সবরকম বিকাশকে চিহ্নিত করে রাখে। বাস্তবিকই যে কোন মহৎ চিত্র দেখার আনন্দের মুখ্য অংশই হল তার মধ্যে আমরা প্রকৃতিকে দেখতে পাই ঠিক যেমনভাবে চিত্রকর তাকে দেখেছিলেন; আমরা নিজেরা যতটুকু ধরতে পারতাম তার চাইতে অনেকাংশেই এর সৌন্দর্য অনেক মহান। অজন্তার উপরে লেখা গ্রিফিথের বইতে গুহাভ্যন্তরের দেয়ালচিত্র থেকে গৃহীত একটি চিত্রাংশ আছে, যাতে রয়েছে একটি রমণী একটি দেবমূর্তির পা আঁকড়ে ধরে আছে। চিত্রটিতে আমরা এমন একজন শিল্পীর কাজ দেখতে পাচ্ছি যিনি দুটো স্বতন্ত্র গুণকে অপূর্বভাবে সমন্বিত করেছেন। তিনি গ্রীকদের চোখ দিয়ে মানবদেহকে দেখেছেন, তেমনি গোলগাল, বলিষ্ঠ এবং মহান শৌর্যসম্বলিত। আবার তিনি আত্মাকে দেখেছেন মধ্যযুগীয় ক্যাথলিকের চোখ দিয়ে, তেমনি এক প্রার্থনার যন্ত্রণাদিগ্ধ হৃদয়ে। হয়তো বা এ ধরনেরই সমন্বয় ও প্রতিফলনের ক্ষমতাতেই নিহিত রয়েছে ভারতীয় চিত্রকলার ভবিষ্যৎ কেন না নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মানবদেহকে জানা এবং অদম্য আবেগের অভিব্যক্তি। টিকে বিশেষত প্রার্থনার ক্ষেত্রে সঠিক চিনে নিতে পারা, এ দুটো মহান সুযোগই হচ্ছে এ দেশের অর্ঘ্য।

কিন্তু তা হলে ইউরোপীয় চিত্রকলায় এমন কি আছে যা ভারতীয় চিত্রশিল্পীকে প্রলুব্ধ করে? আমার নিজের ধারণা, ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীর কাছে পাশ্চাত্য চিত্রধারণা যে সুযোগ এনে দেয় তার মধ্যেই এ আকর্ষণ নিহিত রয়েছে। পাশ্চাত্যে শিল্পকর্ম কোন কারিগরের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত পেশামাত্র নয়, অন্ততঃপক্ষে আধুনিকযুগে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটি ভাষা যার মাধ্যমে মহান মনের অধিকারীরা বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করতে পারেন। বস্তুত এটি কবিতারই প্রকরণ ভেদ, এবং সে জন্যই যখন এবং যেমনভাবেই আসুক না কেন এটি প্রেরণার বশবর্তী। ভারতবর্ষে কিন্তু এর বিপরীত; শিল্পকে এখানে সর্বদাই কারুশিল্প হিসেবে দেখা হয়েছে কিংবা দেখার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সে জন্যই মোটামুটিভাবে এটি বিশেষভাবে কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জাতিগত বা সম্প্রদায়গত শিক্ষার একটা সুবিধে আছে এই যে পুরুষাণুক্রমিক-ভাবে দক্ষতার একটা সংহতি ঘটে এর দরুন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্যাকরাদের ক্ষেত্রে বহিরাগত শ্রমিকদের অকস্মাৎ অনুপ্রবেশের দরুন রুচি এবং জ্ঞানের একটা

অবনমন আমরা সহজেই ধরে ফেলতে পারি। কলকাতায় রঞ্জনশিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবনমন ঘটতে পারে। কেন না নিঃসংশয়েই বলা যায় যে এখন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষাণুক্রমিক কারিগরীর রুচি এবং বিচারশক্তিকে কোণঠাসা করে এখন নতুন ও অপরিক্ষিত আভাকে নিয়ে যা চলেছে তা হচ্ছে রঙের ক্ষেত্রে যারা অশিক্ষিত তাদেরই মনোভাব এবং তারাই এখন প্রধান। সে জন্য রঙের ঔজ্জ্বল্য ও দুঃসাহসিকতা সত্ত্বেও ভারতীয় রঞ্জনশিল্পে আগেকার সৌন্দর্যের বদলে এখন যা এসেছে তা যুগপৎ হাসি ও অশ্রুর উদ্রেক করে।

অপরপক্ষে এ ধরনের সকল ক্ষেত্রেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিক্ষেত্রেই প্রাচীনতর শৈলীর একঘেঁয়েমী পরবর্তীকালে আকস্মিক ও বিশ্বজনীন বেপরোয়াভাবের পথ কেটেছে। কেন না পুরুষানুক্রমিক সমবায়সংঘ দ্বারা অনুসৃত শিল্পকলা এক অসহনীয় স্থিতাপ্রবণ, অবশেষে যতক্ষণ না সে সম্প্রদায়ের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নতুন নতুন আদর্শের খোঁজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অসংখ্য প্রথায় আকীর্ণ হয়ে থাকতে চায়। এ কথা চিত্রকলার ক্ষেত্রে অসংশয়ী সত্য, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের ক্ষুদ্র প্রতিলিপিগুলো পুরুষানুক্রমিক চাতুর্যে পুষ্টকুশলী প্রতিকৃতি হতে পারে কিন্তু এইগুলোর মধ্যে নতুন উপাদানের অভাব বস্তুত এমন সব উপাদান সৃষ্টি করর সুযোগ ও ক্ষমতার অভাব এই সব চিত্রশিল্পীদের মনে কখনো কোন মহান শ্রেণী সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পারে না, কেন না জাতিসূত্রে জন্ম নেয় অভ্যাস এবং অভ্যাসকুশলতা বৃদ্ধি করলেও কল্পনাশক্তিকে সীমিত করে তোলার দিকে প্রবণতা।

বিশেষ একটি মাত্র সম্প্রদায় থেকে না নিয়ে সামগ্রিকভাবে জাতিগতভাবে চিত্রশিল্পী-গোষ্ঠীকে ধরা যায় যদি তা হলে যে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি আমরা আশা করব তা হচ্ছে কল্পনাশক্তির বিশালতা ও স্বাধীনতা, এইসব চিত্রশিল্পীরা তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচন কিংবা অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনভাবেই সীমায়িত নন। এ কথা সত্যি যে এরা এদের পূর্বসূরীদের মত দক্ষ কারিগর কেননা সমস্ত চিত্রশিল্পীরা মুখ্যত দক্ষ কারিগর, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা কবি, স্বপ্নবিলাসী এবং ভবিষ্যতের প্রবক্তাও বটে। সামাজিকভাবে বিচার করলে তাই আমাদের ভারতে চিত্রকলা একালে একটা বিরাট উত্তরণের মধ্যে উন্নীত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইউরোপে অনুরূপ উত্তরণকালে মহান চিত্রশিল্পী গিয়োতো তার কালে সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে,—দান্তে প্রতিভার ছায়ায় আচ্ছন্ন ফ্লোরেন্সে লুপকে এর সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, "প্রস্তরে খোদিত একটি ডিভাইনা কমেডিয়া"। এ রকমভাবেই তাই সর্বদা চিত্রশিল্পীরা সম্প্রদায়গত প্রথার থেকে মুক্ত হয়ে যান, যাতে করে তাঁরা মহত্তর কোন প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন যা কিনা তাঁদের কালের মানস এবং হৃদয়। সর্বোচ্চ শিল্প-কলাতে মননগত এবং আবেগগত প্রতিফলনের সঙ্গে আত্মিক নিবিড়তা বিশেষভাবে মিশে থাকে। তার মানে এই যে এরজন্য প্রয়োজন গভীরতম ও সূক্ষ্মতম ধরনের

শিক্ষা, যে মানুষ তার যুগের সমগ্র সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি তিনি কখনোই সে সংস্কৃতির অত্যুচ্চ অভিব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারেন না। যে মানুষের নিজের জীবন সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের টানা-পোড়েনে ক্লিষ্ট নয় তিনি কিছুতেই তাঁর আশে-পাশের সকলের গোপন ও গভীর আশার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থটিকে উচ্চারণ করতে সমর্থ নন।

সমাজের গৌরবময় যুগগুলোতে একটি বিশেষ চিন্তাই সকল শ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সর্বত্র ছিল একই মন, একই উদ্দীপনা। এবং আদর্শের এই একত্ব সর্বোচ্ছ্বাসী জোয়ারের মত গোপনতম প্রান্তে কর্মরত কর্মীকেও এমন ভাবেই উদ্বেল করে তুলত যতক্ষণ না তিনি জাতীয় উদ্দীপনার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এ্যালিফ্যান্টার খোদাইকাজ বা অজন্তার চিত্রকলার মহত্ত্বের পিছনে রয়েছে এই তথ্যটি। কেন না ভাষণ যে প্রশংসনীয় তা তার নিজের জন্য হয়, বরং তার পিছনে যে শক্তি রয়েছে তাই শব্দের মধ্য দিয়ে সমাজে এগিয়ে এসে তাকে বিশেষত্বমণ্ডিত করে তোলে। শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। ভারতে এর পুনর্জন্ম তখনই সম্ভব হবে যদি এটিকে একটা ভারতীয় জাতীয় চেতনার মহান স্বপ্নের ভৃত্য ও বার্তাবহ করে তোলা যায় সজ্ঞানভাবে। এই একই কারণে, ইংল্যান্ডে এখন এমন কিছু নেই যাকে শিল্পকলা আখ্যা দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী জনসাধারণের সংগ্রামের কিছু নেই—আর সংগ্রাম ব্যতিরেকে কোন মহৎ প্রতিভা অথবা কোন মহান কবিতার অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। তাই, সাম্রাজ্যের যুগে শিল্পে সর্বদাই অবক্ষয় আসতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা বিপরীত। সব কিছুর জন্যই আমাদের সংগ্রাম করতে হয়—আমাদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট করে তোলার জন্য, সেটিকে বহন করে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যাতে করে এর নামে একত্রিত হতে পারি আমরা সকলে। সংগ্রাম আবারও করতে হয়—আগের কাজটা হয়ে যাবার পর আমাদেরই মতো অন্য সকলের কাছেও একে প্রত্যক্ষ বাস্তব করে তোলার জন্য।

এই যখন অবস্থা, তখন স্বপ্নেও কারও এমন চিন্তা করা উচিত নয় যে একটা নীলবর্ণ পাত্র চিত্রণ কিংবা অগ্নিবর্ণ কোন পুষ্প অথবা রমণীয় কোন দৃশ্য অথবা কোন কৌতূহলোদ্দীপক জনগোষ্ঠীর ছবি আঁকাই চিত্রকরের কাজ। পিছনে কোন বিশেষ চিন্তার যন্ত্রণা সক্রিয় থেকে রঙের স্থূলত্ব বরং অনেক ভালো। চিত্রিত মানবতার মত আঁখির উপর সাংকেতিকতার ভার নিয়ে বৃহত্তম যে চিত্র ছিল—তা ছিল আরো অনেক ভালো। কেননা বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পায়ণ, বাণিজ্য আরও সবকিছুর মতই শিল্প-কলাকেও "মাতৃভূমির পুনর্গঠন" ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই যেন এখন পরিচালনা না করা হয়।

দুই

তা হলে আজকের ভারতে জাতীয়তাবাদের বাণী—এই আধ্যাত্মিক বাণীকে বহন করছে শিল্পকলা। কিন্তু এই বাণীকে যদি যথার্থভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তা হলে চিত্রকরদের পেশাকে জীবিকানির্বাহের উপায়মাত্র হিসাবে না দেখে সর্বোচ্চ শিক্ষার চূড়ান্ত একটি প্রকরণ রূপে দেখতে হবে। তাই আজকের দিনে কোন শিল্প-বিদ্যালয়কে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে হবে। শিক্ষাসময়ের বাইরে অন্য সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ আলোচনা আজকের দিনের সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যা ও তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হওয়া উচিত; তাদের পড়াশুনা চিহ্নিত হওয়া উচিত বিশ্বের সমস্ত মহান রহস্যের সম্বন্ধে মন্দা অপরিতৃপ্ত কৌতূহল দিয়ে।

কেন না একথা অনস্বীকার্য যে ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, যে কোন মহান জিনিস শুরু হয় ছাত্রদের গোষ্ঠী বিশেষের একাগ্রতার মধ্যে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির যে কোন একটি সম্পর্কের সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে যখন মানুষ, তখন তাদের একত্রে এগিয়ে আসার পক্ষে বড় বেশী দেরী হয়ে যায়। দুনিয়া কাঁপানো কোন মৈত্রীই কখনো প্রভুদের নিয়ে গড়ে ওঠেনি। একটি পরিণত মন ও অনেক শিষ্য অথবা অনেকগুলো একযোগে সংগ্রামশীল তরুণ মন—এই রকম সব গোষ্ঠীর মধ্য দিয়েই শক্তি বিকশিত হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ খুঁজতে হলে, এই কলকাতা শহরেই কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভের ফলস্বরূপ যে সব আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। নৈতিক শিক্ষার বিতর্কাতীত শক্তি নিয়ে নববিধান এবং প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনের নির্ভয় ও নিঃস্বার্থ সমর্থন দিয়ে সমগ্র সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ অনুগামীদের সকলের সামগ্রিক শ্রম—(মাত্র তিনটি নির্দিষ্ট সংস্থার নামই শুধু করা হল) এরা সকলেই হচ্ছে সেকালের ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া আমাদের উত্তরাধিকার।

ইংল্যান্ড থেকেও আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। লর্ড কার্জন ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা প্রচারিত সাম্রাজ্যবাদী দূষিত তত্ত্বগুলো হচ্ছে তাঁর ছাত্রজীবনে অক্সফোর্ডের সম্পন্ন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তারই ফল। অপর পক্ষে তরুণ বয়সে লর্ড রিপণ ছিলেন খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠতম চক্রের একজন সদস্য—যে সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চার্লস্ কিংসলে এবং টম হিউদেস। এবং সেখানেই তিনি এবং তাঁর পত্নী পরাজিতদের সঙ্গে সমব্যথিতার ন্যায় ও সাম্যের সংস্কার প্রভৃতি মহান দীক্ষায় দীক্ষিত হন—যে সব কারণে তাঁদের নাম চিরকাল ইতিহাসের পাতায় দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে।

আজকের লন্ডনে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় উৎসগুলোর অন্যতম হচ্ছে সমাজতন্ত্রীদের ফ্যাবিয়ান সোসাইটি। তরুণ ও কঠোর পরিশ্রমী কয়েক জন নরনারী মিলে এই গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেন। শুরুতে এঁরা প্রতি শনিবার বিকেলে

কিছু কিছু বই পড়া ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রশ্নগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হতেন।

ইংল্যান্ডের মননশীলতার রাজ্যে লন্ডনের আস্তিবাদীগণ নৈতিক আবেগের আর একটি প্রোজ্জ্বল কেন্দ্র। এক প্রজন্ম আগে এঁরা ছিলেন কতিপয় অতি মেধাবী তরুণ অক্সফোর্ডীয়; এঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন সেই মহান 'গুরু' ইংরেজ ধর্মযাজক কন্‌গ্রেভ্‌ যিনি অগস্ত্‌ কোঁতের বিশ্বাসের পদাঙ্ক অনুসরণে অনেক কিছু ত্যাগ করেছিলেন।

ইংরেজ চিত্রকলার মধ্যযুগীয় আন্দোলন সম্ভবত এটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে—যার শুরু হয় রসেটি, মরিস, বার্ণ জোন্‌স্‌, সাইমন, সোলোমন প্রমুখ তরুণদের হাতে।

না, নিজেদের শক্তিকে খাটো করার ব্যাপারে প্রবীণদের যতই যুক্তি থাকুক না কেন, তরুণদের কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে সন্দিহান হবার কোনই অধিকার নেই। কেননা ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে তাঁরা ছাড়া আর কেউ নেই যে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়া হয় অনেক চিন্তা ও আশা নিয়ে, শুধুমাত্র সংগঠনের চিন্তা নিয়ে নয়। দুজন মানুষ যদি এগিয়ে এসে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীসহকারে শিল্পকলার শিক্ষার ভার তুলে নেন, তা হলে তাঁরাই পারেন ভারতের চিত্রশিল্পের জগৎকে বদলে দিতে। বিশেষ একটিমাত্র বিদ্যায়তনের লোকেরা তাঁদের সম্মুখবর্তী সমস্যাটিকে সম্যক অনুধাবন করলেই নতুন চিত্রধারা জন্ম নেবে। কেন না একমাত্র জীবনই পারে জীবনকে তুলে ধরতে, আর এই চেতনার ত্বরাকরণ ব্যতিরেকে মৃত্যুই একমাত্র গতি।

কিন্তু একজন ব্যক্তি কি করে পারে জাতীয়তার চিত্রশিল্পী হয়ে উঠতে? একটা বিমূর্ত ভাবাদর্শকে কি রূপ দিয়ে রক্তমাংসের আবরণে ঢেকে চিত্রিত করা সম্ভব? নিঃসন্দেহেই তা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এবিষয়ে আমরা যদি প্রশ্ন তুলি, তা হলে মিঃ এ. এন. ঠাকুরের অনন্য চিত্র "ভারতমাতা"ই এ সম্ভাবনাকে প্রমাণিত করে। কিন্তু এতখানি সবই এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়। এই ধরনের কৃতিত্ব একমাত্র তখনই সম্ভব—শিল্পী যখন শিল্পিকে সিদ্ধির তুঙ্গে উপনীত। নতুন শিক্ষার্থীর পক্ষে তা অসম্ভব, কেন না তাঁর চরণ এখন সিঁড়ির প্রথম ধাপে মাত্র। তা হলে তিনি কেমন করে অগ্রসর হবেন, যাতে করে এই রকম মহান ভাবাদর্শকে রূপ দেবার কাজে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হতে পারেন?

প্রথমত এ কথা বুঝতে হবে যে শিল্পকলার সঙ্গে সম্পর্ক সেই আনন্দের—যা দর্শনের দ্বারা লভ্য; যা জ্ঞানদ্বারা লভ্য নয়। কেননা জ্ঞানের প্রয়োজন সিদ্ধ করে বিজ্ঞানসম্মত রেখাচিত্র অনুভূতিকে। সেক্ষেত্রে মূলগত প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে অনুভবের সততা। কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা বিশেষ কোন রূপ দেখে সেটিকে

পছন্দ অথবা অপছন্দ করছি কিনা এবিষয়ে মিশ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে যদি, তাহলে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমরা অনিবার্যভাবে ভ্রান্তির পথে এগিয়ে যাব। এমন নয় যে, যে কোন দৃশ্যই চিত্রকলার পথে উপযুক্ত। এবং এই সত্যটিকে আধুনিক ভারতে জোর দিয়ে বলা বিশেষ প্রয়োজন, যেনন এখানে ফ্যাসান সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা মানুষের রুচি-বিভ্রম ঘটিয়ে ছেড়েছে। যে দেশে এমন একটা ভঙ্গিমা অভব্য বলে পরিগণিত হয় সে দেশেই প্রায় প্রতি গৃহে রাখা হয় এমন একটা ছবি যেখানে একটি তরুণী মেঝেতে উপুড় হয়ে সটান হয়ে শুয়ে শুয়ে পদ্মপাতায় পত্র লিখছে। এক্ষেত্রে একথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, প্রকাশ্যে কোন তরুণী মেঝেতে শুয়ে আছে এমন দৃশ্য আমার জানা কোন দেশেই অনুমোদিত নয়। যেন সে দৃশ্য বাস্তবে অশালীন—রুচিবিগর্হিত তা যেন কল্পনায় সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। যে দেশে প্রকাশ্যে প্রেমমূলক আচরণ কোনদিনই অনুমোদিত নয়, সে দেশে অর্জুন ও সুভদ্রার প্রেমবিনিময়ের চিত্রের ছড়াছড়ি।

যথার্থতা সম্পর্কিত একটা ভুল আদর্শ থেকে এক সব প্রমাদের উদ্ভব, যার দরুণ আমরা আমাদের নিজস্ব অনুভূতির নির্দেশকেও অগ্রাহ্য করে থাকি। এধরনের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাববশতঃই আমার পরিচিত একটি ভারতীয় তরুণী পারী সঁট থেকে পুভি দ্য অত্যন্ত অনাকর্ষণীয় কতকগুলো নগ্নচিত্র সংগ্রহ করে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে এগুলোই তার সবচাইতে পছন্দ। সহৃদয় যে কোন দর্শকের চোখেই এসত্য ধরা পড়তে বাধ্য যে, সে তার পছন্দসই জিনিসকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ না করে আশ্রয় নিয়েছে কল্পনার। —বেচারা! তার কল্পনায় এগুলোই সঠিক জিনিস। অনুরূপভাবেই যে কোন ভারতীয় বাংলো বাড়ীর অতিথি আপ্যায়নগৃহে ধূমপানরতা অথবা অন্য কোন উপায়ে আরামবিলাসে মগ্ন মহিলাদের ছবি মোটেই দুর্লভ নয়, যে কোন ইউরোপীয় গৃহে এধরনের ছবি কিন্তু অতিথির প্রতি ইচ্ছাকৃত অপমান বলে বিবেচিত হবে।

এধরনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আসলে ভুলটা ঘটে থাকে কোন একটা বিশেষ জিনিস আনন্দদায়ী কিনা এই সরল সত্য, এড়িয়ে গিয়ে উচুঁদরের শিল্পকলা বলে ধরে নিয়ে পছন্দ করার নিরুত্তাপ প্রচেষ্টা থেকে। ভারতবর্ষে নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন ছবি সর্বদা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, কেননা বর্তমানে এখানে এদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য যাচাই করে দেখবার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। এসব ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে রুচি বিভ্রম নৈতিকতার দিক থেকে মারাত্মক। অবশ্যই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ সম্মানজনক মহিমাও আছে, যেমন ধরুন—'ভেনাস্ অফ মাইলো' জাতীয় সুপ্রাচীন চিত্রে, দোগাতেল্লোর আঁকা 'পায়ের তলায় ফুটে থাকা কাঁটা খুলে নিতে উদ্যত বালিকা' ধরনের মধ্যযুগীয় চিত্রে এবং জি. এফ্. ওয়াট্সের আঁকা 'ট্রিপটিচ্ অফ লভ' জাতীয় আধুনিক চিত্রে', কেননা এই সব ছবি বাস্তব পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মানবাত্মাকে একট আধ্যাত্মিক সমুন্নতির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু যে-সব লোক এ তথ্য সম্বন্ধে

অবহিত নয় এবং যাদের বিদেশী শিল্পকলা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও নেই, তাদের কাছে এ-ধরনের উক্তি ধোঁয়াটে কচকচির মতো হবে, সেজন্যই নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে অবিসংবাদী নিয়ম এটাই হওয়া উচিত যে নগ্ন চিত্রকে মোটামুটি একেবারেই এড়িয়ে যেতে হবে।

নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতো চোখ তৈরী হওয়া অর্থাৎ যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠা, অনুভবশক্তির এই শিক্ষা ও সূক্ষ্মতা কিন্তু যতটা ভাবা যায় তার চাইতে অনেক বেশী কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মননশীল অথবা আঙ্গিক সর্বস্ব হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এ প্রবণতা অন্ততপক্ষে সাময়িকভাবে হলেও শৈল্পিক প্রবণতাকে আচ্ছন্ন করে এবং শিল্পকে ধ্বংস করে। তাই লাহোর মিউজিয়ামে ব্যাকট্রিয় কিংবা চৈনিক শিল্পকলা প্রভাবিত অনন্য কিছু প্রাচীন ভাস্কর্যের কাজ দেখে আসার পর অনশনরত বুদ্ধের বিশীর্ণ মূর্তি দেখে বুকে হাঁপ ধরে যায়। জয়পুরেও অবশ্য কংকালসার কালীমূর্তির কথা শোনা যায়। এসব ব্যাপার কিন্তু ভুল। একটা শিল্পযুগের মৃত্যুক্ষণকেই চিহ্নিত করে এসব কাজ। শিল্পকলা কিন্তু বিজ্ঞান নয়। সুন্দরের অনুসন্ধান—সে সুন্দরকে সর্বদাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর হতেই হবে এমন নয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সর্বদাই সে সুন্দরের অনুসন্ধান হচ্ছে শিল্পকলার যথার্থ কাজ। শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচির কাছে কোন কিছু যদি অসুন্দর বলে মনে হয় অথবা তাঁর বিশেষ বক্তব্যের পক্ষে সহায়ক বোধ না হয়, তাহলে সে জিনিসকে বর্জন করার অধিকার আছে শিল্পীরা, বস্তুত আমরা মনে মনে ধরে নিই যে তিনি এমনটিই করেছেন, এবং সেই অনুসারেই তাঁর কাজের প্রশংসা অথবা নিন্দা করে থাকি আমরা।

প্রকৃতির মধ্যে অবশ্যই এমন অনেক কিছু আছে যা সুন্দর নয়। এবং বিভিন্ন বিচিত্র উপকরণের মধ্যে শিল্পীকে ক্রমাগত ঝাড়াই-বাছাই করে যেতে হয়। কোন একটা চিত্রে কিন্তু আমরা গড়, অথবা ঘোলাটে কিংবা এলোমেলো এমন কিছুই চাই না। যেমন ধরা যাক—আলোকবিহীন কোন দৃশ্যকেই রম্য বলা যায় না। এমন কি অনালোকিত অবস্থায় কোন চিত্রে জলন্ত যেমন তাৎপর্যবিহীন তেমনি তাৎপর্যহীন তাল-নারিকেলের মুকুট-শোভিত কোন দৃশ্য। কোথায় যে তাদের যাদু সেটা সম্যক্ উপলব্ধি না করেও বহুকাল ধরে লন্ডনের জাতীয় কলা প্রদর্শন কক্ষে কিছু কিছু ওলন্দাজ চিত্রকে আমি মনে মনে দারুণ পছন্দ করে আসছি। ছবিগুলো ডি. হুগ্ নামে এক ব্যক্তির আঁকা, তাতে রয়েছে লাল রঙের বাঁধানো মেঝেসমেত ছোট ছোট বিচার কক্ষ ও রান্নাঘর। বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিগত রুচির দিক থেকে আমি এমন কিছুই অসাধারণ দেখতে পাই না; কেননা আমি নিজে রান্নাঘরের চাইতে মাতৃকা ও দেবদূতদের অনেক বেশী পছন্দ করি। অবশেষে আমি একজন বড় শিল্পীর কাছে আমার এই ব্যক্তিগত সমস্যাটি তুলে ধরলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর হল "যে অল্প কয়েকজন লোক সূর্যলোককে ঠিকমত তুলিতে ধরতে জানেন, ডি. হুগ্ হচ্ছেন তাঁদের অন্যতম। অবশেষ অনুভূতির এই

বিচিত্র উদ্দীপনার রহস্য সমাধান হল। আমি আবার ডি. হুগের ছবি দেখে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করলাম। তাঁর লালরঙের ইটের মেঝে সবসময় আলোকে উদ্ভাসিত।

শিল্পের ক্ষেত্রে ঐক্যের মধ্যে বৈপরীত্যের সুর সৌন্দর্যের একটা বিরাট উপাদান একই কথা খাটে রঙের ক্ষেত্রে। ভারতীয় শিল্পকলার ছাত্রদের মধ্যে আমি একধরনের তৈলচিত্র অনেক দেখেছি যাতে আছে পাতার ছাউনি দেয়া কুটিরের পাশে নিষ্প্রভ অনালোকিত জলাশয়, সমস্ত দৃশ্যটাই আবার নীলচে সবুজ রঙে আঁকা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভয়ংকর দর্শন গাছের ছায়ায় ভারাক্রান্ত। এই সব হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্যের তেমনি হতাশাব্যঞ্জক চিত্রণ, হয়তো বা বস্তুগত তথ্যের দিক থেকে যথাযথ, হয়তো এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলোকে আমরা ভালও বাসি। মেনে নিলাম, কিন্তু বাড়ীটি অথবা জলাশয়টি অথবা পাতাগুলো, যেকোন জায়গায় একটিমাত্র আলোকোজ্জ্বল ছোঁয়া হয়তো বা সমগ্র চিত্রটিকে বদলে দিতে পারত যাদুমন্ত্রের মতো, আরেকটি ছবিও প্রায়শঃই দেখা যায়—বনের মধ্যে শিশু ধ্রুব একাকী চলেছেন। এই ছবিটাও সম্পূর্ণ অস্পষ্ট হয়ে থাকে কোথাও কোন রকম আলোক-স্পর্শ বিহীনভাবে। ঘোলাটে নীলচে সবুজরঙের বন্য ঝোপঝাড় কোন ছবির চরিত্র আনে না। বালক ধ্রুব যখন স্বইচ্ছায় বনের পথে যাত্রা করেন, আমার মনে হয় সেখানে ছিল সর্বব্যাপী সমুন্নতির একটা মহান অনুভূতি, ছিল নক্ষত্রালোকিত বিস্তীর্ণ আকাশ, ছিল উন্মুক্ত পথ, এক বিচিত্র আহ্বান, অরণ্যের গভীরে নিদ্রিত চেতনার নৈঃশব্দ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া এক অনন্ত অসীমের আমন্ত্রণ। আমাদের জানা ছবিগুলোর মধ্যে এসব কোনকিছুই অনুরণিত হয় না। অধিকন্তু শিল্পী যদি একথা বোঝেন যে তিনি যা প্রায়ই দেখে থাকেন তার পরিবর্তে যা তাঁকে আনন্দ দেয়, সেটা আঁকাই তাঁর কাজ, তাহলে ছবিটা হয়তো অনেক আলাদা হতে পারত।

তাই যথার্থ কোন ছবিকে আলোকোজ্জ্বল হতেই হবে, এবং তাকে অবশ্যই হতে হবে ব্যঞ্জনাবহ। অধিকন্তু, তার মধ্যে একটা সুন্দর বিষয়বস্তু থাকতেই হবে যা দেখা মাত্রই আমাদের মধ্যে ভালবাসা এবং উদ্দীপনা উদ্রেক হবে। ভারতের রাস্তাঘাট, নদীতীরে এধরনের চিত্রোপযোগী বিষয়বস্তুর অপ্রতুলতা নেই, শুধু তাদের খুঁজে পাওয়ার চোখ থাকা চাই। শুধু মাত্র হৃদয় দিয়েই শিল্পীকে তাঁর দেখার কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। অতুলনীয় পোশাক পরিহিতা ভারতীয় নারীগণ, শিবের ইঙ্গিতবাহী ভিক্ষাপাত্র ও ভিক্ষান্ন হাতে ভিখারীবৃন্দ; সর্বদেশে-কালে যা সুন্দর সেই শ্রমও এদেশে অনন্য কমনীয়তা ও সূক্ষ্মতার সমন্বয়ে অসাধারণ তাৎপর্যমণ্ডিত; মন্দিরে পুরোহিত, নদীতে মাঝি, সন্তানক্রোড়ে জননী, বিবাহ আসরে বধূ—তোমরা ভারতীয় শিক্ষাকলার শিক্ষার্থীরা, এর মধ্যে এমন কিছুই কি খুঁজে পাওনা, যা তোমাদের ধরে রাখতে ইচ্ছে করে? বিরাট বিরাট দিগন্তের পথ খুলে দেয়—জীবনের ক্ষেত্রে এক এক ঝলক এমন দেখার মধ্য দিয়ে যেতে পারো না তোমরা? ইউরোপের যে কোন জায়গার তুলনায় এদেশে এমন সব জিনিস অনেক বেশি দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি গৃহেই এমন সব জনসমষ্টি দেখা যায় যাদের মধ্য থেকে

আঁকা যায় কৃষ্ণের নন্দ উৎসব বা খ্রীষ্টের জন্ম। তুলসীমূলে সন্ধ্যাবেলায় জ্বালা ছোট্ট মাটির প্রদীপটির সৌন্দর্য কি কখনো অনুভব করনি তোমরা? আসন্ন প্রদোষে শান্তি-জল উৎসবের প্রশান্তির সংবাদ কি পাওনি? বরণডালায় কোন রহস্যময় তাৎপর্য কি তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না? বিশ্বাস করো, এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা ছাড়া বিলাতী প্রয়াস শুধু কলাকৌশলের চর্চা শুধু রক্তমাংসহীন হাড়ের কাঠামো। তারা যেমন অসার ও তেমনি মূল্যহীন।

ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

ভারতীয় কলাবিষয়ে এই প্রথম আমরা একজন ইউরোপীয়র লেখা একটি বই পেলাম, যার পাতায় পাতায় রয়েছে ভারত এবং ভারতীয়দের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয়। মিঃ হ্যাভেলের কাছে ভারতীয় শিল্পকলা কোন বাণিজ্যিক খেলনা নয়, এমনকি কোন সমৃদ্ধ দূর অতীতের স্মৃতির ফসলও নয়। তিনি ভারতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে এক বলেই দেখেছেন। আজকের দিনে যেসব ভারতীয়রা রয়েছেন, সেই তাঁরাই একদা নির্মাণ করেছিলেন কেল্লা, প্রাসাদ, মন্দির, সমাধি ইত্যাদি, আবার যদি প্রয়োজন হয় কিংবা সুযোগ আসে তাহলে সেরকমই আবার করে দেখিয়ে দেবেন। যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় আমাদের শিল্পকলার জন্ম হয়েছিল, সেগুলোকে খুঁটিয়ে বিচার করে, সেই পটভূমিকার সঙ্গে আমাদের বর্তমানকালের সংযোগসূত্র খুঁজে পেয়ে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির সূত্র তিনি দেখতে পান। এই লেখকের চোখে চারু ও কারুশিল্পের দিক থেকে ভারতীয় সমাজ আজও গ্রহণশীল। যতদিন পর্যন্ত হাতের কাজই পরিস্থিতির নিয়ামক, ততদিনই ভারত সেই উর্বরা মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে থেকে যাচ্ছে, যে সময়ে ইউরোপের গীর্জাগুলো নির্মিত হয়, তার মহান সব ছবিগুলো অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে যুগকে ভাল মন্দ যে কারণেই হোক ইউরোপ চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে এসেছে।

আমাদের লেখক বলেছেন, "ইউরোপের মত না হয়ে ভারতে আজো একটা সজীব ঐতিহ্যানুসারী জাতীয় শিল্পকলা রয়েছে, জনসমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তা গাঁথা। এই শিল্পকলাকে আমরা যদি ভালভাবে জানতে চেষ্টা করি তাহলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ইউরোপ এবং ভারত উভয় পক্ষেরই সাহায্য হবে। কিন্তু ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় চরিত্রবিহীন শিল্পকলার সঙ্গে ভারতীয় এই সজীব শিল্পধারার কোন আত্মিক সংযোগ নেই, আর আমরা জাতিগত, চিন্তাগত, ধর্মগত দিক থেকে একেবারেই পরদেশী, সেজন্য এ বিষয়ে নিস্পৃহ প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা বাণিজ্যিক আগ্রহ ছাড়া আর কখনো কিছু দেখায়নি। এর গভীরতম তাৎপর্য আমাদের

* ই, বি হ্যাভেল (লন্ডন), জন মারে ১৯০৮

কাছে লুক্কায়িত থেকে গেছে, এবং একটা জাতির হৃদয়ে কামনা, বাসনা, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাদের কাব্য ; সঙ্গীত ও শিল্পকলায় যে ধরনের অভিব্যক্তিলাভ করেছে, আমাদের হৃদয়ের কোন তারেই তা সাড়া জাগায় না।"

কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা ভারতীয় পাঠকেরা একথা যেন ধরে না নিই যে যেহেতু আমাদের "সজীব ঐতিহ্যানুসারী জাতীয় শিল্পকলা" এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছে সেজন্য শৈল্পিকভাবে আমাদের মধ্যে আকস্মিক যে কোন ভাবনা বা আবেগই আসুক তাকেই অন্ধের মত আঁকড়ে ধরতে হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে যে আমরা ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন এবং যে কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমরা ষোল আনা অভ্রান্ত। এধরনের একটা সিদ্ধান্ত আমাদের বিষয়ান্তরে প্রলুব্ধ করতে পারবে না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে একমাত্র ভারতেই একক ভাবে রয়েছে একটা সজীব ঐতিহ্যানুসারী জাতীয় যুক্তি বোধ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রতিটি ভারতীয় শিক্ষানবীশই যুক্তিগতভাবে অভ্রান্ত। নদীয়ার পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে নিজস্ব কোন মতামতকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে তাহলে অন্তরে অন্তরে সর্বাপেক্ষা ভারতীয়টিকেও দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তালিম নিতে হবে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিচারশক্তিকেও যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেক্ষেত্রেও অনুরূপ কঠোর রূঢ় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমরা সদ্যসদ্যই পেরিয়ে এসেছি সবচেয়ে গোলমেলে অন্তর্বর্তীকাল। ইউরোপীয় বাণিজ্যিকবৃত্তির অধীনে আমাদের অলংকরণমূলক শিল্পক্ষমতার গোড়ায় নাড়া লেগেছে। আমাদের স্থাপত্যকলা এখন সুলভতার দিকে ঝুঁকেছে, মূল্য দেওয়া হচ্ছে উপাদানগুলির আর্থিক মূল্যকে। আমাদের মহত্তর আদর্শগুলো সুলভ কুখ্যাতির প্রতি মোহে রাহুগ্রস্ত। এই এলোমেলো অবস্থার ভিতর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন যথার্থ কারণেই, যথার্থ সুন্দরের প্রতি বিশ্বস্ত অনুরাগের ভিত্তিতে ধৈর্য্য ধরে একটি মহান শিল্পকলার ধারা গড়ে তোলা। কিন্তু এই অনুরাগের শক্তিকে যথাযথ চালিত করতে হলে আমাদের প্রয়োজন একটি সুদক্ষ মনের সাহায্য এবং মিঃ হ্যাভেলের গ্রন্থ আমাদের সেটিই দিতে সক্ষম। মুখ্যতঃ অতীতের মহান শিল্পকর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সমেত ভারতের শিল্পকলার সঙ্গে একটি শিক্ষিত মনের কি করে সংযোগসাধন করা যায়, গ্রন্থটি তারই পথ প্রদর্শক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই বইটি ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় পাঠকের ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপনা ও প্রেরণার দিক থেকে আমাদের কাছে এর অসামান্য গুরুত্ব।

ভারতীয় আদর্শের মাধ্যমেই যে ভারতীয় শিল্পকলাকে বুঝতে হবে, লেখকের এই ধারণা যথাযথ। ভারতবর্ষ গ্রীসের কাছ থেকে তার শিল্পকলার মূল সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে প্রচলিত এই ধারণা যে তাৎপর্য বিহীন লেখক সেটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কেননা ভারতবর্ষ তার আদর্শের মূল যে গ্রীস থেকে সংগ্রহ করেনি একথা তো স্বীকার করে নেওয়া হয়। "একথা অবশ্যই সত্যি যে কোন জাতি তার শিল্পকলাগত আদর্শ

জুড়ে নেবার সময় তার হাতের নাগালের মধ্যে দেশী-বিদেশী সবরকম উৎসকেই কাজে লাগায়। ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বকে গ্রীকরা যতটুকু সৃষ্টি করেছে ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে তার থেকে বেশী কিছু করেনি। তাদের নান্দনিক আদর্শ ভারতের চাইতে মূলগত ভাবেই আলাদা, এবং তারা এই সব চিন্তা-ভাবনাকে কোন দিনই ভারতীয় শিল্পকলার উপর আরোপ করেনি। ভারতীয় শিল্পকলা তার বিশিষ্ট ও মৌলিক চরিত্র নিয়ে সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ভাবনা ও ভারতীয় শিল্প প্রতিভার অবদান।"

চমৎকার যুক্তি, চমৎকার উপস্থাপনা। মিঃ হ্যাভেল তাঁর প্রকাশিত সমস্ত রচনার মধ্যেই ভারতীয় শিল্পকর্মের সংগ্রহশীল চরিত্র বিষয়ক অভিযোগকে খণ্ডন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি সর্বদাই এর শৈলীর স্থির সুনিশ্চিত প্রাচ্যতার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। তার যদি বাস্তবিকই কোন ইতালিয় মানসের ভাবনার ফসল হত তাহলে তা ইতিহাসে একটা বৃহত্তম দৈব ঘটনা বলে পরিগণিত হতে পারত হেলাস যদি তার নিজের ধরনের থেকে এতটা আলাদা (যেমন ভারতীয়) কোন শিল্পকলা জন্ম দিত তাহলে সেটা হত একটা চরম স্ববিরোধ। তিনি যথার্থভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পকলার যে ইউরোপীয় সমালোচনা হয়েছে, সেখানে সর্বদাই পূর্ণাঙ্গ শৈল্পিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কোন মনের সাহায্যের অভাব থেকে গেছে। প্রত্নতত্ত্ব কিংবা সাহিত্যের প্রশাখা হিসেবে শিল্পকলাকে বিচার করা যায় না। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় এবং প্রকরণ। গ্রীক এবং ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে যারা সক্ষম শুধু তারাই একথা আলোচনা করার অধিকারী যে একটি অপরটির কাছে ঋণী কিনা।

ভারত সর্বদাই পাশ্চাত্যের কাছ থেকে সবকিছু সংগ্রহ করে আনছে—এমনতর ইউরোপীয় প্রাক্‌ভাবনা ভারতীয় মৌলিকতা ও আত্মসম্মানবোধের পক্ষে অত্যন্ত হতাশা সঞ্চারী। বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদর্শ ও ভাবধারার বিনিময় যেমন হয়ে থাকে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেও তাই, কিন্তু বর্তমানকালের মতোই অতীতেও ছিল পশ্চাদ্‌গামী প্রবাহ, মাঝে মধ্যে বিপরীতমুখী বাণিজ্যিক পথ। আর অনেক সময় যেমন দেখা যায়—শিশু বড় হয়ে উঠে পিতা-মাতাকে প্রভাবিত করছে, তেমনি ভারতীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে হেলেনীয় সংযোগ যে একটা শক্তিশালী উপাদান সেটা ধারণাতীত কোন ব্যাপার নয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এ ধরনের একটা সংযোগ যে ছিল—সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য সেটি, এর স্থায়িত্ব ও প্রভাব কতটা ছিল তা এখনো পর্যন্ত নিরূপণ করা বাকী আছে, তেমনি ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসাবে এর সত্যতাও নিরূপণ করে দেখতে হবে।

ঐতিহাসিক যুক্তিনিচয়কে মিঃ হ্যাভেল এভাবে পর্যালোচনা করেছেন :—

"খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে এবং তারও পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের

ক্লাসিক শিল্পকলা যখন তার সর্বোচ্চ বিন্দু পেরিয়ে এসেছে, ভারতে তখন পশ্চিম এশিয়া থেকে শৈল্পিক সংস্কৃতির একটা প্রবল জোয়ার আসে। সেই স্রোতের মূল উৎস ছিল ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার সুদূরতম প্রান্ত, কিন্তু তাতে এসে মিশেছিল গ্রীস ও রোম থেকে প্রত্যাবৃত্ত আরো একটি ধারা। প্রাচীন স্বদেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে এইসব সারগ্রাহী প্রভাব যুক্ত হয়ে ভারতীয় ধর্মভাবনা দ্রুত ঘটাল নতুন এক শিল্প-সমন্বয়। পরবর্তীকালে আবার সেটিই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমগামী বহু ধারার উৎসস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

"খ্রীষ্টীয় যুগের গোড়ার শতকগুলিতে, এবং এই ভারতীয় উৎস থেকে চৈনিক চিত্রকলার মহান ধারাগুলির প্রেরণা আসে। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে এই ধারাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষয়িষ্ণু রোমক সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশের উপর পর্যায়ক্রমে শকুনের মত যে সব এশীয় হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে এবং এদিক থেকে এবই ঐতিহ্যকে ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শুধু বাইজেন্টিয় শিল্পকলায় নয় এমন কি মধ্যযুগের গথিক গীর্জাগুলিতেও ভারতীয় শৈল্পিক সংস্কৃতির প্রভাব বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইউরোপ এশীয় সভ্যতার উপর পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে খুব তৎপর, কিন্তু ইউরোপের শিল্পকলা ও সভ্যতায় এশীয় চিন্তাভাবনা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির অনেক বৃহত্তর প্রভাবের কথা যথাযথ মূল্যায়ন কদাচিৎ হয়।

এই সময়ে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সামুদ্রিক বন্দর সমূহ থেকে দক্ষিণ এশিয়া, সিংহল, শ্যাম এবং সুদূর কাম্বোডিয়ার সর্বত্র ঔপনিবেশিক ধর্মযাজক ও কলাকুশলী পাঠানো হচ্ছিল। চীন এবং কোরিয়ার মাধ্যমে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ভারতীয় শিল্পকলা জাপানে প্রবেশ করে। ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গুজরাট থেকে আগত ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ জাভাতে ভারতীয় শিল্পকলাকে নিয়ে যান। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বোরোবুদুরে ভারতীয় ভাস্কর্য তার মহত্তম বিজয় সম্পন্ন করে। হয়তো কোন একদিন ইউরোপীয় চিত্র সমালোচনা বর্তমান সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত হয়ে যখন বিশ্বজনীন এবং অসীমের সঙ্গে এশিয়ার আদান-প্রদানকে পরিমাপ ও যাচাই করবার মাপকাঠি হিসাবে গ্রীস ইতালির শিল্প ধারণাকে ব্যবহার করার নির্বোধ অভ্যাস ছাড়তে পারবেন সেদিন বোরোবুদুরের অসংখ্য অনামী ভাস্করগণকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে একটা সম্মানজনক আসন দেবেন।"

ভারতীয় শিল্পকলার উপর গ্রীকশিল্পকলার প্রত্যক্ষ প্রভাবের পূর্ণ মূল্যায়ন এখানে করা হয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষনীয় যে এটিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েও, ভারতের পরবর্তী শিল্পকলাকে সঠিক বিচার করা সম্ভব নয় যদি না আমরা এক্ষেত্রে, তর্কের খাতিরেও মেনে নিই যে আদি যুগেও আমাদের শিল্পকলায় স্বদেশী উপাদান-গুলোর এতটা ক্ষমতা ছিল যে অনায়াসেই তারা বিদেশী প্রভাবকে আত্মসাৎ করতে

পেরেছিল। একথা বুঝতেই হবে যে, আমাদের যদি নিজস্ব কোন প্রকৃত সৃজনীক্ষমতা না থাকত তাহলে সমগ্র বিশ্বের শিল্পবিশ্ববিদ্যালয়গুলি একযোগে কাজ করেও আমাদের মৌলিক স্রষ্টা বানাতে পারতেন না। তাঁরা সৃষ্টির প্রতিফলন অথবা রূপকল্পের বাইরে আর কিছুই তৈরী করতে পারতেন না। কোলকাতার যাদুঘরে ভারহুত স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আছে তাতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে ক্ল্যাসিকাল ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ঘটার আগে ভারতীয় চিত্রকলা কতটা ভারতীয় ছিল। এই ভাস্কর্যগুলি কাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সাল থেকে। এগুলোর মধ্যে কোন গ্রীক প্রভাবের কথা কেউ কখনো বলেননি। এবং এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে পাথরের উপর এই পর্যায়ের কাজে যারা হাত দিয়েছিলেন তারা মাটি এবং কাঠের মত বিনাশশীল উপাদান নিয়ে কাজ করে আগে হাত পাকিয়েছেন। যে কোন শিল্পইতিহাসের ক্ষেত্রে যখন বৈদেশিক প্রভাবের কথা বলা হয় তখন একটা কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে সেই সব প্রভাবকে স্বীকরণের মত দেশীয় প্রাণশক্তি ও ধারণ ক্ষমতা ছিল কিনা। ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মিঃ হ্যাভেলের সমগ্র বইখানি।

আমাদের লেখকের পরবর্তী প্রশ্নটি খুব সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ। মহৎশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কোন স্থানই নেই, ইউরোপীয় এই ধারণার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তিনি আদর্শের প্রশ্ন তুলেছেন। ইউরোপে ভাস্কর্যকে বিচার করা হয়ে থাকে শারীর-সংস্থানগত প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলার দিক থেকে। এক্ষেত্রে যে কোন সৌন্দর্যের গোড়ার কথা হিসাবে শারীরবৃত্তিয় ত্রুটিহীনতাকে স্থান দেওয়া নয়। "সব সেরা শিল্পেরই প্রকৃত ও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে অনুকৃতি।" বস্তুতঃ এই শেষ বাক্যটি ইউরোপীয় শিল্পকলার প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি সুবিচার করে না। অলিম্পাসের রাজা জীউস্ এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস্ কিন্তু প্রকৃতির কোন কিছুর অনুকরণ হয়। তবে "সব সেরা শিল্পেরই প্রকৃত ও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে অনুকৃতি"—এই ধারণাই আজকের ইউরোপের সাধারণ ধারণা ; ইউরোপীয় শিল্পকলার এই উপাদানকেই ভারতে রবি বর্মা ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে।

মিঃ হ্যাভেল বেশ জোরের সঙ্গেই প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে ভারতীয় ভাস্কর্য শুরু থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিশেষ আদর্শে গড়ে ওঠে। তাঁর মতে, ভারতীয় শিল্পী বিশ্বাস করেন সর্বোত্তম সৌন্দর্যের অনুসন্ধানই করতে হবে। মানবিক অথবা প্রাকৃতিক কায়ারূপের অনুকৃতি অথবা নির্বাচন মাত্র নয়, সাধারণ শারীর সৌন্দর্যের উর্দ্ধে আরো কিছু গভীর অথবা সূক্ষ্ম কোন কিছুর ব্যঞ্জনা আনবার প্রচেষ্টাই তাঁদের ধর্ম। "কোন ভারতীয় শিল্পী যখন ক্ষীণ কটি কৃশোদর কোন দেবমূর্তিকে রূপায়িত করেন, অন্যান্য ছোটখাটো শারীর-সংস্থানগত খুঁটিনাটিকে তেমন আমল না দিয়ে বর্ণালী নকশা-চিত্রটির চূড়ান্ত সরল সৌন্দর্য সম্পাদন করতে প্রয়াসী হন, তখন ইউরোপীয়রা ঘোষণা করে বসেন যে এই শিল্পী অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অঙ্গসংস্থান বিদ্যায় অজ্ঞ ও প্রকৃতির

উচ্চতর কায়ারূপকে অনুকরণ করতে একেবারেই অক্ষম কিন্তু ভারতীয় শিল্পী সৃষ্টি করবেন উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর ধরনের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ; ভারতীয় দর্শন অনুসারে সেই সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করা সম্ভব শুধুমাত্র ঐহিক আসক্তি ও কামনা বাসনাকে দমন করতে পারলেই "

যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে লেখক এবিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। একজন আত্মসংযমী মানুষই যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ তখন এটা স্বচ্ছ যে অনুরূপ কোন পার্থিব ধরন নিশ্চয়ই আছে। লেখকের ধারণা অনুসারে ব্যাপারটি বেশ প্রশংসনীয়ভাবে সূচিত হয়েছে, যখন ৩২টি মৌল লক্ষণের (আধুনিক বাংলায় তাকে বলা হচ্ছে শিবসিংহ) মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে "দেহের ঊর্দ্ধ অংশ হবে সিংহের মত"—এই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় সিংহের বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গভীর ও প্রশস্ত স্কন্ধদেশ, ক্ষীণ ও সংকুচিত তলপেট। মিঃ হ্যাভেল দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারতীয় ভাস্করেরা বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের যে আধ্যাত্মিক জ্যোতিসম্পন্ন মূর্তি গড়তে প্রয়াস পেয়েছেন তার সঙ্গে এই অঙ্গসংস্থানের বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে, "প্রশস্ত স্কন্ধ, গভীর বক্ষদেশ, সোনালী রঙের মসৃণ গাত্রচর্ম, তরুণ সিংহের মত নমনীয় ও কমনীয়"—বুদ্ধমূর্তির এই হচ্ছে বর্ণনা। আমাদের মহত্তম শিল্পকর্মগুলির উৎসমুখে ফিরে গিয়ে আমাদের নিজস্ব মহত্তম আদর্শগুলিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে ভারতীয় সমালোচনাকে অসাধারণ সাহায্য করেছেন।

এই অসাধারণ গ্রন্থখানিতে যেসব চিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে, বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে তাদের তুলনা নেই, ভারত নিজের জন্য কি রেখেছে, তার তুলনায় বরং এখানে পরের জন্য সে কি করেছে সেটাই হচ্ছে তার কৃতিত্বের মাপকাঠি। কন্যাপ্রতিম সভ্যতা সমুদয়ের বৃত্তেই শুধু ভারতের কৃতিত্বের নিশ্চিততম প্রমাণগুলি রয়ে গেছে। তিব্বত, নেপাল, সিংহল এবং জাভার শিল্পকলা থেকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ তুলে এনে লেখক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের ভয় অধিকাংশ ভারতীয়ই হয়তো এই বই পড়তে গিয়ে প্রথম জানতে পারবেন যে জাভার বোরাবুদুরের মহান মন্দির ও শিল্প ভারতীয় ঔপনিবেশিকদেরই কীর্তি। গান্ধারের আধাগ্রীক শিল্পকলা, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের শিল্পকর্ম ও আদি ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে মৌলভাবধারার অপরিমেয় পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে হলে বৌদ্ধ অনুশাসনের 'লোরিয়ান টাঙ্গাই' রিলিফের কাজের সঙ্গে বোরোবুদুরের কাজের তুলনা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। মিঃ হ্যাভেল অনায়াসেই বলতে প্যারেন গান্ধার শিল্পে ভারতীয় আদর্শের কোন প্রতিফলনই নেই। কোলকাতার যাদুঘরে গান্ধার ভাস্কর্য দেখতে গিয়ে "ভারতীয় সন্ন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে অস্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়িয়ে থাকা" কেশবিন্যাসকারীর হাতে সযত্ন বিন্যস্ত গোঁফজোড়া সমেত সপ্রতিভ তরুণ সেনানীজনোচিত মূর্তিগুলির দিকে

দৃকপাত করলেই এ মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। মগধের বুদ্ধমূর্তিগুলির সমুন্নত প্রশান্তি ও সারল্য অথবা বোরোবুদুরের ধ্যানী বুদ্ধের স্বতস্ফূর্ত মাধুর্য ও কমনীয়তার কিছুই এগুলোতে নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে এইসব আদর্শ গড়ে উঠেছে; পরবর্তী প্রজন্মগুলি প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গেই সে উত্তরাধিকার লাভ করেছে। লেখক স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন, "ইউরোপীয় শিল্পকলার ডানাজোড়া আবদ্ধ: এরা শুধু পার্থিব সৌন্দর্যের কথাই জানে। ভারতীয় শিল্পকলা উর্দ্ধতম স্বর্গলোকে বিচরণ করতে করতে এই মর্তভূমিতে স্বর্গের মাধুরীর কিছু অংশ নিয়ে আসতে সতত্ই প্রয়াসী।

হিন্দু ভাস্কর্য সম্বন্ধে হ্যাভেলের বক্তব্য *

ভারতীয় শিল্পকলায় গ্রীকদের প্রভাব আদৌ আছে কিনা, তা থাকলেও কতদূর পর্যন্ত এ ধরনের আধা রাজনৈতিক প্রশ্নকে আলোচ্য গ্রন্থে যে ধরনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি বলে ঠেকবে। তাঁরা আমাদের বলতে চাইবেন যে শিল্পকলার সমগ্র ইতিহাস বিধৃত আছে প্রাচীন বাণিজ্যিক পথগুলির সীমারেখা ধরে ধরে যে নক্সার ইতিহাস, তারই মধ্যে। 'লোরিয়ান টাঙ্গাই' ভাস্কর্যে যে ধরনের বুদ্ধমূর্তি তাকে তাঁরা অস্পষ্ট ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবেন। তাঁদের মতে প্রকৃত ভারতীয় শিল্পকলার অনন্য পদ্মাসনের পরিবর্তে সিংহাসন ও পাদপীঠের যে সাধারণ অলংকরণ, পাশে রাখা খেজুর গাছের গুঁড়ি—ও বিভিন্ন গুহায় ধার্মিক পশুদের কদাকার অবয়বই হচ্ছে শিল্পকর্মটির উৎস সম্বন্ধে সব চাইতে জরুরী ও প্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান। এঁরা আমাদের অনুরোধ করবেন এই কুখ্যাত বিতর্ক পরিত্যাগ করে ঐতিহাসিক অলংকরণের নমুনা ও নক্সাগুলি বিশ্লেষণ করে ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব বিষয়ে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সুনিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করতে। হতে পারে যে এ সব সমালোচকরাই ঠিক বলছেন। কিন্তু এ ধরনের একটি লোকপ্রিয় ইতিহাসে এ প্রশ্নকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যায় না কেন না এটির সঙ্গে সেই চরম ঘটনাটি জড়িয়ে আছে—বৌদ্ধ ধর্মের কাহিনী। খ্রীষ্টিয় যুগের অব্যবহিত পূর্বেই তক্ষশীলা ও তার আশে-পাশের বিশ্বজনীন আবর্তে যে আদর্শ প্রভাব বিস্তার করতে ও সংশ্লেষ সাধন করতে সক্ষম, কি অসাধারণ তার শক্তি। বৌদ্ধ ধর্মের শক্তি কত বড় ছিল, কতদূর পর্যন্তই বা তার বিস্তার, পরবর্তীকালে তার কি রূপান্তর হল, এসব বাস্তবিকই রহস্য থেকে গেছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন কাজই হয়নি। হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও মিঃ হ্যাভেল অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত বৌদ্ধ ভাস্কর্য

* ইণ্ডিয়ান স্কালপ্চার অ্যান্ড পেইন্টিং—ই. বি. হ্যাভেল

বিষয়ের মতই স্বচ্ছন্দ সাহায্য করেছেন। বর্তমানে ভারতীয় নারী-পুরুষের পক্ষে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় শিল্পকলার সম্যক অনুধাবনের জন্য একটা চাবিকাঠি দরকার ; অতীত কোন মহীয়ান যুগের প্রশংসার চাইতেও এটা বেশী জরুরী।

অনন্য একটি মাত্র একক ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংহত পরিচালিত হিন্দুধর্মই যে বৌদ্ধ ধর্ম আমরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারি না। এটি মূলতঃ একটি ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা অনুমোদিত সমাজ ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ এই কারণেই এটি জাতীয় জীবনের সমস্ত পর্যায়েই প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্প, সাহিত্য ও জাতীয়তা বোধকে সৃষ্টি করেছে। মানব নিয়ন্ত্রিত ও সংহত অপর যে দুটি বিশ্বজনীন ধর্মমত সুসংগতি ও যুক্তিবাদের সমর্থন পেয়েছে তার চাইতে এটি অনেক প্রাচীনতর। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই কিছু আগে বা পরে আমাদের একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয় যে এটি আদতে হিন্দুধর্মই ছিল। ঐক্য, উদ্দেশ্য, সংহতি ও সম্ভাব্যতা নিয়ে সক্রিয় হিন্দু ধর্মই ছিল এটি ; কিন্তু অত্যাশ্চর্য একটা দৈব ঘটনা হচ্ছে এই যে এতে এমন অনেক উপাদান পাওয়া যায় যা মৌল প্রথাটিতে প্রথমে ছিল না। এবং ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে যা সত্য, শিল্পকলার দিক থেকে সত্য সেই একই। এমনটি নিঃসংশয়ে গুণগত বিচারে যা সর্বোত্তম, সেই বৌদ্ধ ভাস্কর্য এই মাটিরই ফসল, কিন্তু ভাস্কর্যের পটভূমিকাতেই তা দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রায়শঃই দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে আবেগকে আমরা বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করি, ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাভার বোরোবুদুরের মন্দিরে সেই আবেগ মহত্তম, বৃহত্তম এবং স্পষ্টতম অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কিন্তু সাঁচী, ভারহুত, অমরাবতীর ও এ্যালিফান্টার মন্দিরের মহৎ শিল্পকর্মগুলির জনক যে বিশ্ব, তার দিকে দৃষ্টিপাত না করলে উপরিউক্ত অভিব্যক্তিকেও সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেননা বিরাট বিরাট স্তম্ভগুলি হিন্দু শিল্পধারার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার বিশ্ববাসীর প্রশংসাসূচক দৃষ্টির সামনে তারাই তুলে ধরে বৌদ্ধ আদর্শকে। পাথরে খোদাই ভাস্কর্যের যে নমুনা আমরা পাই তা বহুকাল ধরেই কাঠখোদাইকারী, মূর্তি প্রস্তুতকারী কুমোর ও ছাঁচের মণ্ডনকারীদের মধ্যে চলে আসছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ সনে আকস্মিকভাবে বিশ্বের সিংহাসনে আসীন বৌদ্ধধর্ম তার উৎসস্বরূপ মহান ভারতীয় সভ্যতা তাকে যে যে উপকরণ সরবরাহ করেছে সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরেছে। আস্তে আস্তে অনু-বিশ্বাসটি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বোরোবুদুরে একটি বিজয়ী ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বময় সত্তা নিয়ে উদিত হল। সেই সময়ে জাভার সিংহাসনে রাজপুত অথবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজসিক বংশোদ্ভূত কোন রাজা অধিষ্ঠিত থাকায় নিঃসন্দেহে কাজটা সহজতর হয়েছিল। একটি দেবালয় নির্মাণে ইচ্ছুক এই নৃপতি মাতৃভূমির প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরগুলি ছাড়া আর কোন উপযুক্ত অনুকরণযোগ্য আদল খুঁজে পান নি। ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবার বিশেষের এই ব্যক্তিগত পছন্দটির কথা ছেড়ে দিলে এমন কি একটি শক্তিশালী ধর্মীয় অনুশাসনের সমর্থনপুষ্ট রাজত্বের কথা ছেড়ে দিলে জাভার সভ্যতা কিন্তু মূলতঃ ছিল হিন্দুধর্ম ঘেঁষা।

১৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার শিল্পকলায় এই তথ্য বেশ স্পষ্ট ভাবে নির্দেশিত হয়েছে। মহিষাসুরমর্দিণী দুর্গার মূর্তি (দ্রঃ, পৃঃ ৬২) এই সময়েরই অবদান, এ সম্পর্কে মিঃ হ্যাভেল বলছেন :—

"অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য সদা জাগ্রত চূড়ান্ত শুভ ক্ষমতার শক্তি, ক্রোধ, ঘনীভূত আবেগ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতাকে এই অনবদ্য শিল্পকর্মটিতে যে ধরনের কুশলতার সঙ্গে অভিব্যক্তি দেওয়া হয়েছে তা গুণগত বিচারে যে কোন মনেই অনবদ্য।

সমগ্র ভারতীয় জগতের মহত্তম সাহিত্য কৃতি ও তাদেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ শিল্পকর্ম হিন্দুধর্মেরই অবদান। অনুরূপভাবে জাভা, কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণের মন্দিরগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারতের যে ভাস্কর্যরূপ তাও ভারতীয় আদর্শ ও ভারতীয় শিল্পীদেরই রচনা। বোরোবুদুরের বৌদ্ধধর্মের মতই এ্যালিফান্টার গুহা মন্দিরে হিন্দুধর্ম একই রকম বিচ্ছিন্নতা ও নিরাসক্তিবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ভাস্কর্য বিষয়ে মিঃ হ্যাভেল বলেছেন :—

"অজন্তা, ইলোরা ও এ্যালিফান্টার গুহা মন্দিরগুলোতে গথিক গীর্জা নির্মাতাদের মত একই অনুভূতি নিয়ে ভারতীয় ভাস্করেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন কিংবা বলা যায় অনেকটা ওয়াগ্‌নার যেমন স্বরক্ষেপণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, সেই রকম। প্রকাণ্ড এক পটভূমিকায় আলো ও ছায়ার সুদৃঢ় বৈপরীত্য প্রয়োগ করে তারা বুদ্ধের অসংখ্য উপকাহিনী অথবা হিন্দু বল্লালদের বিচিত্র পুরাণ কাহিনীর উপযুক্ত রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলেছেন এই সব চিত্র ও ভাস্কর্যে।"

ভারতীয় ভাবনার বিরাটত্ব ও শক্তিমত্তাই এই ভাস্করদের কুশলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ্যালিফান্টায় প্রস্তরে খোদাই শিবের ভৈরবমূর্তির মত মহৎ শিল্পকর্ম আর নেই বললেই হয়।

সুবিশাল প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে হিন্দু ভাস্কর্যের। উদাহরণ স্বরূপ, জাভায় প্রাপ্ত চমৎকার দুটো পাথরে কোঁদা ভীমের মস্তকের কথা উল্লেখ করা যায় (পৃঃ ১৪২)। এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :—

"একনজরে এগুলো প্রাচীন ইজিপ্সিয় অথবা গ্রীক শিল্পকলার যে ইঙ্গিত দেয় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এগুলোতে আছে সেরা ইজিপ্সিয় ভাস্কর্যের রেখার মহত্ত্ব, অসাধারণ সাধারণীকরণ এবং সুগভীর বিমূর্ততা, তার সঙ্গে আছে গ্রীক শিল্পকলার সামগ্রিক পরিশীলিত ভাব, কিন্তু এই সব সাদৃশ্যের মূল সূত্র হচ্ছে সবরকমের মহৎ শিল্পকর্মের মধ্যেকার সগোত্রতা, কেননা উপরি উক্ত ধরনগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতীয়।"

মিঃ হ্যাভেলের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে, ভারতীয় বিষয় নিয়ে যাঁরা লিখে থাকেন, শিশুর পিছনে যেমন জননীর অস্তিত্ব, ঠিক তেমনি তাঁদের রচনার খুঁটিনাটির পিছনে থাকবে স্বয়ং ভারত। এই ধারণা বশতঃই যে সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন তার ব্যাখ্যা হিসেবে দক্ষিণ ভারত ও নেপালের সুন্দর

সুন্দর ব্রোঞ্জের কাজ, তিব্বতের রঙীন চিত্রিত নিশান, জাভার প্রস্তর শিল্প—এই ধরনের যে কোন জায়গা থেকে পাওয়া নমুনাকে তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। এই গুণটির জনাই নিষ্ঠার দিক থেকে তাঁর কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ। কোলকাতার আর্ট-গ্যালারীকে সুন্দর তিব্বতীয় তারা-মূর্তিটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :—

"লাবণ্যময় অভিব্যক্তি ও অঙ্গসঞ্চালনে সুস্থ অনুভবশক্তির ছাপ, অনবদ্য কলাকৌশল সংযত ও শোভন আবেগকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নাঙ্গ ও পদযুগলের অত্যন্ত দুরূহঅবস্থিতিকে যথোপযুক্ত কুশলতা ও অঙ্গসংস্থান বিদ্যায় যথাযথ জ্ঞানের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে শিল্পী তার শিল্পবিজ্ঞানে কোন অংশে খাটো নন।"

জাভার প্রজ্ঞাপারমিতার ক্ষেত্রে আমাদের লেখকের অভিমত হচ্ছে এই যে, ভারতীয় মূর্তিকলা মানবশিল্পকর্মে একটা চরম প্রচেষ্টা হিসবে গণ্য হতে পারে।

আমরা ভারতে এই ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত, কোলকাতার যাদুঘরে অবিকল এই রকম একটি মূর্তি আছে—নিঃসংশয়ে এটি উত্তর বাংলা থেকে সংগৃহীত এবং পাল রাজত্বকালে নির্মিত কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই মূর্তিটিকে *এর ধর্মতাত্ত্বিক পটভূমিকা* থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা যায় না, ধ্যানী বুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রথাসিদ্ধ প্রতীকের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন মূর্তিটি সুন্দর হলেও এর সৌন্দর্য ততটা অভিভূত করে না। *জাভাদেশীয় নিদর্শনটিতে আমরা পাই সেদেশে শিল্পকর্মে যে মহান বাছাই ও* বিচার করতে সক্ষম প্রতিভ কর্মরত — তারই আরো একটা উদাহরণ। সমস্ত কৃত্রিম খুঁটিনাটি এখানে বর্জিত। "পবিত্রতা ও স্বর্গীয় জন্মের প্রতীক পদ্মফুলের উপর যোগিনীর ভঙ্গিতে উপবিষ্টা প্রজ্ঞাপারমিতার দুহাতে আধ্যাত্মিক নির্দেশের প্রতীকী চিহ্নস্বরূপ মুদ্রা, তাঁর মুখাবয়বে রয়েছে স্বর্গীয় লাবণ্যের সেই অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি যা জিওভেনি বেলিনি'র আঁকা ম্যাডোনার মধ্যে দেখা যায়। আদি বুদ্ধের সঙ্গিনী প্রজ্ঞাপারমিতাকে বিশ্বের জননী বলে গণ্য করা হয়।"

ভাস্কর্য তাঁদের পক্ষেও সম্ভব, একথা যে জাতি ভুলতে বসেছে, এই ভাবে শিল্প-কলার এই শাখায় তাদের সব সেরা অবদানগুলো তুলে ধরা হল। স্থাপত্যের মতই ভাস্কর্য এমন একটা জিনিস যার সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য প্রয়োজন রাজশক্তির সহৃদয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা, এ ধরনের কোন শক্তির অনুপস্থিতিতে এই ধারাটিকে সজীব ও বলিষ্ঠ রাখা প্রায় অসম্ভব কেননা স্থাপত্যের মত এর ন্যূনতম গার্হস্থ্য প্রয়োজনও নেই বললেই হয়, এর একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে দরিদ্র নির্বিশেষে সাধারণ উচ্চমানের শিক্ষা যার প্রভাবে বড় বড় পৃষ্ঠপোষকের অভ্যুত্থান হতে পারে। তাহলে হয়তো ভারতে আবার নতুন নতুন ভাস্করদের দেখা যাবে যাঁরা ভারতের অতীতের বিজয়-গৌরবকে নতুন করে তুলে ধরবেন এবং প্রমাণ করে দেবেন অতীতের মতই আমাদের মাতৃভূমি আজো প্রতিভাদীপ্ত।

ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে মিঃ হ্যাভেল

সঠিকভাবে বলতে গেলে কোন ছবির দুটো কাজ, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রের আধুনিক বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির খেলোভাবের অত্যন্ত দুঃখকর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর একটি হচ্ছে স্থাপত্যে এর জায়গা অপরটি হচ্ছে বইয়ে এর ভূমিকা। খ্রীষ্টিয় যুগে প্রথম পাঁচ হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ সভ্যতার অধীনে ভারতে প্রথমটির অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল। দিল্লীর মোগল রাজবংশের ছত্রছায়ায় দ্বিতীয়টিরও অনুরূপ উন্নত বিকাশ ঘটে। উভয়-ক্ষেত্রেই, যে ভিত্তিতে কোন মহৎশিল্প লালিত হয়, সে ভিত্তি আজও বর্তমান, যে কোন গ্রামে কিংবা প্রাচীন নৌকোর গায়ে আমরা স্থূল ধরনের মুরাল অলংকরণ দেখতে পাই। যেমন হাতী, ঘোড়া, কুকুরের শোভাযাত্রা কিংবা বাবশিকার ও বিবাহ উৎসবের ছবি, সব ছবিগুলোতেই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে খুঁটি, নানাধরনের অলংকার, আধা জ্যামিতিক পুষ্প—এ সবের মধ্য থেকেই অজন্তা এবং সিংহলের সিগিরিয়ার মহান শিল্পকর্মগুলি জন্ম নিয়েছে। প্রতি প্রদেশেই সুলভ রঙের বাক্স নিয়ে প্রাচীন শৈলীর চিত্রকরেরা এখনো বাজারের ছবি এঁকে যাচ্ছেন, যে ছবিগুলো একটা বিগত গৌরবের স্মৃতি বহন করে।

এই উভয় ধরনের কাজের মধ্যে একটা সমতা বিধান করছে আধুনিক ইজেল চিত্রকলা। বইয়ে যে সব ছবি আঁকা হত সেইভাবে আজকের দিনের ছবির লক্ষ্য হচ্ছে, মহাকাব্যিক অথবা প্রাকৃতিক কোন মননশীল ধারণার বিশেষ কোন মুহূর্তকে তুলে ধরা। কিন্তু এরমধ্যে একটা প্রচেষ্টা রয়েছে দেয়ালচিত্রের জাঁকজমক ও বিস্তারকে উপরিউক্ত লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বিত করা। এগুলো মোটামুটি বৃহদাকার কিন্তু এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রকৃত পুস্তক চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রাচীন শিল্পীদের সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হবার যে তৃষ্ণা ছিল এখন সেগুলোকে সহজসাধ্য যান্ত্রিক প্রতিলিপির মধ্যে অনেক গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এখন প্রাচীন শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলি দুর্লভ মণিমুক্তার মত হয়ে উঠেছে, এই সব রত্নরাজিকে অনেক আগ্রহ নিয়ে খুঁজে বেড়াতে হয় এবং কদাচিৎ কখনো পাওয়া যায়।

ভারতে মুরাল চিত্রকলার যে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতীয়বাদী ও গণতন্ত্রী যে নবযুগ, শিক্ষা এবং নাগরিক জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে বিরাট বিরাট সভাকক্ষগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলবে, সে সবগুলির ক্ষেত্রেই অলংকরণের দাবি থাকবে, এবং নিঃসংশয়ে সেই অলংকরণ অনেকাংশেই হবে চিত্র। এই সব চিত্র-কলার বিভিন্ন ধরনের তিনরকম বিষয়বস্তু থাকবে, যেমন, জাতীয় আদর্শসমূহ, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় জীবন। এই সব মহান চিন্তাধারার ছত্রছায়ায় আগামী দিনের নরনারীরা বড় হয়ে উঠবে। এ ধরনের একটি পটভূমিকায় নাগরিক জীবনও উন্নততর হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে গভীরতর রাজনৈতিক সচেতনতার অভিব্যক্তি যেখানে ঘটবে, সেই সব গ্রামীন সভাকক্ষগুলির অনুরূপ জিনিসই ভারতে ছিল। মিঃ

হ্যাভেল খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ বিহার সমূহের চৈত্যকক্ষগুলিতে শিল্পকলার এমনই অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল।

"আধুনিক পেশোয়ারের কাছাকাছি তক্ষশিলায় বাংলাদেশের নালন্দা, কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীধন্যকটক (অমরাবতী) এর মতো প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় অংকন ও স্থাপত্যবিদ্যালয় ছিল। এবং ভারতের এইসব বড় সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিদেশী সমস্ত শিল্পভাবনা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ভাবনার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় হয়ে উঠত।"

"এই সব কেন্দ্রে সৃষ্ট ভারতীয় শিল্পকলা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে আমাদের যুগ এই অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নবযুগে সমগ্র এশিয়ায় দীপ্তি বিকিরণ করে। এই সব বিদ্যালয়ের দরুনই ভারত অজন্তার শিল্পকলা, অমরাবতী, ইলোরা ও এ্যালিফ্যান্টার ভাস্কর্কীর্তিগুলির জন্ম দিতে পেরেছে।

"আদি যুগের বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতে "ছবিঘরে"র প্রচুর পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে—যে ঘরগুলি সম্ভবতঃ পবিত্র বিষয় নিয়ে চিত্রিত মাঠের সভাগৃহ ছিল।—কিংবা উত্তর ভারতে রাজকীয় প্রাসাদ ও নাগরিকদের বাসগৃহে যে ধরনের বারান্দা ঘেরা উদ্যানপ্রাকারের দেয়ালে আঁকা ছবি থাকে কিংবা ইতিপূর্বে যে সব ভাস্কর্য শোভিত সভাগৃহের কথা বলা হয়েছে—অনেকটা সেই রকম। ভারতীয় শিল্পকলা কুখ্যাতির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও এই সব বারান্দা, প্রাচীর, চিত্রপ্রদর্শনী কক্ষরূপে ব্যবহৃত হত।"

বৌদ্ধ মঠে সন্ন্যাসদীক্ষা, সাধারণ সভা, উপাসনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন এই সব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিরাট বিরাট চৈত্যকক্ষের উপস্থিতির দরুন ভারতীয় চিত্রকলার অনবদ্য ধারাটির বিকাশ-সাধন সম্ভব হয়েছে, অজন্তার গুহায় গুহায় এখনো যার চিহ্ন পাওয়া যায়।

ফ্লোরেন্স নগরীর উপকণ্ঠে সানমার্কোর ডমিনিকান কনভেন্ট ফ্রা আঞ্জেলিকোর হাতে যে ভাবে অলংকৃত হয়েছিল, সেইভাবেই মঠে বসবাসকারী পরিচালকগোষ্ঠীর নির্দেশানুসারেই এ সব চিত্র অংকিত হয়েছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কোনো সন্দেহের অবকাশ এক্ষেত্রে নেই যে, এই সব ভিক্ষুরাই তাঁদের প্রতিভা ও উদ্যম ব্যয় করেছিলেন প্রাচীন বিহার সমূদয়ের নির্মিতি, ভাস্কর্যসৃষ্টি ও চিত্রাংকনের কাজে। সাধারণের মঙ্গলের জন্য সমাজের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর অবদান এসব। তাঁরা স্বজনদের কাছে সক্রিয় সহানুভূতি ও আশ্বাস ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন ছাড়া তাঁদের এই সব কাজের জন্য আর কোন পুরস্কার চাননি। এই কারণেই এই সব মঠবিহার সর্বদা স্মরণীয় কাজ করতে পেরেছেন, তা যে অভিমুখেই তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করুন না কেন।

মিঃ হ্যাভেল বলেছেন—"অজন্তার ধর্মীয় চিত্রগুলি যে সময়-সীমায় আঁকা হয়েছে, তার পরিধি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আমাদের যুগের সপ্তম

শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত—অর্থাৎ আগেকার অধ্যায়গুলিতে ভারতীয় শিল্পকলার যে বিরাট যুগটির পর্যালোচনা করা হয়েছে—তার প্রায় সবটা জুড়েই। দুর্ভাগ্যক্রমে অবহেলা ও অপব্যবহারে এইসব অনবদ্য চিত্রগুলি অনেকাংশেই তাদের বর্ণবিন্যাসের আদি সুষমা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এতদূর নষ্ট হয়ে গেছে যে আগে এগুলো কি ছিল, তারই শুধু করুণ ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয় ছবিগুলিকে। অজন্তার সেরা চিত্রগুলিতে, বিশেষতঃ ১৬ ও ১৭ সংখ্যক গুহার চিত্রাবলীতে আমরা বোরোবুদুরের ভাস্কর্যের অপরূপ নিবিড় প্রকৃতিপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ভক্তির প্রকাশ দেখতে পাই।

মিঃ জন গ্রিফিথের অজন্তা বিষয়ক গ্রন্থে যে সব চিত্রাংশের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে মনে হতে পারে যে হেলেনীয় ও মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক শিল্প আদর্শের এই সমন্বয়ই অজন্তা চিত্রাবলীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু সম্প্রতি এই চিত্রগুলিকে প্রথম দেখে এসে বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক মিসেস্ সি, আই গ্রিফিথ ইংল্যান্ডে বলেছেন যে চিত্রগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রার বর্ণনা চিত্রণে। যে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে শিল্পীরা সাধারণ ও অভিজাত মানুষের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন ইউরোপের চিত্রশিল্পে অন্ততঃ আরো পাঁচশত বছর পরে গিয়োত্তোর কালে পৌঁছোবার আগে তার নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে মিঃ হ্যাভলকে মুখ্যতঃ মোগল যুগ ও তৎপরবর্তী যুগের রাজসভার শিল্পীদের হাতের রত্নতুল্য শিল্পকর্মগুলির কাছে যেতে হয়েছে। এই সব চিত্রের অনন্যসুন্দর প্রতিলিপি করতে পারার দরুন মেসার্স জন মারে এন্ড্ সন্সকে অভিনন্দন জানানো উচিত। বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য বইটির প্রচ্ছদ চিত্র "শাহজাহানের সভার এক শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতিগুলি এই অনবদ্য কাজটির জন্য।

কিন্তু নিজের বিবেকের নির্দেশেই মিঃ হ্যাভেল বর্তমানকে অবহেলা করেন নি। বর্তমানের অপরিচিত শিল্পীদের কাজের নমুনাস্বরূপ "শিবিরে প্রজ্বলিত অগ্নি ঘিরে বৃত্তাকারে ভ্রমণকারীরা" এই মনোরম কাজটি কিন্তু প্রতিলিপিকালে মার খেয়েছে। আলোগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রকট, তুলির ছোঁয়া অত্যন্ত কর্কশ। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃশ্য। ভারতীয় নরনারীরা এই ধরনের ছবি কিনতে উৎসাহী হলে এ ধরনের ছবি আরো আঁকা হত। শিল্পী গাছের তলায় মাঝরাতের দৃশ্যের রোমাঞ্চ নিজে অনুভব করেছেন, চাপা কণ্ঠস্বর, কম্পমান অগ্নিশিখার সামনে যে গল্পগুজব চলেছে, দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে অর্ধ অবগুণ্ঠিতা এক নারীমূর্তি কান পেতে শুনছে সেই কাহিনী, দূরে বিলীয়মান পথরেখার অনুভূতি, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে যে ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে, আর কখনো দেখা হবে না—সমগ্ররূপকল্পটি শিল্পীর ব্যক্তিভাবনায় অনুরঞ্জিত।

আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিহীনতার দরুনই আমরা এ ধরনের ছবি নির্বাচন ও

কেনা থেকে বিরত থাকি, এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে, আমরা বাঁকিপুরের খোদাবক্স পাঠাগারের তাঁদের সংগৃহীত অমূল্য কিছু পাণ্ডুলিপি দেখে মোগল রাজসভার স্ত্রীলোক-গণের শিক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবো। যাঁর স্মৃতিতে পরবর্তীকালে তাজমহল নির্মিত হয় সেই রাণী আর্জমন্দবানু তাঁর স্বামীর জন্মদিনে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করে একটি অনন্যসাধারণ বই কিনেছিলেন যাতে তাঁর স্বামীর স্বাক্ষর রয়েছে। মহান মহান যুগে স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই সুশিক্ষিতা, সর্বদাই কর্মক্ষম এবং প্রায়শঃই সাহিত্যিক রুচিসম্পন্না। স্ত্রীলোকের অজ্ঞতাই জাতীয় অবক্ষয়ের পূর্বাভাস সূচিত করে।

সাদির প্রতিকৃতি ও ওমর খৈয়ামের জন্য শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আঁকা ছবির মধ্যে যদি তুলনা করা যায় তাহলেই মোগল চিত্রশৈলী ও আধুনিক চিত্রশৈলীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্যক্ ব্যাখ্যা করা যাবে।

মোগল প্রতিকৃতিগুলিতে সত্যনিষ্ঠা ও কল্পনাশক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক চিত্রকলা তার বিষয়বস্তুর মানসিক পরিমণ্ডলকেই তুলে ধরতে চায়। তাই আধুনিক শৈলীতে সূর্যোদয় মুহূর্তে ছাদের উপর বসে থাকা একটি মনুষ্যমূর্তিকে আঁকা হয়—তারপর আমরা তাকে তার স্বপ্নের মধ্যে অনুসরণ করে ফিরি।

সাদি নিজেই একজন কবি, তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে একটি বই হাতে, তাঁর মুখ-মণ্ডলে চিন্তার নিবিড়তার ছাপ। কিন্তু এই ওমরকে মনে হচ্ছে তার নিজের ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে আছেন।

প্রাচীন চিত্রকরদের প্রধান দোষ ছিল একটু বেশী কঠোরতার দিকে ঝুঁকে পড়া; আধুনিকদের ত্রুটি এমন একটা কমনীয়তা ও ভাবাবেগ যা প্রায়শঃই প্রায় দুর্বলতার সীমায় উপনীত হয়।

মিঃ হ্যাভেল কৃত প্রতিলিপিগুলির মধ্যে আধুনিক ধারার সর্বশেষ চিত্রটির মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইতে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দিক থেকে আমরা যাই ভাবি না কেন (তাঁকে কাপুরুষরূপে চিহ্নিত করে যে আধুনিক রুকান, আমি নিজে তা একবিন্দু বিশ্বাস করি না।) সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর আঁকা এই ছবি অনবদ্য, বলিষ্ঠ, সংবেদনশীল, উদ্যম প্রাণশক্তিতে ভরপুর। মুকুটচ্যুত এক রাজার পলায়ন ছবির রেখায় রেখায় মুখর। ছবিটির কোন শিরোনাম নেই; আমরা ইচ্ছে করলে এর নামকরণ করতে পারতাম। সর্বোপরি যে মুহূর্তটিকে চিত্রিত করা হয়েছে তা দুঃখজনক হলেও তার মধ্যে কি কোন প্রতিশ্রুতি নেই? এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিষাদ; অথচ শিল্পের জন্য নতুন প্রতিশ্রুতি? ছবিটি দুইয়ের কথাই বলে। প্রাসাদের সিঁড়ির কাছে নৌকো অপেক্ষা করছে। কিন্তু দরজাটা খোলা রয়েছে, পলায়নপর মুখের কঠোর সংকল্পে কিন্তু আশা বেঁচে রয়েছে! এই মুহূর্তটিকে বরং পলায়নের চাইতে সাময়িক অপসরণ বলাই শ্রেয়। তাঁর রাজত্বের কোন

সুদূর দুততায় লক্ষণসেন চিরকাল বেঁচে থাকবেন ও চিরকাল রাজত্ব করবেন। সময় আগত হলে তিনি আবার ফিরে আসবেন।

"আইডিয়ালস্ অব দ্য ইস্ট" এর ভুমিকা *

জাপানী চিত্রাদর্শের উপর রচিত এই গ্রন্থের লেখক কাকাসু ওকাকুরা তাঁর নিজের দেশের কাছে বহুকাল যাবৎ পরিচিত, অন্যরাও তাঁকে জানে প্রাচ্যদেশীয় পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা সম্বন্ধে সর্বাগ্রগণ্য একজন বিশারদ বলে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি এই একই বিষয়ে বিস্তৃততর ও চিত্রসম্বলিত সম্পূর্ণ আরো কোন গ্রন্থ রচনা করবেন।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পকলার ইতিহাসও আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর তরুণ বয়সেই জাপানী সরকার ১৮৮৬ সালে রাজকীয় শিল্প কমিশনের সদস্য হিস্যাবে প্রেরিত হ'ন তিনি। এই অভিজ্ঞতায় অভিভূত না হয়ে পড়ে বরং মিঃ ওকাকুরা এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এশীয় শিল্পের প্রতি নিবিড়তর ও গভীরতর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হলেন। প্রাচ্যদেশের সর্বত্র এখন যা ফ্যাশান সেই ছদ্ম-ইউরোপীয়করণের বিরোধিতা করে তিনি সেই সময় থেকেই জাপানী চিত্রকলাকে বলিষ্ঠভাবে পুনঃজাতীয়করণের দিকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হলেন।

পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই জাপান সরকার মিঃ ওকাকুরার জ্ঞান ও কর্মক্ষমতাকে সম্মানিত করার জন্য তাঁকে টোকিওর ইনোতে নতুন কলাবিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ করে দেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুন তথাকথিত ইউরোপীয়তার তরঙ্গ আবার বিদ্যালয়টিতে প্রভাব বিস্তার করে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় প্রণালীকে অধিকতর জোরদার করে তোলার জন্য চাপ আসতে থাকে। এই সময়ে মিঃ ওকাকুরা ইস্তফা দিলেন। ছয় মাস পরে জাপানের বলিষ্ঠতম তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর ৩৯ জন তাঁকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়। তারাই টোকিও শহরের উপকণ্ঠে ইয়ানাকাতে নিপ্পন বিজিতসুইঁ অর্থাৎ চারুকলাভবন স্থাপন করেন; এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে তার উল্লেখ আছে।

মিঃ ওকাকুরাকে আমরা যদি কোন না কোন অর্থে তার দেশের উইলিয়াম মরিসের স্থান দিই তাহলে আমাদের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া হোক যে নিপ্পন বিজিতসুইঁ হচ্ছে একধরনের জাপানী মার্টন মঠ। এখানে জাপানী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের পাশাপাশি রয়েছে নানাধরনের মণ্ডন শিল্প যেমন, ল্যাকার ও ধাতুর কাজ, ব্রোঞ্জ ঢালাই, চিনেমাটির কাজ ইত্যাদি। পাশ্চাত্যের সমকালীন শিল্প আন্দোলনের ভাল জিনিস যা কিছু, তাঁরা গভীর সহানুভূতি ও সহৃদয়তা নিয়ে সেগুলো অর্জন করতে প্রয়াস

---

* কাকাসু ওকাকুরার লেখা; জন মারে, লন্ডন

পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা জাতীয় প্রেরণাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণেও উদ্যোগী। পৃথিবীর যে কোন শিল্পকর্মের সঙ্গে সমমর্যাদায় উপস্থিত হবার সগৌরব দাবি রাখে এঁদের কাজ। এঁদের মধ্যে আছেন হাসিমোতো গাহো, কানজান, তাইকান, সেজেই, কোজন্ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা। নিপ্পন বিজিতসুইঁয়ের কাজের বাইরে মিঃ ওকাকুরা জাপানী শিল্পসম্পদে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে তার দেশের সরকারকে সাহায্য করবার মত সময় পান, সময় পান চীন ও ভারতের প্রাচীন শিল্পকর্মগুলিকে দেখার ও পর্যবেক্ষণ করার। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রাচ্য সংস্কৃতির স্থান নিয়ে আধুনিককালে এই প্রথম একজন ভ্রমণকারী এলেন। অজন্তার গুহাবলীতে মিঃ ওকাকুরার পরিদর্শন ভারতীয় পুরাতত্ত্বের একটি স্পষ্ট দিক চিহ্ন। এই একই যুগে দক্ষিণ চীনের কিছু শিল্পকর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার দরুন তিনি এক নজরেই দেখতে পেলেন যে এখন গুহায় যে সব প্রস্তরমূর্তি অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো আসলে মূর্তির কাঠামোস্বরূপ, প্রকৃতির সমস্ত প্রাণ চঞ্চলতাকে এই কাঠামোর উপর গাঢ় প্লাস্টারের পলেস্তারার উপর ফুটিয়ে তোলার কথা ছিল। এই সব খোদাই কাজকে খুঁটিয়ে বিচার করলে এই অভিমতেই ফিরে আসতে হয় যে, অজ্ঞতাপ্রসূত হলেও অর্থসর্বস্ব ইউরোপের অচেতন বর্বরতার দরুন বেশ কিছু অনভিপ্রেত বিকৃতি ঘটে গেছে, যেমন হয়েছিল অতি সম্প্রতি আমাদের নিজেদের বৃটিশ গীর্জাসমূহের ক্ষেত্রে।

শুধু স্বাধীন জাতিদের ক্ষেত্রেই শিল্পকলার বিকাশ ঘটতে পারে। জাতীয়তাবোধ বলতে আমরা যা বুঝি স্বাধীনতার সেই আনন্দেরই ফলশ্রুতি ও অভিব্যক্তি হচ্ছে শিল্প-কলা। তাই হাজার বছরের নিপীড়নের দরুন স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন ভারত যে সৃষ্টির আনন্দ ও সৌন্দর্যের জগতে নিজের স্থান হারিয়ে ফেলেছে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু কোন উপযুক্ত বিশারদ যদি এসে বলেন যে, এদেশেও একদা অশোকের যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় ও গুহা মন্দিরগুলি পরিদর্শনরত অসংখ্য চৈনিক তীর্থযাত্রীদের উপরে শিল্পরুচি ও শিল্পভাবনার এমন প্রভাব পড়েছিল, তারফলে চীনের স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিকাশে ভারতের বিরাট প্রভাব পড়েছিল, সে প্রভাব চীনের মাধ্যমে জাপানেও ছড়িয়ে পড়ে—এই উক্তি আমাদের আবার আশ্বস্ত করবে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের একান্ত বিশেষ সমস্যাগুলোকে নিয়ে যারা গভীরভাবে ভাবিত তাঁরা ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে মিঃ ওকাকুরার অভিমতের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করতে পারবেন। বিশ্বের আরেকটি সমান্তরাল মহান চিত্রধারা অর্থাৎ চৈনিকধারাকে তুলে ধরে মিঃ ওকাকুরা এই গ্রীকতত্ত্বের অসম্ভাব্যতার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারতীয় বিকাশে আদত-আত্মীয়তা মূলতঃ চৈনিক ধারার সঙ্গে, তবে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, আদিতে একটি সাধারণ এশীয় শিল্পকলার অস্তিত্ব ; সেইধারাই গ্রীস, সুদূর পশ্চিম আয়ারল্যান্ড, ইট্রুরিয়া, ফিনিশিয়া,

ইজিপ্ট, ভারত ও চীনের তীরে তীরে তরঙ্গ চিহ্ন রেখে গেছে, এরকম একটা অঙ্কে যে কোন রকম বিতর্কেরই একটা যুদ্ধ বিরতি বিন্দু পাওয়া যায়। পন্ডিতরা বহুকাল ধরে মহান নরওয়ে দেশীয় গাথা-কাব্যের একটা এ্যাভ্‌গার্ড পটভূমিকা অনুসন্ধান করছিলেন; সেই প্রাচীন এশিয়ার একটা প্রদেশ হিসাবে গ্রীস সঠিকভাবে খাপ খেয়ে যায়। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ তত্ত্বানুসন্ধানের একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তার ফলে অধিকতর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রণালীর উদ্ভব হয়, যার সাহায্যে অতীতের বহু ভ্রান্তির অবসান সম্ভব।

চীনের প্রসঙ্গেও মিঃ ওকাকুরার আলোচনা বহুতর ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। সেই দেশের পন্ডিতদের মধ্যে মিঃ ওকাকুরাকৃত দক্ষিণী ও উত্তরের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লাওইজম্ ও তাওইজমের মধ্যে তিনি যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তাও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আরো বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর পুস্তকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাঁর অভিমত হচ্ছে—বিশ্বের একটি বহুধাপরিচিত মহান ঐতিহাসিক দৃশ্য, হিমালয়ের গিরিপথ, সমুদ্র পথ ও প্রণালী পেরিয়ে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি, যে আন্দোলন হয়তো অশোকের সময়ে শুরু হয়ে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের নাগার্জুনের সময়ে এসে চীন দেশে শরীরী হয়ে উঠল—তা কোন বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা নয়, বরং এটি হচ্ছে সেই পরিস্থিতিরই প্রতিনিধি একমাত্র যার অধীনে এশিয়ার পক্ষে বেঁচে থাকা ও ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। যে জিনিসকে আমরা বৌদ্ধধর্ম আখ্যা দিয়েছি, তা কোন নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বাস নয়, তার কোন কড়া সীমারেখা নেই, নেই কোন স্পষ্ট সীমানা চিহ্নিত তত্ত্ব যার দ্বারা তার নিজস্ব কোন পবিত্র ধারা গড়ে তোলা যায়। বরং হিন্দুধর্ম নামে যে বিশাল সমন্বয়টি পরিচিত, বৈদেশিক চেতনায় গৃহীত হবার পর তাকে একটা নাম দেওয়া হল—এমনটাও আমরা ভেবে নিতে পারি। কেননা মিঃ ওকাকুরা ঊনবিংশ শতাব্দীর জাপানী চিত্রকলার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে শুধুমাত্র বুদ্ধের ব্যক্তিগত নির্দেশছাড়াও সমগ্র প্রাচ্যের পুরানো কাহিনী ছিল পরস্পর বিনিময়ের বিষয়। বৌদ্ধীকরণ নয়, বরং মঙ্গোলীয় মানসকে ভারতীয়করণই ছিল প্রকৃত সক্রিয় প্রক্রিয়া, নতুন কোন অজানা দেশে প্রথম ধর্মযাজকদের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্ম যদি ফ্রান্সিস-বাদ আখ্যা পায়, ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম দাঁড়াবে।

জাপানের ক্ষেত্রে একথা সুবিদিত যে তার শিল্পকলায় জাতীয় ক্রিয়াকলাপই হচ্ছে মৌল উপাদান। তার শিল্পকলায় প্রতিযুগেই ফুটে উঠেছে তৎকালীন জাতীয় চেতনার বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদান ও নির্দেশ। প্রাচীন গ্রীসের মত নয়, জাপানী চিত্রকলা এমন এক জিনিস যাতে সমগ্র জাতি অংশ গ্রহণ করে; বরং অনেকটা ভারতেরই মত—বিশেষ ভাবনাকে বিস্তারিত করতে সমগ্র জাতি সংহত হয়ে এগিয়ে আসে। সুতরাং যে প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে জেগে ওঠে তা হল সামগ্রিকভাবে জাপানী শিল্প-কলায় যে জিনিস অভিব্যক্তি পায়, সামগ্রিকভাবে তার পরিচয় কি?

দ্বিধাহীনভাবে মিঃ ওকাকুরা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি জাপানে এসে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ও তার শিল্পকলায় স্বচ্ছন্দ সজীব অভিব্যক্তি পেয়েছে। এবং এই এশীয় সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে চৈনিক শিক্ষা ও ভারতীয় ধর্ম এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর মতে তাঁর নিজের দেশের শিল্পকলার বিশেষ চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য তার অলংকৃত ও শ্রমশিল্পঘটিত উপাদানগুলি নয়। এখনো পর্যন্ত ইউরোপে তার মহান যে জীবনাদর্শ অজ্ঞাতই থেকে গেছে তাই হচ্ছে তার মৌল বৈশিষ্ট্য। বিকশিত প্রামমঞ্জরীর গুটিকয়েক চিত্র নয় বরং ড্রাগনের শক্তিদীপ্ত ধারণা ; ফুল এবং পাখি নয়, মৃত্যুর উপাসনা ; যতই সুন্দর হোক না কেন কোন তুচ্ছ বাস্তবতা নয় বরং মানুষের মনের নাগালের মধ্যে মহত্তম কোন চিন্তার মহত্তম কোন ব্যাখ্যা ; বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেকে নয় পরকে রক্ষা করবার প্রবল বাসনা—জাপানী শিল্পকলার প্রকৃত ভাব এসব ক্ষেত্রেই নিহিত। অভিব্যক্তির এইসব প্রক্রিয়া ও উপায়ের জন্য জাপান চীনের কাছে ঋণী ; তবে মিঃ ওকাকুরার অভিমত হচ্ছে ভাবাদর্শগুলির জন্য জাপান ভারতের উপরেই নির্ভরশীল। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস এই যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় নতুন নতুন তরঙ্গের পিছু পিছু এসেছে জাপানের অভিব্যক্তির মহান মহান নবযুগগুলি। ইতালি ও গীর্জার বাণী থেকে বিচ্ছিন্ন হলে উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের যে অবস্থা হ'ত, বিশাল এই দাক্ষিণী উপদ্বীপের উদ্দীপক প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চীন ও জাপানের অনন্যসাধারণ শিল্পানুভূতিও প্রাণশক্তির দিক থেকে অনেক পিছনে থাকত, সম্পদের দিক থেকে হ'ত অনেক দরিদ্রতর। আমাদের লেখকের মতে এশীয় শিল্প কখনোই বুর্জোয়া হতে পারত না ; এক্ষেত্রে জার্মানী, হল্যান্ড ও নরওয়ের সঙ্গে তার প্রবল বৈপরীত্য। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটি যে কৃষকদের অলংকরণের একটা চমৎকার নকশার সূত্রে আবদ্ধ থেকে যেতে পারত তা তিনিও স্বীকার করবেন।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এইসব তরঙ্গ কি করে যে বিভিন্ন জাতিকে উদ্দীপিত করেছিল, পুস্তকটির পাতায় পাতায় তা ব্যাখ্যা করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য : জাপানের ইয়ামাতো জাতি, উত্তর চীনের অসামান্য নৈতিক প্রতিভা, দক্ষিণের সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি—এইসব যে যে পরিস্থিতি নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়েছে,—তা সম্যক্ বুঝে নেবার পর আমরা লক্ষ্য করি যে কিভাবে বৌদ্ধধর্মের স্রোত অনুপ্রবেশ করে কূল ছাপিয়ে সমগ্র জিনিসটাকে একাকার করে দিল। একটি বিশ্বজনীন বিশ্বাসের স্বপ্নের ছোঁয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাজাগতিক ধারণাবলীর উন্মেষ ঘটাল, কলার ক্ষেত্রে রোশনা বুদ্ধের উদ্ভব হ'ল। সেই যুগের নিবিড় সর্বেশ্বরবাদ, ফুজিওয়ারার আবেগবাদ কামাকুরার বীরোচিত পৌরুষের মধ্যে এটি কিভাবে বিস্ফোরিত হ'ল, আমরা তাও লক্ষ্য করি।

ইয়ামাতোদের আদিম ধর্ম শিন্টোবাদ বৌদ্ধ উপাদানগুলিকে মোটামুটি ছেঁটে ফেলে পুনরায় আবির্ভূত হওয়াতেই সেইজী যুগের মহত্ত্বের বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়। এই ধরনের বিরাটত্ব বহু দূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ রুচি ও ভাবাদর্শের মধ্যে সে অসংহতি ছড়িয়ে পড়ছে, এই মুহূর্তে প্রতিটি প্রাচ্য-প্রেমীই সেদিকে আতংকবিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন।

তাই এশীয় জনগণকে তাঁদের গৌরবময় অতীতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে নিয়ে সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। তাই মিঃ ওকাকুরা যেভাবে করেছেন, তেমনিভাবে এশিয়াকে দেখাতে হবে যে, আমরা যেমন কল্পনা করি এশীয় শিল্পকলা তেমনি কিছু খণ্ড ভৌগোলিক সত্তার সমন্বয় মাত্র নয়, এটি একটি একত্রিত সজীব সত্তা—এর প্রতিটি অংশ—একে অন্যের উপর নির্ভরশীল—সমগ্র সত্তাটির একটিমাত্র জটিল জীবন।

স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি আমেরিকা গিয়ে ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন—ভ্রাম্যমাণ সেই সন্ন্যাসীটির প্রতিভার প্রভাবে বিগত দশ বছরে অশোক যুগের অনুরূপভাবে আবার প্রাচীন হিন্দুধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গত ছ' সাত বছর ধরে এখান থেকে আবার ধর্মযাজকেরা ইউরোপ ও আমেরিকায় যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর দরুন এক ধর্মীয় সাধারণীভবন সম্ভব হবে, প্রকৃতিবিজ্ঞানে শীর্ষবিন্দুতে উত্তীর্ণ হয়েছে যে প্রটেস্টান্ট মননের স্বাধীনতা, তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটবে ক্যাথলিক ধর্মের আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক সম্পর্কের। এমন মনে হতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী জনগণের অদৃষ্টে লেখা আছে তারই বিজিত প্রজাদের ধর্মীয় আদর্শের কাছে বিজিত হওয়া। উপরি উল্লিখিত মহানভারতীয় চিন্তানায়কের ভাষায় বলতে গেলে—"অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন অবনমিত ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসই অর্ধেক পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে, তেমন বহু-নিন্দিত হিন্দুরাও যে এখন আবার পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে—এটা অসম্ভব কল্পনা নয়।" এইরকম কোন ঘটনাই উত্তর এশিয়ার আশার বিন্দু। আমাদের যুগের প্রারম্ভে যে প্রক্রিয়াতে একহাজার বছর লেগেছিল এখন হয়তো বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে কয়েক দশকের মধ্যেই পুনরাবৃত্ত হতে পারে এবং পৃথিবী আবার দেখতে পারে প্রাচ্যের ভারতীয়করণ। তাই যদি হয় তাহলে এর বহুমুখী ফলাফলের মধ্যে একটি হবে এই যে ইংলণ্ডে বিগত দশকে যেমন মধ্যযুগীয় পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল তারই সমান্তরাল ভাবাদর্শসমূহের পুনরাবির্ভাব ঘটবে জাপানী চিত্রকলায়। চীনে এর সহযোগী কি বিকাশ ঘটবে? ভারতেই বা কী হবে? কোন প্রভাবের দরুন পূর্বদেশীয় দ্বীপের সাম্রাজ্য অন্যদের প্রভাবিত করবে? মহান জননী এশিয়া এসব প্রশ্নের সমাধান করবে একথা যদি প্রমাণ করতে না পেরে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আমাদের লেখক বৃথাই বাক্য ব্যয় করেছেন।

মধ্যযুগীয় সিংহলী শিল্পকলা

আলোচ্য বইটির কাগজ ও ছাপার সৌকর্য এর গুণাবলীর সূচনা মাত্র। এইসব দিক থেকে 'মধ্যযুগীয় সিংহলী শিল্প' হচ্ছে একটা বই যাকে আদর্শস্বরূপ ধরা যায়। কল্মস্কট বইয়ের জন্য উইলিয়াম মরিস আগে যা ব্যবহার করতেন সেই হস্তচালিত মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত এই বই এবং এর রচয়িতার দেশ থেকে প্রচারিত এই বই হাতে নাড়াচাড়া করলে সকলেই একথা বিশ্বাস করবেন যে উদ্ভবের সঙ্গে বইটির সাযুজ্য রয়েছে এবং এর শুভ জন্ম মুহূর্ত প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও শুভ।

লোককাহিনী ও গাথাকাব্যের বলিষ্ঠ সরল পরিভাষায় নিষিক্ত এই বইয়ের ইংরিজী ভাষা, ছাপার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও আধুনিক বিশ্বের সেরা কারুশিল্পী মরিসের স্পর্শ অনুভব করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর অবদানের যথা বিচার করতে গেলে 'মধ্যযুগীয় সিংহলী শিল্পকলা'র' একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে এর বহুসংখ্যক প্রাযুক্তিক পরিভাষা, যা বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় এই সব পরিভাষা কোন ক্ষেত্রেই রচনাপ্রবাহকে ব্যাহত করেনি এবং লেখক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এগুলোকে সমধর্মী ইংরিজী শব্দে ব্যক্ত করতে। অবশ্যই বিশেষ ধরনের এই বইতে বিদেশী প্রাযুক্তিক ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য। যথাসাধ্য যা করা যেতে পারে তা হ'ল ধ্বনিগত প্রবহমানতার বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে এগুলোকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা।

বিষয়বস্তুটি অবশ্য একনজরে দেখে যা মনে হয়, তার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ কুমারস্বামী সিংহলী পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুভূতিরও অনুরূপ ইংরিজী ভাষা খোঁজার প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়ে গেছেন এবং 'লীচগেট' অথবা 'হেওমেন' অথবা 'সুইংঅফ্ ড্রুম' এ ধরনের অনুবাদ বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তি দেখা যায় তার মূলে 'রায়ত', 'জমিদার', '...ণ' এসব শব্দকে তুলে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার অবদান কিছু কম নয়, ভাবটা এই এদের কোন পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ নেই, এবং এদেরকে অনুবাদও করা যায় না।

ডঃ কুমারস্বামীর এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যদেশীয় মধ্যযুগীয় এক রাজত্বকালে শিল্প ও কারুশিল্পকে সম্পূর্ণ কার্যকরী অবস্থায় খুঁটিনাটি পারস্পরিক সম্পর্কসমেত তুলে ধরা এবং এটাও দেখানো যে এগুলি অনবরত প্রেরণা ও সংরক্ষণের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সভ্যতার উপর নির্ভরশীল হয়েও বিকাশ ও চরিত্রের দিক থেকে কতখানি মৌলিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

তিনি বলছেন: "দক্ষিণভারত ও সিংহলের শিল্পকলা কী ঘনিষ্ঠভাবেই না সংযুক্ত; * এইভাবে তামিল কারুশিল্পীদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েও এঁদের স্বদেশী ঐতিহ্যের জীবনীশক্তি ও প্রবহমানতার কথা মনে রাখতেই হবে। সিংহলী জনগণকে

---

* আনন্দ কে. কুমারস্বামী

একটা বিষয়ে পুরো কৃতিত্ব দিতেই হবে যে সামগ্রিকভাবে তাঁদের শিল্প দক্ষিণ ভারতের শিল্পের চাইতে শৈলী এবং অনুভূতির দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এঁদের মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয়, বিশেষত, প্রাচীন বৌদ্ধশৈলীর অসংখ্য স্পষ্টতর চিহ্ন যা এখন ভারতেও সহজে পাওয়া যায় না।"

আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতকে শিল্পসমন্বয়ের সম্পূর্ণ একটি বৃত্তের জননী হিসাবে :—"ভারতীয় শিল্পের (সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাভার শিল্পসমেত) বিভিন্নমুখী বিকাশের মধ্যে নিহিত যে, লক্ষণীয় ঐক্য তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অলংকরণের বিভিন্ন উপাদানকে ধরে রাখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সে ঐক্য ভৌগোলিক ভাবেও বিচার্য। এ প্রসঙ্গে আমি সমগ্র ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'দ্বীপসমূহে' বিশেষ বিশেষ বাণিজ্য কলা কৌশলের বিচিত্র বিচ্ছিন্নতা নিয়েও টিঁকে থাকার কথা উল্লেখ করতে পারি। এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে এই যে একদা এইসব কারুশিল্প ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও প্রবহমান ছিল, এথেকে এটাও বোঝা যায় এ ছিল ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ।"

ভারতের শিল্পকলার প্রবহমানতা প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, ডঃ কুমারস্বামীর যেসব পাঠক পাঞ্জাব ও হিমালয়ে ব্যাপক ঘোরাফেরা করেছেন তাঁরা সানন্দে ও সচকিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে উত্তর ভারতে ভূমিয়াদেবীর উপাসনা খুবই ব্যাপক (যিনি সিংহলের গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বহুবার উল্লিখিত হয়েছেন)। ভারতের ঐক্য সত্যিই অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে বহুধাপ্রকট।

লেখক একথা মনে করেন না যে সিংহলী শিল্পকর্ম মণ্ডনশিল্পের অতিরিক্ত কিছু:-

"অনেকটা আদি-মধ্যযুগীয় ইউরোপের মত এক সামন্ততন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় কারু শিল্পীদের জীবন ও শিল্পকর্মের স্মারক এই গ্রন্থটি। চারুশিল্পের ক্ষেত্রে মহৎ কোন কৃতিত্বের যুগ নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়নি। ভারতীয় চারু ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত কৃষি অলংকরণ বিদ্যার একটা সুন্দর ও সুরুচিসম্মত পরিকল্পনার কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। সিংহলী শিল্প অনিবার্যভাবেই ভারতীয়, কিন্তু তাতে বিশেষ কৌতূহলজনক একটি কিছু রয়েছে। তা হল এই, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত এতে খাঁটি হিন্দু, যদিও অভিপ্রায়ের দিক থেকে কিছুটা বৌদ্ধ একটা আদি চরিত্রের পরিচয় রয়েছে, তা মূল ভূখণ্ডে ভারতীয় চিত্রকলায় এতটা পর্যন্ত বেঁচে নেই। অপেক্ষাকৃত গৌণ শিল্পকর্ম ও চিত্রগুলি এমন যে আমরা সেগুলোকে অশোকের কালের সংস্কৃতির কালে এবং বারহুত নির্মাতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে পারি।"

এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ সিংহলী শিল্পের উপযুক্ত স্থান ও এটি কোন শ্রেণীর শিল্পকলা সেই প্রসঙ্গে ডঃ কুমারস্বামী প্রচুর বাক্‌বিন্যাস করেছেন।

"ক্যান্ডিয় চিত্রকলা বিশেষতঃ সাধারণভাবে ক্যান্ডিয় নকশার সব চাইতে বড় চরিত্র হচ্ছে এর আদর্শবাদ। এই আদর্শবাদ সব ভারতীয় শিল্পেই আছে কিন্তু ক্যান্ডিয় শিল্পে এটি আছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিছু কিছু 'মাগুল লাকুনু' নিতান্ত চিত্রলিপি

চাইতে সামান্য কিছু অতিরিক্ত। কিন্তু এরও নকশা ও ছবিতে আদর্শবাদ অতি মাত্রায় চিহ্নিত। ক্যান্ডিয় চিত্রগুলিতে বৃক্ষগুলিকে লক্ষ্য করা যাক ; এগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের প্রতিকৃতি নয় এগুলো সবই বিমূর্ত, এ ধরনের সমস্ত গাছ সম্পর্কে শিল্পীর সাধারণীকৃত ধারণার প্রতিনিধিত্ব করছে এরা। আমি যখন শিল্পীর কথা বলছি তখন কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কথা বলছি না, বহুকাল আগে যেসব শিল্পী একযোগে এই ভাষাকে রূপ দিয়েছেন তাঁদেরকেই বোঝাচ্ছে। আর আমি ভাষা কথাটাই ব্যবহার করছি কেন না কবির কাছে যেমন শব্দ ও ছন্দ তেমনি শিল্পীর কাছে প্রথা ও ঐতিহ্য, এবং সে জিনিস ব্যক্তিবিশেষের হাতে তৈরী হয় না। ক্যান্ডিয় শিল্পকলার আদর্শবাদ হচ্ছে ভারতের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারের অংশ বিশেষ কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে ভারতীয় শিল্পের মহত্তম, এমনকি কোন মহৎ যুগের শিল্পকর্মেরও প্রতিনিধিত্ব করে না ক্যান্ডিয় শিল্প। বরং কৃষি-অসংকরণের একটা মহান ও সুন্দর নকশার পর্যায়ে ভারতীয় চিত্রকলারই ছায়া দেখা যায় ক্যান্ডিয় শিল্পে। ভারতীয় শিল্পকলার আদিস্তর থেকে হস্তান্তরিত ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে ক্যান্ডিয় শিল্পকলা, পরবর্তী প্রভাবসমূহের দ্বারা এই শিল্প সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ, কিন্তু অনেক দিক থেকেই আদিম ; যেমন কাঠখোদাই কিংবা এ ধরনের আরো ক্ষয়শীল উপাদানে তৈরী মূর্তিগুলোই অনুরাধাপুর ও পোলননারুবার প্রস্তর শিল্পে রূপ পেয়েছে। বারহত ভাস্করেরা যদি অষ্টাদশ শতকের ক্যান্ডিতে আবার প্রাণ ফিরে পেতেন তাহলে এর বিহার-দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলির শৈলী বা বিষয়ের মধ্যে কোন কিছুই এঁদের কাছে অদ্ভুত বা অপরিচিত ঠেকত না। দান্যাগিরিগালায় চিত্রগুলির সঙ্গে বারহাতের ভাস্কর্য খোদাই গাছগুলোর পার্থক্য শুধু তাদের নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেরণাস্বরূপ গভীরতর আবেগের মাত্রায় ; কোন মহান ঐতিহ্যের সূচনায় এত কাছাকাছি কোন কাজে আমাদের এটাই প্রত্যাশা থাকা উচিত।

"সিংহলী ও ভারতীয় শিল্পের আদর্শবাদকে উপলব্ধি করা যায় বারহাত অথবা ক্যান্ডিয় বৃক্ষাবলীর পর্যবেক্ষণে ; অন্যভাবেও হতে পারে। কোন গাছকে দেখার দুটো রাস্তা আছে ; একনজরে অথবা কোন আলোকচিত্রে। এটি আমাদের চোখে মনে হয় ডালপালা ও পত্রবিন্যাসের একটি অনিয়মিত বেড়ে ওঠা, ফলে আলোছায়ার একটা বিভ্রান্তিসূচক প্রভাব উৎপন্ন হয়। আমরা শিগ্‌গীরই এর থেকে বেশী চিনতে শিখে যাই, এবং তারপরে বিভিন্ন জাতের গাছকে আলাদা করেও চিনতে পারি। কিন্তু বিভিন্নজাতের অসংখ্য গাছ নিবিড়ভাবে বিচার করে দেখলে আমরা উপলব্ধি করি যে প্রত্যেকটিরই অস্তিত্বের একটা নিয়ম আছে ; পাতাগুলোর আছে বিশেষ অবয়ব ও বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্য, ডালপালাগুলোর বেড়ে ওঠার বিশেষ পদ্ধতি, ফুলগুলোর মধ্যে এক ধরনের বিশেষ সামঞ্জস্য। প্রত্যেকটি বাস্তব গাছকে তখন মনে হয়, গাছসংক্রান্ত কোন অধিকতর নিখুঁত ও ছন্দময় আদর্শের মূর্তরূপ বলে। এই আদর্শকে প্রতিফলিত করতে পারাই হচ্ছে শিল্পের উদ্দেশ্য।

"আদর্শায়িত প্রয়োগের একটা খুব ভাল উদাহরণ পদ্ম। ভারতীয় চিত্রকলায় ভারতীয় মরমী সাধকদের কাছে পদ্মফুল মধ্যযুগীয় ইউরোপের কাছে গোলাপ যা সেঃ রকম। বৃটিশ মধ্যযুগীয় চিত্রকলা হচ্ছে গোলাপের একটি সুদীর্ঘ প্রদর্শনী, তেমনি স্বর্গীয় সত্তার সিংহাসনস্বরূপ বহুদল পুষ্পটি ভারতীয় শিল্পকলায় একটি রোমান্সস্বরূপ। এর আদর্শায়িত রূপ প্রতিটি পাত্রে প্রতিটি নকশায় বারে বারে পুনর্জন্ম লাভ করে। টিউডর গোলাপ যেমন সব গোলাপেরই প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি সাধারণ পদ্মের আদর্শ রূপের প্রতিনিধিত্ব করে। সব পদ্মের সব রকম আবেগানুভূতি সংহত হয়ে আসে একটি বিমূর্ততায়। শিল্পরূপগুলির রহস্য এইখানেই— আদর্শায়িত রূপগুলি চিরন্তন ও অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করে—অনেকটা যেন ঈশ্বরের হৃদয়ে নিহিত কোন ভাবনারই মতো। সেজন্যই বারহুতের গাছ ও ক্যান্ডিয় গাছ একই সূত্রের দ্বারা অভিব্যক্তি পেয়েছে। শিল্পে আবেগানুভূতিকে অভিব্যক্ত করার প্রেরণার জন্ম হয় জীবনের ঐক্যানুভূতি থেকে— যে অনুভূতি হচ্ছে একের মধ্যে বহুর স্বীকৃতি। বহুর মধ্যে এককে দেখবার ইচ্ছের অভিব্যক্তিই হচ্ছে আদর্শায়িত রূপের প্রতিনিধিত্ব, বিভিন্ন জটিল অবয়বকে তাদের সরলতম স্বরূপে গুটিয়ে এনে ব্যক্ত করা। এই বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বিরাট এক আত্মীয়তা; নৈসর্গিক কোন ঘটনার অনুক্রমানুসারে কোন নৈসর্গিক বিষয়ের প্রাকৃতিক নিয়ম তৈরী হয়, তেমনি আদর্শ শিল্পকর্ম আবেগের অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক চিত্রাংকন হচ্ছে জিনিসকে যেমন মনে হয় সেভাবে তুলে ধরা, আর শিল্পকর্ম হচ্ছে জিনিসগুলোর আসল স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করা। সরলভাবে বলতে গেলে—বিজ্ঞান তন্ময়। শিল্পকর্ম মন্ময়। তাদের উদ্দেশ্যকে সচরাচরের মতো যেন একাকার করে দেখা না হয়, — এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

এই অনন্যসুন্দর অনুচ্ছেদটিতে আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-যুগগুলিকে নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণকারী বিধিটির চকিত সাক্ষাৎ পেলাম। মহান শিল্পযুগগুলি সবই মহান ধর্মযুগ—আদর্শের মহিমায় মানুষের আত্মা যখন গভীরভাবে আচ্ছন্ন—সেইসব ঐতিহাসিক মুহূর্ত শিল্পকর্মে বিধৃত। এই সত্যের সঙ্গে পারম্পর্যক্রমেই ভারতীয় ধ্যানধারণা ও ভারতীয় শিল্পে সম্পূর্ণ সাযুজ্য। ডঃ কুমারস্বামী এখানে খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে বিজ্ঞান অথবা ধর্মের মতো শিল্পকলা তাকিয়ে থাকে দেখার অন্তরালে অদেখার দিকে, ভারতের সমস্ত চারু ও কারুশিল্প মানসিক এই প্রক্রিয়াদ্বারাই উদ্দীপিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আলোচ্যবইটি সবরকম হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে উপাদানের দিক থেকে যথার্থই খনিবিশেষ। রঞ্জন ও ধাতব শিল্প, কাষ্ঠের কাজ ও ধাতু-ঢালাই—এ ধরনের নানা বিষয়ে প্রচুর খুঁটিনাটির সন্নিবেশ করা হয়েছে। পেশাদারী অথবা সৌখীন যে কোন দিক থেকেই আগ্রহী ব্যক্তিরা এই দিক দিয়ে বইটির অসামান্য মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন।

কিন্তু ভারতীয় প্রজ্ঞা যেমন কখনো সম্পদের পরিমাপে মানবতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না সেই আদর্শানুসারী ডঃ কুমারস্বামীও এইসব শিল্পের সামাজিক পটভূমিকে বিস্মৃত হননি। কারুশিল্পী জাতিগুলোকে তিনি নিয়ত পর্যবেক্ষণ করেছেন জাতির সম্মান ও খাদ্যসরবরাহের মধ্যে মূর্ত জাতীয় সম্পদের স্থিতির আসল তাৎপর্য তিনি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"সিংহলী সমাজ যে ধান্যভিত্তিক একথা খুব ভালভাবে বোঝা যায় না। ভূসম্পদ গুটিকতক লোকের বিলাসমাত্র ছিল না, অধিকাংশ লোকের জীবিকা ও দৈনন্দিন কাজই ছিল ভূমিভিত্তিক। নিজস্ব জমি না থাকা এখনো পর্যন্ত বিশেষ সম্মানার্হ নয়। রাজা থেকে সুরু করে নীচের দিকে পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের ভূমিকর্ষণে ছিল অব্যবহিত স্বার্থ ; প্রায় প্রতিটি মানুষই নিজের হাতে নিজের জমি চাষ করত।

"বড় বড় মোড়লরাও নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে লজ্জা পেতেন না ; তরুণদের পক্ষে প্রতি বছর অন্ততঃ কিছুটা ফসল ঘরে তোলা ছিল অন্যতম লক্ষ্য ; এইসব উদ্দেশ্যে কারুকার্যখচিত হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা কাস্তে কখনো-সখনো ব্যবহৃত হত ; জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ, এমন কি গ্রামীণ জনসমাজের মহিলারা পর্যন্ত সর্বদা মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি থাকতেন এবং পরস্পর একযোগে মাঠে কাজ করতেন। এমনকি হস্তশিল্পীরাও তাঁদের প্রত্যক্ষ জীবিকা হিসাবে তাঁদের হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, যন্ত্রপাতি একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁরা বীজ বপন অথবা ফসলকাটার সময়ে প্রয়োজন মত মাঠের কাজ করতেন।"

গ্রামজীবনকে এই ধরনের নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

"ভারতের মতোই এখানেও আপাতস্বৈরাচারী শাসনের তলায় তলায় ছিল গণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী গ্রাম্য সংগঠনগুলি—একথা সহজেই বোঝা যায়।"

ভারতীয় পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রবণতা বিশেষতঃ ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে যা এত প্রয়োজনীয়—সেইসব ঝোঁকই বর্তমান নৈরাশ্যবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমসাময়িক তথ্যগুলির আনন্দময় বিন্যাসে ফুটে উঠেছে। ডঃ কুমারস্বামী বলছেন : "বিহারের জন্য দান সংগ্রহ ও বিহার খাড়া করার সময় গ্রামবাসীদের প্রায়শ একযোগে কাজ করাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কাজ করার ক্ষমতার পরিচায়ক। রাজকীয় অথবা রাজপ্রতিনিধিমূলক পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে এ ধরনের একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় প্রদেশের পশ্চিম বিভাগে থেম্পবুলে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হবার পূর্বে মাত্র কয়েকটি বিহার ছিল। কিন্তু এখন যেগুলো দেখা যায়, তার অধিকাংশই ১৮১৫ সালের পর গ্রামবাসীদের ভূমি অর্থদানে তৈরী।"

বর্তমান বইটিতে যেমন আছে, সিংহলী শিল্পকলার সেই ইতিহাসকে অবহেলা করা যায় না। কেন না বিভিন্ন অলংকরণের নকশায় যেসব 'মোটিফ্' বা উপাদান ব্যবহার

করা হয়েছে—অধিকাংশের উৎসই ঐতিহাসিক সূত্র। পদ্ম, পদ্মদল, বো-পত্র, গাছপালা, কেউটের মাথা হংস,—এর সবকটিকেই লেখক পর্যবেক্ষণ ও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, —মূল শিল্পকলার সঙ্গে লেখকের তৎসংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলিও সমানভাবেই উপভোগ্য।

সিংহলী নকশায় অবশ্য ভারতীয় আদর্শোদ্ভূত 'মোটিফ' ছাড়াও আরো অন্যান্য কিছু নিদর্শনও আছে। ৫৪৩ খ্রী পূর্বাব্দে বাঙালী জলদস্যুরা এখানে অবতীর্ণ হবার আগে, প্রাক বৌদ্ধযুগে সিংহল হয়তো চৈনিক, দ্রাবিড়ীয়, ও ইজিপ্সীয় উপাদানের মিলনকেন্দ্র ছিল। সেজন্য এখানে ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পকর্মের কিছু কিছু প্রাণশক্তি ও পবিত্রতার স্পর্শ পাওয়া যথেষ্টই স্বাভাবিক। ডঃ কুমারস্বামী অবশ্য গ্রীস বিষয়ক আধুনিক বুকনি দ্বারা আদৌ প্রভাবিত নন। তিনি আদি অথবা আধুনিক বিশ্বের সৌন্দর্যানুভূতির একমাত্র উৎস হিসাবে হেলেনীয় মনকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিশেষ বিশেষ রূপকর্মের জনক হওয়ার চাইতে সেগুলোকে বিকশিত করে তোলাতেই গ্রীসের বিশিষ্টতা। এবং নকশার দিক থেকে এশীয় ও গ্রীক ভাবনার সাধারণ উদ্ভব-বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে আমরা সঠিক না ভেবে পারি না। এই অভিমত যথেষ্ট মূল্যবান ও জোরালো—ভবিষ্যতে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণার কা জ হতে পারে।

কিন্তু অ্যাসিরিয়, গ্রীক, ইজিপ্সীয় আত্মীয়তার বেশ কিছু নমুনা সিংহলী নকশায় পাওয়া যায়; তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, আয়ারল্যান্ডের মতোই সিংহলও সম্ভবতঃ একদা পীত জাতিগণের সভ্যতাদ্বারা সৃষ্ট অতি প্রাচীন এক সংস্কৃতি-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ছাড়াও ডঃ কুমারস্বামী বেশ কিছু 'বর্বর' 'মোটিফকে'ও তুলে ধরেছেন —সেগুলো সর্বকালে, সর্বযুগে শিশু ও আদিম মানুষের চিত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফুটে ওঠে।

ঐতিহাসিক প্রশ্নটির অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে গুছিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি কৈফিয়ত দিচ্ছেন:

"আদি ভূমধ্যসাগরীয় রূপকল্পের কথা মনে করিয়ে দেয় এমন অলংকারগুলিকে আমি যখন প্রথম দেখি, আমি সাধারণভাবেই ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক-প্রভাবের গুরুত্ব, স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তিবিষয়ক অভিমতটিকেই গ্রহণ করেছিলাম এবং সেই চিন্তাধারা অনুসারেই সিংহলে এইসব অলংকরণ রূপকল্পের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। ভারতের জন্য বুদ্ধের আদর্শরূপ বিদেশীরাই নিরূপণ করে দিয়েছিলেন, গ্রুনউইডেলের এই বিবৃতিকেই আমি সেই সময় মেনে নিয়েছিলাম···কিন্তু তারপর থেকেই, বিশেষ কোন যুগে যতই ব্যাপক হোক ভারতীয় শিল্পে গ্রীক-প্রভাবের অস্তিত্ব—জটিল সমস্যাবলীর এই ধরনের সরল ব্যাখ্যাতে আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। গান্ধারশিল্পধারার শৈল্পিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গৌণ ও মেয়েলি শিল্পকর্মের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করাই গ্রীক-প্রভাব নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করার কারণ। আরেকটা কথাও

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত শিল্পকলার স্বাভাবিক মূল উৎস গ্রীস—ইউরোপীয় তত্ত্বানুসন্ধানীদের এই বিশেষ অন্ধ সংস্কারটির দরুনই তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে এই ক্ল্যাসিক শিল্পকলার প্রভাব পাশ্চাত্যের মতই প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও চিরস্থায়ীভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সাধারণভাবে শিল্পী নন এমন সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একথা সবসময় বুঝতে পারেন না যে, যেকোন যুগের পাশ্চাত্য শিল্পকলার তুলনায় চৈনিকই হোক কিংবা ভারতীয়ই হোক এমন সব প্রাচ্য-শিল্পকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কিছুমাত্র কম নয়।"

এ ধরনের কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে এতে যা রয়েছে তার চাইতেও অধিকতর সম্পদের ইঙ্গিতের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ না করে পারা যায় না। একটি ক্ল্যাসিক কাজ সাধিত হয়েছে, পাশ্চাত্য বিষয় নিয়ে সম-মানের রচনা লিখতে সক্ষম এমন ব্যক্তি লিখেছেন এটি প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখকের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই তাঁর লেখনীনিঃসৃত আরো লেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই ধরনের কাজের সূত্র ধরে আরো কিছু কি করবেন না? গবেষণার ক্ষেত্র অসীম। প্রতি ভারতীয় প্রদেশ, প্রতি মধ্যযুগীয় নগরী, ঐতিহ্য, বিধি, হস্তশিল্প ও শিল্পকলায় অমর হয়ে থাকবার যোগ্য, ছাপার অক্ষরে ভবিষ্যতে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা আছে এদের। এমনভাবে স্বদেশের সম্পদরাজিকে শ্রেণীবদ্ধ করে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবেন এমন মানুষেরা কোথায়?

জাতীয়তাবাদের নীতি ও স্বদেশসংক্রান্ত ভাবাবেগের সঙ্গে এভাবেই যুক্ত হতে পারে জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনাক্রম্য একটি পটভূমিকা। ভারতবর্ষ রত্নরাজিতে পূর্ণ; শুধু খুঁজে নেওয়ার মত লোকের অপেক্ষা। বাইরের থেকে শ্রমসাধ্য সংকলন প্রায় মূল্যহীন। এধরনের কোন কাজে শিক্ষিত চোখ, মস্তিষ্ক ও হাতের যেমন প্রয়োজনীয়তা, তেমনি প্রয়োজন প্রেমিকের ভালবাসা, কবির অন্তর্দৃষ্টি ও শিশুসুলভ কমনীয়তা। শুধুমাত্র তখনই আমরা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের এমন একজন সাক্ষী পাব, যাকে কোনভাবেই টলানো যাবে না। ভূমিয়াদেবীর জয় হোক। জয় হোক স্বদেশজননী দেবীর!

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনী

ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতায় সরকারী কলাবিদ্যালয়ে এই সমিতিআয়োজিত নবীন ও পুরাতন ভারতীয় শিল্পকলার কৌতূহলদ্দীপক প্রদর্শনীটিতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার কল্পনাবিলাসী চরিত্রটিকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেরা নমুনাগুলির বেশ বড় সড়

একটা সংগ্রহ না হলে আমাদের শিল্পকলার বিগত পাঁচটি শতাব্দীর সাধারণ চরিত্র কী ছিল সে বিষয়ে কোন মতামত গঠন করা যায় না। এর বর্ণবিন্যাসের আকর্ষণ অবশ্য সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু আমাদের মূর্তিনির্মাণকারীদের অভ্রান্ত পবিত্র প্রতীকচিহ্নগুলির ঐতিহ্যানুসারী ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমরা শিল্পীর মুক্তি কোথায় ছিল, তা আর বুঝে উঠতে পারি না। কাংড়া উপত্যকা, কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, সর্বত্রই হিন্দু শিল্পীদের মৌল বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় উপাদান, একথাও সর্বজনবিদিত। মোগল ও অন্যান্য ছোটখাট রাজদরবারগুলির ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলা পরিমাণে অনেক কম; কেন না সেসব ক্ষেত্রেও পাশাপাশি থেকে গেছে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা ও পবিত্র গ্রন্থাদির সচিত্র ব্যাখ্যা। অধিকন্তু ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রকলাকে ধরা যায়, স্বর্গীয় আদর্শ যার মূল শিকড় সেই মহান ভাবাভিব্যক্তির একটি গৌণ শাখা হিসাবে।

প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মাত্রা সত্ত্বেও এই প্রাচীন জাতীয় শিল্পকলা উচ্চশ্রম সৃজনী অর্থেই ইউরোপের যেকোন শিল্পকর্মের মতই সম্পূর্ণ মাত্রায় কল্পনাদীপ্ত। এখানে দুটি গরুর পাল নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রবেশের একটি দৃশ্য আছে। রঙের ছোঁয়াগুলো খুব সূক্ষ্ম, প্রাচীর ও তোরণগুলি যেকোন মোগল ও রাজপুত শহরের মত; বালকদুটি চাষীর পোষাকে বেশ মনোরম অথচ সরলভাবে সজ্জিত, তাদের চুলগুলো গ্রাম্য ধরণে ছাঁটা; তাদের পাশে, ছবির সামনের দিকে সারিবদ্ধ গরুর পাল এগিয়ে আসছে, সম্ভবতঃ সেগুলো সাদা পটভূমিকায় পেন্সিল দিয়ে আঁকা। সমগ্র ধারণাটি এত সুন্দর ও সামগ্রিকভাবে এত মৌলিক যে একে ভোলা যায় না। অন্য আরেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণবেশী শিবের সামনে অনশনরতা উমার ছবি, কিংবা কৈলাসের কোন চিত্র, এ ধরনের আরো অনেক কিছু। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিল্পী ঐতিহ্যানুসারী প্রতীকটিকে বেড়ি হিসেবে না নিয়ে অভিব্যক্তির এক বিরাট মুক্তি হিসেবেই অনুভব করেছেন। গাথা, লোককথা ও বিভিন্ন গ্রন্থের টীকাস্বরূপ সাধারণ জনজীবনের মধ্যেই শিল্পীরা এইসব সুন্দর সুন্দর চকিত মুহূর্ত আবিষ্কার করেছেন। এইভাবে স্বচ্ছন্দে দেখা সৌন্দর্যকেই শিল্পীরা পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে দেয়ালে অঙ্কিত রাজপ্রাসাদের মধ্য থেকে নারীবাহিত এক পাল্কিতে আসীন এক রাজার চিত্রটিকে অলংকরণের দিক থেকে একটা মহান ধারার সেরা ফসলগুলির অন্যতম বলে গণ্য করা চলে। রমণীদের পোশাকে উজ্জ্বল রঙের ছোপ, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাজসভার নীচু দেয়াল ও মেঝে সবই শ্বেত মর্মরের; অনেক পিছনে ঈষৎ বাদামী এক ছোঁয়া দেয়ালের বাইরে নদীর আভাস বহন করছে। ছবিটির অনুভূতি যদি মহত্তর কিছু হত তাহলে এটিকে একটি সেরা শিল্পকর্মের স্থান দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু হুঁকা পানরত কোন ব্যক্তিকে মহিলারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এমন একটা দৃশ্য অচিন্তনীয়। তবে আমরা ছবিটির অলংকরণ সৌন্দর্যেরই শুধু প্রশংসা করছি। জে. পি. গাঙ্গুলীর পদ্মানদীর

ছবিটিতে যেমনভাবে সাদার পরিপ্রেক্ষিতে সাদা দিয়েই বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে এ ধরনের কাজ বিশেষ স্মরণীয় এবং এর ঐতিহাসিক নজীরের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার দ্রুত সারসংক্ষেপের মাধ্যমে প্রস্তুতি লাভ করে আধুনিক চিত্রের ঘরগুলিতে যখন আমরা প্রায় ডজনখানেক তরুণ চিত্রশিল্পীর ছবি দেখি, তখন তাকে প্রাচীনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিরূপে প্রকৃত স্বরূপে উদ্ভাসিত বলে বুঝতে পারি। বীণাবাদনরতা মহাশ্বেতা, বাঁয়ে 'তুলসী মূলে প্রদীপজ্বালা স্ত্রীমূর্তি' (বেঙ্কটআপ্পা) এবং দক্ষিণে প্রিয়নাথ সিংহের 'চৈতন্য'কে জাতীয় শিল্পকলার ওতপ্রোত অংশ বলে মনে হয়। এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীর মধ্যে যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান, আমরা তার কথা ভুলেই যাই। হারিয়ে-যাওয়া সুতোর খুঁটটি খুঁজবার জন্য আর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয় না। নতুন ধারার এক গোষ্ঠীর থেকে আরেক গোষ্ঠীতে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পারি যে সেই হারিয়ে-যাওয়া খুঁটটি আবার ফিরে পাওয়া গেছে। স্বর্গতঃ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর চিত্রগুলির একটা স্মরণীয় সংকলন তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন এই সোসাইটি, নন্দলাল বসুর সংগ্রহের বাঁদিকে তাঁর পনেরো ষোলটি ছবি দেয়ালে ঝোলানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তাঁর লক্ষ্মণসেনের পলায়ন সেরা শিল্পকর্ম, কিন্তু নহুষের রথ, কার্তিকেয়, বিক্রমের সিংহাসনেও আমরা তাঁর কাজকে যে বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী চিহ্নিত করে রাখে, সেই একই অনুভূতির সাক্ষাৎ পাই। মহাভারত রচনা, রাজা অম্বরীষের চক্র এবং ডমরু—প্রতিটি নিজ নিজ ধরনে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতপ্রতিভার বিকাশমুহূর্তে এই শিল্পীর অকাল মৃত্যুতে বাস্তবিকই বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

নন্দলাল বসুর শিল্পকর্ম তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে নতুন কোন ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাঁর প্রতিটি নতুন কীর্তি নিয়েই তাঁর স্বদেশবাসী যথেষ্ট গর্বিত। এই প্রদর্শনীতে তাঁর সর্বশেষ কাজ 'অগ্নি' ও 'অহল্যা' দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও এই প্রদর্শনীতে তাঁর বিভিন্ন শৈলী ও মহান প্রাযুক্তিক কুশলতার নিদর্শন-স্বরূপ আরো বেশ কিছু কাজ রয়েছে। এই শিল্পীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা শুধু আরো বিশালতর পরুষতর, অধিকতর সংশ্লেষী প্রয়োগের। তাঁর 'ভীষ্মের শপথ' অথবা 'দময়ন্তীর স্বয়ংবর' এই অভিমুখে প্রচেষ্টা, কিন্তু এই সব কাজ তাঁর ক্ষুদ্রতর কাজের অনন্য আকর্ষণকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। আমরা চাই কোন মহৎ শিল্পকর্মে একযোগে এই সব গুণের উপস্থিতি।

ইউ. সি. গাঙ্গুলীর চিত্রকলার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, তাঁর কোন ছবিই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায় না। এটি বর্ণবিন্যাসের ক্ষতিসাধন করেও ভাবধারাকে অতিমাত্রায় মননশীল করে তোলার ফলশ্রুতি। এই শিল্পীর প্রতি আমাদের উপদেশ হচ্ছে একবছর ধরে তিনি শুধু রঙের পরিকল্পনা নিয়েই কাজ

করুন। এই ধরনের আত্ম নিয়ন্ত্রণের পর তিনি দেখতে পাবেন যে তাঁর সৃজনী শক্তি বিস্ময়করভাবে সংস্কৃত হয়েছে, তখন তিনি চিরকাল আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে যাবেন। অসিতকুমার হালদারের 'সীতা' এধরনের বিষয় নিয়ে রচিত সর্বসার্থক প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় চিত্রকলায় ম্যাডোনার মতই ভারতীয় শিল্পে সীতার প্রাধান্য থাকা উচিত ছিল। ভারতীয়দের সীতার প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধা, সম্ভবত তারই দরুন আমরা বাঙ্গালীরা তাঁর প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে—সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস আত্মবিশ্বাসকে, ধরে রাখতে পারি না শ্রী হালদারের 'মোয়াজ্জিম' বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে পরম রমণীয়। বস্ত্র ও মর্মরের ডোমের উপর ঊষার শ্বেত আলোক চূড়ান্ত চিত্তাকর্ষক ; কিন্তু হায়, এই ছবির পক্ষে মোয়াজ্জিম অতি মাত্রায় সুসজ্জিত। নিদ্রিত বিশ্বকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, এই ভঙ্গিমা অথবা "নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা শ্রেয়ঃ"—এই শব্দগুলির সংগীতময়তা ছবিতে ফুটে ওঠেনি।

ঈশ্বরী প্রসাদের বেশ কিছু কাজ বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে, কেন না, এইসব ছবি আঁকা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় মৌলিক রঙ দিয়ে। ভারত যদি তার প্রাচীন রঙগুলি আবার তৈরী করতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তাহলে আধুনিক দেশগুলির তুলনায় শিল্পের ক্ষেত্রে সে অসাধারণ সুবিধা ভোগ করবে একথা স্বতঃসিদ্ধ। অতীতে রঙের ক্ষেত্রে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বের অর্ধেক রহস্যই এখানে নিহিত আছে। স্যার লরেন্স জেংকিন্সের আঁকা কৃষ্ণ ও যশোদার ছবিতে ব্যবহৃত লাল রঙ এই সব প্রাচীন রঙের সৌন্দর্যের সীমা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলে। বিশুদ্ধতা, উজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বের দিক থেকে আধুনিক কোন কিছুর মতোই এগুলি নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে এই ধরনের কার্যকলাপে এই সোসাইটি আরো বহুদূর এগিয়ে যাবেন

হাকিম এম্ খানের কাজ কিছু আলোচনার দাবী রাখে। তাঁর আঁকা 'মহম্মদ শাহের দরবার' কোনো কোনো হিন্দু শিল্পীর বৈশিষ্ট্যস্বরূপ অন্তর্লীন মানসিকতার দরুন স্মরণীয় হয়। স্মরণীয় এই কারণে যে একটি জটিল বিষয়বস্তুকে এখানে সুষম ও সরলভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। লোকজন ও বর্ণবিলাস সমেত মর্মরের সভাগৃহটি সজীব, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময়। স্মৃতি থেকে আঁকা শিল্পীর পিতার প্রতিকৃতিটি মোগল যুগীয় প্রতিকৃতির শৈলীর চমৎকার পুনরুজ্জীবন। একটি মাত্র মুহূর্তের স্থির হয়ে থাকার মধ্যেই মানুষটি যেমন ছিলেন—তা ধরা পড়েছে।

এই সব চিত্রকলার উপস্থাপনার জন্য সাম্প্রতিক এই প্রদর্শনীটি সুদীর্ঘ কাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পুরোন দিনের প্রিয়গণ" ও তাঁর ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ ইম্প্রেশনিষ্ট রেখাচিত্রগুলিকে ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের কাজের পটভূমিকা ও পরিপূরক হিসেবে দেয়ালে রাখা হয়েছে। আমরাও আনন্দিতচিত্তে

বেরিয়ে আসি কেন না প্রাচীন ধারা ও নবীন ধারার মধ্যে এই সংযোগ সূত্রটিকে ইতিপূর্বে কখনো এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। আমরা অনুভব করি যে আমাদের দেশে ভবিষ্যতে ম্যুরাল চিত্রকলা, ঐতিহ্যাসিক জাতীয়, শৌর্যমণ্ডিত মহান ভারতীয় চিত্রধারার যে স্বপ্ন আমরা দেখি, বস্তুতঃ তারই অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

শিল্প সমালোচনা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ভারতমাতা'

ভারতীয় শিল্পকলায় নবযুগের সূচনাকে প্রমাণিত করতে পারে এমন একটা ছবি আমরা পেয়েছি। আধুনিক যুগের অবদান হিসেবে অভিব্যক্তির সমস্তগুলো বাড়তি পথ ব্যবহার করেও শিল্পী এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ একটি ভারতীয় ভাবনাকে ভারতীয় আঙ্গিকের মধ্যেই রূপ দিয়েছেন। পদ্মফুলের বঙ্কিম রেখাবলী, জ্যোতির শ্বেত আভা, শক্তির স্বর্গীয় বিকিরণের প্রতীক হিসেবে এশীয় ভাবনায় ভাবিত চতুর্ভুজ মূর্তিটিতে চমৎকার সংযোজন। বিশ্বাস, বিদ্যা, অন্ন, বস্ত্রদায়িনী মাতৃভূমির যে কল্পনা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের কল্পনায় প্রদীপ্ত তাকেই রূপ দেওয়ার কাজে একজন ভারতীয় শিল্পী এই প্রথম সফলকাম হলেন—এই চিত্রটি এরকম একটি সেরা শিল্পকর্ম। দেশমাতৃকার মধ্যে তিনি কি দেখেছেন তা তিনি আমাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। সমস্ত কিছু ভাল যিনি দিয়েছেন অথচ যিনি চিরন্তন কুমারী দেশমাতৃকার সেই আত্মা প্রার্থনা এবং দানে তিনি চিরকাল মানব অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্ত। অস্বচ্ছ পদ্মগুলি এবং শুভ্র জ্যোতি, চার হাত এবং অনন্ত ভালবাসা তাঁকে সাধারণ জগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছে, অথচ হাতে শাঁখা, অবগুণ্ঠন সমেত পোশাক, খালি পা এবং সহৃদয় দরাজ অভিব্যক্তি এসব প্রতিটি খুঁটিনাটি দিয়ে তিনি কি একান্তভাবেই আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি, আমাদের ভারতভূমির একাধারে মাতা ও কন্যা এমন কি প্রাচীন ঋষিদের কল্পনায় চিরকালীন ভারতীয় বালিকা উষাবালার মতোই একজন নন।

'ইণ্ডিয়া দি মাদার'

যেসব ঘটনা নিয়ে খুব হৈ চৈ করা হয়—সব সময়েই যে সেগুলোই শুধু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয় তা নয়। একথা বলতে আমার অন্ততঃ কোন দ্বিধা নেই যে, গত মাসে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দি স্পিরিট অফ্ দি মাদারল্যাণ্ড' ছবির আবির্ভাব। এটি প্রকাশিত হয় জুন মাসের 'ভাণ্ডার'এ। এই চিত্রে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে—যার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় চিত্রকলা প্রতীক্ষা করে আছে, এমন সব নতুন ধরনের সমন্বয়ী ভাবধারার

জন্ম হল যা ভারতের আধুনিক যুগকে চিহ্নিত করে রাখবে, যদি জাতীয়তা এবং নাগরিক আদর্শ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সাহায্যের সব রকম স্বাধীন উন্মুক্ত সমবায় —এগুলোই যদি নবযুগের বিশেষ দিক চিহ্ন হয় তাহলে একথা স্পষ্ট যে আমাদের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ প্রতীক থাকতেই হবে, যার ছত্রছায়ায় আমরা নবযুগের কথা ভাববো। এসব প্রতীকের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠায় আগামী অনেক দশক এমন কি অনেক শতাব্দী ধরে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কাজ হবে।

আমি অনেকদিনই ভেবেছি যে, আমি যদি কোন ভারতীয় রাজপুত্র হতাম তাহলে আমি আমার বাড়তি রাজস্বের সবটাই ব্যয় করতাম নাগরিক ও ঐতিহাসিক চিত্রকলার উন্নতিকল্পে। এই উদ্দেশ্যে আমি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতাম, পুরস্কার ঘোষণা করতাম, রঙিন ছবির সস্তা প্রতিরূপ তৈরির জন্য ছবি ছাপার ছাপাখানা স্থাপন করতাম। এইখানে আমাদের এই ধুলিধূসর গলি পথে আমি অনেক খোলা বারান্দা তৈরী করে দিতাম চতুষ্কোণের তিনদিক ঘিরে। তার ভেতর দিকে থাকত মহৎ সব ম্যুরাল চিত্র, কিছু রঙের কাজ, কিছু মোজাইকের কাজ এবং কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় খোদাই-এর কাজ—সবই আমাদের নাগরিক ও জাতীয় অতীতের মহান সব চিত্রাবলী, এসব কাজ আমাদের ভারতীয় মন্দিরগুলোতে অনেকদিন ধরেই আছে। আমি কাঞ্জিভরমে রামায়ণ বিষয়ক চিত্রগুচ্ছ দেখেছি এবং অন্যত্রও দেখেছি—মহাভারত ও পুরাণের ওপর ছোটখাটো কাজ। কিন্তু আমি যেসব অট্টালিকার কথা বলছি সেগুলো হবে লোকসাধারণের জন্য। এসব জায়গায় কোন পৌরাণিক দৃশ্য থাকবে না, তার বদলে থাকবে অশোক ধর্মপ্রচারকদের পাঠাচ্ছেন, কণিষ্ক রাজসভায় আসীন, বিক্রমাদিত্য অশ্বমেধে আহুতি দিচ্ছেন, চিতোরের বারো জন মুকুটধারী বন্দী—আকবরের অভিষেক, তাজমহল তৈরী, ঔরংজেবের শেষকৃত্য, ত্রিপুরা পাহাড়ে রাণী জাহ্নবী সতী—এসব এবং এই ধরনের আরো বিষয়বস্তু এখানে প্রদর্শিত হবে। নদীর ঘাট—প্রতিটি নারী, কাজে যাবার পথে এবং ফেরার পথে প্রতিটি শ্রমিক এখানে ভারতের ধ্যান-ধারণা এবং চার হাজার বছর ধরে ভারতের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে।

লন্ডনে প্রতি শনিবার সকালবেলা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিলেতের সেই পার্লামেণ্ট ভবনে গেলে সবচাইতে যা মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে তা হল দুটো লবিতেই ম্যুরাল চিত্রাবলীর বিন্যাস যাতে রয়েছে ইংলন্ডের ইতিহাসে আভিজাত্যপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক গৌরবের বিভিন্ন সুর বেজে উঠেছে এমন সব বিষয়, হাউস অফ লার্ডস অথবা হাউস অফ কমন্সের উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। তেমনি ম্যানচেষ্টার টাউন হলে দেয়ালে আঁকা রয়েছে আদিযুগে ও মধ্যযুগে ম্যানচেষ্টার শহরের চরিত কাহিনী—যে কোন দর্শকই সেখানে দাঁড়িয়ে অনুভব করবেন যে মানবজীবনের বভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা সবটাই প্রায় এখানে প্রতিফলিত কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অসুবিধেটা

কিন্তু একই। এইসব ফ্রেস্কোর কাজ রয়েছে অট্টালিকার অভ্যন্তরে, ফলতঃ এইসব উপভোগ করতে পারে তারাই শুধু যারা মোটামুটি বিত্তশালী এবং ইতিমধ্যেই যারা শিক্ষা পেয়েছেন। শিক্ষার এই মাধ্যমকে ভারতের মতো অপূর্ব আবহাওয়ার দেশের ভেতরে বন্ধ করে রাখার কোন মানে হয় না। ছবিগুলোকে এবং দর্শকদের বৃষ্টি এবং রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য চওড়া চওড়া ঝুলন্ত ছাউনিই যথেষ্ট। গলি রাস্তাগুলোই একেকটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবে। ছবিগুলো দেবদেবীর চাইতে অতিরিক্ত কিছু হবে, এটা হবে একটা স্কুল, একটা লাইব্রেরী, একটা মহাকাব্য। স্বাভাবিক-ভাবেই এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নিতে হলে রাজপুত্র হয়ে জন্মানো দরকার। কিন্তু আধুনিকযুগে ম্যুরাল চিত্রকলার সহজলভ্য পরিবর্ত হিসেবে সুলভ রঙিন ছাপার কাজ চলতে পারে। দূর দূরান্তের খামার বাড়িগুলোতে এবং অনুরূপভাবেই বাজারের বারান্দায় আমরা এধরনের দেবদেবীর চিত্র দেখতে পাই যার অধিকাংশই তৈরী হয়েছে জার্মানীতে যেগুলো অত্যন্ত দুঃখজনকভাবেই বিকৃত। এই সব পোস্টারের (এগুলোকে এ ছাড়া আর কি নামেই বা অভিহিত করা যায়!) কোন স্বদেশী বিকল্প তৈরীর কাজে হাত দিলে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পকলার ছাত্ররা প্রশংসনীয় কিছু কাজ করবেন। এবং এই সিরিজে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চমৎকার 'ভারতমাতাকেই' আমি সর্বাগ্রে স্থান দেব। এই ছবিটিকে এনলার্জ করে ছাপানো উচিত—আমি যে বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলছিলাম সে উদ্দেশ্যে দুটো কিংবা তিনটে উজ্জ্বল অথচ নরম রঙে যদি ছাপানো যায় তাহলে আমরা পাব নিখুঁত সূক্ষ্মতার সঙ্গে মহান এক সৃজনী কল্পনার সমন্বয়। ভারতমাতা দাঁড়িয়ে আছেন সবুজ পৃথিবীর উপর ; তাঁর পিছনে রয়েছে নীল আকাশ ; অপূর্ব ছোট দুটি পায়ের নীচে রয়েছে চারটে অস্বচ্ছ সাদা পদ্মের বঙ্কিম রেখা। ভারতীয় চিন্তাভাবনায় যা সর্বদাই স্বর্গীয় শক্তির দ্যোতনা আনে, তাঁর রয়েছে সেই চারটে হাত। তাঁর শাড়ী, কিন্তু ভাঁজগুলো সমেত নীতিবাগীশদের মতোই কঠোর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ। তাঁর চোখ এবং ভ্রূযুগলের মহান আন্তরিকতার পিছনে আমরা প্রশস্ত এক শুভ্র জ্যোতির অস্তিত্ব অনুভব করে সন্ত্রস্ত হই। শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন, বস্ত্র —সন্তানের প্রতি মাতৃভূমির এই চারটি দান তিনি তার চার হাতে দিচ্ছেন।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটি ভারতীয় হৃদয়ের কাছে ভারতীয় ভাষায় একটি আবেদন বয়ে আনে। নতুন ধরনের এই হচ্ছে প্রথম মহান ও সেরা এক শিল্পকর্ম। আমি যদি পারতাম তাহলে এই ছবি হাজারে হাজারে ছাপিয়ে সারা দেশে প্রচারের জন্য ছড়িয়ে দিতাম যতদিন না কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত প্রতিটি চাষী অথবা মজুরের ঘরে ঘরে—দেয়ালে এই ভারতমাতা ছবি প্রলম্বিত হয়। যতবারই এই ছবিটির গুণাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় ততবারই এই ছবির বিশুদ্ধতা ও ব্যক্তিত্বের কোমলতাতে অভি-ভূত না হয়ে পারা যায় না। নিঃসন্দেহে এটি একটি অপূর্ব জিনিস যে—ভারতীয়দের জন্য একজন ভারতীয়ের আঁকা ভারতজননীর এই প্রথম ছবিতে এসবগুণই সব চাইতে সোচ্চার।

এর স্রষ্টার এটাই যে প্রথম সুন্দর কাজ এমন নয়। কিন্তু আমার মতে এঁর প্রাক্তন সমস্ত কৃতিত্বই এই ছবির পিছনে স্থান পাবার যোগ্য—যেমন আদি কবিতার পিছনে স্থান পায় লিখিত চরিত্রগুলি। এতদিন পর্যন্ত শ্রীযুক্ত ঠাকুর তাঁর শিল্পভাষা তৈরী করছিলেন, তাঁর নিজস্ব শৈলী রচনা করছিলেন, এখন তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। ঈশ্বর করুন তিনি যেন কখনও থেমে না যান। তাঁর একক প্রচেষ্টায় যে ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পিছন পিছন সে ভাষায় আসুক আরো হাজার হাজার উত্তরসূরী—এই শিক্ষা যাঁদের বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

'সীতা'

এই ছবি এক অসাধারণ মানসিক নিবিড়তার বিশিষ্ট দ্যোতনা বয়ে আনে। সম্ভবতঃ ভারতীয় ধরনের পরমা সুন্দরীর কোন মুখের ছায়া এই ছবিতে নেই। ভ্রুযুগল পশ্চাৎ অপসৃত, কণ্ঠদেশ একটু স্থূল—কোন হিন্দু রমণীর সাধারণতঃ এধরনের মুখাবয়ব হয় না। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত ঠাকুরকে তাঁর চিত্রণের বলিষ্ঠতার জন্য অভিনন্দন জানাতেই হয়। রামায়ণে যেমন চিত্রিত হয়েছে, সীতা যে সর্বাগ্রে একজন ভালো নারী—এবং শুধু তারপরেই তিনি একজন মহীয়সী স্ত্রী—একথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। এই ছবিতে, সীতাকে আমরা দেখি—সমস্ত মহৎ অনুপাত ও অনন্য এক প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনকে উপহাস করতে পারেন। তাঁর বিতৃষ্ণা দিয়ে রাবণকে দাহ করতে পারেন। এমন কি এ ছবিতে আমরা এমন একজন মহিলার চকিত সাক্ষাৎ পাই যিনি জনসমক্ষে অবমাননার আগেই আহত আত্মাভিমান নিয়ে মহৎ পশ্চাদপসরণ করেন।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর বন্দিনী সীতার জন্য প্রেক্ষাপট যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গেই নির্বাচন করেছেন। তিনি সীতাকে বসিয়েছেন গরাদের পিছনে, তিনি মহাসাগরের জলের উপর দিয়ে চেয়ে আছেন বাইরে, তাঁর চোখে ঊষার জন্য অনন্ত তৃষ্ণা। তাঁর বন্দীত্ব ও বিষাদকে এদৃশ্য যতটা প্রকট করে তুলেছে নদীর ধারের অশোকবন যা কিছুতেই পারত না। আলোক চিত্রের মধ্যে প্রত্যূষের আকাশের অসাধারণ সৌন্দর্য মূল ছবিটির মত ধরে রাখা অসম্ভব। কিন্তু অবশেষে আমাদের মধ্যে এর একটা আভাস ধরা পড়ে। ভারতীয় মাতৃকা অবশেষে একটা অবয়ব পেলেন। আগামী যুগের প্রতিটি মহৎ শিল্পীই তাঁর নিজস্ব ধরনের সীতাকে সৃষ্টি করতে পারবেন। এ ছবির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে করে বলা যায় যে এমন কি ইউরোপেও এর প্রভাব পড়বে, রাফায়েল কিংবা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, কোরেগ্গিও বা বত্তিচেল্লির আঁকা স্বর্গীয় পরিবারের ছবির মত। কিন্তু আবার একথাও বলতে হবে যে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যিনি সীতা নন এমন কাউকে গ্রহণ করা যাবে না। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আঁকা বলিষ্ঠ এবং মহিয়সী নারীত্ব, রাজকীয় অহমিকার অবনমন, আশাবাদী অথচ নৈরাশ্যপূর্ণ পত্নীত্ব নিয়ে এই যে সীতা আমাদের

মধ্যে এনে দিয়েছেন এক গভীর সন্তোষজনক পরিতৃপ্তি যা খুঁজে পেতে আমাদের কোন প্রচেষ্টাই করতে হয় না।

শাহজাহান ড্রিমিং অফ দ্য তাজ

(শাহজাহানের স্বপ্নের তাজমহল)

পূর্বদিগন্ত থেকে সূর্যাস্তের শেষ বর্ণচ্ছটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। তরুণ চাঁদ এখনো মেঘের অনেক পিছনে। সম্রাট নদীর ধারে একাকী অশ্বারোহণে এসেছেন প্রার্থনা করতে। যে দুজন এক হয়েছিলেন তাঁরা পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হয়েছেন—বিচ্ছেদের সেই ভয়ংকর মুহূর্তের পর অনেকদিন, হয়তো বা অনেক মাস কেটে গেছে ; টাটকা ক্ষতের মতই বেদনায় হৃদয় এখনো স্পন্দমান অথচ প্রশান্তির আভাসও দেখা দিচ্ছে ; আত্মার মধ্যে আমরা বেদনা ও প্রশান্তির মিলনক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। নদীর দূর প্রান্তে নিকটেই রয়েছে একটি সমাধি—তাঁর সমাধি। হে বহতা নদী। হে ছোট্ট সমাধি। হৃদয়ের অভ্যন্তরে আজ আতে কি নিদারুণ শৈত্য। সমস্ত পৃথিবী যখন রহস্যের আবরণে ঢাকা পড়বে, চাঁদ যখন যাবে অস্তালোকে, শাহজাহান তখন একাকী অশ্বারোহণে যাবেন, নামবেন সেখানে, হাঁটুগেড়ে বসবেন, মর্মর চন্দ্রাতপের নীচে, অজস্র আবেগতপ্ত চুম্বনে এই শীতল প্রস্তরখণ্ডগুলিকে অভিষিক্ত করবেন, এই নীরব পৃথিবী, প্রেমিক তাঁর কাছে প্রতীয়মান হবে প্রিয়তমার পোশাক-প্রান্তের মতো। অথচ তখনও হতাশা এবং তৃষ্ণার দাহনে তাড়িত হবেন তিনি। কিন্তু এখন, তিনি প্রর্থনারত। একজন মুসলমান নৃপতির সমস্ত মহিমা এবং রাজসিকতা নিয়ে তিনি ঘোড়ার পিঠে ইতস্তত পরিভ্রমণ করছেন, তাঁর মাথা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে হাত দুটি স্থির, তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। মানুষের জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাসের যে সান্ত্বনাদায়ী প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত বলিষ্ঠ ভাবনায় তিনি তা অনুভব করছেন। শ্বেত মর্মরের দীপ্তি তাঁকে শান্তির বাণী শোনাচ্ছে। মৃত্যুর আড়ালে অন্তর্হিতা যে নারী, কোন সিংহাসনই তাঁকে তুলে ধরতে পারে না। এই মর-পৃথিবীর যন্ত্রণা ও বেদনা প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং দৈব ঘটনা, এসব থেকে কতদূর যেতে পেরেছেন তিনি। এক মহান শ্বেত পক্ষীর মত অসীম থেকে যে আত্মা তাঁর কাছে ভালবাসা ও সমবেদনা বয়ে নিয়ে এসেছিল ডানায়, সে আবার ফিরে গেছে ঈশ্বরের পক্ষপুটে। এই ধুলোর অস্তিত্বই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটা মহান উৎসর্গ। ঘরে প্রদীপ নিবে গেছে কিন্তু দেবস্থানে কি একটি শিখা প্রোজ্জ্বল থাকে না ? জায়া, জননী, রাণী চলে গেছেন, কিন্তু স্বর্গে ভগবানের নতজানু হয়ে এক দিব্য আত্মা পৃথিবীতে তাঁর প্রিয়তমের জন্য প্রার্থনা করছেন।

এরকমই কোন মুহূর্তে কি তাজমহলের স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল ?

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত এই ছবির ভিত্তি হচ্ছে নিম্নলিখিত কাহিনীটি :

"শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করতে যাবার সময় রাণী তাজবিবিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে জৈনাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে নদীর দূর প্রান্তে একটি সুন্দর উদ্যানে তাঁকে প্রথম সমাহিত করা হয়। একদিকে রয়েছে রণপ্রাঙ্গণ, ওপারে বাগানের মধ্যে তাজবিবির ছোট্ট সমাধি। প্রতি শুক্রবারে শাহজাহন একাকী নদী পার হয়ে যান প্রার্থনা করতে।"

এ সৌন্দর্যের আবেদন সকলেরই কাছে এই বিষয়ের নিবিড় প্রশান্তি দাবি জানায় রাত্রিকালীন শিল্পসুষমার, কুহেলীঘেরা চাঁদের আলো প্রলম্বিত হচ্ছে তাজবিবির ছোট্ট সমাধিটির ওপর—সম্রাটের জীবনে এর আধ্যাত্মিক স্থান বিস্ময়করভাবে ব্যক্ত। এই চিত্রণ বলিষ্ঠতাপূর্ণ কিন্তু তবু আমাদের ইচ্ছে হয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরের হাতে আবার বর্ণসুষমা উপভোগ করতে। উজ্জ্বল আকাশ এবং স্বচ্ছ নির্মল আবহাওয়ার এই দেশের চিত্রকলার একদা যা ছিল বৈশিষ্ট্য, সেইসব উজ্জ্বল এবং কোমল অভিব্যক্তির কিছু কিছু আমরা আবার শ্রীযুক্ত ঠাকুরের হাতে ফিরে পেতে চাই, নিজ মহিমায় আবার নিজেই তিনি যাকে অতিক্রম করে যাবেন।

দ্য পাসিং অব শাহজাহান

(শাহজাহানের শেষ বিদায়)

আগামী দিনে একজন মহান ভারতীয় চিত্রসমালোচক হিসেবে যার নাম বহুধাশ্রুত হবে সেদিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বলছিলেন, "তিনি যে শুধু বর্তমানে ভারতের প্রথম সারির একজন বলে প্রত্যাশিত তা নয়, সম্ভবত ইউরোপের ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে।" এ সংখ্যায় অনবদ্য চিত্র 'শাহজাহানের শেষ বিদায়'-এর যে প্রতিলিপিটি ছাপা হয়েছে সেটা দেখলে ডঃ এ. কে. কুমারস্বামীর এই প্রশংসাবাক্যের তাৎপর্য যে কোন অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

কোন কোন জীবনের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে যে সেসব জীবন কতগুলো নাটকীয় যোগ্যতায় পূর্ণ থাকে, এক জীবনেই তারা বহু জন্মের ফসল ঘরে তোলে। তাঁদের প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে রত্নটি এবং তার আধার অদ্ভুত এক সামঞ্জস্যে মিলিত হয়। শাহজাহানের ক্ষেত্রে মূলত এটাই ব্যাপার। বিক্ষুব্ধ তরুণ সৈনিকটি দিল্লীর সম্রাট হলেন ; তাঁর জীবনে, তাঁর রাজত্বে কোন মহিমাই অপূর্ণ রইল না। সফল সেনানায়ক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসক, সমৃদ্ধতম নৃপতি—কোন ভূমিকাতেই তিনি ব্যর্থ নন, অথচ তাঁর তুলনায় নিম্নপদস্থদের জীবনে যেসব ছোটখাটো এবং সূক্ষ্ম আনন্দের অনুভূতি, সেগুলো থেকেও তিনি বঞ্চিত নন। সমগ্র ভারতের সম্রাট শাহজাহান আবার বিশ্বের দাম্পত্য প্রেমের একজন চূড়ান্ত প্রতিভূ হিসেবেও অনন্য এক নায়ক, যা কিছুই তিনি দিতে পারেন, তাতে করেও এক নারীর নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কোন অসুবিধে হয়নি।

এবং যেন এগুলো সবই তাঁর পক্ষে অতি সামান্য। এর পরেও তাঁকে দেওয়া হল প্রিয়তমার সম্মানে অমর সঙ্গীত নিবেদনের দুর্লভ সৌভাগ্য। কেন না তাঁর স্ত্রী আর্জমন্দ বানু ও দেবী এবং জননীস্বরূপা ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত তাঁর প্রতিভার অবদান, সৌধগুলি এবং নগরগুলি, এক সম্রাটের কণ্ঠনিঃসৃত মর্মরে রচিত কবিতা নয় কি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একক নৃপতিই এ ধরনের কোন স্থাপত্য-নিদর্শন রেখে যাননি, এবং শাসনভূমির কোন রাজাই এমনভাবে আবেগে বিহ্বল ও আপ্লুত হননি।

তবুও এই মহৎ জীবন বাস্তবিকই এমন নিখুঁত যে, আমরা জাঁকজমক ও সাফল্যের কোন একঘেয়েমী দেখতে পাই না। বিষাদের সুরটি সঙ্গীতের মধ্যেই ওতপ্রোত, আনন্দময় অনুরাগপর্বের এল দীর্ঘ বিপত্নীক জীবন। প্রোজ্জ্বল সম্রাটজীবনের শেষ হল সপ্তবর্ষব্যাপী কারাবাসে। যাঁর সামনে সমস্ত পৃথিবী নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাত, অবশেষে তাঁর নিজের একটি মাত্র কন্যার দীর্ঘস্থায়ী সেবা ও সুমিষ্ট আশ্বাস ও বিশ্বাস পেয়েই তিনি কৃতজ্ঞ ও গর্বিত হলেন। বিশ্বের সিংহাসন থেকে নেমে এলেন কারাকক্ষে। যেসব ছায়ার মধ্যে শাহজাহান শেষের সেই দীর্ঘ সাতটি বছর কাটালেন তাদের মধ্যে ছিল কোন্ কোন্ স্মৃতি কোন্ কোন্ আশা ?

এখানেই শেষ।

আগ্রা ফোর্টে এখনও পর্যন্ত যে কাহিনী বলা হয় তাতে জানা যায় যে সম্রাটের একান্ত আগ্রহে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিটির শেষ শয্যা নদীর ধারে যুঁইফুলের বেদীর নীচে বারান্দাটুকুতে নিয়ে আসা হয়। জাহানারা তাঁর পিতার চরণপ্রান্তে বসে কাঁদছেন। আর সকলেই সরে গেছেন, কেন না এই সম্মানিত বন্দীর জন্য আর কোন কিছুই করণীয় নেই। গালিচার প্রান্তে পড়ে আছে শেষবারের মত খুলে রাখা রাজকীয় শিরস্ত্রাণ ও জুতোজোড়া। শাহজাহানের জন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কমনীয় রাজকুমারটির বিষণ্ণ আত্মাকে ঘিরে রেখেছে নৈঃশব্দ্য, রাত্রি এবং সঞ্চরণশীল মেঘের ওড়নায় ঢাকা শোকগ্রস্ত চাঁদ।

কিন্তু শাহজাহান নিজে ? তাঁর কাছে এই মুহূর্তটি প্রত্যাশাবিহ্বল। প্রাকারের নীচে বহতা নদীর মৃদু মর্মর শব্দ তাঁকে আরেকটি নদীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যার পাড়ে তাঁর আত্মা দাঁড়িয়ে আছে। নিকটেই, বাঁকাটির পিছনেই একটি শ্বেত ওড়নায় আচ্ছাদিত একটি বায়বীয় অস্তিত্বের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর তাজ। মমতাজের জন্য রাখা সেই তাজমুকুট। কিন্তু আজ রাতে তাজ তাঁর মুকুটের চাইতেও বেশী কিছু, আজ রাতে তাজ তিনি নিজেই, আজ রাতে তিনি তাঁর প্রাচীন দিনের সমস্ত মহিমা ও মাধুর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে অথচ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অনন্য পবিত্রতা। আজ রাতে জলের মৃদু কল্লোলের পিছনে এই রাজসিক অবয়বের প্রতিটি রেখা বলছে এক সর্বব্যাপী পবিত্রতা, শান্তি ও কোমলতার কথা, অপেক্ষা করে আছে সেই তীর্থযাত্রীটির জন্য, যিনি ক্লান্ত পদে, সামনে ঝুঁকে পড়া অবনত মস্তকে এগিয়ে আসছেন। আহা!

যিনি আসছেন প্রাসাদ, কারাগার, রণক্ষেত্র এবং প্রার্থনা-কক্ষ সব কিছু পিছনে ফেলে নিকটেই মৃত্যুর এই শান্ত তীরে।

শাহজাহানের এই শেষ বিদায় সত্যিই রাজসিক, যে রমণীর হৃদয়ের যিনি রাজা, তাকেই তিনি দিয়েছেন সব কিছু, বিশ্বের সব সেরা জিনিস, সমস্ত কিছু দিয়েও বাস্তবিক অর্থেই তিনি সেই চরম মুহূর্তে রাজা।

নন্দলাল বসু

সতী

এ ছবির চিত্রকর যদি হতেন কোন ইয়োরোপীয়, তাহলে আমরা নিঃসংশয়ে বিষয়-বস্তুটিকে দেখতাম সৌন্দর্য ও বিজয়ের অপূর্ব সমন্বয় নিয়ে দর্শকের সামনে উদ্ভাসিতপূর্ণ দৈর্ঘ্যের এক অপূর্ব সুন্দরী নারীমূর্তিরূপে। নন্দলাল বসু অবশ্য যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে এই ধারণাটিকে রূপ দিয়েছেন, ভারতীয় অনুভূতির বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণের দিক থেকে এর থেকে বেশি তাৎপর্যময় আর কিছু হতে পারত না। আমাদের সামনে আমরা দেখছি এক নারীকে, বাস্তবিকই তিনি সুন্দরী ও বধূবেশে সজ্জিতা, তার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে আছে বিজয়ের মুহূর্তটির জন্য অথচ তাঁর নিজের মহিমা সম্বন্ধে তিনি একটুও সচেতন নন। কোন ভারতীয় মনীষী হয়ত এভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে অবয়বটি বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এর মধ্যে অণুমাত্র রজঃ নেই। ঘূর্ণ্যমান শিখাগুলি উর্ধ্বমুখী। আগুনের শিখর-চূড়ায় এক সিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিতা। অথচ তার মনে কোন ভয় নেই। তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে মিশে নেই কোন বিদায়ী ক্রন্দন। তাঁর চোখদুটো কিছুই যেন দেখছে না। নিচের শিখাকেও না কিংবা যেসব প্রিয়জনকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের দিকেও না—একেবারেই কিছু নয়, শুধু যাঁর সঙ্গে তিনি পুনর্মিলিত হতে যাচ্ছেন, সেই পবিত্র অবয়বটি ছাড়া। তাঁর মন স্থির, প্রশান্তিতে আপ্লুত। এই মুহূর্ত হচ্ছে মিলনের মুহূর্ত, বিচ্ছেদের কিছুই তিনি জানেন না।

এই নিখুঁত ভয়হীনতা, যে কোন রকম আত্মসচেতনতার এই অনুপস্থিতির মধ্যেই আমরা পাই নারীর মহিমা সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণাটিকে। বিশ্বাস, স্বাধীনতা, জ্ঞানের অধিকার এই সব বড় বড় কারণে অন্য অন্য দেশে যা করা হয়েছে, এখানে হাজারগুণ সাধারণভাবে তাই করা হয়েছে। গৃহকোণের সূক্ষ্ম কোমলতার সম্মানেই তা করা হয়েছে। যেসব নারী এ সব জিনিস করেছেন তাঁরা চিরকাল ধরে তাঁদের বংশধরদের দ্বারা পূজিত হন, এবং এটাও ঠিক যে জাত তাঁদের জন্ম দিয়েছে, তাদের সাহসিকতা ও অসামান্য আনুগত্যবোধ কোনদিনই একেবারে লোপ পেতে পারে না; হয়তো বাস্তবিকই এই অর্থ আর কখনো ব্যবহৃত না হলেও চিরকাল গোপনেই থেকে যাবে। ভবিষ্যৎকালে দুনিয়া-কাঁপানো কোন সংকটকালে হয়তো পাবে নতুন কোন ভাষা কিংবা নতুন কোন অভি-

বাঁ। প্রাচীন ভারতীয় গৃহের গৃহবন্দী পত্নীত্ব থেকে মহান কোন সন্ন্যাসিনীর শহীদ-জনোচিত মৃত্যু—সত্যিই কি এটা গৌরবের পথ নয় ? এ পথে প্রতিটি পায়ের চিহ্নই আমাদের প্রণাম পাবার যোগ্য।

শিবনৃত্য

পৃথিবীতে একটিই মাত্র ভারত আর ভারতে মাত্র একজনই শিব। শূন্যতার দেবতা, চরম বৈরাগ্যের দেবতা, ধ্বংসলীলার দেবতা—নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' মতই মহাদেবের এই রূপকল্প মানবমনের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। হিন্দু পুরাণের এই অংশটুকুর মত এমন গভীর আবেগ, এমন দার্শনিক সাহসিকতা এবং অসীমের উদ্দেশ্যে এমন সরাসরি আবেদন সমগ্র বিশ্বে কোন কবিতাতেও নেই। আমাদের চতুষ্পদ পূর্বপুরুষ থেকে আদিমতম বন্য প্রজাতি থেকে শুরু করে উচ্চতম, সভ্যতম প্রজাতি পর্যন্ত আমরা সকলেই জেনে এসেছি মানুষের পিতা এবং বন্ধু, একজন ব্যক্তিগত সখা, সচিব ও পরমজ্ঞানী বন্ধু। একাধারে যিনি স্রষ্টা এবং পালনকারী তাঁকে কি করে পূজা করতে হয়। মোহজাল যিনি ছেদ করেছেন, যিনি আত্মার মুক্তি ছাড়া আর কোন কিছু চানও না, দেনও না, যিনি পৃথিবীর নিঃস্বদেরই শুধু ভালবাসেন, যাঁর আনন্দোল্লাস জাগে শুধু ধ্বংসলীলায়, সেই দেবতাকে ভালবাসতে আমাদের মাতৃভূমির সন্তানরা ছাড়া আর কেউই সাহস পায়নি।

পুরাণ এবং উপকথার শিব কিন্তু ইনি নন, ইনি হচ্ছেন পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি, অটুট নিশ্চয়তার শিব, এঁকেই প্রলয় নৃত্যের নর্তক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। নটরাজ বা নৃত্যপর রাজা হিসেবে শিব-কল্পনা দক্ষিণ ভারতের সৃষ্টি, সেখানে সমস্ত প্রতীকের মধ্যেই তার এই চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্বের মূল উৎস, দর্শনের আত্মাকেই দক্ষিণ ভারত জয় করেছে। দক্ষিণ ভারতের কাছে আমরা স্থির দেবতা, ধ্যানমগ্ন কোন উদাস সন্ন্যাসী পাইনি, কিন্তু পেয়েছি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতকে এবং সাধারণ শিল্পীর নটরাজকে

আধুনিক যুগ প্রতিটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও অবদানকে সাধারণ ও বিশ্বজনীন করে তুলেছে। অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে আমরা অদ্বৈতকে গ্রহণ করি এবং সেই বিশ্বাসের প্রতীককে রূপ দিই, যেমন ভাবে একজন মহান প্রতিভা এক্ষেত্রে করে দেখিয়েছেন।

শিবনৃত্য চিত্রে সমাহিত অবস্থা হয়ে উঠেছে গতিশীল, এতে সমাধিকেই শারীরিক ক্রিয়াকলাপরূপে দেখান হয়েছে। এছাড়া আর কোনরকম হওয়া সম্ভব ছিল না। স্বর্গের সমস্ত স্তম্ভ আর খিলান ধ্বসে পড়ছে, ত্রিশূল জ্বলছে। সমগ্র বিশ্ব অগ্নিবেষ্টিত এবং অমর স্বপ্নবিলাসী তিনি ভগবৎ চেতনার মদিরাপানে মত্ত অবস্থায় নৃত্য করছেন। নাচের মধ্যে যে ঐকতান শুধু সেটুকু অভিমুখে তাঁর চেতনা জেগে আছে। এই নাচ

সমগ্র বিশ্বকে তার ছন্দের লীলায় মাতিয়ে তোলে এবং এর ছন্দে ছন্দে দিবারাত্রি আবর্তিত হয়।

আবার বলছি, এ ধরনের ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক তেমনি, এ শিল্পকর্মটিতেও আমরা অবহিত হই একটি নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক আত্মসমাহিত অনুভূতি সম্পর্কে, এখানে এসে সমালোচনার শক্তি হারিয়ে যায়। শিল্পীকে যে ধারণা ব্যাকুল করেছিল, সেই ভাবাবেগে আমরাও আন্দোলিত হই।

কৈকেয়ী

কৈকেয়ী এখনো পর্যন্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে উঠতে পারেননি। এখনো পর্যন্ত তিনি গোঁসাঘরে প্রবেশ করেননি। তাঁর কাছ থেকে অপসৃয়মানা কুজা দাসী মন্থরার মাথাটুকুই শুধু দেখা যাচ্ছে, তা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে। দশরথের রাণীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা বা সকলের চাইতে সুন্দরী কৈকেয়ী একাকী বসে আছেন, তাঁর মাতৃত্ববোধ, মহত্ত্ব ও উচ্চাশার লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কৈকেয়ীর প্রায় সেই ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা প্রায় সেই মুহূর্তটাকে দেখতে পাচ্ছি, যখন তাঁর স্বামী ও সন্তানের সুখ সম্পর্কে তিনি নির্বিকার হয়ে পড়বেন এবং তিনি একাকী মাধুর্যের তীর থেকে স্বার্থপর লোভের তরণীতে একাকী পাড়ি দেবেন। সেই তিনি, যিনি ছিলেন রাজার কাছে একদা আনন্দময়, পুষ্পের মত, তাঁরই পরিণাম লেখা আছে স্বামীহন্ত্রী হিসাবে; তাঁরই স্বামীর জীবনের সূত্রটিকে খড়্গাঘাতে ছিন্ন করতে তিনি উদ্যত। অনারীজনোচিত প্রলোভনের এই মুহূর্তে তাঁর সৌন্দর্য অনেকটা পুরুষের চরিত্র পেয়েছে। রাজরক্তে যেমন দেখা যায়, তেমনি শক্তিমত্তা ও একগুঁয়েমী রয়েছে এখানে। দশরথ ও তাঁর পুত্ররা তাঁর মধ্যে যে কমনীয়তা ও মৃদুতা খুঁজে পেতে ব্যগ্র ছিলেন, এই নিদারুণ সংগ্রাম তার কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। এবং কি চমৎকারভাবেই না তাঁর শাড়ীর পাড়ের তরঙ্গিত বাঁকগুলো রাণীর মনের সংঘাতময় অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তুত করে দিচ্ছে। কৈকেয়ীকে এখানে লেডী ম্যাকবেথ ধরনের নায়িকাদের সঙ্গে একপর্যায়ে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর মধ্যে ভারতীয় চরিত্রের সূক্ষ্মতা ও অনুভূতিপ্রবণতা রয়েছে, যা সেই ভয়ংকর স্কট জায়ার চরিত্রে আমরা দেখিনি। কৈকেয়ী এখানে আরো অনেক বেশী জটিল, অনেক বেশী মানবিক। তিনি যতটা পুরুষের মত, তার চাইতে অনেক বেশী নারী। লেডী ম্যাকবেথের বলিষ্ঠতা ছিল এমনই, মাঝে মাঝে তার স্বামীকে নারীর ভূমিকায় চলে যেতে হত। কৈকেয়ী আমাদের মনে অনেকটা করুণার অনুভূতিকেই যেন জাগিয়ে তোলেন। তিনি নিজেই যেন তাঁর সেই প্রকৃত ও মহত্তর সত্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, বিপর্যয়ের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে আবার একদিন যার কাছে ফিরে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে হবে।

অবচেতনায় আমরা জানি যে পাশ্চাত্য নায়িকার মন যখন আবছা ভাবে জানতে পারবে তার অপরাধের চরিত্র কি, তখনই তিনি নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে যাবেন ; অতিথি এবং রাজার হত্যায় যে পর্যায় শুরু তা সম্পূর্ণ হবে আত্মহত্যায়। কিন্তু কৈকেয়ীর আত্মার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে সব কিছু জুড়িয়ে দেওয়া অনুতাপের প্রবাহ। এই মুহূর্তে তিনি রহস্যময় নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র ; তাঁরই ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটতে থাকবে। কিন্তু চিরকালের জন্য এখানেই তাঁর শেষ নয়।

দশরথের মৃত্যুশয্যা

এই চিত্রের সরল করুণ রসটুকু তাঁদের কাছেই সব চাইতে বেশি উপভোগ্য যাঁরা মূল চিত্রটি দেখেছেন। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারকাখচিত রাত্রি। এই প্রহর অন্ধকারের, শয্যার পাশে একটি দীপশিখা সে অন্ধকারকে একটু ফিকে করে তুলছে। দীপশিখাটিকে দেখাচ্ছে অনেকটা সূক্ষ্ম সোনালী সুতোর মত। কৌশল্যার ঘরে দশরথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁর মুখে জেগে রয়েছে বেদনা ও তৃষ্ণা, তাঁর চিন্তাশীল ভঙ্গিমাতে ব্যঞ্জনা আছে, তিনি কান পেতে আছেন কোন প্রত্যাবৃত্ত পদধ্বনির আশায়, যে পদধ্বনি নিজ মুখেই বলবে তার নিজের কাহিনী। রাণী তাঁর স্বামীকে হাওয়া করছিলেন—রাণী না বলে তাঁকে শুধু পত্নী বলাই ভাল। কিন্তু সহসা যেন তাঁর নিজের নিঃসঙ্গতার চিন্তা ও দশরথের দুঃখে অভিভূত হয়ে পাখাটাকে যেন একপাশে ছুঁড়ে ফেলেছেন এবং দুঃখ ও প্রার্থনায় মিশে তাঁর মাথা হাতের উপর অবনমিত। শীঘ্রই বয়স্ক রাজার আত্মা বিশ্বের উন্মুক্ত পরিসরে যাত্রা করবে—তিনি পড়ে থাকবেন পতিহীনা, পুত্রহীনা একাকিনী। যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, কিন্তু যে যন্ত্রণা বিস্ময়করভাবে অভিব্যক্তিতে সংযত সে যন্ত্রণাই কিন্তু আমাদের চেতনার গভীরে স্পর্শ করে। আমরা জানি যে এখন থেকে কৌশল্যার জন্য নৈশ-বায়ু এ প্রহরের উদ্দেশ্যে শোক করবে। আমরা জানি যে তাঁর জীবনে এর পর আসবে বহু বর্ষব্যাপী একাকীত্ব, তাঁর বৈধব্য হবে পরম পবিত্র ও সুন্দর। অথচ এখানে কিন্তু দুঃখের কোন স্থূল অভিব্যক্তি নেই। সবকিছুই স্থির চুপচাপ নিয়ন্ত্রিত। জলরঙে আঁকা মূল রেখাচিত্রটি যার হাতে থাকবে তিনি ফিস্‌ফিস্ করে কথা না বলে পারবেন না। এই অঙ্কনে নিবিড়তার যাদু এমনি স্বমহিম।

এই রেখাচিত্রটি কলকাতার কলাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর কাজ। এখন আর একথা বলা যায় না যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই শুধু তাঁর নিজস্ব অঙ্কনধারাটির ধারক। তিনি একটি অনুধারকগোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কলাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রকৃত মূল্যসম্পন্ন মৌলিক কাজ দেখাতে শুরু করেছেন। এখন একথা বলা যায় যে অবশেষে একাধারে প্রকৃত ভারতীয় ও প্রকৃত আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্ম হয়েছে। মানব প্রচেষ্টার এই ক্ষেত্রটিতে এখন ভারতীয় মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঘটনা ঘটে যাবার পর সচেতন হওয়াই বিধি এবং সহজ কিন্তু এই নতুন অঙ্কনধারার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে হয়তো পূর্বাহ্নে অবহিত হওয়া সম্ভব। দর্শকের চোখে প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে তা হচ্ছে তাদের ধ্যান-ক্ষমতা। দেখে মনে হয় প্রতিটি ছবিই মহান নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পরিকল্পিত হয়েছে। আরেকভাবে বলা যায় যে ভারতীয় শিল্পীদের রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণকে চিত্ররূপ দেবার অসাধারণ ক্ষমতা। এই গুণটি আমাদের সামনের ছবিটিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই পত্রিকার অন্য সংখ্যায় আরেকজন শিক্ষার্থীর 'সূর্য' বলে যে অসাধারণ ছবিটি ছাপা হবে, তারও একই বৈশিষ্ট্য। 'ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কুরুক্ষেত্রের সংবাদ বলা' ছবিটিতেও শোনা যাচ্ছে একই গুণ পাওয়া যাবে—নিবিড়তাকে সংযত রাখার ব্যঞ্জনা।

আরেকটি যে বিশেষ গুণের জন্য ছবিগুলো লক্ষণীয় তা হচ্ছে একটা সরল জাঁকজমক ও সূক্ষ্মতা। এখানে রাজার শয়নকক্ষের আসবাবপত্র হচ্ছে একটা আরামকেদারা, একটা বাতি, একটা গালিচা ও একটা পাখা। প্রতিলিপিতে মৌলিক রঙের সেই জোরটা কিছুতেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, তাই কেদারাটিতে, পাখা ও শাড়ীতে রাণীর বাহুবলয়ে—শয্যাপার্শে প্রলম্বিত পর্দার পিছন দিয়ে উঁকি দেওয়া অপূর্ব নীচু ঝুলন্ত বাতিটিতে সোনালী রঙের ছোঁয়া যে কি অসামান্য অলংকরণ তা বোঝানো সম্ভব নয়। বিরাট প্রস্তরময় জানলাটিকে ফাঁকা রাখা হয়েছে—তাতে আরেক রকম অনবদ্যতার স্পর্শ। গৃহস্থালী আসবাবপত্রের এমন মহিমা, এমন সূক্ষ্মরুচি এই ছেলেরা কোথায় শিখলেন। গালিচার নকশা এবং মেঝের সাদাকালো টালির কাজ একটু বেশী প্রকট। কিন্তু মূল ছবিটিতে ত্রুটি নেই।

ভারতে অতীতের গৌরবের সমতুল্য নতুন কোন মহান শিল্পের জন্ম নিয়ে যারা আগ্রহী এবং যাঁরা এর ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎসাহী, তাঁরা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীন কলাবিদ্যালয়ে যেসব নতুন কাজ করা হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলোর দিকে আনন্দিত চিত্তে দৃষ্টিপাত করতে পারেন। মিঃ ই. বি. হ্যাভেল এই সম্ভাবনাগুলো পূর্বাহ্নেই দেখতে পেয়েছিলেন এবং এগুলোকে ফলপ্রসূ করবার জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

অহল্যা

বাবু নন্দলাল বসুর আঁকা এই ছবিটি, এই ক্ষমতাশালী শিল্পীর অনন্য কৃতিত্বসমূহের অন্যতম। প্রস্তরীভূত নারীটির অথবা বশিষ্ঠমুনি, তরুণ নায়কগণ, যেদিকেই আমরা তাকাই, আমাদের একই অনুভূতি জাগে ; এটা এরকমই হওয়া উচিত তা না হলে এটা এত সুন্দর হত না। যেকোন বয়স অথবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে এরকম একটা ছাপ মুদ্রিত করতে পারা একটা বিরাট জয়। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে একথা

স্বীকার করলেও এখানে একটা ত্রুটির কথা আমরা অনুভব না করে পারি না। এমনও হতে পারে যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীনতা এর ত্রুটির উৎস। রাম এবং তার ভাই লক্ষ্মণের সৌন্দর্য এবং সূক্ষ্মতা বড় বেশী। তাঁরা প্রায় রমণীজনোচিত, জন্ম ও জাতিগত সূত্রে তাঁরা অভিজাত। তাঁদের দেহের প্রতিটি রেখায় তা মুদ্রিত। তাঁরা দয়ালু, দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিশাপের বন্ধন থেকে যে রমণীকে রাম মুক্তি দিতে যাচ্ছেন, তার প্রতি তাঁর করুণা স্পষ্টতই অভিব্যক্ত। কিন্তু অভিজাতবংশজাতা সুন্দরী রমণীরাও এভাবে অনুভব করতে এবং চাইতে পারেন। স্পষ্টত পৌরুষের স্পর্শ আমরা এখানে দেখতে পাই না। আমরা চাই সেই মানুষকে যিনি শুধু পুরুষ এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর আপোসহীন অদম্য বলিষ্ঠতা নিয়ে তিনি আর কিছু হতে পারেন না। আমরা ঈশ্বরের এই অবতারের মধ্যে চাই গৌরব, মহিমা এবং কমনীয়তা। আরেক দিক দিয়ে ঋষির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাঁর মুখেই বা কেন এই দুর্বলতা বা প্রকারান্তরে অমায়িক ভাব? সমগ্র গোষ্ঠীটির মধ্যে ব্যক্তিত্বের সারল্য ও অনুতাপের কঠোর মহিমা নিয়ে একমাত্র অহল্যাকেই মনে হয় বলিষ্ঠতম উপাদান। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করি যে, বহু শতাব্দী ধরেই প্রকৃত ও মহিয়সী নারীসত্তা এদেশে নিদ্রিত। এসো, বিশ্বের, প্রভু—তোমার করুণাধারায় তাকে বন্ধন মুক্ত করো।

দময়ন্তীর সয়ম্বর

দেবতাদের কাছে দময়ন্তীর আবেদনের মুহূর্তটি এই চিত্রে ধরা হয়েছে। নিষাদরাজ যে মঞ্চে অধিষ্ঠিত, দময়ন্তী সেখানে পৌঁছেছেন। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিনি সেখানে রয়েছেন। কিন্তু হায়! তাঁরা সে পাঁচজন, কি করে দময়ন্তী তাঁর বাক্‌দত্ত স্বামীকে চিনে নেবেন?

শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখলে আমরা এ দৃশ্যকে কমণীয়তা ও মাধুর্যে মণ্ডিত দেখি। রঙের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে। এ দৃশ্য প্রায় একটিমাত্র রঙেই আঁকা।

নলের দেহাবয়ব সম্ভবত অতিমাত্রায় তারুণ্যমণ্ডিত ও পরম সুন্দর। আমরা একথাও বিশ্বাস করি না যে সৌন্দর্যের যুগে মানুষ চারপাশে গদিতে ঠেস দিয়ে হাতে ফুল নিয়ে উপবিষ্ট হতেন। একথাও মনে হয় যে, তরবারী জিনিসটা বোধহয় প্রকৃতই ছিল রাজাদের হাতের খেলনা। তবুও স্বীকার করতে হয় যে, প্রাচীন কাহিনীটির গরিমা ও প্রচ্ছন্ন হাস্যরসটি সুন্দরভাবেই ফুটে উঠেছে।

বলা হয়ে থাকে যে, ইউরোপীয় মনের তুলনায় ভারতে দময়ন্তীকে ততটা হার্দ্যভাবে আদর্শায়িত করা হয় না। এটা দুঃখজনক। কেননা তাঁর চরিত্র নিশ্চতই বিশ্বজনের স্বপ্ন-বিলাসের দাবী রাখে। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে—সম্ভবত গান্ধারীকে বাদ দিলে আদি আর্য নারীসত্তার প্রাণশক্তি ও জটিলতার এমন বলিষ্ঠ সজীব নিটোল উদাহরণ আর একটিও নেই।

দময়ন্তী তাঁর সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে অনেকটা সেক্সপীরীয় নারীদের মত। অথচ তাঁর আহত স্বামীর প্রতি স্নেহময় কোমলতা, সমস্ত ছোটখাটো মানবীক ত্রুটিবিচ্যুতি সমেত মানুষ নলকে চিনে নেওয়া ("ধুলো ও ঘাসে আপ্লুত, ম্লান হয়ে আসা মাল্যে আচ্ছাদিত ভূমিস্পর্শী তাঁর চরণযুগল")—ভারতীয় প্রতিভার মূল বস্তুকে মূর্ত করে তোলেন। —অতি নাটকীয়তা থেকে যা অনেক দূরে এবং অনুভূতি প্রকাশে যা অনবদ্য ও সংযমী। রাজকুমারীত্ব, মাতৃত্ব, স্থৈর্য, দূরদৃষ্টি, চূড়ান্ত পত্নীত্ব, পবিত্রতা, ধৈর্য, অসীম বুদ্ধিমত্তা—প্রাচীন কাহিনীগুলিতে এই সব গুণেরই পরম্পরাক্রমে গুণগান করা হয়েছে। এঁদের অন্তরের ঐশ্বর্যে মানুষ প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এখনো এটি বৈদিক যুগ, দেবতারা এখনো অর্চিত, সর্পকুল এখনো ইন্দ্রজাল বিস্তারে সক্ষম। তবুও বৈদিক যুগ অতিক্রান্ত হতে চলেছে, কেন না দেবতারা প্রায় হাস্যকর ও লঘু হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এখন আর বিরাট কোন শক্তিও নন, এমন কি তেমন বড়ো কোন যোদ্ধাও নন, পৃথিবীতে বসবাসকারী সর্পকুলের তুলনায় এঁদের কাছে পৌঁছোন বরং সহজ। এবং দেবগণ মানুষের মতোই নল ও দময়ন্তীর মধ্যে মূর্ত সত্য ও পবিত্রতার সর্বনিয়ন্তা আদর্শের প্রতি একান্ত দাবীটুকু ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন।

ভারতীয় সৌন্দর্যের যুগের অনিন্দ্য কুসুমনিচয়ের অন্যতম এই কাহিনীটি। ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথায় এর জুড়ি মিলবে?

জগাই এবং মাধাই

বাবু আনন্দলাল বসুর জগাই ও মাধাইয়ের ছবিটি বিশুদ্ধ রেখাচিত্র পদ্ধতিতে আঁকা, ওয়াশ বা রঙের ছোঁয়া প্রায় নেওয়া হয়নি বললেই চলে। এই বিদ্যায়তন ও শিল্পীর পক্ষে চিত্রটি মহান প্রাযুক্তিক বিজয়ের আরেকটি নিদর্শন। কেন না, এ ধরনের একটা কাজ সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ শ্রম, ছোটখাটো খুঁটিনাটির প্রতি যতখানি মনোযোগ দিতে হয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বলিষ্ঠ শারীরবৃত্তের অংকন, হাজার হাজার ছোট আঁচড়ে তৈরী চুল, পাগড়ির সুনির্দিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা, মডেলিং-এর আভাস—বহু ওয়াশের হাল্কা কাজ, আলোছায়ার সঠিক সংস্থান—এ সব কিছুই সূচিত করছে সময় এবং ব্যক্তির অমিত ব্যবহার। মোট কাজটি কি অনবদ্যই না হয়েছে! এই ছোট্ট শিল্পকর্মটির প্রাযুক্তিক ত্রুটিশূন্যতার আরেকটি অসাধারণ প্রমাণ এই যে, আতস কঁচের তলায় ধরলে দুটো মুখের ছাঁচই সব চাইতে স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে।

বড়ো একটা নদীর ধারে একটা বালুকাস্তূপের আড়ালে হাসিখুশী দুই বীর চর্মাসন বিছিয়ে বসেছেন ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করে কাটাবার অভিপ্রায়ে। নিকটের পাজী লোকটিই মদের পাত্র ও তিনটে পেয়ালা নিয়ে এসে বসেছে—আমাদের এমনটি ভাবতেই

ইচ্ছে করে। তার কাছে আমোদ প্রমোদের এটাই পন্থা। কিন্তু দূর প্রান্তের দুজনের কেউই যে মাদুরের উপর তারা বসে আছে তার বাইরে আর কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে না ; তাদের সামনে যে ফলের রেকাবীটি রয়েছে, মনে হচ্ছে তাদের কাছে সেটাই রাজভোগ। মদের পাত্র যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন যে হুঁকোর নিদ্রালু আনন্দ আসবে তারও যেন পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। রূপোলী রঙের তরল পদার্থটির দিকে মুহূর্তের জন্য জগাই-মাধাইয়ের দৃষ্টি পড়ামাত্র তাদের গ্রাস করল একটা তৃতীয় অবস্থা। পার্থিব আনন্দের চাইতে কল্পনার আনন্দই এমন কি মদিরা পাত্রের মধ্যেও তাদের কাছে বড়—এমন একটা দ্যোতনাই যেন সূচিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যপানের ভঙ্গিতে তারা মুহূর্তের জন্য থমকে আছে, চুমুক দেবার আগে ক্ষণকালের জন্য ভাবিত।

যে আনন্দ তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেটা কিন্তু নিতান্তই নির্দোষ। তারা পাগলাটে ধরনের লোক, কিন্তু দুর্বৃত্ত নয়, শিশুপ্রতিম কিন্তু ধূর্ত নয়। বিহ্বলতার প্রহরেও তাদের আনন্দের মধ্যে গর্হিত কিছু নেই। অভিজাত বংশে জন্ম এবং সূক্ষ্মরুচির পরিচায়ক, সুন্দর হাত উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ লক্ষণীয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের মত যে স্নেহের বন্ধনে এরা আবদ্ধ, তার মধ্যে একটা খোলামেলা সহজিয়া, সতেজ ভাব আছে। এমন কি তাদের পাপের মধ্যেও পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতায়, তারা বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির অধিকারী।

দুর্লভ সৌভাগ্যক্রমে তারা এমন ধাতুতে গড়া যে ধাতুতে সাধু সন্ন্যাসীরা তৈরী—এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা, কেন না মানুষ যখন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয় অথবা স্থূলতায় আপ্লুত হয়ে থাকে, এমন আকস্মিক পরিবর্তন সচরাচর ঘটে না। ধর্মীয় ইতিহাসে এমন অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের নিদর্শন ভূরি ভূরি ছড়িয়ে থাকলেও যেমন ভাবে চিত্রিত হয় এসব ঘটনা কিন্তু ততটা দৈবী নয়। এগুলো দৈব নিশ্চয়ই। কিন্তু আত্মার যে চরম মহিমা ও পুণ্যফল প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাকে যদি দৈব ধরে নিই, শুধু সেই অর্থে। বিধি এবং যৌক্তিকতার বাইরে কিন্তু এসব ঘটনা নয়। যে রাস্তার ধারে তাঁর বাস ছিল সহসা সেখানে একদিন মেরী ম্যাগডালেন খ্রীষ্টের ছায়ায় যদি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তবে সে ঘটনার কারণ এটাই যে তাঁর নিজের মধ্যেই চিরকাল ছিল এই আদর্শের জন্য অন্তঃশীলা এক অনুসন্ধান, তাঁর নিজেকে বিলিয়ে দেবার মত একটা নৈর্ব্যক্তিকতা। অনুরূপভাবেই, বাংলাদেশে এত জনপ্রিয় জগাই-মাধাই (তারা সর্বত্রই সমাদৃত কেন না তাদের পিছু পিছু আশার বাণী আসে) ঘোর দুষ্কৃতির মধ্যে ডুবে ছিল এটা ভাবা ভুল হবে। তাই যদি হ'ত, নিত্যানন্দ তাদের প্রতিটি প্রহারের বিনিময়ে হাজার হাজার আলিঙ্গন উপহার দিলেও তাতে কোন ফল হ'ত না। কিন্তু না, আসলে তারা ছিল শান্ত জনপদের শান্তি ভঙ্গকারী। তারা ছিল দুর্ধর্ষ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন রূঢ় ব্যবহারিক রসিকতায় মজা পাওয়া ধরনের লোক। তারা তাদের আশপাশকে বিধির বিরুদ্ধাচরণ ও হট্টগোলে ডুবিয়ে রাখতে ভালবাসত কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা ছিল,

সদাচারী। তাদের রুক্ষতা ছিল আসলে ভয়শূন্যতা, তাদের নিষ্ঠুরতা ছিল চিন্তাহীনতা। তাদের হৃদয়ের জ্বালানি ছিল আগেই স্তূপীকৃত, অপেক্ষা ছিল সহৃদয় প্রেমের আগুনে জ্বলে ওঠা। সে আগুন প্রোজ্জ্বলিত হল সেই দিন, যেদিন ভগবৎ-চেতনার মদিরাপানে মত্ত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে সেই রূঢ় প্রহারকারীদের দিকেই বাহু প্রসারিত করে দিলেন, যাদের প্রহারে তক্ষুণি তাঁর রক্ত ঝরেছে। সেই মুহূর্তেই জগাই এবং মাধাই প্রথম উপলব্ধি করলেন এতকাল তাদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা ছিল আসলে একটি বিরাট খোঁজা। তাদের মধ্যেই এতকাল অচেনা হয়েছিল এক অদ্ভুত পরমানন্দ। মদিরা পানের সমস্ত প্রত্যাশা এবং হতাশার ব্যাখ্যা এখানেই। তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্তি অবশেষে ব্যাখ্যাত হল, এবং অজানার এক পথে পৌঁছতে হবে। তা হলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দ কি এখানেই বিদায়! কৃত্রিম সমস্ত উত্তেজনাকে এখানেই বিতাড়ন! এখন থেকে সর্বোত্তমের অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের সন্তোষ হবে না। শান্ত শিষ্ট নদীয়া নগরের দুর্বৃত্তরা হয়ে উঠেছে শিশুপ্রতিম সন্ন্যাসী। যারা উপাসকদের নির্যাতন করে বেড়াতেন তারা এখন শিক্ষক ও পূজারীর ভূমিকা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদের সামর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আমাদের সামনের এই চিত্রটিতে, যেখানে মদিরা সঞ্জাত আনন্দ কোনভাবেই স্থূল অথবা নিম্নরুচির নয়।

বিক্রমাদিত্য এবং বেতাল

প্রতিলিপির আবছা ভাবের মধ্য দিয়ে ছবিটির ভাষা বুঝতে হচ্ছে। বিক্রমাদিত্য রাত্রিকালে পথে হেঁটে চলেছেন, তাঁর পিঠের কংকালসার ভুতুড়ে মূর্তিটি চেপে আছে; রাজা পরাজিত হবেন, এই আনন্দে সে বিচিত্র হাসি হেসে চলেছে। বেতাল কেমন অপার্থিব! বিক্রমাদিত্য কেমন শিশুপ্রতিম এবং স্থির সংকল্প। রেখাচিত্রটি সশ্রদ্ধ ভাবের উদ্রেক করে। এই চিত্রটি অদ্ভুতরসের শিল্পকলা। আমরা অদ্ভুতরসের শিল্প-কলা ভালবাসি চাই নাই বাসি, এই ছবিটির ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার মধ্যে ভারতীয় নির্ভিকতা, বলিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে।

সে যাই হোক, শিল্পকলার শিক্ষার্থীদের একথা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তাদের প্রকৃত কাজ হচ্ছে সুন্দরকে প্রতিফলিত করা। যা কিছু সত্য, যা কিছু ভাল তাকেই রূপ দেওয়া। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ধাবমান মুহূর্তগুলোতে নয়, অনন্ত বিশ্বজনীনকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরাই তাদের কাজ। হাস্যরস হচ্ছে জীবনের ক্ষেত্রে নুনের মত এবং কিছুটা সঞ্জীবনী; কিন্তু হাসি ফোটাতে তেমন বড় প্রতিভার প্রয়োজন নেই, সীতা কিংবা যুধিষ্ঠিরের ছবি আঁকতে যে শক্তিমত্তার প্রয়োজন।

ছবিটির কাহিনী হচ্ছে :

উজ্জয়িনী নগরে একই দিনে একই সময়ে তিনজন মানুষের জন্ম হয় ; প্রথম জন বিক্রমাদিত্য, রাজগৃহে তাঁর জন্ম ; দ্বিতীয়জন একজন কলু ছিলেন ; তৃতীয়জন একজন যোগী বা সন্ন্যাসী, যার অভ্যাস ছিল কালীর কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই বলি দেওয়া। এই যোগী কলুর ছেলেকে মেরে ফেলল এবং রাজা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে কলুর ছেলের মৃতদেহ শ্মশানের ধারে ঝুলিয়ে দিল ; তারপর বিক্রমাদিত্যকে বলল অন্ধকার রাতে শ্মশানে গিয়ে বেতাল (রক্তচোষা) গ্রস্ত ওই মৃতদেহটি নিয়ে আসতে, যাতে করে সে মা কালীর সামনে একটি নরবলি দিতে পারে। যোগীর উদ্দেশ্য ছিল মৃত কলুর ছেলের শবের উপর বসে বিক্রমাদিত্যকে বলি দেওয়া। এই বেতাল যখন বিক্রমাদিত্যের পিঠে চেপে যেতে যেতে তাকে পঁচিশটি কাহিনী শোনায়— বেতাল পঞ্চবিংশতি। প্রতিটি কাহিনী শেষ হলে বেতাল আবার শ্মশানে ফিরে যায়, প্রতিবার আবার বিক্রমাদিত্যকে গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনতে হয়। পঞ্চবিংশতিতম গল্পটি বলতে গিয়ে বেতাল তাঁকে যোগীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলে এবং বিক্রমাদিত্যকে অনুরোধ করে তাকে হত্যা করে মা কালীর কাছে নরবলির ফল পেয়ে পৃথিবীর রাজা হতে।

বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়

সমুদ্র মন্থন

হিন্দুপুরাণে সমুদ্র মন্থন এমনই একটা বিষয় যা পড়লে মনে হয় যে কোন শিল্প-প্রতিভাই বিষয়টিকে চিত্রের পরিসরে ও অনুপাতে ধরতে পারবেন না। কিন্তু এই ছবিটি আমাদের ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন করছে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে শৈশব থেকে গল্প শুনে শুনে একজন হিন্দু এই ধরনের একটা জটিল ও বহুধা বিস্তৃত বিষয়কেও তার নিজস্ব ধরনে মানস চক্ষে প্রতিফলিত দেখেন। এখানে অসুরদের যে হাস্যরস ও বৈচিত্র দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে তা তেমনিই মনোরম ও কমনীয়, পরীপ্রতিম মুকুটধারী দেবগণ, তাঁরা রয়েছেন বাঁয়ে। কিন্তু অ-মানবীয় উপাদানকে রূপ দেবার কাজে শিল্পীর ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সীমিত। সমুদ্রবক্ষকে মেঝের মত চিত্রিত করেছেন তিনি, যার উপরে আধিভৌতিক সত্তারা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে—এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত কিন্তু সমুদ্রবক্ষে মাছের ছবি এঁকে সমুদ্রকে সমুদ্র বলে বোঝানোয় তাঁর প্রাচীন আসিরীয় পদ্ধতির অবলম্বন খুব সুখকর নয়। সমুদ্রের অতল থেকে উদ্গীর্ণ আগুন এবং ধোঁয়ার আবছা ইঙ্গিত ঠিকই আছে। কিন্তু মন্দার পর্বতের শিখরের মাঝামাঝি জায়গায় কেন তিনি মন্থন রজ্জু সাপটি দেখালেন ? কেন না সাপটি সুনিশ্চিত পিছলে যাবে। কেনই বা তিনি এর নীচে অর্থাৎ জলের কাছাকাছি, রাখলেন সব স্ফুলিঙ্গ ও বিন্দুগুলি যা সূর্যালোকের খুব কাছাকাছি নয় ? একটা ঝর্ণার শীর্ষের ইঙ্গিতবহ বর্ণচ্ছটাই বা কেন ? স্বর্গীয় মন্থনের ফলে যে সব বস্তু উঠে এসেছে, তার অন্যতম হিসেবে চাঁদকে দেখানো

হয়েছে, কিন্তু সেটিও একটু বেশী সোচ্চার। সমুদ্রকে দেখানো হয়েছে মাঝামাঝি দূরত্বে কিন্তু তার রেখাগুলো এতই মসৃণ যে মনে হচ্ছে এক নীচু দেয়াল খাড়াখাড়ি উঠে আসছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা সাপের মাথাগুলি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। গাছের মত করে সাপেরা ভেতরে বাইরে ডালপালা মেলে না। এবং মন্দার পর্বতের গায়ে পাক দিয়ে থাকা সর্পদেহের স্থূলত্বের তুলনায় তাদের সরু সরু গলা এবং ছোট ছোট মাথা অনেকটা অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের মত মনে হয়। তার চাইতে বরং দেবতাদের ব্যবহৃত রজ্জুর মত জিনিসটি অনেক ভাল যদিও শেষ প্রান্তে এসে লেজের চূড়ান্ত বিন্দুটি খুব একটা সাপের মত নয়।

এই সমস্ত দিকগুলো দেখিয়ে দিয়ে আমরা শিল্পবর্মটির ত্রুটির তালিকা শেষ করে ফেলেছি। একথা সর্বজনবিদিত যে সব দেশের শিল্পীদের কালে দেবদূতের ডানার জোর, দ্বিতীয় জোড়া বাহু, সাপের অতিরিক্ত মাথা ইত্যাদি দুরূহতম অসুবিধাজনক ও হোঁচট খাওয়ার সামিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্পকলা এই সব সমস্যার মোকাবিলা এমন সাহসিকতা ও মহিমার সঙ্গে করেছে যে ভারতীয় শিল্পীদের কাছে আমাদের দাবী নিঃসংশয়ে বড় বেশি। ছবির মানবীয় দিকটিতে ফিরে এসে আবার বলি যে এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভাবেই অনেক কিছুই বলার আছে। একদিকে এতে রয়েছে বলিষ্ঠতা ও অদ্ভুত রসের খেলা অপরদিকে তেমনি বলিষ্ঠ অথচ মহান সৌন্দর্যরস, সমগ্র ধারণার শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা অনস্বীকার্য।

অমিতকুমার হালদার

বীণা

"কি সুর বাজে আমার প্রাণে
আমি জানি, মনই জানে"—

এখানে আমরা অঙ্কন, রঙ ও পটভূমিকার দিক থেকে অবর্ণনীয় সুন্দর ছোট্ট কাজ দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপর ছেয়ে থাকা অনন্য সুনীলে এসে মিশছে বর্ণাঢ্য হৈমন্তী ছোঁয়া। সম্মুখবর্তী নারীটির স্বপ্নবিলাসী অথচ চিন্তামগ্ন ভঙ্গিমার সঙ্গে খাপ খেয়েছে ঊষা। কিংবা সায়াহ্নের প্রাঙ্গনের ছন্দ—যাতে বিশালতা ও নিঃসঙ্গতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নারীটি যেমনভাবে তাঁর হৃদয়ের সঙ্গত অন্বেষণ করছেন, তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন তাঁর হাতের বীণার মৃদুমধুর গুঞ্জরণ শুনতে পাচ্ছি। এ ধরনের রত্নসদৃশ কাজের উপস্থাপনা পুস্তক অলংকরণের ব্যঞ্জনা আনে। এ ছবিটির নীচে একটা পত্র কিংবা চতুর্দশপদী কবিতা থাকলে মানানসই হ'ত। সে যাই হোক পারসিক অলংকরণে বাংলা লিপিটি দেখে আমরা একটু বিভ্রান্তি বোধ না করে পারি না। এর কারণ কি? সেই প্রবাদ বাক্যটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—

"জলের মধ্যে বাস করি ত্রিকোণ শরীর
মৎস্যও নয়, কূর্মও নয়, নহি কোন বীর"।

শুধু কি সৌন্দর্যের কারণেই পারসিক লিপিপদ্ধতি অনুকৃত হল ? পারসিক লিপি নি সন্দেহে সুন্দর, কিন্তু বাংলা লিপিও তো সুন্দর। তবে কি চিত্রটির বিষয় বস্তুর সঙ্গে মানানসই বিশেষ কোন ভাবাবেগের খাতিরে এই প্রয়োগ ? এই ধরনের কোন ব্যাখ্যা দিলে সম্ভবত প্রকৃত কোন পারসিক যাজক আমাদের উপর আদৌ সন্তুষ্ট হবেন না। লিপির এই উৎকেন্দ্রিকতা বাদ দিলে, শিল্পকর্মটি অসাধারণ সূক্ষ্ম, শিল্পীকে আমরা তার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুখলতা রাও

শহীদ শ্রীমতী

'বৌদ্ধ উপকাহিনীর এক শতক' নামক একটা প্রাচীন নেপালী গ্রন্থে শহীদ শ্রীমতী কাহিনীটি পাওয়া যায়। ইতিহাসের দিক থেকে এটি অসার, কেননা এতে যে সব ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, বুদ্ধের সমসাময়িক এবং ভক্ত অজাতশত্রুর সঙ্গে সম্ভবত তার কোন যোগাসূত্র নেই। আদৌ যদি কাহিনীটিকে সত্য বলে ধরতে হয় তাহলে এর কালকে হাজার বছর এগিয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্মের শত্রু বাংলাদেশে শশাঙ্ক রাজার শাসনকালে নিয়ে আসতে হয়। সিংহাসনে আরোহণের সময়ও প্রভু বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর চিহ্নিত সাক্ষাৎকারকালের অন্তর্বর্তী সময়ে, সম্ভবত রাজা অজাতশত্রু। এই মহান গুরুর প্রতি একটা বীতরাগ ও নিস্পৃহতাবোধে ভুগেছেন। কিন্তু এখানে যতদূর বলা হয়েছে, এই বীতরাগ ততদূর যাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়াও স্বয়ং বুদ্ধের জীবৎকালেই বুদ্ধের ছোটখাটো ব্যাক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পূজা অর্চনার এতটা বাড়াবাড়ি আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এ সত্ত্বেও কাহিনীটির একটা নিজস্ব আবেদন আছে। স্তূপার্চনা কিভাবে হ'ত, ঘটনাক্রমে এথেকে আমরা সে বিষয়ে অবহিত হই। ভারতবর্ষে চিন্তাশক্তির এমন ব্যাপ্তি এবং দার্শনিক উদারতা এমন যে, এখানে ধর্মীয় শহীদত্ব প্রায় অসম্ভব। তাই যে কোন পরিস্থিতিতেই বিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এমন সব নামের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। যে আদর্শ বা যে কারণে আমরা সানন্দে মৃত্যু বরণ করতে পারি, জীবনের ক্ষেত্রে তার চাইতে মহৎ আর কিছু নেই। এ জিনিস ছাড়া ইতিহাস অসার হয়ে উঠত। এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন আছে। শহীদ শ্রীমতীর কাহিনী হচ্ছে পূজা অর্চনায় ঐকান্তিকমগ্ন এক ভারতীয় রমণী কি করে ফাঁসির মঞ্চের ভয়কে অগ্রাহ্য করে অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত্যু-বরণ করলেন, যেন অনন্ত স্বর্গসুখের দরজা তাঁর কাছে খুলে গেল।

অবদান শতকে বলা হয়েছে যে "রাজা বিম্বিসার প্রভুর কাছে সত্য দীক্ষা পেয়ে তাঁর অন্দরমহলে প্রভুর কেশগুচ্ছ ও নখকণা নিয়ে তার উপর এক বিরাট স্তূপ নির্মাণ করেছেন। দাসীরা সেই স্থানে প্রতীদিন পূজা অর্চনা করত। পিতাকে হত্যা করে

সিংহাসনে আরোহণ করবার পর অজাতশত্রু মৃত্যু ভয় দেখিয়ে পুরাঙ্গনাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন যে স্তূপে কেউ আর পূজা-অর্চনা করবে না। কিন্তু শ্রীমতী নামে এক দাসী তার নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্তূপমূলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রদীপমালায় সজ্জিত করেন। রাজা অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আদেশ দেন। মৃত্যুর পর দেবপুত্রী হয়ে শ্রীমতী প্রভুর সামনে একটি বেণুকুঞ্জে আবির্ভূতা হন। জ্ঞানের বজ্রাঘাতে মানব দুঃখের পাহাড় বিদীর্ণ করে তিনি তার ঈপ্সিতকে পেলেন।"

শ্রীযুক্তা সুখলতা রাওয়ের অঙ্কিত এই ছবিতে আমরা শ্রীমতীকে স্তূপের সামনে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাই, তাঁর হাতে রয়েছে আরতির দীপ, স্তূপের পদপ্রান্তে পড়ে আছে পূজার ফুল। আমাদের মনে হয় যে ফুলগুলো সরাসরি মেঝেতে থাকলেই ভাল হত, কেন না প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এমন একটা রচনায় সস্তা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা একটা বেনারসী ট্রে সুর কেটে দিচ্ছে। আমাদের আরো মনে হয় যে স্তূপটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর এবং অর্চিত বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে উপাসিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ হলে আরো ভাল হ'ত। কিন্তু ছবিটিতে নৈঃশব্দ ও মহান বিস্তৃতির একটা ইঙ্গিত আছে। মৃত্যু দূতের নিকটে এগিয়ে আসছে কিন্তু তারা এসে দেখতে পাবে একটি মগ্ন অভিভূত আত্মাকে। শহীদ শ্রীমতী শুনতেও পাবেন না।

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অভিমন্যু

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত 'অভিমন্যু' এমন একটা ছবি যার নাম দেওয়া যেতে পারত 'উপসাগরের কূলে' অথবা 'ভরসার শেষ বিন্দুতে'। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তাঁর ধ্বংসসাধনে উদ্যত সপ্তরথীর সম্মুখে। তাঁর তূণ নিঃশেষিত। তাঁর ধনু ভেঙ্গে গেছে। তিনি নিজে তার পরিত্যক্ত রথটির চাকা ঘেঁসে পিছু হঠছেন অস্ত্র নেবার জন্য। তিনি কুরু-সেনানীকে ছত্রভঙ্গ করেছেন কিন্তু নিজে এখন তিনি শত্রুপরিবেষ্টিত। তাঁর সামনে এখন পরাজয় ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই কিন্তু এখনো তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দেননি।

রণক্রিড়ার আনন্দ এখনো তাকে ছেড়ে যায়নি। তরুণ মুখটির ওপর এখনো কোন ছায়া পড়েনি। তাঁর চেহারায় গরিমা ও স্বাধীনচেতা ভাব এখনো পর্যন্ত হতাশা বা ভয়ের ছায়ায় ম্লান হয়নি। একজন বীর ও বীরপুত্রের এমনটাই হওয়া উচিত। শত্রু এবং মিত্রকে সমজ্ঞান করে, পরিণামের দিকে না তাকিয়ে যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ—এই মনোভাবই তো যথোচিত। এই চিত্রের একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে প্রয়োগগত। তরুণ বীরের মুখটি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও পৌরুষদীপ্ত, কিন্তু দেহাবয়ব, কটিদেশ, অর্দ্ধউপবিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

সম্পূর্ণভাবেই নারীজনোচিত। শিল্পীর তরফে জীবন নিরীক্ষার অভাবেরই ফল এটি। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যে এখানে মানবদেহ নিরীক্ষার প্রচুর সুযোগ। আমরা অবশ্য শিল্পীর প্রস্তুতির জন্য শবব্যবচ্ছেদগৃহে অস্থিসংকুল শারীর বিদ্যাচর্চা অথবা শিল্পীর মডেলের নগ্ন বা অর্ধনগ্ন রূপ দেখাকে অপরিহার্য মনে করি না। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে সবচেয়ে বড় বড় ত্রুটিগুলোর উৎস উপরি উক্ত দুটি বিষয়ে নিহিত আছে। নদীর ধারে কিংবা রাজপথের ধারে যে জীবনধারা তাকে-পর্যবেক্ষণ করার মধ্যেই সুযোগ রয়েছে শিল্পীর শারীরবৃত্তীয় জ্ঞানার্জন। মাঝি, মুটে, মালী, পুঁতির মালা গলায় গ্রাম্য নারী, এইসব বিভিন্ন ও অনন্য সব পোশাকে সজ্জিত দেহ আমাদের পথে পথে হেঁটে যায়, গলিতে গলিতে খেলে বেড়ায় শিশুরা।

পারীতে এক বছর কাটিয়ে আসার চাইতে কোলকাতা কিংবা বেনারসে একঘন্টা কাটালেই যথেষ্ট। সেজন্য কোন শিল্পীর পক্ষে আগে পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও আত্মস্থকরণের কাজ সম্পন্ন করে অবয়ব ও অঙ্গ সঞ্চালনের উপর দৃঢ় অধিকার অর্জন করতে হয়। তা না করে কোন শিল্পী যখন কোন একটা দেহকে সাজিয়ে এবং ভঙ্গিমা দিয়ে দাঁড় করিয়ে, তা দেখে ছবি আঁকার ছেলেমানুষী ইউরোপীয় অভ্যাসের দাসত্ব করেন অথবা কোন পুরুষের চিত্র আঁকতে গিয়ে কোন রমণীকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেন তখন আমরা অসুখী বোধ না করে পারি না। এক্ষেত্রে শিল্পী ঠিক তাই করেছেন। এমন কি এই যোদ্ধা রাজপুত্রের বেশভূষাতেও সামগ্রিকভাবে একটা স্ত্রীজনোচিত ভাবই আসে, সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ভাবে যতই তাদের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করা যাক না কেন। পৌরুষ, দার্ঢ্যের যে রুক্ষতা এখানে তার কিছুই পাওয়া যায় না। আমৃত্যু সংগ্রামের রক্ত চিহ্ন বা ধূলিচ্ছটা কিছুই এখানে নেই। এই অভিজাত তরুণকে দরবার কক্ষের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। এমন কি তার চুলের মণিমাণিক্যগুলি পর্যন্ত একটুও অবিন্যস্ত হয়নি।

অলংকরণগুণের দিক থেকে ছবিটি অবশ্য খুব আকর্ষণীয়। প্রতিলিপিটি যখন এত বর্ণাঢ্য ও উজ্জ্বল, মূল চিত্রটি নিশ্চয় আরো অনেক সুন্দর। সৌন্দর্যানুভূতির দিক থেকে বিচার করলে শ্রীগুপ্তের মধ্যে এমন সব গুণ আছে যা তাঁকে বহুদূর নিয়ে যাবে। তাঁর এখন প্রয়োজন আদর্শসমূহকে সম্যক অনুধাবন এবং বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সংকট মুহূর্তকে উপস্থাপিত করতে তাঁর মননশক্তির চূড়ান্ত প্রয়োগ।

রামসীতার অভিষেক

ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারী কমিটি সম্প্রতি এই ছবিটি কিনেছেন।

এ ছবিটির বর্ণসমাবেশ যাঁরা নিজের চোখে দেখেননি তাঁদের এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া অসম্ভব। মুখ্যত হলুদের বিভিন্ন মাত্রায় চিত্রিত এই ছবিটি ছোট্ট হলেও

একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। ছবিটির আনুমানিক কাল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। শিল্পীর নাম জানা নেই। শৈলীর দিক থেকে একে লক্ষ্ণৌ ধারার অন্তর্ভুক্ত বলাই সুবিধাজনক। এই শৈলীর সম্পূর্ণ ইতিহাস বাঁকিপুর নগরের একটি অভিজাত মুসলমান পরিবারে অপূর্ব পাঠাগারে লভ্য। মোগলদের অধীনে ধর্মপুস্তক চিত্রণ-পদ্ধতির ধারারই একটি পরিবর্তিত বিকাশ হচ্ছে এই শৈলী।

ধ্যানধারণার দিক থেকে সীতা ও রামের অভিষেক মধ্যযুগীয়। ইউরোপীয় চিত্রকলায় স্বর্গসভার যে সব চিত্র আছে তার সঙ্গে এটি তুলনীয়। কিন্তু এখানে যে অনায়াস সরলতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবধারাটি ব্যক্ত হয়েছে আমি আর কোথাও সেরকম দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। চিত্রটিতে আছে রাজার উদ্যান ও সিংহাসন, পিছনে রয়েছে একটি রাজপ্রাসাদ। এটাই হয়েছে স্বর্গের রাজকীয় ও স্বর্গীয় গৃহ। স্বর্গীয় যুগল পূজিত হবার জন্য আসন পরিগ্রহ করেছেন। তাঁদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এই পবিত্র নাটকের অন্যান্য কুশীলবেরা ও তাদের লোক-লস্কর। পটভূমিকায় অযোধ্যার শ্বেত প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। একটা আতস কাঁচ সহযোগে খুঁটিনাটি অনবদ্য ত্রুটিহীনতা এখানে লক্ষণীয়। এই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিত্রানুপাতের নিখুঁত যথাযথতা। শিল্পীর মনে নিঃসংশয়ভাবে সর্বদাই লম্বিত আর সমান্তরাল রেখাগুলি পৌঁছিয়ে যেতে যেতে এক বিন্দুতে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু অযোধ্যা এখানে একটি জায়গামাত্র, নগর নয়। এই আত্মার বাসগৃহ, শ্বেতপ্রাচীরে ঘেরা একটি দৃশ্য, এটি বহুজন অধ্যুষিত কোন দেশ নয়, এটি একটি রাজকীয় স্বর্গীয় আবাসভূমি। ইউরোপীয় মনের উপর গীর্জা যে ছাপ সর্বদাই মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছে, এখানে ঠিক সে আদর্শই শিল্পীর মনে প্রতিফলিত। তবে অনুরূপ চিন্তাভাবনা ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত কোন ইতালিয় চিত্রে আমরা সম্ভবত এই পবিত্র জনগোষ্ঠীর পটভূমিকা হিসাবে কোন বিরাট নগরীর অংশবিশেষ উপস্থাপিত দেখতে পেতাম। ভারতীয় চিত্রে ঐক্য ব্যক্ত হয়। ইতালিয় চিত্র সম্ভবত টুকরো টুকরো ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে, একটি ধারা বলে, একটি পরিপূর্ণ সাযুজ্য বিশিষ্ট সামাজিক বিন্যাসের কথা—তার সন্তান-সন্ততিদের চেতনায় সেটি সর্বদা উপস্থিত। অপর ধারাটি হয়তো উচ্চারণ করে জটিলতর অমেয় কোন অনুভূতির কথা, কিন্তু নান্দনিকভাবেও তা অপেক্ষাকৃত কম নিখুঁত।

এ ছবিতে ব্যবহৃত সমস্ত মুক্তোগুলোই খাঁটি, সেগুলো চিত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবির ফ্রেমটি আয়নার। শিল্পীর পরিচয় অজ্ঞাত।

পুভি দ্য শভান

সেণ্ট জেনেভিয়েভের পারী পর্যবেক্ষণ

স্যাঁত জেনেভিয়েভ হচ্ছেন নারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী (সন্ন্যাসিনী)। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে নিদ্রিত নগরীর উপর তিনি প্রার্থনারতা। পারীর প্যান্থিয়নের দেয়ালে স্যাঁত জেনেভিয়েভের জীবনী নিয়ে পুভি দ্য শভান যেসব মহান ফ্রেশকোর কাজ করেছেন, ছবিটি তার অন্যতম। ফরাসীরা তাঁদের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মৃতের বিশ্রামগৃহ এই বিরাট গীর্জাটিকে ঐতিহাসিক ও লোকায়ত ম্যুরাল চিত্রকলা দিয়ে অলংকৃত করেছেন ; হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের ফেডারেশন হলকেও আমরা ঠিক এভাবেই সাজাব। এই বিশেষ চিত্রটি প্রায় প্রাচ্যদেশীয় হয়ে উঠতে পারতো। বয়স্কা সন্ন্যাসিনীর মাথায় ঘোমটা। অবশ্য এই ঘোমটা সন্ন্যাসিনীর প্রাচ্যদেশীয় গৃহিণীর মত নয়। তাহলেও এখানে আত্মীয়তার একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আরো লক্ষ্য করি, প্রাঙ্গনের প্রাকার, বহু অট্টালিকার সমতল ছাদ, নিদ্রিত নগরীর সুসজ্জিত স্তম্ভনিচয়, অনেকটা আমাদের তুলসী গাছের মত গোলাপ গাছ এবং দ্বারপ্রান্তে ছোট্ট দীপটি। স্যাঁত জেনেভিয়েভের মুখাকৃতি ও দেহাবয়ব কোন হিন্দু বিধবারও হতে পারত। এধরনের শত শত নিদর্শন কি আমাদের জানা নেই!

তাই, নিদ্রিত বিশ্বের সতর্ক প্রহরী ও অভিভাবিকা রূপে নারীত্বের যে চিরন্তন ব্রত—এই আদর্শকেই আমরা আধুনিক চিত্রকলায় লোকায়ত সত্তার সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি রূপে ফিরে পাই। অতীতে যেমন গৃহ ও গীর্জার ক্ষেত্রে, তেমনি ভবিষ্যতে নগরী ও জাতির উপর স্পন্দমান প্রার্থনার শক্তি, প্রশস্ততর চেতনা ও বৃহত্তর ভাবনার আলোকে ছড়িয়ে পড়বে।

জে. এফ. মিলে

অ্যাঞ্জেলাস

শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বের কথা প্রত্যেকেই শুনেছেন এই ধরনের তারতম্য ছোট মাপের মানুষের হাতে শুধুই যে বিবৃতিমাত্র, উপরি উক্ত ছবিটিতেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেন না জাঁ ফ্রাঁসোয়া মিলের চাইতে মহত্তর কোন বস্তুবাদীর কথা আমার জানা নেই। ইউরোপীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি পবিত্র নাম স্বরূপ একটি ফরাসী গ্রাম বার্বিজঁকে যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেই ক্ষুদ্র শিল্পীগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর চাইতে বড় বস্তুবাদী হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ তাঁর এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম 'অ্যাঞ্জেলাসে' যে আদর্শবাদের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে তার নজির কি আর কোথাও আছে?

এখানে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন 'অ্যাঞ্জেলাস' শব্দটি হচ্ছে এক ধরনের প্রার্থনা, বরং বলা যায় একধরনের উপাসনার নাম। মেরী নাম্নী সেই কুমারীকে দেবদূত এসে অভিবাদন জানিয়ে যখন বলেন যে তিনি খ্রীষ্টের জননী হতে যাচ্ছেন, সেই অভিবাদনে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল তাই দিয়েই তৈরী হয়েছে এই উপাসনা পদ্ধতি। "হে মেরী! হে লাবণ্যময়ী কুমারী। প্রভু আছেন তোমার সঙ্গে। নারীদের মধ্যে তুমি মহিমান্বিতা, তোমার গর্ভের ফল—খ্রীষ্ট ও পবিত্র।" একটি অতি বিশেষ অর্থে কোন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর কাছে এই অভিবাদন বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে অবতারবাদের স্মৃতি ; মানবীয় এবং স্বর্গীয় সত্ত্বার মধ্যে যে রহস্যময় সংযোগ, তাঁর বিশ্বাস অনুসারে যা খ্রীষ্ট রহস্যের সমাধান স্বরূপ, এই উপাসনার মাধ্যমেই তা মূর্ত হয়। তাই নিষ্ঠাবান ক্যাথলিকগণ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যার নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রহরে এ শব্দগুলো নিজের মনে উচ্চারণ করার একটা অভ্যাস রপ্ত করেন। ক্যাথলিক দেশে কিংবা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী গৃহে গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে এই প্রার্থনার জন্য একটা সাধারণ সংকেত দেওয়া হয়, সমস্ত কার্যধারা ক্ষণকালের জন্য থামলে পরে শান্তভাবে এ শব্দগুলি পুনরাবৃত্ত হয়।

এই ছবিতে তাহলে আমরা সেই মুহূর্তটিকে প্রত্যক্ষ করছি। স্বর্গ এবং মর্তের মহান এক নাট্যমুহূর্তে, ক্ষেতে আলু তোলার কাজে ব্যস্ত কয়েকজন চাষী অ্যাঞ্জেলাস ঘণ্টাধ্বনিতে সচকিত হয়ে তাদের সরল শ্রদ্ধাভরে বিহ্বল হয়ে আছে। ছবিটির দিকে তাকালে পরে চাষীরা ক্ষেতটি, ফসলগুলি এমন কি সুদূর গীর্জার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই না, কিন্তু প্রার্থনায় পবিত্র একটি জাতির শ্রমের যে গভীরতর ও মহানতর সত্তা, তার সম্বন্ধে অবহিত হই।

আমার সর্বদাই মনে হয় যে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীর কাছে এই ছবিটি একটি বিশেষ বার্তাবহ। প্রকৃতি থেকে সরাসরি মিলের কাছে আসেনি। এমন কোন কিছু এ চিত্রে নেই। এই দৃশ্যের প্রতিটি জিনিসই বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ। কিন্তু তাহলেও বস্তুর এই প্রতিরূপ কিন্তু আলোক চিত্রের মত নয়, বরং কোন কবি অথবা সন্ন্যাসীর চোখে দেখা জিনিসের মত। এক মহৎ মানুষের হৃদয় এবং মন এখানে বস্তু ও প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছে। এটি বস্তুবাদ। সত্যি। কিন্তু এটি আদর্শবাদও। হায়! এর তুল্য প্রশংসনীয় ও আদরণীয় কোন দৃশ্য বা কোন মূর্তি আজকের ভারতে কি পাওয়া যাবে না?

ম্যাডোনা অ্যাণ্ড চাইল্ড

চিত্র সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত টীকা

স্মরণীয় ইউরোপীয় চিত্রাবলীর প্রতিলিপি করতে গিয়ে শুধু আধুনিক শিল্পকর্মগুলির জন্যই বেশ কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। বর্তমান যুগে ইউরোপীয়

চিত্রকলার বিষয় ও কলাকৌশল সম্বন্ধে পাঠকের মনে এইভাবে একটা ব্যাপক ছাপ মুদ্রিত করার আশা আমরা রাখি, তারপরে প্রাচীনতর যুগে পেঁছিয়ে যাব ; প্রাচীন মহৎ শিল্পকর্মগুলি আদর্শস্বরূপ বেশ কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি করে আমরা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাব কি ভাবে এই ক্ষমতা অর্জিত হল।

অবশ্য এই প্রণালী নির্বাচনের আর একটা কারণও আছে। কেন না বস্তুত আমাদের পাঠকেরা যদি প্রথমেই 'বত্তিচেলির' আঁকা 'ভার্জিন অ্যাণ্ড চাইল্ড' ; 'হবেমা'র আঁকা 'এভনিউ অফ ট্রিস্ এ্যাট মিডেল্ হারমিস্', 'রাফায়েলের' বেশ কয়েকটি ম্যাডোনা এবং 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চির'—'লাস্ট সাপার' দেখে ফেলেন তাহলে তাঁরা আর আধুনিকদের ন্যূনতর গুণসম্পন্ন কাজগুলি দেখতে চাইবেন না। প্রাচীন যুগের মানুষ চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে অনেক বেশী তন্নিষ্ঠ ছিলেন, তারই ফলে তাঁরা এমন সব ধারণার জন্ম দিতে পেরেছেন, যাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনন্ততার আভাস। তাঁরা এঁকেছেন মহামহিম শৈলীতে। আধুনিক কাজ ন্যূনতর, অধিকতর ব্যক্তিগত, এতে খোঁজা হয় চকিত অপসৃয়মান অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি। এবং সে কারণেই এগুলি অনেক সময় অনবদ্য হয়েও দর্শকের মনে তাৎক্ষণিক ছাপ ফেলে।

অপর পক্ষে এগুলো যখন ব্যর্থ হয়, তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুচ্ছতা ও অতি নাটকীয়তা ; যেক্ষেত্রে প্রাচীন শিল্পী সর্বদাই ছিলেন আন্তরিক। তাঁরা কখনোই আত্মসচেতন ছিলেন না এবং অনেক বিষয়েই তাঁরা অতিরঞ্জন করলেও আড়ষ্টতা কিংবা স্থূলতা দোষে দুষ্ট হলেও তাঁদের কোন ক্ষেত্রেই গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বলা যায় না।

এই সব পার্থক্যের একটা বড় কারণ নিহিত আছে এই তথ্যে যে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইতালি, জার্মানি এবং হল্যান্ডের শিল্পীদের ক্ষেত্রে আধুনিকদের তুলনায় বিষয়বস্তু নির্বাচনে ছিল সীমিত সুযোগ। প্রথমত, অন্তত ইতালির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁরা ধর্মীয় বিষয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু আঁকেননি। তারপর তাঁরা গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক্সের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকতে শুরু করলেন। তখন আমরা পেলাম ভেনাস, অরোরা, সূর্যদেবতা এবং এ ধরনের আরো অনেক কিছু। বস্তুবাদের ধারণা অথবা সাধারণ জীবনের সাধারণ জিনিসের ছবি আঁকার ধারণা জন্ম নেয় হল্যান্ডে। এখনকার দিনে যেটা প্রায়শই দেখা যায় যে একেকজন শিল্পীর ক্ষেত্রে একমাত্র ভাবনাই থাকে এমন কিছু আঁকা যা ইতিপূর্বে কখনো আঁকা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইউরোপের স্বপ্নবিলাসীরা এবং কবিরা—এবং রঙের ভাষায় কাব্য লেখেন যাঁরা সেই চিত্রীরা বারেবারেই প্রাচীন ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে ফিরে না গিয়ে পারেন না। সম্ভবত তাদের এই অনুভূতি জাগে যে প্রাচীন মহৎ শিল্পীদের মতো একটি 'ম্যাডোনা' বা 'লাস্ট সাপার' জাতীয় চিত্র না আঁকা পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের শক্তির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নয়। হয়তো এই আবেগ-এর চাইতে সূক্ষ্মতর আরো কিছু, সাধারণ মানুষের ভাষায় উচ্চতর আদর্শকে অনুবাদ করার একটা আকাঙ্ক্ষা। সে যাই হোক এমন কি আধুনিক

যুগেও বেশ কিছু চমৎকার চিত্রই ধর্মীয় এবং খ্রীস্টীয়। ইতিমধ্যেই আমরা আধুনিক চিত্রকলার যে দুটি নমুনা পেশ করেছি—'পুভি দ্য শভানে'র আঁকা 'স্যাঁত জেনেভিয়েভ ওয়াচিং ওভার পারী' এবং 'জে. এফ. মিলের' 'অ্যাঞ্জেলাস' সেখানে পুরোপুরি না হলেও উপরি উক্ত কথা আংশিক খাটে। কিন্তু এ মাসে আমরা যে ছবি দিচ্ছি, তার ক্ষেত্রে একথা অনেক বিশদার্থে সত্যি। ডাগ্‌নান্ বোভার্ট নামে জীবিত এক চিত্রশিল্পীর আঁকা এটি একটি আধুনিক ম্যাডোনা।

অনেক দিক দিয়ে আলাদা হলেও ছবিটির মূল প্রেরণার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার দরুন মিলের আঁকা অ্যাঞ্জেলাসের সঙ্গে এটিকে খুব ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়। জিনিসটা হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের মিলন ঘটানো। এই ছবিতে অঙ্কিত জননী মূর্তিটি এক ইতালীয় কৃষক রমণী কিংবা এক সন্ন্যাসিনী কি না—আমরা সঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শিশুটি একটি ইতালীয় কৃষক-শিশু। আদত আদর্শকে বিশ্বস্ত-ভাবে রূপায়নের কাজে শিল্পী কোন খুঁটিনাটিকেই বাদ দেননি। যে অঙ্কের মধ্যে আমরা এই যুগলকে উপস্থাপিত দেখছি তা হ'ল একটি কৃষক গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর লতাঘেরা একটি বারান্দা—খুবই সাধারণ দৃশ্য—সম্ভবত কোন ইতালীয় খামার বাড়ী কিংবা কুটিরের আদলে আঁকা। কিন্তু এখানে একটা মঠের ব্যঞ্জনা দিতে চাওয়া হয়েছে। চাষী রমণীর ভারী 'স্যাবোট' সমন্বিত যে সরল পশমী জামাটি রয়েছে জননীর গায়ে তার সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর অভ্যাসের একটা ইঙ্গিত আছে। এই চিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে প্রতীকিও রয়েছে। আমাদের একথা উপলব্ধি করতে হয় যে ইনি যেমন ঠিক খ্রীষ্টের জননীও নয় ঠিক তেমনি একজন আপাত কৃষক পত্নীও নন। আসলে ইনি হচ্ছেন মাতৃবাণী, যে চিন্তাকে আমরা সব চাইতে উপরে স্থান দিই, তাকেই আবার আমরা প্রাণপণে বক্ষে আঁকড়ে ধরি।

এই ছবিকে সম্যক অনুভব করতে হলে প্রথমবার দেখতে হবে আকস্মিকভাবে। শুধমাত্র এই উপায়েই এই ছবিতে ব্যক্ত দৃষ্টির বিস্ময়কর অন্তরঙ্গতার স্পর্শ পেয়ে অভিভূত হওয়া সম্ভব, কোন যুগে আঁকা আর এমন কোন ছবির কথা আমার জানা নেই, যে ছবি নিজের কমনীয়তার রহস্য এমন শক্তিমত্তার সঙ্গে ব্যঞ্জিত করে।

রিখ্‌টার

কুইন লুইসে

নিঃসন্দেহে এই ছবিটি আমাদের পাঠকদের অনেকের কাছেই পরিচিত। প্রুশিয়ার সেই পরমাসুন্দরী রাণীর প্রতিকৃতি, যার নিজের দেশের জন্য বারংবার কাকুতি মিনতিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রথমে প্রায় কান দেননি তারপরে কিছুটা রসিকতা করেছেন এবং সবশেষে আকস্মিকভাবে প্রত্যাখান করেছেন। শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাণী

লুইসের প্রতি নেপোলিয়নের এই তথাকথিত অপমান অনেকেই বেশ নিষ্ঠা সহকারে মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন, যাঁরা ফ্রান্সের সঙ্গে লড়াইকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, এবং ১৮৭০ সালের সেই ভয়ংকর প্রতিশোধ বৃত্তিতে তাদের ভূমিকাও নগণ্য ছিল না। কেন না সংযুক্ত জার্মানীর প্রথম সম্রাট 'গ্রে কাইজার' উইলিয়ামের জননী ছিলেন রাণী লুইসে এবং নব্য জার্মান চিন্তাধারায় তিনি একজন প্রধানা মহীয়সী নারীরূপে পূজিতা।

এখানে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি নেপোলিয়নের অভ্যর্থনার জন্য রাজকীয় পোশাকে বিভূষিতা, নেপোলিয়নের রাজসভার ফ্যাশনের চরিত্র লক্ষণের প্রতিভূ বলে এই পোশাককে বলা হত 'এম্পায়ার গাউন'। একজন মহীয়সী ও সুন্দরী নারীর প্রতিভূ, নিজের দেশ এবং প্রজাদের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ এক রাণী, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দৃঢ়, দারিদ্র্যের মধ্যেও মাধুর্যময়ী ও ধৈর্যশীলা নারীর প্রতিভূ হিসাবে এই ছবি বিশেষ পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। মুকুটটি ও বিবাহের আংটিটি ছাড়া অন্য কোন রকম রত্নরাজির অনুপস্থিতির এই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করছে জাতীয় বিপর্যয়ের কাল-রূপে। উন্নত ভুরু মননশক্তির পরিচয় বহন করছে, তেমনি আরমাইনের ক্লোক উৎসব সজ্জার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখ দুটি ও গাম্ভীর্য ও সরলতামণ্ডিত মুখাবয়ব বলে দিচ্ছে এই নারী রাজাদের মধ্যে আসন নিয়েছেন এবং যিনি জাতির আশা-ভরসার অভিভাবকস্বরূপা, নারীত্বের দিক থেকেও তিনি কিন্তু অসামান্যা। তিনি পবিত্রতা বিনয় ও শ্যালীন সারল্যে বিভূষিতা, যাঁর মননশক্তি একজন রাজ-নীতিজ্ঞের অথচ যার হৃদয়টি শিশুর মত।

জুলে বেতোঁ

কৃষক বালিকাগণ

জুলে বেতোঁর আঁকা এই দুটি কৃষক বালিকা কি সুন্দর ও কি বলিষ্ঠ অথচ কেমন সরস ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ: সূর্যোদয় মুহূর্তে কাজে যাবার পথে গুঞ্জনরত লার্কা পাখির গান শুনে একজন মোহিত হয়ে থেমে গেছে। আরেকজন তার সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে দুলকিচালে বাড়ী ফিরছে। উভয়ক্ষেত্রেই ছবির সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে আপাত পটভূমিকার আড়ালের কোন গভীরে। একজনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ভাবাবেশ যেন বালিকাটির হৃদয় পাখীর গানের সঙ্গে মিশে গেছে, অপরক্ষেত্রে বাদামীরঙের বলিষ্ঠ মুখশ্রীর চাইতেও স্বচ্ছন্দে সঞ্চরমান দেহটির পরিমিতি ও ভঙ্গিমাটি বেশি সুন্দর। এধরনের সৌন্দর্য ভারতের পথে-ঘাটে প্রতিনিয়তই দেখা যায়। দিনের মধ্যে কত শতবার ইচ্ছে করলেই কোন কৃষক রমণী বা মজুরনীর মধ্যে এই

রাজসিক সৌন্দর্য দেখা যায়, কিন্তু হায় এ দৃশ্য দেখবার জন্যে তেমন সশ্রদ্ধ ও সহৃদয় চোখ যেন কারুরই নেই।

আমরা যে সাতটি ছবির প্রতিলিপি উপস্থাপিত করলাম তার মধ্যে ছয়টিই ফরাসী ও একটি জার্মান একথাটি স্মর্তব্য। ফরাসীরা একটা বিষয়ে কোন লুকোচুরি করে না যে তাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্মভূমির পুনরুজ্জীবন—এবং সে উদ্দেশেই তাঁরা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তাদের কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত কঠোর পরিশ্রম করছেন। এমন কি জার্মান শিল্পী রাণী লুইসের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই তাঁর নিজের মহিমার চাইতে জার্মানীর মহিমা প্রকাশ করতে বেশী ব্যগ্র হয়েছেন।

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা জাতীয়তাবোধের আবেগ থেকেই সঞ্জাত। এখনো পর্যন্ত এ মহান ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনক্ষম এবং সৃজনশীল, নতুন নতুন প্রজন্মকে নতুন এবং অনধিগত সমুন্নতিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

গুইদো রেনি

বিয়াত্রিস্ সেন্সির চিত্র

এই সংখ্যায় আমরা যে চিত্রটি মুদ্রিত করছি, তা হল বিয়াত্রিস্ সেন্সির চিত্র—শোনা যায় এটি নাকি গুইদো রেনির আঁকা। বিয়াত্রিসের লোক-প্রচলিত কাহিনীটির খুঁটিনাটি এখানে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন দেখছি না। লোক-কথা অনুসারে তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করার সঙ্গে জড়িত—যে পিতা তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে নির্দোষ এই ঘোষণায় অবিচল ছিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হবার সময় তিনি দর্শকদের দিকে যে বিষণ্ণ হতাশার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, বলা হয়ে থাকে যে এই চিত্রটিতে গুইদো রেনি সেই মরণাহত দৃষ্টিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু বার্তোলত্তির অনুসন্ধানের ফলাফল "শেলীর শক্তিমান লেখনীপ্রসূত সেন্সি-ট্র্যাজেডীর রোম্যান্টিক উপাদানগুলি থেকে কাহিনীটিকে বঞ্চিত করেছে।" "এবং বার্তোলত্তি আরো দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, বিয়াত্রিসের মৃত্যুর পর অন্তত দুটি বছর পার হবার আগে রোমে গুইদো আঁকা সুরু করেননি। সুতরাং রোমের বার্বেরিনি প্রাসাদের অন্যতম ঐশ্বর্যস্বরূপ বিয়াত্রিসের মাধুর্যমণ্ডিত ও বিষণ্ণ মুখাবয়বের এই প্রতিকৃতিটি সম্ভবত গুইদোর আঁকা হতে পারে না।" কিন্তু এই চিত্রের বিষয়বস্তু বা চিত্রকর যেই হোক না কেন, এর সৌন্দর্য প্রশ্নাতীত। কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে যে, এটি বিশ্বের করুণতম চিত্র।

ডিকেন্স ছবিটির বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম: বিয়াত্রিস্ সেঞ্চির প্রতিকৃতি এমন একটা ছবি, যাকে ভুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। মুখমণ্ডলের অসীম মাধুর্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা প্রাঞ্জল কিছু আছে যা আমাকে তাড়া করে ফিরছে। মাথার উপর সাদা রঙের ঢলঢালা আবরণ, লিনেনের ভাঁজের মধ্য দিয়ে বাদামী রঙের চুল ঝুলে পড়েছে। কোন কোন কাহিনীতে বলা হয় যে গুইদো ছবিটি এঁকেছিলেন বিয়াত্রিসের শিরশ্ছেদের আগের দিন রাতে, কেউ কেউ বলেন যে চিত্রটি গুইদো এঁকেছেন স্মৃতি থেকে, তিনি তাকে বধ্যভূমিতে যাবার পথে দেখেছিলেন। আমি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত; তাঁর এই ক্যানভাসে বিয়াত্রিশকে যেমন দেখা যাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে বিয়াত্রিস জল্লাদের চাকাটি প্রথমবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা গুইদোর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে একটি চাহনি মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন, সেই চাহনিটিই তিনি আবার আমার মনে মুদ্রিত করে দিয়েছেন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ভীড়ের মধ্যে তাঁর পাশটিতেই দাঁড়িয়েছিলাম।